প্রকাশক :
শ্রীরণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৫

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বিমল দাস

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস সিণ্ডিকেট,
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

আমার দুই ভ্রাতৃবধূ

নীতা চন্দ্র

ও

আলপনা চন্দ্র

কল্যাণীয়াসু

—দাদা

RAMER ANGATABAS

[A Mythological Novel on Ram's exile in the forest]

BY

Dr. Dipak Chandra

Price : Rs. 40/-

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

উপন্যাস :

জননী কৈকেয়ী

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম (অখণ্ড সংস্করণ)

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়
(১ম ও ২য় খণ্ড)

বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ

কাশ্যপেয়

মহাবিশ্বে মধুকৈটভ

রাবণ বহে নিজ নাম

দ্রৌপদী চিরন্তনী

সমালোচনা সাহিত্য :

মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

বাংলা নাটকে আধুনিকতা
ও গণচেতনা।

সম্পাদনা গ্রন্থ :

হরিবংশ

মনোজ বসুর রচনাবলী (১ম-৪র্থ খণ্ড)

মনোজ বসুর কবিতা

॥ দৃষ্টিকোণ ॥

রামায়ণ পাঠের সময় আমার মনে যে সব প্রশ্ন জেগেছে সেগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে নিয়ে লিখলাম "রাবণ বহে নিজ নাম", "জননী কৈকেয়ী" এবং "রামের অজ্ঞাতবাস"। অর্থাৎ, রামায়ণের একটা সাজানো সংসার।

বাল্মীকির উত্তরকাণ্ডে রামায়ণ সমাপ্ত। একালের লেখক উত্তরকাণ্ড দিয়েই উপন্যাস শুরু করেছেন। বাল্মীকির আর্যকীর্তনে রামভক্তিতে মন যখন গদ গদ, টৈটম্বুর তখন বাল্মীকি যুধিষ্ঠিরীয় সত্যভাষণ করে রাবণ মহিমার উপর দু'চার ফোঁটা শান্তির জল ছিটিয়ে দিলেন উত্তরকাণ্ডে। মিথ্যা ভাষণের অপরাধ স্খালন করতে আর মনের স্বস্তি পেতে যেন আদিকবি ঐ ছিঁটে ফোঁটাটুকু করলেন। কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লে চতুর্দিকে যেমন তার উজ্জ্বল জ্যোতির বিকীরণ ঘটে, তেমনি রাবণের দীপ্ত ব্যক্তিত্বকে রামের বিরাট পুরুষকার দিয়ে চাপা দিতে গিয়ে রাবণ চরিত্রের চতুষ্পার্শে এক জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেখি, রাবণের মহিমা, মহত্ব, শৌর্য-বীর্য রামচন্দ্রের নেই। তবু আর্য কবি, অনার্য মহিমা ধূলিসাৎ করতে রামচন্দ্রকে বড় করে তুলেছেন। ইতিহাস ও সত্যের এই বিকৃতি রামায়ণ পাঠের সময় প্রত্যেকের বার বার মনে হবে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাস ইতিহাস নয়, তার ছায়া মাত্র।

রামায়ণ আর্য কবির মহাকাব্য। আর্য-নৃপতির বিজয় গাথা। আর্যদের মহিমা গৌরব এর বর্ণণীয় বিষয়। আর্যদের সব ভাল, আর অনার্যদের সব মন্দ এই বৈষম্য মহাকাব্যের পাতায় পাতায়। আর্য উপনিবেশ ভারতভূমিতে অনার্য কবির কোন প্রাচীন রচনা পাইনা কেন? আমরা কি কখনও নিজেকে সে প্রশ্ন করি? বেদ-উপনিষদ-অষ্টাদশ পুরাণ-মহাকাব্য সব'ত আর্য কবির রচনা। তাহলে অনার্যদের কি? উন্নত দ্রাবিড় সভ্যতার সাক্ষী কিন্তু মহেঞ্জোদড়ো। এ দেশের মানুষ যখন লিপির ব্যবহার জানত, তখন আর্যরা লিপি কি জানত না। তবু অনার্যসাহিত্য নেই, হল না—এ কি বিশ্বাসযোগ্য? ইতিহাস বলে, আর্যরা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে এ দেশের অনার্য কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের সব নিদর্শন ধ্বংস করেছে নিজেদের স্বার্থে। তারা বড় এবং শ্রেষ্ঠ এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তুলনা করার কোন নিদর্শন রাখেনি। বর্বর আর্যজাতি ইতিহাসের উপর যে নিষ্ঠুরতা দেখাল এদেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয়, সংস্কৃতিমান, উন্নত অনার্যজাতি তা পারল না। ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত ট্রাজেডি। উত্তরকালের অনার্য বংশধরেরা জানল তারা বর্বর, অসভ্য, অশিক্ষিত, অমার্জিত, সংস্কৃতিবিহীন, কৃষ্টিবিহীন এক মানব

গোষ্ঠী। তাদের অতীত নেই ইতিহাসও নেই। সব দেশে সব কালে এই ঐতিহাসিক ধারা চলে আসছে। ইংরেজরা এককালে ভারতীয়দের সব কিছু ছোট করে দেখেছে। অনেক সত্যকে মিথ্যা ও বিকৃত করে এদেশের গৌরবকে খর্ব করেছে, হেয় করে দিয়েছে। আবার এ দেশবাসীর শিক্ষায়-দীক্ষায় উক্ত ধারণাকে পুষ্ট করে ইংরাজপ্রীতি সঞ্চার করেছে। আজকের ঐতিহাসিক গবেষণায় ইংরাজ সৃষ্ট সেই মিথ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু রামায়ণকে নতুন চোখে দেখার কৈফিয়ৎ। বর্তমানে রামায়ণ নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে। এখন রামায়ণ শুধু কল্পনা, আর রূপকথাভরা কাব্য নয়। জীবন্ত ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, কালের কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন খুলে দিয়েছে, দেখেছে রাবণের মুখ। যে মুখের জন্য রাম সংসার, রাজ্য, সিংহাসন, স্বজন ছেড়ে বনে বনে চোদ্দ বছর ধরে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। অনার্য রাজা রাবণের সোনার লঙ্কাকে ধ্বংস করতে ইতিহাসের সভ্য উন্নত আর্যদের লেগেছে চোদ্দ বছর। চোখা চোখা তীর, বাঘা বাঘা অস্ত্র রামের ছিল তা সত্ত্বেও রাবণকে ঘায়েল করতে ৮৮ দিন লাগল তার। এই যুদ্ধ করতে রামচন্দ্র কত নীচে নেমেছে, অথচ রাবণ কোন সম্ভ্রম, গৌরব না হারিয়ে, কারো সাহায্য ভিক্ষা না করে চতুর্দিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে দুই মাস আঠাশ দিন ধবে। ঘরের শত্রু বিভীষণ যদি রামের সহায় না হ'ত তাহলে রামকে পরাভবের গ্লানি, অপমান নিয়ে দেশে ফিরতে হত। এই ঐতিহাসিক অনার্য গরিমাকে আদি কবি একেবারে উল্টে দিয়ে রামের জয়গান করেছেন।

খুব চলতি প্রবাদ হল : "রাম না হতে রামায়ণ" অর্থাৎ রামচন্দ্রের জন্মের আগে রামায়ণ। কথাটা আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। রামায়ণ পাঠের সময় সচেতন পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন রামচন্দ্রের আবির্ভাবের আগেই তার জীবন ও কর্মের একটা ছক আঁকা হয়ে গেছে। দেবতা ও মানুষ মিলে রাবণ বধের জন্য সেই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাটি করেছিল। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রর সেই পরিবেশ তৈরী হয়েছে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে।

রামায়ণ রাম রাবণের যুদ্ধকাব্য। বাল্মীকি রামের মুখ দিয়েই ঘোষণা করেছেন —সীতাহরণ পরোক্ষ কারণ মাত্র। এ যুদ্ধ ক্ষাত্রবংশের গ্লানি মোচনের জন্য। রাক্ষসরাজ্যে আর্যবিজয়কেতন উড্ডীন করার জন্যে। তাহলে পিতৃসত্য রক্ষা করার কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। পিতৃসত্য রক্ষা করতে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিল এতকালের বড় মিথ্যেটা ভাঙবে রামের চোদ্দ বছর বনবাসের দিকে তাকালে। গহন অরণ্যের পথে পথে রামচন্দ্র মুনি ঋষিদের সঙ্গে মিলে শুধু রাবণবধের বিবিধ পরিকল্পনা আর ষড়যন্ত্র করেছে। রাবণবধের কার্য সম্পন্ন করতে রামের বনগমন ছিল অপরিহার্য। অর্থাৎ, **রামের বনবাসের পশ্চাতে অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক গোপন উদ্দেশ্যকে তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থের নাম "রামের অজ্ঞাতবাস"**। বনবাস কার্যতঃ রামের রাজনৈতিক অজ্ঞাত-

রাস হয়ে উঠেছিল। শ্রামচন্দ্রর রাবণবধ সম্পন্ন করতে চোদ্দ বছর লেগেছিল। বাল্মীকি ঐ সময়কালকে রামচন্দ্রর বনবাসের শর্তের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে অনার্যা কন্যা কৈকেয়ীর উপর ঘৃণা সৃষ্টি করল।

রাবণ সীতাকে বিবাহ করবে কিংবা তাকে উপভোগ করবে এই মনোভাব নিয়ে সীতা হরণ করেনি। আসলে, ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে, রামের রাক্ষস বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশ করতে রাবণ সীতা হরণ করেছিল। রামচন্দ্র চক্রান্ত করে রাবণকে নারী হরণে বাধ্য করেছিল। লক্ষ্মণ যদি শূর্পণখার উপর বর্বর আচরণ না করত তাহলে রাম-রাবণের যুদ্ধ হত না। রাবণের নারী হরণের কোন প্রশ্নও থাকত না।

রাবণকে লোকের চোখে ছোট করে তোলার জন্য সীতা হরণের ঘটনাকে বড় করে তোলা হল। কিন্তু বীরপুরুষ লক্ষ্মণ যে অবলা নারীর উপর বিক্রম দেখাল তার কেমন নিন্দা করা হল না। যদিও লক্ষ্মণের বর্বরতা নিন্দার কোন ভাষা নেই। তবু শূর্পণখার নাসিকা ছেদন কিংবা অযোমুখীর স্তন কর্তনের মত জঘন্য বর্বরতা সম্পর্কে পাঠকের কোন আহা-উহু নেই। কিন্তু রাবণের নারী হরণ একটা জঘন্য অপরাধমূলক কাজ বলে নিন্দিত হল। ভীষ্মের কাশীরাজ কন্যা অপহরণ কিংবা অর্জুনের সুভদ্রা হরণকে কেউ বর্বরোচিত কাজ বলল না। অথচ, রাবণ সীতা নামক মহিলাটির প্রতি কোন অশোভন আচরণও করেনি, তার সম্ভ্রম নষ্টও করেনি। রাজ-প্রাসাদে তাকে পরম সমাদরে রেখেছিল, তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেছিল রাজকুলবধূ সরমাকে। তবু লোকে রাবণকে ঘেন্না করল? আর্য কবি তাকে ঘৃণার পাত্র করে আঁকলেন আর্য ঔপনিবেশিকতাবাদের স্বার্থে।

রাবণ সত্যিই সীতাকে হরণ করেছিল কি? এ রকম সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। তুলসীদাসী রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ ও পদ্ম পুরাণে, ছায়া সীতার কথা আছে। বাল্মীকি রামায়ণে লঙ্কায় সীতার অগ্নি পরীক্ষার ঘটনার দিকে তাকালে উক্ত সংশয় আরো জোরালো হয়। অগ্নি সর্বভুক। অগ্নিতে প্রবেশ করে বেঁচে ফিরে আসা এক অবাস্তব ঘটনা। তবু বাল্মীকি লিখলেন, "মূর্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন। জানকী তরুণ সূর্যপ্রভ ও স্বর্ণালংকারশোভিত, তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলংকার ম্লান হয় নাই। সর্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্বাঙ্গ সুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী, ইনি নিষ্পাপ।" মানুষের ধর্মবিশ্বাস, সত্য প্রীতিকে মূলধন করে নকল সীতাকে অগ্নিদগ্ধ করা হল, আর আসল সীতা গ্রহণের এক ভেল্কি তৈরী করা হল। উপন্যাসে এর এক বিশ্বাসযোগ্য আবহ সৃষ্টি করেছি।

সীতা হরণের উপাখ্যান আলোচ্য উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যাপার। রাবণ কাকে হরণ করেছিল? অগ্নিপরীক্ষায় দগ্ধ হল কে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেয়া খুব কঠিন। বিভিন্ন ঘটনা সাপেক্ষে আমার মনে হয়েছে ঐ রমণী শবরী ছাড়া আর কেউ নয়।

রাম শবরীর প্রেম স্বর্গীয়। পদ্মপুরাণে তার এক অদ্ভুত কাহিনী আছে। বন থেকে আহৃত ফল মূল শবরী দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে কামড়িয়ে মিষ্টতা পরীক্ষা করে, তা রামচন্দ্রকে ভক্ষণ করতে দিল। এই ঘটনা খানিকটা রহস্যের ইংগিত দেয়। প্রথমতঃ, ফলে শবরী ও রামের পরস্পরের যে ওষ্ঠে সংযোগ হল তা তাদের নিবিড় প্রণয়ের দ্যোতক। একমাত্র স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেম সম্পর্কে এই ধরনের আহারাদি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু সমাজে এর একটা গভীর দার্শনিক দিক আছে। এই ঘটনা দুটি আত্মার অভিন্ন মিলনের সংকেত। অপরপক্ষে একত্রে আহার বৈবাহিক সম্পর্ক পাকা হলেই একপাত্রে নারী পুরুষের সামাজিক প্রথা কোন কোন দেশে চালু আছে। তৃতীয়তঃ রামচন্দ্র বনবাসকালে বহু ভক্ত রমণীর সংস্পর্শে এসেছে, বহু নারী প্রণয় নিবেদন করেছে, কিন্তু শবরীর অনুরূপ প্রেম সম্পর্ক কারো সঙ্গে গড়ে ওঠেনি, অথবা তাদের সঙ্গে আহার ভাগাভাগি করেও খাইনি। চতুর্থতঃ শবরী মুনিদের মধ্যে বাস করেছে। রামের মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কার্যের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও গৌরব শবরীর সম্যক অনুভব করার সুযোগ হয়েছিল। তাই সে নিজেকে রামের কার্যে উৎসর্গ করেছিল। পঞ্চমতঃ মতঙ্গ মুনি তার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল রামের হাতেই তার মুক্তি। তাঁর মোক্ষলাভের সিঁড়ি। এই বিশ্বাসেই শবরী রামচন্দ্রের সামনে চিতা প্রস্তুত করে অগ্নিতে প্রবেশ করেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম কারণটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

আরো একটি তথ্য হলঃ মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাত্মরামায়ণের এক অদ্ভুত কাহিনী আমার শবরী ধারণার সূত্র। ইন্দ্রজিতের পতন হলে রাবণ দেবতাদের এবং রামকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করল। ঐ ভোজসভায় প্রত্যেককে তাদের স্ত্রীসহ খাওয়া বাধ্যতামূলক এবং কেউ তা না করলে আহারের কোনো ব্যবস্থা হবে না এরকম শর্ত ছিল। রামচন্দ্র ছাড়া আর সকলে পত্নীসহ উপস্থিত ছিল। রামচন্দ্র তার অক্ষমতার দোষ রাবণকে দিলে, সে তা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে। এবং রামকে পুষ্পক বিমানে করে বৈদেহীকে আনতে বাধ্য করে। এই আখ্যানের বাস্তবতা প্রশ্ন সৃষ্টি করলেও সীতা হরণের মধ্যে যে ছলনা ও রহস্য ছিল তা স্পষ্ট হয়। উপন্যাসে আমি এই সূত্রটি গ্রহণ করেছি। এই কারণেই সীতার ভূমিকা পালন করেছে শবরী। লঙ্কার অগ্নিপরীক্ষায় রামচন্দ্র তার মোক্ষলাভের পথকেই কেবল প্রশস্ত করে দিয়েছিল। আর সেই বহ্নিমান চিতা থেকে জনক নন্দিনী জানকীকে রামচন্দ্র এক অদ্ভুত

বিস্ময় উৎপাদন করে জনসমক্ষে গ্রহণ করল। উপন্যাসে তার এক বিশ্বাসযোগ্য আবহ তৈরী করেছি।

উৎস হতে প্রবাহিত জলধারা যেমন নদী নিজের গতিতে বয়ে যায়, রামচন্দ্রের জীবন ও ঘটনা অনুরূপ ধারায় এগিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাস মোট পাঁচটি পর্বে সুবিন্যস্ত। প্রত্যেকটি পর্বের একটি করে শিরনামা দিয়েছি।

রচনাশৈলী প্রসঙ্গে দু'চারকথা বলা আবশ্যক। "জননী কৈকেয়ী"তে রামের বনযাত্রা পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান উপন্যাস কার্যতঃ সেখান থেকে সূচনা। রামের বনগমনের পশ্চাতে বহির্পৃথিবীর বৃহত্তম স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি কাজ করেছিল তার সঙ্গে 'জননী কৈকেয়ী'র পারিবারিক রাজনীতির কোন মিল নেই। বহির্পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে রামচন্দ্রকে সরিয়ে আনতে দশরথ অন্তঃপুরে নিজের তৈরী এক ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ে,—পারিবারিক ট্রাজেডির নায়ক হয়। অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রে রাম নিরুপায় হয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করে বনবাসে যাচ্ছে এই সংবাদ 'জননী কৈকেয়ী'র পাঠক জানেন। তাই এই গ্রন্থের সূচনা এখান থেকে করেছি। রামের অত্রিমুনির আশ্রমে পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন লেগেছিল। মুনির আশ্রমে পৌঁছনোর ঐ সময় সীমার মধ্যেই রাম জন্মের বহু আগে থেকে রাক্ষস অসুর নিধনের যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেবতা ও মানুষ মিলে করেছিল তার এক পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছি উপন্যাসে। একটি জটিল রচনাশৈলীর মাধ্যমেই কাজটা করতে হয়েছে। দিন এবং রথযাত্রার বিরতি বোঝাতে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদের পরিকল্পনা করতে হয়েছে। আর ঐ বিরতির সময় রামের অজ্ঞাতবাসের পশ্চাতে যে ঘটনা, ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা এবং রাজনীতি ছিল তা পাঠকের গোচরীভুত করে ঘটনার পূর্বাপর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। উত্তর কাণ্ডের পূর্বপর্যন্ত ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

পরিশেষে জানাই, এই গ্রন্থ রচনার জন্য একটি বছর সময় লাগল। প্রকাশক ও বন্ধু শ্রীরণধীর পালের ঘন ঘন তাগিদ, উৎসাহ না পেলে এই বই প্রকাশ হতে আরো বিলম্ব হত। তাঁর কৌতূহল, আগ্রহ আমাকে নিরন্তর কার্যে প্রেরণা যুগিয়েছে। সহযোগিতায় মুগ্ধ হয়ে আছি।

ডঃ দীপক চন্দ্র

ইক্ষ্বাকু বংশ

আদিপুরুষ : মনু > ইক্ষ্বাকু > কুক্ষি > বিকুক্ষি > বাণ > অনরণ্য > পৃথু > ত্রিশংকু > ধুন্ধুমা > মহারথ > যুবনাশ্ব > মান্ধাতা > সুসন্ধি > ধ্রুবসন্ধি > ভরত > অসিত > সগর > অসমঞ্জ > অংশুমান > দিলীপ > ভগীরথ > কুকুৎস্থ > রঘু > প্রবৃদ্ধ > শংখ > সুদর্শন > অগ্নিবর্ণ > মরু > প্রশুশ্রুক > অম্বরীষ > নহুষ > যযাতি > নাভাগ >
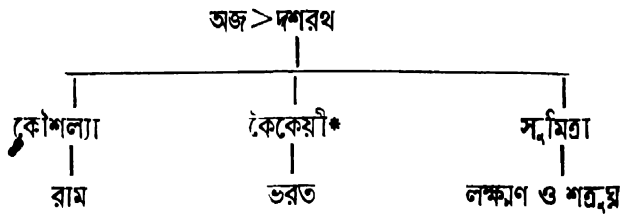
[* আমার চোখে কৈকেয়ী দশরথের ছোটরাণী এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁর যমজ পুত্র। মৎ-লিখিত "জননী কৈকেয়ী" গ্রন্থে এই মত প্রতিষ্ঠিত করেছি।]

॥ প্রথম পর্ব ॥

রাম না হতে রামায়ণ

॥ এক ॥

সরযূতীর। পাশেই নিবিড় সবুজ অরণ্য। তরল সোনার মত রোদ গলে গলে পড়ছে নদীর কালো জলে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। মৃদু বাতাসে দুলছে কৃষ্ণ-চূড়ার মঞ্জরী। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মত শাল ফুল ঝরে পড়ছে। বহুদূরে থেকে ভেসে আসছে হিংস্র শ্বাপদের গর্জন। শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক। নিস্তব্ধতার ভেতরেও প্রাণের স্রোত বয়ে যাচ্ছে সরযূর মত।

অরণ্যের শান্ত সবুজ সীমানায় শ্বেতমর্মরে গাঁথা কৌশল্যার সাতমহলা। সেখানে সে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ।

প্রাসাদের সামনে মস্ত ফটক। নহবৎখানা। নাট মন্দির পেরিয়ে প্রাসাদে যেতে হয়। ফটক হাঁ-হাঁ করছে। বর্মপরিবৃত প্রহরীরা বর্শা ও ফলক হাতে নিয়ে সিংহদ্বার থেকে একেবারে প্রাসাদের সদর দুয়ার পর্যন্ত সার সার নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে।

রামচন্দ্রের রথ থামতেই একজন প্রহরী ছুটে এল। দরজা খুলে ধরল। রথ থেকে নামার সময় কেমন একটা দ্বিধা এবং জড়তা দেখা গেল তার। প্রাসাদ দ্বারে ঢুকতে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল।

কৌশল্যা জানলা দিয়ে নির্নিমেষ চোখে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। মায়ের মন দিয়ে অনুভব করতে পারল তার অস্থিরতা। ভীষণ অসহায় এক মানুষ বলে মনে হল তাকে। রামের ভাবভঙ্গিতে সহজ স্বাভাবিক ভাবটি ছিল না। প্রাসাদে ঢুকতে তার সংকোচ হচ্ছিল। এদিক ওদিক ভাল করে তাকিয়ে ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। পশ্চাতে তার লক্ষ্মণ। মুখখানা তার আগুনের মত গণ গণ করছিল। মনে হচ্ছিল দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সংঘাতে তার শরীর জুড়ে যেন বেজে যাচ্ছিল যুদ্ধের দামামা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কৌশল্যার বিভ্রম ঘটল। পায়ের নিচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পাচ্ছিল। তার শিথিল হাত থেকে বিগ্রহের জন্য স্বহস্ত রচিত পুষ্পমাল্যখানি স্খলিত হল। চেষ্টা করেও তার অবশ্যম্ভাবী পতন ঠেকাতে পারল না কৌশল্যা। আশংকায় মনটা দুলে উঠল। পাপবোধে ক্ষতবিক্ষত হল চিত্ত।

তাড়াতাড়ি মালা কুড়িয়ে মাথায় ঠেকাল। মনে মনে ইষ্ট দেবতার কাছে হাজার বার মার্জনা ভিক্ষা করল। তাঁর করুণা চাইল। বিগ্রহের গলায় মালা দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল, কি যেন প্রার্থনা করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর চরণামৃতের স্বর্ণপাত্রটি হাতে করে উঠতে গিয়ে কেমন করে তা থেকে এক ঝলক চলকে পড়ল মেঝেয়।

অমঙ্গল আশংকায় কৌশল্যার বুক থর থর করে কেঁপে উঠল। শরীরের ভেতরটা

যন্ত্রণায় মোচড় দিল। প্রবল পাপবোধের এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন তাকে দুর্বল করে দিল। মনে হল, ঘর থেকে বেরোনোর শক্তি পর্যন্ত তার নেই। জড়বৎ দেহটি এক প্রবল সম্মোহনে বন্দী।

প্রিয়পুত্র রামের আগমন টের পেয়েও কৌশল্যা তার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। অথচ, তার দেবদূতের মত পবিত্র মুখশ্রী দেখলে হৃদয় ভরে যায়। আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। তবু চোখ বুজে এল। বুক টনটন করল।

স্তব্ধ কক্ষ।

কৌশল্যার বিষণ্ণ শ্বাসের শব্দ শুধু শোনা যাচ্ছিল। রামচন্দ্র কক্ষে পা দিয়ে অবাক হল। কৌশল্যার শান্ত ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল। স্মৃতি—ভারাক্রান্ত। ছলছল করুণ চোখে কি গভীর মায়া নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দুঃখিনী অভাগিনী জননীর জন্যে কষ্ট হয় রামচন্দ্রের। কিন্তু এই কষ্ট অযোধ্যার রাজমহিষীর প্রাপ্য নয়। তবু এই দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনা বহুকাল ধরে ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। ছোটরাণী কৈকেয়ী জননীর জীবনে অভিশাপ। তার নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্যও দায়ী সে। নিজের অজান্তে নিঃশব্দ এক আর্ত্তনাদ তার বুক ঠেলে উঠে এল।

কৌশল্যার বিস্ফারিত দুই চোখে সুনিবিড় ব্যথা ঘন হয়ে উঠল। কেমন একটু ম্লান দেখাল তাকে। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতার ঢেউ তার বুকে দাপিয়ে বেড়াল। রামচন্দ্র তার সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে জননীর নানা মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারল। কৌশল্যার চোখে চোখ রেখে নিঃশেষ করে দেখল। ক্ষণিক নৈকট্যে তার দ্বিধা ও জড়তা কাটল। মনে, বল ও সাহস—দুই পেল। চোখ বুজে ধীর স্বরে বলল ঃ মা, কোনদিন তোমার দুঃখ এবং অসুবিধে বুঝিনি। কোনটা তুমি ভালবাস জেনেও তোমার অপছন্দের কাজটা পিতার ইচ্ছেয় করেছি। আজ অযোধ্যা ত্যাগ করে যাওয়ার সময় সেই কথা বড় বেশি মনে পড়ছে। আর, অনুশোচনায় বুক জ্বলে যাচ্ছে।

কৌশল্যা চমকাল। তার বুকের ভেতর ধুক্‌পুক্‌ করে শব্দটা আরো দ্রুত হল। চোখের চাহনিতে শিশুর অসহায়তা ফুটল। চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল। সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে ভেজা গলায় বলল ঃ পুত্র আজ অভিষেক তোমার। শুভদিনে অমন অলক্ষণে কথা বলে না বাবা।

জননীর আশংকা ও উদ্বেগে রামচন্দ্রের হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। স্বপ্নাতুর চোখে কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল। অবরুদ্ধ গলায় অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ অযোধ্যা আজ ছেড়ে যাচ্ছি মা। যেতে আমাকে হবেই। যাওয়ার আগে তোমার ঐ রাঙা দুই চরণ ছুঁয়ে মনের সাধে প্রণাম করব বলে এসেছি।

কৌশল্যা স্তব্ধ। মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকের খাঁচায় আটকে রইল। ব্যাথা করল। মূর্ছারোগীর মত এক অসহায় কষ্টকর অবস্থা তার চোখ মুখের রেখা ও রঙ বদলে দিল। কান্না গিলে গিলে বহু কষ্টে উচ্চারণ

করলঃ মহারাজ, শেষ মুহূর্তে তোকে রাজা করল না। অভিষেকের বদলে নির্বাসন! জানতাম, এমন একটা কিছু হবে। ভাগ্যহীন মায়ের পুত্র তুই। কপালে তোর সুখ লেখা থাকতে পারে না। এসব জেনে বুঝেও তোর জন্য মন কাঁদে। আমি'ত মা! সব জননীর মত পুত্রকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি। আমার সে সাধের স্বপ্ন ভাঙল কে পুত্র? যৌবরাজ্যে অভিষেকের দিনক্ষণ তোমার স্থির হয়ে গেছে, বিভিন্ন দেশ দেশান্তর থেকে অতিথিরা এসেছে, রাজা, ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষি সবাই এসেছে। তবু মায়ের সঙ্গে কৌতুক! দুষ্টু ছেলে।

মা! বলে রামচন্দ্র চমকে উঠল। কন্ঠস্বরে তার আর্তি বাজল ঝংকারে।

প্রত্যুষে মন্দির থেকে অভিষেকের প্রসাদী ফুল, চরণামৃত আর মঙ্গলঘট নিয়ে বশিষ্ঠকে যখন আসতে দেখলুম তখন হতভাগিনীর অন্তরটা দুলে গেল, গর্বে, আনন্দে স্ফীত হল। দু'চোখে আমার স্বপ্নের ছবি। আমি রাজমাতা! কৌশল্যার স্বরের মধ্যে স্নেহ টলটল করছিল।

যন্ত্রণার কষ্টে রামের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। কষ্টে ডাকলঃ মা-গো!

রামের ডাকে কৌশল্যা চমকাল! থমকে গেল তার সকল প্রগলভতা। তার দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা নিবিড় হল। বিশ্বাসের মাঝখানে বিস্মিত সংশয় তাকে আকুল করে তুলল। বিভ্রান্ত গলায় বললঃ কিন্তু বিধাতা বড় নিষ্ঠুর পুত্র। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে তিনি নিয়ে নেন। আমার সুখটুকু তাঁর সইল না। আমার জন্যেই তোর এই দুরবস্থা। কিন্তু কার স্বার্থে পিতা এত নিষ্ঠুর হতে পারল? ছোটরাণীর কোন অনিষ্ট ত তুই করিসনি, তবু তোকে অযোধ্যা থেকে সরাল!

কৌশল্যার দৃষ্টি দপ্ করে জ্বলে উঠল। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় মোচর দিল। সমস্ত চৈতন্যজুড়ে দশরথের ব্যক্তিহীনতার প্রতি ধিক্কার, অভিসম্পাত সর্বশক্তিতে কণ্ঠে সংহত করল কৌশল্যা। তবু ভাষা গেল বদলে। তিক্তস্বরে স্বগতভাবে বললঃ ছিঃ ছিঃ রাজা, এ তুমি কি করলে? পিতা হয়ে পুত্রকে বনবাসে নির্বাসন দিলে? কষ্ট হল না?

কৌশল্যার চোখে পলক পড়ে না। চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা জ্বল জ্বল করল। বললঃ ধিক্, ছোটরাণী! ডাইনী! সর্বনাশী। তোর জন্যে আমার সংসার ভাঙল। রাক্ষুসী। স্বামী পুত্র কেড়ে নিয়ে পথের ভিক্ষুকের চেয়েও আমায় নিঃস্ব করে তোর সুখ হল না সর্বনাশী? শুধু স্বপ্ন ছিল বাকী। তাও কেড়ে নিল পুত্র। আমার নিজের বলতে এই দেহ ছাড়া আর কি রইল? আমি কি নিয়ে থাকব?

রামের বুকে মাথা রেখে কৌশল্যা কাঁদল অনেকক্ষণ। নিদারুণ একটা গ্লানিকর অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন কৌশল্যা। তার ঘন কালো আয়ত দুই চোখের তারা নিশ্চল বেদনায় থম থম করতে লাগল। রামচন্দ্রের সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভুত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল সে। শরীরের ভেতর একটা আকুল করা অস্থিরতা টনটন করছিল। একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছিল।

ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর কৌশল্যা থম থমে গলায় বলল: পুত্র, কি মোহ নিয়ে থাকব এখানে? আমিও তোর সঙ্গে যাব। তুই ছাড়া আমার কে আছে আর।

রামচন্দ্র চমকাল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কিত গলায় বলল তোমাকে আমার সঙ্গে নিতে পারলে সবচেয়ে আনন্দিত হতাম মা। কিন্তু অরণ্যের পথ দুর্গম। পদে পদে বিপদ। বাধা। অনিশ্চয়তা। সেখানে জীবন সুখের নয়। অত কষ্ট এবং ধকল তোমার শরীরে সইবে না। তুমি সাতমহলাতেই থাকবে।

রামচন্দ্রের বাক্যে শান্ত নিথর স্তব্ধতাও কেঁপে উঠল। কৌশল্যার দুই চোখে কেমন একটা নিবিড় ব্যথা ফুটে উঠল। বলল: পুত্র, আমি মন্দ ভাগিনী। জীবনে বহু কষ্ট, দুঃখ, ক্লেশ ভোগ করেছি। অনেক ব্রত উপবাস করে তোকে পেয়েছি। আমার ইহকাল পরকাল তুই। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মার চেয়ে সৎ-মার কথা বড় হল? বিমাতার আচরণ জননীর মত নয়। তার কোন কথাই আর শ্রদ্ধার সঙ্গে মানা উচিত নয়। সে তোর শত্রু। শত্রুকে বিশ্বাস কর না পুত্র। শত্রুর বাক্যে গর্ভধারিণী জননীকে পরিত্যাগ করতে পার না। পিতার আদেশও নয়। তিনি নিজের বশে নেই। তাঁর মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। তাই, দেবোপম পুত্রকে বনে পাঠাতে হৃদয় কাঁপল না। নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর। পুত্র, আমি তোর জননী। এ পৃথিবীতে জননীর মত কেউ আপন হয় না। তার মত মংগলাকাংখী নেই। সন্তানের জন্যে জননী সব পারে। আমিও পারব। এখানে আমি কি নিয়ে থাকব? ছোট-রাণীর অনুগ্রহ, কৃপা, করুণা নিয়ে এ পোড়া দেহকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে মৃত্যু অনেক অনেক ভাল। আমার সম্মতি ছাড়া বনে গেলে অনশনে জীবনপাত করব। মন্দ-ভাগিনী কৌশল্যার বাঁচার আর রুচি নেই। কার জন্যে, কি আশায় বাঁচবে? রাম ছাড়া কে আছে তার?

কৌশল্যা একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগল। রামচন্দ্র একটু দিশাহারা বোধ করল। জননীর আকুল করা কথার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে রইল। স্তব্ধ দুই চোখে অসহায় আর্তি। বুকের ভেতরটা তার কেমন করছিল। আকস্মিক দুর্বলতাবশতঃ অসহায়ভাবে উচ্চারণ করল: মা, আমাকে দুর্বল করে দিও না। আমার পথ আগলে থেকো না। জননীর চোখের জল সন্তানের শুধু কষ্ট দুঃখের কারণ হয়।

কৌশল্যা ঠোঁট কামড়ে ধরে উদ্গত কান্না রোধ করল। চাপা কান্নায় কয়েকবার বুক উঠানামা করল। ভাঙা গলায় উচ্চারণ করল: পুত্র! ছোটরাণীই আমার সর্বনাশ।

রাম নীরব। করুণ চোখে জননীর দিকে চেয়ে রইল। থমথমে দুই চোখে কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্ন ভাব। কত ছবি, কত কথা তার মনে এল। কেমন করে বোঝায় তার বনগমনের জন্যে ছোট মা কৈকেয়ীর কোন দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে নারদের মন্ত্রণা তার অযোধ্যা ত্যাগের গোপন কারণ। অভিষেকের পূর্বমুহূর্তে তার আগমন শুধু আকস্মিক নয়, চরম নাটকীয়।

মাথার ভিতর দিয়ে খণ্ড মেঘের মত চিন্তা ভেসে যায়। কত ছবি, কত কথা তার মনে ভাসে। নারদের মুখ মনে পড়ে যায়। তার কথাগুলো কানের ভেতর ঝংকারে বাজতে থাকে। বৎস, রামচন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রের বিশেষ দূত হয়ে এসেছি। তোমার শৌর্য, বীর্য, সাহস, তেজ, বুদ্ধি, সমরকৌশল, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উপর দেবতাদের আস্থা জন্মেছে। তারা তোমাকে একজন সহযোগী বন্ধুরূপে পেতে চায়। তোমার মত একজন বীরের সহায়তা পেলে তারা পৃথিবী থেকে রাক্ষস, অসুর ও দানবের অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন দূর করতে পাবে। তোমার মত মানব হিতৈষী, আর্ত্ত মানুষের সেবক ও বন্ধুকে দেবতাদের আজ ভীষণ দরকার। কিন্তু রাজাসনে বসে সে কাজ সম্ভব নয়। অযোধ্যার সিংহাসনে তোমার অভিষেক মানে সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে নিজেকে বন্দী করা। রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে এমন জড়িয়ে যাবে যে তা থেকে বৃহৎ দেশ সেবা মানব সেবায় আদর্শের আলো আর দেখতে পারে না। রাজ্য ও রাজনীতির স্বার্থে রাক্ষস ও অসুরের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করাও কার্যতঃ বিপজ্জনক। মহাশক্তিমান রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে একা সংগ্রাম কোন আর্য নরপতির সম্ভব নয়। আবার তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার মনোবলও কারো নেই। সবাই রাবণের ক্রোধ ও আক্রোশের ভয়ে ভীত। দেবতাদের পরাজয় আর্যাবর্তের নরপতিদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। রাবণের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মানুষ নেই পৃথিবীতে। জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সততা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সমন্বয় না হলে কোন জাতি স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি পায় না। মুক্তির সে পথ বুঝি আর খোলা নেই। তাই, দেবতারা নতুন পৃথিবী গড়ার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের পুরোভাগে তুমি থাক। তোমার নেতৃত্বে গড়ে উঠুক রাক্ষস নিধনের মহাযজ্ঞ।

এই পর্যন্ত বলে, কুটিল চোখে নারদ তার দিকে তাকাল। রামের মুখে স্পষ্ট দ্বিধার ভাব, চোখে বিস্মিত জিজ্ঞাসা। তাকে একটু গম্ভীর অন্যমনস্ক দেখাল। ভাষাহীন চোখে নারদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল ঃ মহামুনি মহাবল রাক্ষস নিধনের যজ্ঞে আমার মত সামান্য এক মানুষের উপর দেবতা ও ব্রাহ্মণের এই আস্থা কেন ?

নারদ তার গম্ভীর মুখ ও স্তব্ধ দুই চোখের উপর নিজের নেত্রদ্বয় স্থাপন করে বলল ঃ বৎস, একমাত্র তুমিই নিজের কর্মশক্তিতে, সেবায়, আত্মত্যাগে, মহত্ব ও সততায় নেতৃত্বের সোপান বেয়ে বেয়ে একেবারে উপরে উঠেছ। জনস্বার্থের আকাংখার সঙ্গে তোমার কর্মক্ষমতাকে মিলিয়ে নিয়েছ। আর্ত্তপীড়িতের বেদনার প্রতিকারে তুমি এগিয়ে এসেছ। তোমার নির্লোভ চরিত্র নিঃস্বার্থ-কর্ম তোমার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ। তুমি মাটি থেকে উঠে এসেছ। পরম শত্রুও আশ্চর্য হয়েছে তোমার ত্যাগ ও মহত্ত্ব দেখে। তোমার ভেতরে আছে ভারতবর্ষের হৃদয় জাগানোর মন্ত্র। এ দুর্লভ ব্যক্তিত্ব আর কোন মানুষের মধ্যে কেউ দেখেনি।

নারদের বাক্যে মুখে চকিতে রক্তের ঝলক লাগল রামের। মস্তিষ্কের ভিতরে কথাগুলোর এক প্রতিক্রিয়া শুরু হল। বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল।

অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্র হচ্ছিল। খুব মহৎ কিছু হওয়ার কথা তার জ্ঞান হওয়া থেকে শুনে আসছে। এই মুহূর্তে প্রত্যাশা যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। কোনদিন এইভাবে ঘুমন্ত আকাংখা জ্বলে উঠবে হিসেব করে দেখেনি। অকস্মাৎ তার বুকের ভেতর অনুভব করল প্রবল রাক্ষস বিদ্বেষ আর ঘৃণা যেন পাক খাচ্ছে। রামচন্দ্র নারদের চোখের দিকে অপলক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল: বৎস, একাই নিজের পথ খুঁজে নিতে তুমি জন্মেছ। আমরা উপলক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্য আমাদের এক। আত্মবিশ্বাস ছাড়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায় না। বিশ্বাসের জমি রাজক্ষমতায় থেকে তৈরী করা যাবে না। নির্লোভ, নিঃস্বার্থ হওয়ার মহান আদর্শে বড় হয়েই তবে প্রত্যয় সৃষ্টি করা যায় অন্তরে। অকস্মাৎ সবার সামনে মহান হওয়ার সেই অপূর্ব সুযোগ এসেছে। ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, মহত্বে, আদর্শে, সততায়; সিংহাসন, ঐশ্বর্য, মর্যাদা তুচ্ছ করার মহান সাহসে বড় হওয়া।

আপনা থেকে রামচন্দ্রের বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মুগ্ধ আবেগে দুচোখ বুজে এল। চোখ বুজতেই চোখের কোল ভরে গেল জলে। মনটা খুসিতে দীন হয়ে গেল। মাথা নুয়ে এল শ্রদ্ধায় অনুরাগে। নিজেকে মনে হল কত মহৎ, কত উদার, আর কত বড়। কি বিপুল শক্তি তার দেহে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ তারা রবির মতই সে অবিনশ্বর। মুগ্ধতা রামচন্দ্রের শরীরে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন সৃষ্টি করল। খুসি খুসি মুখ আর নম্র চাহনি মেলে সে স্থির দৃষ্টিতে নারদের দিকে চেয়ে রইল।

নারদ অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে রামের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করল। তার পর মৃদু-স্বরে বলল: বৎস, বিধাতা বড় রসিক। নিজের হাতে তিনি তার আসর সাজিয়েছেন। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তোমার কোন অধিকার নেই। তবু মহারাজ দশরথ তোমাকেই উত্তরাধিকারী করতে চান। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। কৈকেয়ী আত্মাভিমানবশতঃ স্বীয় পুত্রের জন্য অযোধ্যার সিংহাসনের উপর আপন দাবিতে অটল। দেশ কাল পরিস্থিতি নিজে এসে হাজির হয়েছে তোমাকে অযোধ্যা থেকে নিতে। অযোধ্যার বাইরে তোমার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার দরকার। 'বন হল গোপন কার্যকলাপের নিরাপদ আশ্রয়। একমাত্র বনেতে চরের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে নিঃশব্দে দৃষ্টির অগোচরে একটু একটু করে অত্যাচারী লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশের আয়োজন করতে হবে। কাজটা খুব দুরূহ ও জটিল। তাকে ধ্বংস করার শক্তি সৃষ্টি করতে হবে একেবারে অভ্যন্তর থেকে। শুধু রাজ্যের অভ্যন্তরে নয়, মনের অভ্যন্তরে নিয়ে নিতে হবে সংঘাতের বীজ। এই পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী এবং সময়সাপেক্ষ। কৈকেয়ীর সিংহাসন দাবির ঘটনা হবে তোমার অযোধ্যা পরিত্যাগের সহজ কৈফিয়ৎ। আর বনগমনের উদ্দেশ্য সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে এবং অযোধ্যা ত্যাগের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে শত্রুর সন্দেহ চাপা দিতে তোমার সরল পিতৃভক্তি হবে রক্ষাকবচ। অভিষেকের মত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বর্জন করে, লোভ, মোহ জয় করে, সুখ, ঐশ্বর্য, আনন্দ বিলাস ত্যাগ করে পিতৃসত্য রক্ষার

জন্য যে বনবাস মেনে নিতে পারে তার মত ত্যাগী নির্লোভী মহাপুরুষকে শত্রুও শ্রদ্ধা করবে। তার কোন কাজই সন্দেহের হবে না তখন। তোমার অযোধ্যা পরিত্যাগের জন্য কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা, অমানবিক নিষ্ঠুরতা লোকচক্ষে দায়ী হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্মই তুমি করছ।

নিরপরাধিনী কৈকেয়ীর জন্যে রামচন্দ্রের কষ্ট হচ্ছিল। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার থাবা গেড়ে বসল। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা অসহনীয় দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল। নিজেকে তার ভীষণ ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছিল। একদৃষ্টে সে কৌশল্যার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকে। নিজেকে প্রশ্ন করে, মানুষ এত নিষ্ঠুরভাবে আর একজন নির্দোষ মানুষকে দোষ সাব্যস্ত করে কি করে? নিজের স্বার্থপরতার কথা কি তার মনে পড়ে না?—ছোটমার জন্যে তার বুক টনটন করতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়ল। মৃদুস্বরে বলল: মা-গো ছোট মা নির্দোষ। তার কোন অপরাধ নেই। বনবাস আমার বিধিলিপি। পিতার কর্মফল।

কৌশল্যার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দাঁত টিপে সে একটা অসহনীয় যন্ত্রণা দমন করল। কষ্টে জিভটাকে ঠেলে দিল বাইরে।

মায়ের কষ্টে রামের বুকের ভেতর টনটন করছিল। উদারভাবে হেসে খুব সহজ-ভাবে বলল: মাগো বিধাতা অযোধ্যার পরিবর্তে বিশাল অরণ্যের একচ্ছত্র অধিপতি করে দিলেন আমায়। ভরত অযোধ্যার রাজা, আমি বিশাল পৃথিবীর রক্ষক। এত বড় একটা আনন্দ সংবাদ শুনেও তুমি নিরানন্দ কেন?

কৌশল্যা সম্মোহিত! স্তব্ধ। বাক্য হারা। সে কিছুই দেখছে না। বুকের ভেতর তার ঝড়ের শব্দ। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নীরবতা। ঠোঁটে ঝড়ের কম্পন যা ভেতর থেকে উৎসারিত; দমনে অসহায় এবং দুরন্ত। আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে থাকে। কালো দুই চোখের কোণে খুশির ঝলক, যদিচ তা কান্নার আবেগে কাতর করে তার মুখ।

রামচন্দ্রের দৃষ্টি রূপ বদলায়। কৌশল্যার তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করে অঙ্গে। অধরে হাসি বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে ওঠে। অপরূপ দেখায়। ক্ষণকালের জন্য কৌশল্যা চিন্তাশূন্য ও সম্মোহিত। তার মুগ্ধ দুটি চোখ রামচন্দ্রের চোখের উপর। রামচন্দ্র সহসা চুপি চুপি স্বরে শপথ বাণীর মত উচ্চারণ করল: মা গো পিতৃবাক্য পালন করতে আমাকে বনে যেতে অনুমতি দাও। এই পুরীতে তোমার দেখাশোনা করবে বশিষ্ঠ পুত্র সুযজ্ঞ আর সুমিত্রা জননী। লক্ষ্মণ সীতা আমার অনুগমন করবে!

পালঙ্কের উপর চুপ করে বসে আছে কৌশল্যা। ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ কেটে যাচ্ছে তার। যে আবেগটা রামচন্দ্র নামে এক সীমায় আবদ্ধ ছিল, আজ কোথায় কি করে যেন তার স্রোতটা হারিয়ে যাচ্ছে। আর তার দুঃখটা মনে অবাধে বিস্তার লাভ করে। রামের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

এক অসহায় কান্না বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে। চোখের পাতা ভিজে যায়। ফোটা ফোটা জল টল টল করে। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল।

রাম কৌশল্যার কান্না দেখল। মনটা তার সিক্ত হল। বিষণ্ণ বেদনায় হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হল। কৌশল্যার কাঁধে হাত রাখল। উদাস গলায় বলল ঃ বনে যাওয়া এমন কিছু ঘটনা নয়। তবু উতলা হচ্ছ কেন? এতে কোন দাবী হারানোরও আশংকা নেই।

কৌশল্যা কান্নার মধ্যেও অবাক হল না। জলভরা চোখে তার দিকে তাকাতে গিয়ে আরো জোরে কান্না এল। কান্না চাপতে গিয়ে হিক্কার মত গলা থেকে একটা শব্দ বার হল। হাঁ করে করে কণ্টে শ্বাস নিতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদিল। কান্না থামলে রামচন্দ্র উদাস গলায় বলল ঃ এই পৃথিবীতে কিছুই চিরন্তন নয়। একদিন সব মুছে যাবে। আমরা যা যা করছি, সব চিহ্ন মুছে যাবে। কেবল কীর্তি থাকবে চিরকাল। শোক, দুঃখ, বেদনা, অনুতাপ, ক্রোধ, ঘৃণা—এসব কত কি করে মানুষ অযথা শুধু সময়ের অপচয় করে, নিজের আয়ু ও শক্তির খানিকটা ক্ষয় করে থাকে। এতে কোন মঙ্গল হয় না।

কৌশল্যা হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল। আশ্চর্য্য হল আরো। মানুষ, রামের কাছে কোন বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে মানুষের কীর্তি। আবেগ, ভালবাসার কোন কানাকড়ি মূল্য রামের কথায় আছে কি, টের পায় না কৌশল্যা। রামের বাক্য শুনে তার মনে হল, প্রিয় পরিজনদের মধ্যে যে ভালবাসা, সমবেদনা ও প্রেম তা অনেকটা বোধ হয় চোখের ভ্রম। পুত্র তাকে এই বিভ্রম থেকে দূরে থাকতে বলছে। কিন্তু তার নিজের মুখে যে উদ্বেগ ও বেদনা ফুটে উঠতে দেখেছে, সে কি খাঁটি নয়? অভিনয়? কৌশল্যার হৃদয় জুড়ে একটা হাহাকার বাজে। আনমনা হয়ে যায় সে। মনটা ভারাক্রান্ত হয়। দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। রামের কথার কোন জবাব দেয় না। বুকের পাশে হঠাৎ একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। সারা শরীর তার কুঁকড়ে যায়। বুক থেকে একটা আর্ত্তস্বর নির্গত হল। বলল ঃ তোরা বাপ বেটায় আমাকে কি ভাবিস বলত? আমি কি নরদেহে এক পাথরের মূর্তি? আমার হৃৎপিণ্ড নেই, মগজ নেই, বোধশক্তি নেই, সুখ দুঃখ নেই? বলতে বলতে কৌশল্যা ঝর ঝর করে কাঁদিল।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রামচন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করতে বিলম্ব হল।

দ্বিপ্রহর।

রোদে ঝলমল।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বিপুল জনতার ভীড়। অপলক চোখে তারা চেয়েছিল রামচন্দ্রের আসা পথের দিকে।

রামচন্দ্র আস্তে আস্তে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এল।

জনতা সম্মোহিত। ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তারা রামচন্দ্রকে দেখতে লাগল। চোখে তাদের বিহ্বলতা।

রামচন্দ্র নির্বিকার। পাপবোধে অবসন্ন, ভারাক্রান্ত তার চিত্ত। মানসিক শক্তিতে তখন তার ভাঁটির টান। তবু সেই মুহূর্তে কেমন একটা আবেগে, উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা কাঁপল। বার বার শিহরিত হল সর্বাঙ্গ। এরকম আগে কখনও হয়নি। বুকের ভেতর আনন্দের অবোধ রহস্যময় অনুভূতি তার সকল দুঃখের, বেদনায় যন্ত্রণার সান্ত্বনা হয়ে উঠল।

রামচন্দ্র গভীর দৃষ্টিতে জনতার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসি তার অধরে খেলে গেল। সেই হাসিতে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হয়ে উঠল। হাত নেড়ে জনতাকে সংকেতে বোঝায়, এটা কিছু নয়। বনবাস তার ভাগ্যের লিখন। জনতাকে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আবেদন করল ইশারায়।

তারপর আর দাঁড়াল না। নির্বিকারভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

প্রাসাদের সিঁড়ির মুখে রথ দাঁড়িয়ে ছিল। রামচন্দ্র কাছে আসতেই সুমন্ত্র দরজা খুলে ধরল। রাম হাত বাড়িয়ে সীতাকে ধরল। লক্ষ্মণ বসল রথের পাদানীতে। জনতা কিছু বোঝার আগে সুমন্ত্র রথ ছেড়ে দিল। আরো ছ'খানা দ্রুতগামী রথ ও তেজী অশ্ব রামের অনুগমন করল। এর কোনটিতে বস্ত্র, অলংকার, মুদ্রা, খাদ্য, কোনটিতে অস্ত্র, ধনুক, তীর, বর্ম ছিল।

বিশাল জনতার মাঝখান দিয়ে রথ বায়ুবেগে বেড়িয়ে গেল। অগণিত দর্শকদের দিকে উদাস চোখ দুটি ছড়িয়ে দিয়ে রাম চুপ করে বসে ছিল রথে। মুখেতে তার কেমন একটা নিবিড় ব্যথা ঘন হয়ে উঠল। দর্শকদের অনুভূতি তোলপাড় হল। বুকটা হায় হায় করে উঠল। মনে হল, দস্যু তাদের সম্পদ লুঠ করে যেন নিঃস্ব করে দিয়ে গেল। এক বিপন্ন অসহায়তাবোধে তারা রুদ্ধবাক। তাদের বোবা কান্নার কোন আওয়াজ ছিল না।

সরযূর তীর ঘেঁষা রাস্তা ধরে রামচন্দ্রের রথ ছুটল। সাত রথের চাকার ধুলোয় আকাশ ঢেকে গেল। পিছনের কোন কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না।

দীঘল পথের চিত্রময় নিস্পন্দ অরণ্যের সারি সারি বৃক্ষ যেন অযোধ্যার শোকস্তব্ধ প্রজাকুল ও প্রিয়জন। নিতান্ত দীন অনুগ্রহ প্রার্থীর মত সসংকোচে তার দিকে তাকিয়ে যাত্রাপথের শুভ ও কল্যাণ কামনা করছে। অযোধ্যার মানুষের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কথা মনে করে হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে বার বার মনে হল, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ যেন জনতার অব্যক্ত কান্নার আওয়াজ ছড়াচ্ছে বাতাসে।

প্রগাঢ় দুঃখের মধ্যে রাম অনুভব করল, প্রকৃতিরাজ্যে প্রকৃতি কত শান্ত ও নির্বিকার। নিস্পৃহ ও উদাসীন। তার কোন অশান্তি নেই, দুঃখ নেই। কারো জন্যে কোন কষ্ট নেই। একেবারে নির্লিপ্ত আত্মসুখী। সচল প্রাণীকুল—জীবজন্তু,

পাখী, কীটপতঙ্গেরও নেই জীবনের দ্বন্দ্ব কিংবা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। অথচ প্রকৃতি অন্তর্গত প্রাণী মানুষের কত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, উত্তেজনা আছে।

মধ্যাহ্নের চড়া রোদে বাতাস তেতে উঠল। রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ একটানা আর্তনাদের মত কানে বাজতে লাগল। মৃদুমন্দ শব্দ তার যন্ত্রণাকে গভীর করে তুলল।

অশ্বেরা ক্লান্ত। হাঁফাতে লাগল। মুখে ফেনা পুঞ্জীভূত। শ্রান্তিতে তাদের পদক্ষেপে মন্দক্রান্তা ছন্দ।

হু হু করে হাওয়া ছুটে যাচ্ছিল কানের পাশ দিয়ে। কত জায়গার কত হাওয়া, কত কি ছুঁয়ে তার কানে বিঁধছিল। চরের মত রাজ্যের অদ্ভুত অদ্ভুত সংবাদ রামের কানে ভালোমন্দ মিশিয়ে ফিশ ফিশ করে বলল। আর রামচন্দ্র নিবিষ্ট মনে বাতাসের কথা শুনছিল। তাই রথে রামচন্দ্রকে উদাস, অন্যমনস্ক, নিস্পৃহ লাগল।

বাতাসের স্বরে কানে কানে শুনতে পেল ঃ রামচন্দ্র তুমি সাধারণ মানুষ নও। দুঃখী, দুর্গত মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনা, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, পীড়ন থেকে উদ্ধার করতে জন্মেছ। পৃথিবীতে তুমি পরিত্রাতা। মানুষের অবতারী। ছোট গৃহকোণ তোমার জন্যে নয়। বিশাল পৃথিবীর অবারিত প্রান্তর, অরণ্য, নদী, পর্বত তোমাকে নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। উন্মুক্ত অম্বরতলই তোমার স্বক্ষেত্র। দশরথের সাধ্য কি রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দিতে তোমায় আটকে রাখে? মহাপৃথিবীতে তোমার নিমন্ত্রণ। রাজা দশরথও সেকথা জানত। তবু রাজার ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সুখ, বিলাস, আনন্দ, সিংহাসন দিয়ে তোমাকে শক্ত করে বেঁধেছিল। কিন্তু বিধাতা নিজের প্রয়োজনে তোমাকে ঘরছাড়া করেছে। বিধাতার ভুলে তোমার ভাগ্যলিপিতে খানিক কাটাকুটি হয়েছিল বলে তোমাকে নিয়ে একটা সুন্দর নাটক হল। নাটকের প্রস্থান করুণ ও মর্মান্তিক। নব নব দুঃখ বরণের কঠিন মূল্য দিয়ে বিধাতার কাজের যোগ্য হতে হয়। তোমাকেও অনেক দুঃখের মূল্যে সার্থক হতে হবে। কিন্তু বিধাতা একেবারে নির্দয় নয়। তোমাকে তাঁর পথের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী করেনি। লক্ষ্মণ ও সীতা'কে তোমার সহযাত্রী করে পথের দুঃসহ একাকীত্বের বোঝা কিছুটা লাঘব করেছে। প্রিয় মানুষ ছাড়া অভিযাত্রীর কোন সুখই সুখ হয় না। এই দুনিয়ায় এদের দুজনের মত আর কে সঙ্গী আছে তোমার? নারীর সাহচর্য, প্রেম ও সেবা ছাড়া পুরুষের বীর্য উন্মুক্ত গতি লাভ করে না। তার পৌরুষ বিকশিত হয় না। পৌরুষের অনির্বাণ অগ্নিশিখার আধার লক্ষ্মণ। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তাতে লক্ষ্মণের মত উৎসর্গিত প্রাণ ভ্রাতৃবৎসল সহযোগীর একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্মণ তোমার জীবনের আশীর্বাদ। আর, জীবনদীপ সীতা তোমার যাত্রাপথের মঙ্গলশঙ্খ।

নিঃশব্দে একটা শ্বাস রামের বুক থেকে ধীরে ধীরে নামল। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম তার বাহ্যিক নড়াচড়া প্রকাশ পেল।

নদীর তীর বরাবর পথে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা ছিল। রাম নিজের চিন্তায় বিভোর

হয়ে গিয়ে এই নিস্তব্ধতাকে আরো গভীর করে অনুভব করল। মনে হল, বাতাসের ফিস ফিস কথা'ও তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা। নিজের মনের কথাই বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। রামচন্দ্রের মনে খুশির হাওয়া বইল। মহৎ কথা চিন্তা করা সব সময় ভাল। এতে নিজের ভেতরেও মহত্ত্ব জেগে উঠে। এখন ভাবলে অবাক লাগে, এই বেড়িয়ে পড়াই তার কাছে কত কঠিন ছিল।

দশরথের অগাধ স্নেহ তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। এটাই ছিল তার কাছে বড় বন্ধন। মনের গভীরে তার শিকড় গেড়ে বসেছিল। যা সহজে সে উপড়োতে পারছিল না। পিতাও জানত, বুক ভর্তি করুণা, অনুরাগ, মায়া ও শ্রদ্ধা নিয়ে রাম অনুগত ও বাধ্য পুত্র। তাকে নিয়ে পিতৃভক্তির এমন সব অদ্ভুত কাল্পনিক গল্প দশরথ তৈরী করত যা তার তরুণ বয়সের মনে রোমহর্ষ রহস্যময় আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগাত।

পিতৃভক্তি নামক এক ঐন্দ্রজালিক মায়ার ঘোরে দশরথ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তার বিবেক বুদ্ধি এবং বিচার শক্তিও লোপ পেল। দুর্বলতার এই রন্ধ্রপথ ধরে দশরথ সুকৌশলে অযোধ্যায় রাজ্যের ভার তার উপর চাপানো আয়োজন করল। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ অযোধ্যার সিংহাসনের উপর তার কোন দাবি ছিল না। এ ছিল একান্তভাবেই ভরতের। তবু পিতা হয়ে দশরথ পুত্র ভরতকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকেই ভরতের স্থলাভিষিক্ত করার জন্যে কত গোপন কূট ষড়যন্ত্র দিবানিশি করল অযোধ্যার রাজপুরীর অভ্যন্তরে।* তাতে তার অনুমোদন ছিল না। আপত্তিও ছিল না। পিতার আশাভঙ্গের মনঃকষ্ট স্মরণ করে নিতান্ত সংকোচবশতঃ পিতার কার্যের সমালোচনা কিংবা প্রতিবাদ করতে পারেনি। পিতৃভক্তি, বাধ্যতা এবং আনুগত্য-বোধের কাছে ছিল নিরুপায় আত্মসমর্পণ। এই একটিমাত্র দুর্বলতা তার অমলিন চরিত্রের চিরকলংক হয়ে রইল। জননী কৈকেয়ীর কাছে সেজন্য চির অপরাধী সে। শুধু তাই নয়, নিজের অজান্তে তাঁর চোখে অনেক ছোট হয়ে গেছে। মন থেকে জীবন থেকে এই অপরাধবোধ, যন্ত্রণা, আত্মগ্লানি কোনদিন তার মুছবে না।

অন্ধ পিতৃভক্তির কথা মনে হলে আত্মধিক্কারে অপমানে তার বুক জ্বালা করে। চার দিককার কলুষিত পরিবেশের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে। পিতৃভক্তির মোহে বিভ্রান্ত হওয়ার দুঃখ তাকে দশরথের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে। গণগণে অভিমান তার বুকের ভেতর, অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘূর্ণি বাতাসের মত এমন পাক খাচ্ছিল যে, পিতার কোন আবেদন নিবেদন প্রার্থনায় সাড়া দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। বরং প্রত্যাখ্যানের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে পারার সুখ তাকে কিছুটা অবাধ্য এবং প্রমত্ত করে তুলল। বুকের ভেতর তার বিসর্জ্জনের বাজনা দ্রিমি দ্রিমি তালে বাজছিল।

নারদের পরামর্শ ও নির্দেশ তার মনের ভেতর শক্তি যোগাচ্ছিল। তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে এক বৃহত্তর কর্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সুখ তখন সমস্ত চেতনা জুড়ে

---

* "জননী কৈকেয়ী" উপন্যাসে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে গোপন ষড়যন্ত্রের আগ্রহী পাঠককে অবশ্যই ঐ বইটির কাহিনী পড়তে হবে।

ঝংকারে বাজছিল। কতো কর্মের আহ্বান, কতো নতুন দায়িত্ব, কতো অভিনব সংগ্রামের কথা তার মন ছুঁয়ে থাকল।

অথচ কি আশ্চর্য্য, জনতার দৃষ্টি সম্মোহিত হয়ে রইল ওর মহত্ব দেখে। পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে কত সহজে লোভ মোহ জয় করে এক মহান আদর্শে সে তাদের চোখে বড় হয়ে উঠল। শ্রদ্ধায় করুণায় তাদের দুই চোখের দৃষ্টি ছল ছল করতে লাগল। তাদের নীরব বিষণ্ণ দুই চোখের তারায় জোনাকির আলোর মত জ্বলছিল প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সরল অঙ্গীকার।

রামচন্দ্র রথে খুবই চিন্তিতভাবে দু'হাত জড়ো করে থুতনির উপর ভর রেখে শূন্য চোখে সামনের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে রইল। মনের সঙ্গে তার অহরহ কথা যেন নানা রকম আবেগ অনুভূতি উত্তেজনার ঢেউ তুলে পাল তোলা নৌকার মত ভেসে বেড়াতে লাগল। নারদের মুখখানা চোখের তারায় ভাসতে লাগল।

পথের দু'ধারে গাছের মিছিল। ভারী সুন্দর। তার ফাঁকে ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছিল রামচন্দ্রের দৃষ্টি এবং চিন্তা। অশ্বের খুরের শব্দ তার হৃৎস্পন্দনের মত ধুক্-পুক্ করে বেজে যাচ্ছিল অবিরল। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে তার বারংবার মনে হতে লাগল, বিশাল পৃথিবীর যত বৈচিত্র্যই থাকুক তার জীবনেও বৈচিত্র্য কম নয়। বরং সে আরো আশ্চর্য এবং অভিনব।

রামচন্দ্রের চোখে কোন দৃষ্টি নেই। জন্মের বহু আগেকার একটা ঘটনা অকস্মাৎ তার মনে পড়ল। আর সে গল্পের বক্তা বিশ্বামিত্র। আচার্যের দীপ্ত মুখ, উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, অনির্বচনীয় কণ্ঠস্বর রামচন্দ্রের উৎকর্ণ মুখে, চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা স্বপ্নালুতা সৃষ্টি করল। চোখের পাতায় নেমে এল স্মৃতি। বিস্মৃত সে কাহিনীতে কত চাঞ্চল্য কত উত্তেজনা, সংঘাত, ষড়যন্ত্র, অস্বস্তি, আরো কত কিছু।

॥ দুই ॥

নিঃসন্তান মহারাজ দশরথ মুনি ঋষিদের পরামর্শে পুত্রলাভের জন্য এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করল। দশরথের বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিল ইলাবৃতবর্ষের দেবকুলের সকল দেবতারা। এ ছাড়া আর্যাবর্তের বহু রাজা, মহারাজা, নৃপতি, সামন্ত বণিক, অভিজাত ব্যক্তি এবং মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণেরাও ছিল সেখানে। উৎসুক নগরবাসী ও গ্রামবাসীও ভীড় করেছিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দেখতে। বিপুল মানুষের সমাগমে, কোলাহলে, গম গম করতে লাগল উৎসব অঙ্গন।

দেবতাদের আগমনে মুনি ঋষিরা সবচেয়ে খুশি হল। কারণ, এই সভার পেছনে ছিল দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা বিশেষ উদ্যোগ। অনেককাল দেবতাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। দেবতারাও আর ইলাবৃতবর্ষ* ছেড়ে সমতলপ্রদেশে

---

* জম্বুদ্বীপের নয়টি দেশের মধ্যে একটি। কৈলাসের নিকট। অন্য মতে, পামির বা পূর্ব তুর্কিস্তান নিয়ে ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষের অপর নাম স্বর্গ। এখানে দেবতা নামে এক জাতি বাস করত।

নেমে আসে না। ফলে, দীর্ঘকাল ধরে উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। সময়স্রোতে শুধু ব্যবধানটা বড় হয়েছে।

বেণ রাজার সময় থেকে দেবতা ও মানুষের বিরোধের সূত্রপাত। বলতে গেলে আর্যাবর্তের মনুর প্রতিষ্ঠিত বংশ মানুষের* সঙ্গে ইলাবৃতবর্ষের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এমন কি ভাবের আদান প্রদান, বাণিজ্য পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। বেণ রাজা ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দাম্ভিক সম্রাট। মনুর সময় থেকে আর্যাবর্ত ছিল করদ রাজ্য। মানুষেরা দেবতাদের সব কর্তৃত্ব ও নির্দেশ মেনে চলত। ইন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ছিল তাদের প্রতিরক্ষা। মানুষের সাহায্যে এবং প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে দেবতা ও মানুষের মেলামেশা গভীর হল। কিন্তু বেণ ইন্দ্রের পুতুল হয়ে থাকতে রাজি হল না। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য, সম্পদ, শৌর্যবীর্য, পৌরুষ, শক্তি, বীরত্ব, ক্ষমতা সব তার আছে। ইন্দ্রের চেয়ে কোন অংশে কম নয় সে। স্বাধীনচেতা বেণ তাই ইন্দ্রের অধীনতা অস্বীকার করল। রাজস্ব বন্ধ করে দিল। বেণের স্পর্ধা, ঔদ্ধত্যে ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে মানুষের সঙ্গে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল। সহযোগিতা বন্ধ করল। এমন কি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের দুর্গম রাস্তাটিও বজ্র দিয়ে উড়িয়ে দিল। মানুষকে জব্দ করার জন্যে দেবতারা করল না এমন কোন কাজ নেই।

তারপর বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হল। দেবতার সঙ্গে মানুষের যে একটা নিবিড় মধুর সম্বন্ধ ছিল এককালে, কিংবা তাদের ভাষা, ধর্মও যে এক—এ সব ভুলে গেল মানুষ।

অসুররাজ শম্বরের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে ইন্দ্র অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করে আর্যাবর্তের মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠাল। রাক্ষসরাজ রাবণের অভ্যুত্থান এবং তার রক্ত চক্ষুর ভয়ে, অত্যাচারে, উৎপীড়নের আশংকা করে আর্যাবর্তের রাজাদের কেউ প্রকাশ্যে ইন্দ্রের সাহায্যে এগিয়ে আসতে রাজি হল না। দেবপক্ষ গ্রহণে তারা বিরত বোধ করল। কিন্তু দশরথ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে বুঝতে পারল, এখন দেবতাদের চরম দুঃসময়। ইন্দ্রকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার মত কোন দেব-নৃপতি ছিল না। রাবণের হাতে তারা সকলে পরাভূত। সুচতুর রাবণ ইন্দ্রের অমরাবতীর উপর আঘাত হানার আগে একে একে তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে অধিকার করে নিয়ে কার্যতঃ ইন্দ্রের শক্তি পঙ্গু করে দিল। এই রকম একটি সংকট সময় শম্বর ইন্দ্রকে আক্রমণ করল। বিপন্ন দেবতাদের দুর্দিনে সহায় হলে তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। চিরন্তন বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হবে। দেবতাদের তেজ, বুদ্ধি, সাহস, মনীষা, ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধার বস্তু। দেবতাদের বন্ধু হলে একটা অলিখিত কূট রাজনৈতিক সম্পর্ক সুদূর-প্রসারী মূল্য লাভ করবে। দশরথ তাই দেবলোকে যাওয়া মনস্থ করল। বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত করে সে ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দিল এবং যুদ্ধ করল। এর ফলে, দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্য-লোকের একটা মধুর সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হওয়ার পথ সুগম হল।

---

* দশরথের চল্লিশ পুরুষ বা তেবোশ বৎসর আগে মনু ইলাবৃত বর্ষ থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেড়িয়ে সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। মনুর থেকে মানুষ জাতির উদ্ভব।

যুদ্ধের অনেককালপর, দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের অতীতের ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার এক মহান সংকল্পের ভাবনা বিশ্বামিত্রের মাথায় দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু তার একটা উপলক্ষ্য ও ক্ষেত্র দরকার। তবেই ভাব-বিনিময়ের উপর বস্তু-বিশ্বের তরঙ্গ এসে লাগে। যদিও তার পরিবেশ রয়েছে পরিস্থিতির অভ্যন্তরে। মানুষ ও দেবতাকে একবার এক জায়গায় করতে পারলে সমস্যা, সংকটের তীব্রতা যে কিছু সুরাহা হতে পারে এই বিশ্বাসে দৃঢ় সে। রাক্ষস-রাজ রাবণের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ রুখতে দেবতা ও মানুষের শক্তির সংযোগ অবশ্যই প্রয়োজন।

দেবতারা বিপন্ন। বরুণ, পবন, যম প্রমুখ দেব নৃপতিরা রাবণের কাছে পরাভূত। ইন্দ্রের রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে তারা। ইন্দ্র নিজে অসুররাজ শম্বর কর্তৃক আক্রান্ত। তার পিছনে রাবণের উস্কানি, উৎসাহ ও সাহায্য ছিল। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে ইন্দ্র শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করল। কিন্তু ভীষণ দুর্বল হয়ে গেলো। রাবণের আক্রমণ সম্ভাবনা চিন্তা করে ইন্দ্র তার সঙ্গে সন্ধি করল। স্বর্গরাজ্য হারানোর সম্ভাবনা তাতে দূর হল, সিংহাসনও রক্ষা পেল, কিন্তু ইন্দ্রত্বের অহংকারের ক্ষয় এড়ানো গেল না। ইন্দ্রের বশ্যতা, আত্মসমর্পণ রাবণের রাজনৈতিক কৌলিন্য, মর্যাদা, গৌরব, আত্মশ্লাঘা শুধু-বাড়িয়ে তুলল না, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি আধিপত্যর ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করল। অন্যরাজ্যের উপর তার দৌরাত্ম্যও বাড়ল। প্রত্যেকেই বাবণকে সমীহ কবে চলতে লাগল। রাবণ তখন ভারতবর্ষের একটি সর্বাধিক উচ্চারিত নাম। তার নামের সঙ্গে ভয় ত্রাস যুক্ত ছিল। আর্যাবর্তের বহুনরপতি নিয়মিত প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে তার রোষ থেকে দূরে থাকত। মানুষের ভয়, ভীতি পূজা পেয়ে রাবণের দম্ভ, অহংকার, ক্রোধ, জেদ, স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়ে গেল। আর এর সব ঝামেলা গিয়ে পড়ল মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণদের উপর। কার্যতঃ আর্যাবর্তের সকলরাজ্য শাসন করত তারাই। তাদেরই নীতি ও ইচ্ছা আর্যনরপতিদের দিয়ে প্রয়োগ করত। রাবণভীতির মূল্য দিতে দিতে তাদের রাজকোষ শূন্য হওয়ার উপক্রম হল। শাসন-কার্যের সঙ্গে যুক্ত নিরুপায় মুনি ঋষিরা তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের স্মরণাপন্ন হল। তাদের সব সমস্যাই বিশ্বামিত্র মন দিয়ে শুনল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। মানুষের আস্থা, আত্মপ্রত্যয় ফেরানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার আগে। ভয়ংকর অত্যাচারের তীব্র অসহিষ্ণুতায় ক্রমে ক্রমে ঐক্য ও সংহতির দিকে তাকে নিয়ে যাবে। বর্তমানে স্বর্গে ও মর্তে তার পরিবেশ প্রস্তুত। শুধু দরকার উভয়ে সংযোগ।

একদিন সে সুযোগও এল। বিশ্বামিত্র সংবাদ পেল, মহারাজ দশরথ পুত্রকামনায় ভীষণ ব্যাকুল হয়েছেন। তরুণ চিকিৎসক ঋষ্য শৃঙ্গ তার প্রজনন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্যে এক জটিল চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সংবাদটা বিদ্যুৎ চমকের মত তার মস্তিষ্কের অন্ধ কুঠুরিগুলো উদ্ভাসিত করে তুলল। রাজার পুরুষত্ব অর্জনের গোটা ব্যাপারটার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে তাতে একটি সুন্দর ধর্মীয় মহিমার তকমা এঁটে দিলে পুত্রলাভের রহস্যটা যেমন অলৌকিক হয়ে উঠবে তেমনি দেবতা ও

মানুষকে এক জায়গায় এনে বসানো যাবে। একমাত্র দশরথের আমন্ত্রণেই তারা অযোধ্যায় আসতে পারে। দশরথ তাদের বিপদের বন্ধু। তাদের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ করেছে সে। সুতরাং, তার কোন আহ্বান, আমন্ত্রণ, প্রত্যাখ্যান করবে না দেবতারা। দশরথের পুত্রীয়েষ্টিলাভের চিকিৎসার সুদীর্ঘ সময় সীমাকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করলে তা একটি বৃহৎ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। দেবতাদেরও যোগ দেয়া কোন বাধা থাকবে না। এর ফলে, মানুষ ও দেবতার ভাববিনিময়ের একটা মঞ্চ তৈরী হবে। অন্যদিকে দেবতাদের মত শক্তিশালী; মর্যাদা-সম্পন্ন বুদ্ধিমান জাতির পদার্পণে দশরথের রাজনৈতিক কৌলিন্য, মর্যাদা, গৌরব বেড়ে যাবে। তাই দশরথের পক্ষে এই রকম একটি বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে রাজি হয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। বিশ্বামিত্র কালক্ষয় না করে সেদিনই অযোধ্যায় যাত্রা করল।

বিশ্বামিত্রের পরিকল্পনা মতই পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করল দশরথ। তার জনপ্রিয়তা, আস্থা এবং শত্রু সংখ্যা পরিমাপ করার জন্যে একটি অশ্বমেধের ঘোড়াও ছাড়া হল।

যজ্ঞ ছিল উপলক্ষ। যজ্ঞকে রাজনৈতিক রূপ দেবার জন্য এবং মেলামেশার ক্ষেত্রকে অবাধ উন্মুক্ত করে দেয়া হল। মানুষ ও দেবতার যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-ভারতের রাক্ষসরাজ রাবণের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং তার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি রুখবার জন্যে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে তার শুভ ফলটি আদায় করে নেয়ার কাজে বিশ্বামিত্র খুবই মনোযোগী।

যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রহ্মা, ইন্দ্রকে দেখে বিশ্বামিত্রর দুই চক্ষু সহসা আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল। প্রতিকূল অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা দেবতাকে স্বর্গলোক থেকে মাটিতে নামিয়ে আনল। রাবণ তাদের সম্ভ্রম ও গৌরবকে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে, তাকে পুনরুদ্ধার করতে তারাও নীচে নেমে এসেছে আজ। স ভ্রম হারানোর এই আত্মগ্লানি যতকাল ইন্দ্রের মনে থাকবে ততদিন বাইরে যা থাকুক, ইন্দ্র মনে মনে রাবণের শত্রু থাকবে। রাক্ষস বিদ্বেষ অবশ্য তার মন থেকে কোনদিন মুছবে না। লোকচক্ষে ইন্দ্র রাবণকে মিত্রের আসনে বসিয়ে নিত্য বিবেকের সঙ্গে লড়াই করছে। সে সংঘর্ষ এখন আর ইন্দ্রের একার নয়। সব দেবতার। তাই সকলে এসেছে পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞে যোগ দিতে। মানুষের সঙ্গে মৈত্রী, সহযোগিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক অনুকূল আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলার আন্তরিক তাগিদ নিয়েই তারা এসেছে। দশরথের পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞে যে রাজনৈতিক মেলামেশার এক নিরাপদ মঞ্চ হয়ে উঠবে অযোধ্যায় তাতে বিশ্বামিত্রের অন্তরে আর কোন সন্দেহ রইল না।

নিজের অজান্তে আত্মপ্রত্যয়দীপিত সাফল্যের হাসিতে রঞ্জিত হল গম্ভীর মুখখানা। দেবতা অসীম শক্তিশালী। তবু, মানুষের রাজনৈতিক সাহায্যলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। মানুষের সহায়তায় রাক্ষস ও অসুর এই দুই অশুভ শক্তির দমন যে সম্ভব দেবতারাও সেরকম চিন্তা করেছে। পৃথিবী থেকে রাক্ষসদের অত্যাচার, উৎপীড়ন,

দৌরাত্ম্য মুক্ত করতে দৈবীশক্তি যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে মানুষী উদ্যোগ, শ্রম, সহযোগিতা মনীষা, তেজ এবং বুদ্ধির একান্ত সংমিশ্রণ প্রয়োজন। দেবতা ও মানুষের অন্তরে এই শুভবুদ্ধির উদয়কে বিশ্বামিত্র এক নতুন যুগের সূচনা বলে মনে করল। তার অন্তর বিকশিত হল। আঁখি স্বপ্নাবিষ্ট হল।

ঋষিরা উচ্চৈস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছিল। যজ্ঞকুণ্ড থেকে প্রগাঢ় লাল রঙের জ্যোতি সংখ্যাহীন আলোর শিখায় লক্‌লক্‌ করতে লাগল। সরযূর জলের বুকে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিবিম্ব। শিখা স্থির। কিন্তু স্রোতের বুকে সেগুলো ভেঙে ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেসে যাচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ শিখা হয়ে জ্বলছিল যতদূর স্রোত যায়।

বিশ্বামিত্রের চোখের তারায় তার আলো নাচছিল। কিন্তু সে সব কিছুর উপর তার দৃষ্টি ছিল না। অন্য এক চিন্তায় তন্ময় সে। পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞ তার স্বপ্ন-মদির আঁখির তারায় লক্ষ লক্ষ রাক্ষস অসুরবধের বহ্ন্যুৎসবের এক কাল্পনিক ছবি হয়ে উঠল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে নিজের অন্যমনস্কতার মধ্যে ডুবে গিয়ে ভাবতে শুরু করল দেবতা ও মানুষের এ এক আশ্চর্য মহামিলন। এক সম্মিলিত মহা উদ্যোগ। দেশ কাল পরিস্থিতির বন্ধনই যেন অনির্বচনীয় করে তুলল তাকে। কাল স্বয়ং দেবতা ও মানুষের মিলনের পৌরহিত্য করছে। এই অনুভূতিতে বিশ্বামিত্রের উজ্জ্বল চোখের কৃষ্ণতারা দুটি যেন ঝিক্‌ করে হেসে উঠল।

যজ্ঞাগ্নির আলোয় উদ্ভাসিত হল বিশ্বামিত্রের কলেবর। তার বর্ণচ্ছটায় তার মুখ, চোখ, শরীরে রক্তিম আভা ছড়াল। আর তাতেই অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল, ক্রোধ অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলছে যেন বিশ্বামিত্র অন্তরে, তার সর্বদেহে যেন বিকীর্ণ হচ্ছিল তার গণগণে তেজ।

বিশ্বামিত্র স্তব্ধ। গম্ভীর। নির্বাক। চিন্তায় মগ্ন। হৃদয়ের ভিতরে তার কি যেন ঘটে যাচ্ছিল। কিসের প্রকাশের অপেক্ষায় তার অন্তরের সকল অনুভূতি যেন একাগ্র। যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত সকলের মধ্যে সে কেবল স্বতন্ত্র। বহুর মধ্যে সে একা। তাকে চিনে নিতে ব্রহ্মার কোন কষ্ট হল না।

ব্রহ্মা অপলক স্থির দৃষ্টিতে বিশ্বামিত্রকে নিরীক্ষণ করছিল। স্পষ্টতঃ বুঝতে পারছিল ঋষির বুকের ভেতর যজ্ঞের কুণ্ডের মত গণগণে আগুণ। ঋষির আরক্ত চোখের কোণে সংকল্প হীরার মত চিক্‌ চিক্‌ করছিল। মুখে তার প্রত্যয়ের কাঠিন্য, শপথের দীপ্তি। চোখে বিদ্বেষ বহ্নি। ধনুকের মত বাঁকা ঠোঁটে দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসা। বিশ্বামিত্রের এই মূর্তি ব্রহ্মার অন্তরে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করল। অসুরত্রাস থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারে এমন একজন সর্বত্যাগী নেতার অন্বেষণে তার বহুকাল কাটল। তবু, মনের মত একজন মানুষের সাক্ষাত হয়নি তার। বিশ্বামিত্রকে দেখেই অকস্মাৎ তার মনে হল, এই ঋষির বুকে রয়েছে এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণের আবেগে ছটফট করছে তার বক্ষদেশ। শুধু দরকার একটু ইন্ধন। বিস্ময়ে আনন্দে ব্রহ্মার দুই চোখ চক্‌ চক্‌ করতে লাগল। বুকের ভেতর তার আশায় নাকাড়া বাজতে লাগল। প্রত্যাশায় সুখের ভেতর ডুবে গিয়ে অজ্ঞাতসারে অস্পষ্ট ভাষায়

উচ্চারণ করল ঃ এই ঋষিই পারবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে। মহাকালের পরোয়না নিয়ে এসেছে যুগান্তর ঘটাতে।

অযোধ্যার রাজগৃহে মুনি ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেবতাদের নানারকম শলা-পরামর্শ হল কয়েকদিন ধরে। অবশেষে স্বার্থান্বেষী রাজা-মহারাজাদের বাদ দিয়ে বশিষ্ঠের গৃহে একটি সভা ডাকা হল। মুনি ঋষি ব্রাহ্মণেরা একে একে সমবেত হতে লাগল সেখানে।

বাইরে ঝড় জলের তাণ্ডব। বাতায়ন রুদ্ধ গৃহে কম্পমান দীপশিখালোকিত কক্ষের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে উত্তেজিতভাবে পদচারণা করছিলেন বিশ্বামিত্র। চোখে মুখে তাঁর শংকা এবং দুর্ভাবনার ছাপ প্রকট। অনতিদূরে একটি দারুনির্মিত চৌপায়ায় প্রবীণ সৌম্য-দর্শন ব্রহ্মা মাথা নত করে বসেছিল। কাকে নিয়ে কিভাবে রাক্ষস বধের পরিকল্পনা হবে এই চিন্তায় ব্রহ্মা সর্বক্ষণ মগ্ন। কারণ এই সভার আহ্বায়ক সে। মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে মনুর বাসভূমি আর্যাবর্তে এবং দেবভূমি ইলাবৃতবর্ষে অসুর ও রাক্ষসের সম্মিলিত অত্যাচার, অনাচার এবং উচ্ছৃংখলার সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা এবং তার আশু প্রতিকার নিয়ে সম্ভাব্য আলোচনা করা ছিল সভার প্রধান কর্মসূচী।

দূরদূরান্ত থেকে যে সব মুনি ঋষিরা এসেছিল দশরথের পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞে তারা সকলে ঝড় জল উপেক্ষা করে বশিষ্ঠের গৃহে উপস্থিত হল!

ক্রমেই বাইরে ঝড় জলের বেগ বাড়ল। বজ্রনির্ঘোষে ঘন ঘন কেঁপে উঠছিল কক্ষের রুদ্ধ কপাট। শান্তভাবে যারা কক্ষে অপেক্ষা করছিল তাদের মনও প্রমত্ত ঝড়ের মতই অস্থির অশান্ত। কিছুতে কেউ যেন মনেতে স্বস্তি ও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। একটা আতঙ্কে যেন সকলে তটস্থ। প্রত্যেকে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা নিয়ে ঘন ঘন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিল।

হঠাৎ বিশ্বামিত্র অস্থির পদ-চারণায় ক্ষান্ত হয়ে ব্রহ্মার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ঃ মহাত্মা প্রজাপতি, আপনি প্রাজ্ঞ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। সব বৃত্তান্ত জেনেও আপনি যদি চুপ করে থাকেন তা-হলে প্রতিকারের উত্তর পাই কি করে? অথচ, এই মহাসংকটে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

ব্রহ্মার ভাবলেশহীন দৃষ্টি বিশ্বামিত্রের মুখে স্থির, অপলক। আপন মনোভাব গোপন করতে ব্রহ্মা কপট শ্বাস মোচন করল। বুকের ভেতর থেকে খুব ধীরে ধীরে সে শ্বাস নামল। মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ আমরা এক অসহায় অবস্থার ভেতর বন্দী। কি করলে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ভেবে কূলকিনারা করতে পারছি না। সবাই মিলে চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা কিছু হবে।

ব্রহ্মার বাক্যে বিশ্বামিত্র অসহিষ্ণু হল। স্বগতোক্তি করে বলল ঃ অথচ একদিন আর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের দরকার ছিল। এই সুজলা সুফলা দেশের

মাটির দখলের ভূমিকা নিয়েছিল এই মুনি-ঋষিরা। নইলে মুষ্টিমেয় আর্যনৃপতির সাধ্য কি বাহুবলে অসুর রাক্ষস দানবের বাসভূমি এই বিশাল ভারতবর্ষকে পদানত করে!

ব্রহ্মা নিরুত্তর। দৃষ্টিতে তার অন্যমনস্কতা।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ভৎর্সনা করার জন্যে বলল ঃ আত্মশ্লাঘা ঋষির ধর্ম নয়। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণে আত্মোৎস্বর্গ করা ঋষির স্বধর্ম। এটা তার অন্যতম কর্ত্তব্য। ঋষি হয়ে তুমি ফলের প্রত্যাশা কর কেন?

বশিষ্ঠের বাক্যে বিশ্বামিত্রের দুই চক্ষু আরক্ত হল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আত্মসংবরণ করে বলল ঃ ব্রাহ্মণের এই বিনয় আর আত্মদীনভাবই তাদের অবজ্ঞা, উপেক্ষার পাত্র করেছে।

প্রসন্ন হাসি ফুটল বশিষ্ঠের অধর যুগলে। বলল ঃ বৎস বিশ্বামিত্র, আত্মাভিমান থেকে এখনও মুক্ত হয়নি তোমার চিত্ত। নিষ্কাম কর্মের আত্মপ্রসাদ স্বতন্ত্র। স্থূল বস্তু দিয়ে তাকে পরিমাপ করতে চেওনা। ঋষির ধর্ম ত্যাগ। গ্রহণে ঋষির ধর্ম ক্ষয় হয়।

বিশ্বামিত্র'র ভুরু কোঁচকাল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ দিন বদলাচেছ। স্বার্থপরতার বিষে দুষিত হচেছ পরিবেশ। ঋষির মহান আত্মত্যাগের গৌরব কোথায়? জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে তারা শাস্ত্র ছেড়ে শস্ত্র ধরেছে। সত্তগুণ রজ গুণে রূপান্তর হয়েছে।

বিশ্বামিত্রের বাক্যে শ্লেষ ও বিদ্রূপ ছিল। স্পষ্টত, বশিষ্ঠ ছিল তার আক্রমণের লক্ষ্য। বিশ্বামিত্রের বাক্যের বশিষ্ঠ মর্মাহিত হল। বিব্রত বোধ করল। নিজের অজান্তে তার বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মধুর কণ্ঠে বলল ঃ এ হল বিশ্বাসের কথা। ইলাবৃতবর্ষ থেকে যেদিন ঋষিরা এদেশে পদার্পণ করল, সেদিন থেকে ভূমি ছেড়ে তারা ভূমার সন্ধান করছে। তাদের সন্ধান এখনও অব্যাহত। দানবের অত্যাচারে উৎপীড়নের ভয়ে তারা থেমে যায়নি। একমাত্র ঋষির ভেতরে আছে অনলস কর্মশক্তি এবং দৃঢ় মানসিকতা। বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর কল্যাণবোধের কথা তার কাছে বড়। বাহুবল তার নেই। কিন্তু আত্মবলের দ্বারা সে জয় করেছে, বশ করেছে। ঋষির এই শক্তিতে রাজাও ঋষি হয়।

বশিষ্ঠের বাক্যে ঋষিরা হর্ষোৎফুল্ল হল। সকলের চোখে মুখে খুশির দীপ্তি ঝিলিক দিল। ঋষিত্বের গর্ব ও আনন্দের আত্মপ্রসাদে তারা প্রগলভ হল।

বিশ্বামিত্র কোন কথা খুঁজে পেল না। দুচোখের তারায় তার আর্ত্তি ও বেদনা প্রকাশ পেল। অপলক চোখে বশিষ্ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। তারপর ক্রোধের বশে নিজের মস্তকে সজোরে করাঘাত করল। অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে নিরুপায় আর্ত্তস্বর নির্গত হল ঃ হায়রে ঋষিত্বের অভিমান।

বিশ্বামিত্রের অসহায় বিচলিতভাব ব্রহ্মাকে সচকিত করল। স্তব্ধ কক্ষে সকলের ভারি নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পেল ব্রহ্মা। অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি সবার মুখের উপর সঞ্চালিত হল। বিলোল চাহনি বশিষ্ঠের মুখের উপর স্থির। মুখে তার রহস্যময়
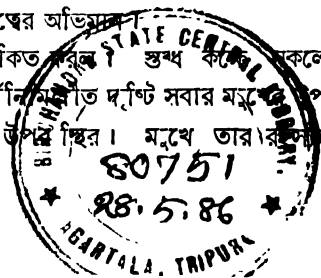
কৌতুক হাসি। বশিষ্ঠ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। ব্রহ্মার অর্থপূর্ণ চাহনি আর হাসি তাকে দিয়ে যেন কি বলতে চাইল। এক নিরন্তর জটিলতার মধ্যে বশিষ্ঠ হারিয়ে গেল। ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বিশ্বামিত্রকে বলল : বৎস, তোমার চিত্ত অশান্ত। বিচারের ধৈর্য তোমার নেই। তোমার অবগতির জন্যে বলি, সংঘাত বাঁধানোর জন্যে ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ ধৈর্য, কৌশল, ভদ্রতা, শালীনতার প্রতিমূর্ত্তি।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ার মত জ্বলে উঠল বিশ্বামিত্র। বলল : হ্যাঁ, পরিস্থিতির অস্থিরতায় জীবনের ভিত্-ভিত্ ভেঙে গেছে। এই অবস্থায় অশান্ত হওয়া কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। কিন্তু আপনার মত ঋষিতুল্য ব্যক্তিরাই মুনি ঋষিদের জীবনে ভয়ংকর বিপদ। ধর্ম ব্রত আদর্শ পালনের নামে এক আত্মসুখী জীবনযাপনের পক্ষপাতী আপনারা। একবারও চিন্তা করেন না দীর্ঘকাল ধরে যে আদর্শের পিছনে ঘুরে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা যদি বেঁচে থাকার অন্তরায় হয়, ধর্মপালনের বাধা হয়, স্বার্থলাভের মহান আকাংখ্যা বিপর্যস্ত হয়, তাহলে এই ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মূল্য থাকল কোথায় ?

ন্যায়ধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম ও কূটনীতির অসাধারণ মিশ্রণে রচিত বিশ্বামিত্রের অনবদ্য বক্তব্যে সভাস্থ ব্যক্তিরা অভিভূত হল। ব্রহ্মা প্রফুল্লিত হলেন। একটা চাপা গুঞ্জন ক্রমে সরব হল। বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত ও সংযত করার জন্য জাবালি কৌতুক হাস্যে অধর রঞ্জিত করে বলল : রাজর্ষির মতই কথা।

গৌতম মুনি বলল : ঋষি হওয়া সহজ নয় গাধেয়। তুমি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমার ধমনীতে ক্ষত্রিয়ের রক্ত। তাই মন থেকে সাধারণ ক্ষত্রিয়ের লোভ, বিদ্বেষ, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, ক্রোধ, ত্যাগ করতে পারনি।

ক্রোধে বিশ্বামিত্রের দুই চক্ষু দিয়ে অগ্নি নির্গত হতে লাগল। ওজস্বী ভাষায় বলল : এসব নিয়েই রক্তমাংসের মানুষের গোটা পরিচয়। ঋষিও ক্রোধ মুক্ত নন। নারায়ণের বুকে ক্রুদ্ধ ভৃগুর পদচিহ্ন মোছেনি কোনদিন, মুছবেও না। ক্রোধে নিদ্রিত ভগবানের ঘুম ভাঙে। ক্রোধের শক্তিই পারে অসাধ্য সাধন করতে। ক্রোধ হল পৌরুষ, বীর্য, তেজ, আত্মার জ্যোতি। এই ক্রোধেই রত্নাকর দস্যু কবি বাল্মীকি হল। ক্রোধ শুধু শক্তি নয়, সে মন্ত্র, মুক্তির পরোয়ানা। সুতরাং ক্রোধকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার কিছু নেই।

বশিষ্ঠ স্তম্ভিত। অন্যান্য মুনি ঋষিরা নির্বাক। ব্রহ্মা বিস্মিত। মোটা সাদা ভুরুর নিচে ব্রহ্মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসু চোখ, শানিত নাসা, চিন্তা চিন্তা মুখখানিতে স্নিগ্ধ মৃদুর আভাস তাকে এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছিল। চমকানো বিস্ময়ে টনটন করছিল তার বুক। সত্যিই ক্রোধ এক আশ্চর্য অভিনব সম্পদ। তবু এই দুঃসহ সুন্দরের অপব্যাখ্যা চলে আসছে চিরকাল। ক্রোধের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা চিন্তা করে ব্রহ্মা ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হতে লাগলেন। সারা অঙ্গে তার বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। কানের মধ্যে বিশ্বামিত্রের কথাগুলো কেবলই প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তবে কি প্রকৃত ক্রোধের অভাব ঘটেছে আজ ? মহাশক্তি উদ্বোধনকারী

ক্রোধ কোথায় গেল ? একমাত্র বিশ্বামিত্র ছাড়া আর কারো মধ্যে ক্রোধের সেই তেজ কৈ ? ক্রোধের দুর্জয় সাহসই বা অন্তর্হিত হল কোথায় ? দেবতারাও ক্রোধে দেউল হয়ে গেছে। নৈরাশ্য, হতাশা, অবসাদ, ভীরুতা, লাঞ্ছিত জীবনের গ্লানি, অপমান, দুঃখ-বেদনা আজ দেবতা ও মানুষের জীবনে বৈরী। জীবনশক্তির অপচয় ; মানে সাহস, তেজ, বীর্যেরও অবক্ষয়।

বিশ্বামিত্রকে ভীষণ ভাল লাগল ব্রহ্মার। তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দুর্বার শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও ভাবপ্রবণতায় তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হল ঝরবার। এরকম তার আগে কখনও হয়নি। ব্রহ্মা স্পষ্টত অনুভব করল, বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে পরিবর্তন তা ক্ষাত্রতেজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার এবং বিদ্রোহের। তার চোখের চাহনিতে আত্মপ্রকাশের নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ। মুষ্টিবদ্ধ হাতের পেশীতে পাকিয়ে উঠেছিল সমস্ত শরীরের দৃঢ়তা, একটা দুর্বোধ্য প্রত্যয় আর বজ্রকঠিন শপথের স্পষ্ট সংকেত। দুর্জয় সংকল্পের আবেগে স্ফীত শিরাগুলি যেন টনটন করছিল। বিশ্বামিত্রের ব্যক্তিত্বটা কি ধরনের তা অবশ্য ব্রহ্মার জানা নেই। কিন্তু তার কথাতে যে ব্যক্তিত্ব ফুটল তা থেকে বিশ্বামিত্রকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে ব্রহ্মার কোন অসুবিধা হল না। বিশ্বামিত্র সম্পর্কে একটা প্রবল গর্ববোধে তার বুক উত্তেজনায় কাঁপছিল। মনে মনে হাজারবার উচ্চারণ করল ঃ এই তো চাই।

ব্রহ্মা তার প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল বিশ্বামিত্রকে। আস্তে আস্তে মুখে তার কোমলতা ফুটল। যেমন শিশুর অসহায়তা দেখে মায়ের মুখে ফোটে অনেকটা সেরকম। আর সেই মুহূর্তে কি অপরূপ হয়ে গেল মুখটা। হাসি মুখ করে মৃদুস্বরে বলল ঃ বিশ্বামিত্র, তোমার বাক্য আমাকে চমৎকৃত করল। কথায় তোমার ক্ষত্রিয় রাজার অস্ত্রের ধার। তোমার চাওয়া পাওয়াও রাজার মত। কিন্তু তোমার অন্তরের ইচ্ছাকে সকলের পক্ষে বোঝা শক্ত। ইচ্ছেই আনে প্রাণে নতুন চিন্তা, নতুন উত্তেজনা। ইচ্ছায় প্রাণ মেতে না উঠা পর্যন্ত শক্তি বিকশিত হয় না। এই যে প্রাণের শক্তি এইতো প্রাণায়াম। সাধক একেই কেন্দ্রস্থ করে সিদ্ধিলাভ করে। সেই সিদ্ধি তুমিও পাবে।

ব্রহ্মার কথায় বিশ্বামিত্র অবাক হল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। দৃষ্টি স্থির। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ল না। কেবল মৃদু মন্থর ঢেউয়ে বুক উঠানামা করতে লাগল। অন্যেরা তন্ময় হয়ে ব্রহ্মার মুখ পানে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কারো মুখে কোন কথা ছিল না। কারণ, সকলের ধারণা ব্রহ্মা যা বলেন তা সব সঠিক। তাঁর কার্যের সমালোচনা করা কারো শোভা পায় না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

বশিষ্ঠ একটু ভুরু কুঁচকে চিন্তান্বিত মুখে বলল ঃ ঋষির সংযম যদি কর্মে না রইল, তাহলে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায় ? ঋষির কর্ম হবে আদর্শের পথে, নিষ্কাম মতে জীব ও সংসারের কল্যাণে। তাতে স্বার্থের মোহ থাকবে না, অসূয়া দ্বেষের পঙ্কিলতা থাকবে না, থাকবে না বঞ্চনা কিংবা অহমিকার গ্লানি।

ব্রহ্মার মুখে হাসি, চোখে উজ্জ্বল আলোর ঝলক। মধুর হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ কাজ দিয়ে মানুষের বিচার হয় বটে, কিন্তু তার মনের গতি প্রকৃতি দিয়ে সে বিচার নিষ্পন্ন হয়। জেদের বশে রাজা বিশ্বামিত্র তোমার ধেনু হরণে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু তা দিয়ে তার কর্মের বিচার করতে পারলে তুমি? পারলে না। বিশ্বামিত্রের মধ্যে মহৎ মানুষটা সব গণ্ডগোল করে দিল। একদণ্ডে রাজা থেকে ঋষি হল সে। সেই কর্মের গৌরব বিশ্বামিত্রকে গৌরবান্বিত করল। প্রকৃতপক্ষে কর্মের ভেতর তার আত্মজাগরণ হল। কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্মে আমার চির অধিকার, কিন্তু ফলে আমি নিষ্কাম—এইতো সাধকের ধর্ম। কর্মই আসল। কর্মের গৌরবের ভেতর কবি বাল্মীকির অতীতের অগৌরবের কালিমাময় জীবন হারিয়ে গেল।

ব্রহ্মার কথায় বিশ্বামিত্র খুশি হল। একটা দীপ্তি ক্ষণেক খেলা করে গেল তার মুখে।

বশিষ্ঠের ভ্রূকুটি উৎসুক মুখ দেখে বোঝা গেল, সে কষ্ট করে আত্মসংবরণ করছে। মুখে একটা কষ্টের ছাপ সুনিবিড় হল, ঠোঁট কাঁপল। ব্রহ্মার কথা প্রতিবাদ করা নিরর্থক মনে করেই বশিষ্ঠ চুপ করেছিল। কারণ এই বিতর্ক তার পুরনো বিরোধকে ইন্ধন দেবে। তাতে অকারণ শত্রুতা ও মনোমালিন্য বাড়বে। সম্পর্ক তিক্ত হবে। তাই বশিষ্ঠ ইচ্ছা করেই চুপ করে রইল।

ব্রহ্মার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার ঠেলে ঢুকল নারদ। বৃষ্টিতে তার বসন ভিজে গিয়েছিল। গায়ের সঙ্গে এঁটে বসেছিল। কিন্তু তার প্রতি কারো দৃষ্টি ছিল না। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ নির্বাক মুনি ঋষিদের নিশ্চল দৃষ্টিতে কিসের একটা সাড়া পড়ে গেল। সকলে তার আগমনের জন্য উদগ্রীব হয়েছিল, এটা মুনি ঋষিদের ঔৎসুক্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল। তাই তাকে দেখামাত্র আগ্রহে ত্রস্ত হয়ে উঠল। নারদ ফিরে আসায় বিশ্বামিত্র স্বস্তি পেল। বুক থেকে তার দুশ্চিন্তার পাহাড় সরে গেল যেন। খুশিখুশি ভাব নিয়ে বলল ঃ মুনিবর, আপনার বসন সিক্ত। ঠাণ্ডাতে শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। এখন আপনার বসন ও উত্তরীয় বদলে আসুন।

পাশের ঘরে বসন ছেড়ে নারদ দ্রুত ফিরে এল। তার মুখ একটু গম্ভীর। কপালে চিন্তার বলিরেখার ভাঁজ স্পষ্ট হল। কোন কথা বলল না। ঋষিদের মধ্যে এসে বসল।

বিশ্বামিত্র'র দুই চক্ষুর স্থির দৃষ্টি জিজ্ঞাসায় চিকচিক করে উঠল। বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিশ্বামিত্র। নারদ নীরব কেন? তার কথা বলতে বাধা কোথায়? অন্য দেশের মানুষের মত সেও একটা সুদূর আর রহস্যময় ব্যবধান বজায় রেখে চলেছে। কেন? অজানিত একটা আশংকায় তার বুকের ভেতর টিপ টিপ করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল ঃ ঋষিবর আমাদের জন্যে কি সংবাদ নিয়ে এলেন?

কয়েকমুহূর্ত কি চিন্তা করল নারদ। চোখ দুটোকে কক্ষের দেয়ালের উপর নিবদ্ধ করে দিয়ে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে অস্ফুটস্বরে বলল ঃ সংবাদ শুভ নয়। দক্ষিণ

দেশের রাক্ষস এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অসুর, দৈত্য এবং দানব জাতিরা জোট বেঁধেছে। রাবণের নেতৃত্বে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেহাদ ঘোষণা করতে তলে তলে প্রস্তুত হচ্ছে। আর্যাবর্তের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের ইন্ধন দিচ্ছে তাড়কা ও তার পুত্র মারীচ ও সুবাহু। ঋষিদের বিব্রত করলে সর্বত্র অস্থিরতা দেখা দেবে। সর্বত্র ভয় বিভীষিকার পরিবেশ সৃষ্টি করাই তাদের কাজ। রাজাদের মনোবল ও সৈন্যবল পঙ্গু করে দেবার জন্য মারীচের নেতৃত্বে এক অতর্কিত হানাবাহিনী গঠিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের ঘায়ে তারা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চায় আর্যাবর্তের মানুষকে।

এসব করে তারা লাভবান হবে কি? বিশ্বামিত্র অত্যন্ত বিমর্ষভাবেই কথাগুলো বলল।

নারদের ভুরু কুঁচকে গেল। বলল: মুনি ঋষিরা তাদের কৌতুককর পরিকল্পনার আসল চাবিকাঠি। তারা বিব্রত বিভ্রান্ত হলে নিশ্চয়ই লাভবান হবে।

সমবেত প্রত্যেকের দৃষ্টি বিশ্বামিত্রের মুখের উপর। কারো মুখে কথা নেই। শুধু শাঁ শাঁ করে বাতাস বন্ধ দুয়ারের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মত গোঙাতে লাগল।

বিশ্বামিত্রের বড় বড় ডাগর দুইচোখে চিন্তার ছায়া ঘন হল। মাথা নীচু করে প্রশ্ন করল: আপনার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার আছে।

গভীর বিস্ময়ে অপলক হয়ে উঠল নারদের কুঞ্চিত চক্ষু। বলল: মুনি ঋষিদের তপোবন স্থাপনের উদ্দেশ্য আর রাক্ষস অসুরের কাছে গোপন নেই। তাই মুনি ঋষিরা তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাদের অপদস্থ ও অপমান করতে পারলে আর্য-সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ বন্ধ হবে।

উদভ্রান্ত আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে নারদের দিকে তাকিয়ে তীব্র ঘৃণায় আর উষ্মায় দগ্ধ হতে হতে অস্ফুটকণ্ঠে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলল: মূর্খ! কথা বলার সময় বিশ্বামিত্রের মুখ জ্বলজ্বলিয়ে উঠল। নাকের পাশে ফুলে উঠল। যেন অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে, তর্জনী নেড়ে বলল: ব্রাহ্মণের ক্রোধ কত ভয়ংকর, মূর্খেরা জানে না।

মিথ্যে আস্ফালনে লাভ কি রাজর্ষি? নারদ নিস্পৃহভাবে উত্তর করল।

নারদের বাক্যে বিশ্বামিত্র থমকে গেল। বিভ্রান্ত চোখে তাকাল তার দিকে। এই মুহূর্তে কি বললে ভাল হয় স্থির করতে পারল না বিশ্বামিত্র। তীব্র একটা অসহায় বোধে তার কান জ্বালা করতে লাগল। ক্রোধ আর অপমানে জ্বলে উঠল দুই চোখ। বিপন্ন গলায় বলল: অনেক নির্মম লাঞ্ছনা আর অপমান পুঞ্জীভূত হতে হতে বুকের ভেতর এক বারুদের স্তূপ হয়ে উঠেছে। বিস্ফোরণ আর অগ্ন্যুৎপাতের জন্য প্রয়োজন সামান্য উপলক্ষ্য।

বিশ্বামিত্রের ক্ষিপ্ত অবিচলিত মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার অধরে। সে হাসি অসহায় মানুষের বিফলতার অবসাদে বিষণ্ন আর করুণ। ধীরে ধীরে বলল: ঋষিবর আপনার

কথাই ঠিক। রাক্ষস, অসুর, দানবের পুঞ্জীভূত অপমান লাঞ্ছনা, বঞ্চনা অসন্তোষের বারুদের স্তূপে আগুন লেগেছে। বিদ্রোহ দাবানলের মত জ্বলছে চতুর্দিকে। ঋষিদের সাধ্য কি মন্ত্র বলে নেভায় সে আগুন। তাড়কা প্রেমের প্রতিহিংসা এই দাবানলের উপলক্ষ্য। রাবণ তার ইন্ধন ছড়াচ্ছে। যুগযুগান্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার রোষে তাদের উপর রাগ করা যেতে পারে কিন্তু তাতে সমস্যার কোন সুরাহা হবে না। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাঁধে, তখন অভিমান আর অহংকারের ভাববিলাস শোভা পায় না।

বিশ্বামিত্রের মুখে কথা যোগাল না। কিন্তু ভীষণ এক অস্থির উত্তেজনায় তার বুক খামচে ধরলো। হিংসা বিদ্বেষে জ্বলে যেতে লাগল অন্তর।

নারদ তার দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ভেতর ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল ঃ অসুর, রাক্ষস, দৈত্য এরা সকলে আমাদের প্রতিপক্ষ। শত্রুরা জেনেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো আর্যদের মধ্যে দিন দিন মাথা চাড়া দিচ্ছে। তাদের ঐক্য সংহতি বিপন্ন। এই দারুণ সংকটের একমাত্র ভরসা মুনি ঋষিরা। সুতরাং তাদের যত ভীত, সন্ত্রস্ত এবং অশান্ত করে তোলা যাবে, বিব্রত, বিভ্রান্ত চিন্তা যত তাদের অনুভূতির মধ্যে ক্রিয়া করবে, ততই মুনি ঋষিদের তেজ, সাহস, শক্তি, উদ্যম, উৎসাহের ক্ষয় হবে। জীবননাশের আশংকায় এবং বিপন্ন জীবন রক্ষার জন্যে তারা রাক্ষসদের প্রতিকূল আচরণ করবে না। শুধু তাই নয়। শত্রুপক্ষের লোকদের আরো একটা মতলব আছে, মনে হচ্ছে ঋষিদেরও সন্ত্রস্ত রেখে তারা আর্য সাম্রাজ্যকে অন্তর্দ্বন্দ্বে আরো দুর্বল করে দিতে চাইছে। এছাড়াও ঋষিদেরও তারা কার্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে।

নারদের কথায় যথেষ্ট যুক্তি ছিল। বিশ্বামিত্র মাথা নেড়ে সমর্থন করল। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা প্রকট হল। বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় বলল ঃ দিগ্বিজয়ী আর্যরা এদেশে বহিরাগত ঠিকই। কিন্তু ভূজবলে, বুদ্ধিবলে এবং কৌশলে তারা সব বিপদ বাধা জয় করে কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।* ধমনীতে তাদের পবিত্র রক্তধারা বইছে আমাদের। দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়া, থেমে যাওয়া, কিংবা অসহায় বোধ করা আমাদের রক্তে ও প্রকৃতিতে বিধাতা লেখেনি। পূর্বপুরুষেরা বিপদে কখনও বুদ্ধি ধৈর্য হারায়নি। আমরা তাদের সন্তান। আমরাও অবিচলিত থাকব।

বিশ্বামিত্রের কথায় ইন্দ্র পুলকিত হল। তার চোখে মুখে একটা খুশি খুশি ভাব ফুটল। কিন্তু মনের ভেতর জেগে উঠা আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করল।

সকলের চোখ নিঃশব্দে এর ওর চোখে ঘুরছে। শুধু একটি প্রশ্ন বিশ্বামিত্রের প্রত্যয়ের আকর্ষণ তারা অন্তরে কেন অনুভব করছে না?

অকস্মাৎ কড়্ কড়্ শব্দ করে বিরাট জোরে বাইরে কোথাও বাজ পড়ল। ক্ষিপ্ত

* মৎলিখিত 'কাশ্যপেয়' উপন্যাসে এর পূর্ণ বৃত্তান্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে আর্যরা এ দেশকে তাদের উপনিবেশ করেছিল।

প্রভঞ্জনের ধাক্কায় কেঁপে উঠল রুদ্ধ কপাট। বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো খোলা দরজায় হানা দিয়ে গেল।

পবন নিজের মনে ক্ষীণস্বরে জবাব দিল ঃ প্রকৃতিও যেন দৈত্য পীড়নে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। আমাদের মতই অসহায়। নীরবে মার খাচ্ছে আর অন্ধকারের বুকে মুখ লুকিয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাঁপছে। পরিত্রাণের কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না।

গভীর বেদনায় পবনের কণ্ঠস্বর কেমন বিষণ্ণ আর করুণ শোনাল। সকলের অন্তর স্পর্শ করল তার অসহায়তা। কেউ কোন কথা বলল না। প্রত্যেকে মাথা নিচু করে রইল। কেবল ক্রুদ্ধ আক্রোশে বিশ্বামিত্রর মুখে চোখে বিকৃতির চিহ্নগুলো ফুটে উঠল।

আচ্ছন্নতা কাটিয়ে মহর্ষি নিশাকর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। গভীর ভাবে কি যেন বলতে লাগল। উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, মস্তিষ্কের অতলান্ত থেকে তার কথা গুলো যেন আহরণ করছে। কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর ধীর এবং শান্ত। বুকের ভেতর তার বাঁশীর সুর বেজে উঠল। চোখ দুটো ভীষণ আনন্দে যেন বুজে এল। শুভ্র বসন, শুভ্র উত্তরীয়, শুভ্র কেশ শ্মশ্রু তাকে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সুষমা দান করল। কেমন মহৎ আর শুদ্ধাত্মা দেখাল মহর্ষিকে। বিনম্র স্বরে বলল ঃ হয়ত এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এক অনাগত শক্তিমান নবজাতকের অপেক্ষা করতে হবে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, দুঃসময়ের গর্ভে মানুষের পরিত্রাতা শিশুর জন্ম হয়। মুক্তিব্যাকুল মানুষ অধীর প্রতিক্ষার প্রহর গুনে একদিন তাকে পায়। আমার জ্যোতিষী গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। কালস্রোতের এবং নক্ষত্রের অবস্থান গণনা করে জেনেছি সে শিশু আসছে অযোধ্যার রাজগৃহে। নবদুর্বাদল শ্যামের মত তার গাত্রবরণ।

নিশাকরের কথায় নিঃশব্দ কক্ষের প্রতিটি মানুষ গৃহকোণে রক্ষিত দীপশিখার মত বিস্ময়ে কেঁপে উঠল। ব্রহ্মার মুখ মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হল। শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিশাকরের গণনার সঙ্গে ব্রহ্মার নিজস্ব গণনার ফল মিলে যাওয়ায় গভীর এক সুখে আনন্দে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। অস্ফুটস্বরে নিজের মনে বলল ঃ একদিন মহর্ষি নিশাকরের ভবিষ্যৎবাণী যে সত্য হবে তাতে কোন সংশয় নেই।

তবে আর কি ? রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ল বিশ্বামিত্র। ভ্রূকুটিবদ্ধ দুই চোখে তার বিরক্তি ফুটে উঠল। নিচু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ঃ আপনারা কিন্তু আমার জবাব এড়িয়ে যে যার বিশ্বাস, অনুমানের কথা যা হোক একটা কিছু বুঝিয়ে অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই আত্মবঞ্চনার প্রয়োজন কি ? কার স্বার্থে নিজেদের সঙ্গে এ ছলনা ?

বিশ্বামিত্রের জিজ্ঞাসার কি জবাব দেবে ঋষি ও দেবতারা ? মানব চরিত্রের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল, সে একটা কিছু বিশ্বাস করতে ভালবাসে। তাই ব্রহ্মা মহর্ষি নিশাকরের উক্তি সমর্থন করে আপন প্রত্যয়ে দৃঢ় হতে চাইল। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মন থেকে কি করলে সংশয় সন্দেহ দূর হয় তার ভাবনায় অস্থির হল। প্রতিবন্ধতাকে

জয় করার যে দুর্জয় সংকল্প ও দৃঢ় মনোবল তার আছে সে এক দুর্লভ সম্পদ। এ ক্ষমতার সামান্যতম ব্যবহার হলে বহুর কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়ন হবে।

কক্ষে নিথর নিস্তব্ধতা। সূচীপতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। ব্রহ্মার অন্ধকার মানসে হঠাৎ এক ঝলক আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল ঃ আমার মনে হচ্ছে আজকের সংকটে বিশ্বামিত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। স্বেচ্ছাচারী দানবশক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ব্রাহ্মণের তেজ, ত্যাগ, বিনয়, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষত্রিয়ের বীর্য, দম্ভ, অহংকার ও বলের সমন্বয় হওয়া দরকার।

আচমকা একটা অনুভূতিতে চমকে উঠেছিল কক্ষের সবাই। বিশ্বামিত্র চকিতে ফিরে তাকাল। চোখের দৃষ্টি তার কি গভীর আর ধারাল।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল বশিষ্ঠ। নিজের জায়গায় চুপ করে বসে স্তিমিত কণ্ঠে বলল ঃ বিশ্বামিত্রর ভেতর খুব গভীরে একটা নিয়ম ভাঙার প্রবণতা জেগেছে।

মহর্ষি নিশাকর মৃদু মৃদু হাসছিল। বশিষ্ঠের কথার পিঠে বলল ঃ বিশ্বামিত্র আর নিয়মশৃংখলায় থাকতে চাইছে না। পাগল ইচ্ছেটা উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে উদ্দাম গতিতে যদি শুধু লক্ষ্যহীন হয়ে ছোটে তাহলে অবশ্যই একসময় ক্লান্তি নামবে শরীরে। এরপর যখন বোধনের লগ্ন আসবে তখন কর্মে থাকবে না উদ্যোগের উদ্যম। ফল না পাকলে বৃন্তচ্যুত হয় না। দিনের জন্য রজনীকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করতে হয়।

অত্রিমুনি এবং গৌতম একসঙ্গে বলল ঃ অবশ্যই !

নারদের ঠোঁটে হাসি। চোখে ভ্রূকুটি। বঙ্কিমনয়নে বিশ্বামিত্রর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ একমাত্র বিশ্বামিত্রের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে ব্রাহ্মণের তেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের সমন্বয় হয়েছে। সুতরাং বিশ্বামিত্র দৈত্যচরিত্র ব্যক্তির বিনাশের উপায় উদ্ভাবনের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

নারদের বাক্যে বিশ্বামিত্র চমকাল। সারা শরীরে তার বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। বুকের ভিতরে খুব গভীরে শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন থর থর করে কাঁপল অনেকক্ষণ। উচ্চকিত রক্তের ছোঁয়ায় মুখ রাঙা হল। শিরগুলো অসহ্য উত্তেজনায় চিন্ চিন্ করছিল। ঘোর লাগা এক আচ্ছন্নতার মধ্যে কথাগুলো সে ধীরে ধীরে বলল ঃ দেবর্ষি ! আমায় নিয়ে এ কৌতুক কেন ? পরিহাসের মত কথাগুলো আমার মর্মে বিঁধছে। বুঝছি না, আমার উৎকণ্ঠা নিয়ে কেন এইভাবে বিদ্রূপ করা হল ? আমি যে কত অসহায়, অক্ষম সে কথা যদি জানতেন—

এতক্ষণের দেখা বিশ্বামিত্র হঠাৎ যেন বদলে গেল। কণ্ঠস্বর যেন আর্তবেদনায় বেজে উঠল।

ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের ভিতরের গনগনে অভিমানটুকু আঁচ করতে পারল। নিজের অজান্তে মমতা, দরদ তার টলটল করে উঠল। আস্তে আস্তে বলল ঃ ঋষিবর, এ আত্মাভিমানের কথা। দুর্দিনে সংকটে কেউ কাউকে বিদ্রূপ করে না, বিশ্বাস করে। এ হল নারদের আত্মপ্রত্যয়ের কথা। প্রকৃতপক্ষে, তোমার উপর নারদের মত অনেকেই

নির্ভর করতে পারে। সফল কর্মসূচী রূপায়ণে নির্ভরতা এবং প্রত্যয় এক বিরাট সম্পদ।

বিশ্বামিত্র জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে ঝড়-জলের অবস্থা দেখছিল। ঝড়ের তাণ্ডব তখনও অব্যাহত, কিন্তু বর্ষণ মন্দীভূত হয়েছে। ঝড় তার একাকিত্বের রোধটিকে আরো অসহনীয় করে দিল। চারদিকে থেকে উন্মাদ বাতাস ছুটে আসছে। লয় করে দিল সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তি। এমন কি অহংবোধ পর্যন্ত।

ঘন অন্ধকারের ভেতর চোখে কিছু দেখতে পেল না। কানে শুধু ঝড়ের উন্মাদ আর্তনাদ। তবু বিশ্বামিত্র তার পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিল ব্রহ্মার কথাগুলো। নিজের মনে নির্ভরতা, প্রত্যয়, শব্দ দুটি বারংবার উচ্চারণ করল। একটা মহান অনুভূতি জাগল অন্তরে। পরিব্যাপ্ত নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। সেই আলোয় গাছপালা, আকাশ, চরাচর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিশ্বামিত্রের বুকের অতলেও যেন সেই আলো এসে পড়ল। ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের মত খুব বেশিক্ষণ সেই বোধটুকু তার চিত্ত ও চিন্তাশক্তিকে রঞ্জিত করতে পারল না। প্রবল আত্মাভিমানের স্বর বেজে উঠল তার কণ্ঠস্বরে। বলল: মুনিবর, আমার বুকের ভেতর যে কি যন্ত্রণায় জমাট বেঁধে আছে তার ভাষা বোঝাব কি করে? ঋষির বাহুবল, ধনবল কিছু নেই। আর্যনরপতিরাও নেই তাদের পাশে। আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, নিরাশ্রয়, নিরলম্ব। এমনকি দেবতারাও নিজেদের স্বার্থ সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করে যুদ্ধ বর্জনের নীতি নিয়েছে। দুর্যোগময়ী, ভয়ংকর রাতের মতই এক ঘোর অন্ধকারে বসে বসে আমি কেবল স্বপ্নের জাল বুনছি। কিন্তু আমি একা কি করতে পারি? অথচ একদিন আর্যাবর্তের রাজ্য শাসনের কর্ণধার যে মুনি ঋষি এবং ব্রাহ্মণ তারাই আমাকে জানাল অগস্ত্যের আকস্মিক বিদায়ে এক শূন্যতা এবং সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পুরনোরীতিতে আর্যকিরণের যুগ শেষ হয়েছে। নতুন প্রত্যয় আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আর্যধর্ম এবং মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির এক নয়া রাজনীতি সূচনার প্রয়োজন। তাড়কাকে নিশ্চিহ্ন করে ব্রাহ্মণ্য গৌরব রক্ষার আবেদনও করা হল। এবং সব শেষে আমার উপর চাপানো হল সেই দুরূহের কাজের দায়িত্ব। তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে রাজী হয়ে গেলাম। ক্ষমতা কর্তৃত্বের মোহ নেশার মত। কিন্তু সহযোগিতা ছাড়াই একা কর্তব্যের পথে চলেছি। বড় উদ্যোগ, বড় কাজ একার চেষ্টার যত্নে বেশিদূর এগোয় না।

ব্রহ্মা খুব শান্তভাবে বিশ্বামিত্রর দিকে চেয়েছিল। ভিতরে ভিতরে তার অস্থিরতাকে ব্রহ্মা অনুভব করল। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: ঋষিবর পৃথিবীতে কাজ করার লোক যে খুব কম হয়, এত জান তুমি। তবু মনস্তাপ কেন? মনে রেখ, মহাকাল নিজের নিয়মে চলে। নিজের কর্ম তিনি নিজেই করে নেন। কাল পূর্ণ হলে তার রথচক্রে বেগ সঞ্চার হয়। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। গণনায় জেনেছি, তুমি মহাকালের মহাযজ্ঞের ঋত্বিক। আর নবদূর্বাদলের মত যে নবজাতক আসছে, ইক্ষ্বাকুবংশের রাজগৃহে সে হবে তার রূপকার। ফুল নিজের নিয়মে ফোটে। মানুষের

সাধ্য নেই গাছের ডালে ফুল ফোটায়। বীজ ছড়ালেই ফুল হয় না। ফুল পেতে হলে গাছকে পরিচর্যা করতে হয়। মালি অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা নিয়ে ফুল ফোটা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে। তারপরে সে পূজার অর্ঘ হয়। তেমনি নিজেকে সকল অবস্থার জন্যে প্রস্তুত করতে হবে ঋষিবর। পবিত্রতার আত্মিক সত্তা প্রত্যেকের ভেতর প্রচ্ছন্ন। তাকে কেবল সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করা চাই। সেই উপলব্ধি হলেই মনে হবে নিজেই পরিত্রাতা।

ব্রহ্মার বাক্য বিশ্বামিত্রের অন্তর ছুঁয়ে গেল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে কড় কড় শব্দ করে বাজ পড়ল। তার প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘরের রুদ্ধ কপাট।

তারপর থেকে বিশ্বামিত্র বদলে গেল। রাক্ষস অসুরের ধ্বংস সাধনাই তার একমাত্র জপমন্ত্র। ধ্যানে মনোসংযোগ হয় না। ইষ্টের নামোচ্চারণে ভুল হয়। বিব্রত বিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন করে এ তার হল কি? চোখের পাতা বন্ধ করলে দেখতে পায় উৎপীড়িত মুনি ঋষিদের অসহায় করুণ নিষ্পাপ মুখ; তাদের নষ্ট যজ্ঞ, অগ্নিদগ্ধ কুটীর। অমনি এক আর্তনাদের পরিবেশ। অসহায় করুণ নিষ্পাপ মুখ, তাদের লণ্ড ভণ্ড যজ্ঞ, দগ্ধ কুটীর। অমনি এক বিজাতীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধে বুক জ্বালা করে। আত্মদাহের তপ্ত কটাহে রক্ত টগবগিয়ে ফোটে। সত্তার ভেতর নিদ্রিত বিশ্বরথের ঘুম ভাঙে। নিজের মনে চিৎকার করে বলেঃ

বিশ্বরথ!
বিশ্বরথ, কোথা তুমি?
লক্ষ জনগণ মনে তোমার বিজয় ধনুর টংকার বাজে—
ত্যাগ কর তোমার ছদ্ম সজ্জা।
ঘৃণগ্রস্থ, পৃথিবী মৃত্যুর জ্বরে কাঁপে হারে হারে—
অস্ত্র খোঁজে উৎপীড়িত বসুন্ধরা, বিদ্রোহী *কৌশিক নদীর বুকে।
ওগো, বীর ধর অস্ত্র, কর সংগ্রাম।
ত্যজ অভিমান!

* ঋষিত্ব লাভের পূবে বিশ্বামিত্রব ক্ষত্রিয় নাম। মহ রাজ গাধির পুত্র ।তান।
* ক্ষত্রিয় নৃপতি বিশ্বরথ কৌশিক নদীর তীবে ঋষিত্বের জন্যে তপস্যা করেছিল

॥ তিন ॥

সাঁ সাঁ করে বাতাস কেটে রথ ছুটল। রামচন্দ্রের চোখে মুখে বাতাসের ঝাপ্টা লাগল। চুলগুলো হাওয়ায় উড়তে লাগল। কখনো মুখের উপর পড়ছিল। কিন্তু সেদিকে রামের ভ্রূক্ষেপ নেই। মস্তিষ্কে তখন নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসার ভীড়। চোখে অবাক মুগ্ধতা। যে পথে রথ চলেছে সেই পথের চলমান শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি শূন্য। যেন স্বপ্নের ঘোরে নিশ্চুপ। রথ চলার পথে পথে যেসব দৃশ্য অনুভূতি মনের ভিতরে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তার আর এক বিস্মৃত অতীত ঘটনাকে তার চোখে তারায় জীবন্ত ও চিত্রবৎ করে তুলল।

সীতা অনেকক্ষণ ধরে রামচন্দ্রের ভাবলেশহীন দৃষ্টি, স্তব্ধ বিফলতা, থমথমে গম্ভীর মুখ, অন্যমনস্ক আত্মবিস্মৃত ক্রিয়াকলাপের দিকে অবাক মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল। নিজের মনে রামচন্দ্র ঘাড় নাড়ছিল, ভুরু ঘোড়াচ্ছিল। দু'চোখ টানটান করছিল। মৃদু মৃদু হাসছিল। সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে করছিল। কিছুই ওঁর চেতনাকে নাড়া দিচ্ছিল না। অথচ রথে তার অস্তিত্বের নৈঃশব্দ ও নীরবতায় সীতা ভীষণ অস্থির এবং ক্লান্ত বোধ করল। বলার মত কথাও খুঁজে পেল না। ভারী অস্বস্তি লাগল।

লক্ষ্মণ মুখ ভার করে হতভম্বের মত বসে ছিল।

রামচন্দ্র নির্বিকার। আত্মসুখী পুরুষ মানুষ। নিজের জন্য ছাড়া আর কারো জন্যে ভাবে বলে মনে হল না। মানুষটাকে চিরকাল অদ্ভুত লাগে সীতার। না সংসারী না সন্ন্যাসী। এই মধ্যযৌবনে জীবনের খেলা মাঝপথে থামিয়ে বনবাসে যেতে কারো ভাল লাগে না। তবু রামচন্দ্র অভিমানবশে, নিছক খেয়ালেই তাই করে বসল। অথচ আশ্চর্য, তার জন্যে কোন শোক অনুভব করল না। রামের স্তম্ভিত চোখে মুখে এক ধরণের আচ্ছন্নতা চার দিককার বিভিন্ন ঘটনা, উদ্বেগ, ভয় যে বিব্রতভাবনায় তাকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করছিল, সীতা তার অনুভূতিতে টের পেল। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে থাকতে নিঝুম শরীরে এক ধরণের শীতলতায় তার দুই উরু পা অবশ হয়ে গেল। মাথার ভেতরও এলোমেলো ভাবনা গুলিয়ে দিল সব।

আড়ষ্টভাবে বসে বাইরের চলন্ত প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করল। অরণ্য নিবিড়। ছায়া ঘেরা বিশাল গাছগুলোর ভৌতিক অবয়ব একটা ভয়ধরা যন্ত্রণায় তাকে তটস্থ করে তুলল। প্রকৃতি ও চরাচর যেন এক নিমেষের জন্যে অলৌকিক বলে বোধ হল।

সহসা নিকটে দুটি নিশ্বাসের সঘন সংঘাতে সুখকর আনন্দের শীৎকার ধ্বনি বাজছিল। চকিতে সীতার দুই চোখ শব্দের দিকে ধাবিত হল। মিথুনরত বরাহ চুম্বকের মত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারল না। ভীষণ সুন্দর লাগল। এত সুন্দর যে লজ্জার থেকে বেশি আরো কিছু যা তার ত্রিংশৎবর্ষী

রক্তের শিরাতেও প্রবাহিত হচ্ছিল অনেকটা গলিত আগুনের স্রোতের মত, যা তার সমস্ত শরীরে একটা প্রবল জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই শিহরণ শুধু বাইরে নয়, ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অসহিষ্ণুতায় পীড়া দিচ্ছিল। নিজেকে তার কেমন অশক্ত লাগল। দূরে বহে কোন গাছের ঝোপে পাখির স্খলিত জিজ্ঞাসু ডাক শোনা গেল।

দ্বিপ্রহরের আলো ম্লান হয়ে এল। ছায়া দীর্ঘতর হল। নিরলস প্রার্থনায় গেরস্থদের খোকা হোক বলে পাখী ডেকে যাচ্ছিল। অবাক জিজ্ঞাসায় সীতার মস্তিকের অন্ধকার সীমানায় এক বিস্মিত অতীতের ঝিলিকে ঝলকিয়ে উঠল রামচন্দ্র। স্মৃতি বিস্মৃতির দোলায় সমগ্র অনুভূতি একটি মাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হল।

প্রকৃতির ঋতুচক্রে গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল হয়, বীজ হয়। বীজ থেকে গাছ জম্মে। এমনি করে বংশগতি কালস্রোতের নিয়মে নিরন্তর জীবনের দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃতির ঋতুচক্রের সেই কালস্রোতে তার নারীত্বের বারোটি বছর* কাটল। তবু মাতৃত্ব কি? মিথুন কাকে বলে কিছুই জানে না সে। এখনও তার যৌবন অনাঘ্রাত। তনুতে তনুতে পুরুষের শরীরী স্পর্শে রোমহর্ষে উন্মাদনার সুখকর উল্লাস, আনন্দ সবই তার কাছে কল্পনা। এই চিন্তা চকিতে যন্ত্রণার মত তার বুকে বিদ্ধ হল। একটা বেদনাহত নারীত্বের অভিমান আর লজ্জার অনুভূতি তার মনের দিগন্তকে ছুঁয়ে গেল। অথচ প্রাণের মূলে নিজের দ্বারা সৃষ্টি, তৃষ্ণা, আশার সাড়া রামচন্দ্রের কাছে কোনদিন মেলেনি। পুরুষের যে আচরণ যুবতী রমণীকে মুগ্ধতার ওপরে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়, আশা জাগায়, তৃষ্ণা জাগিয়ে দেয় আকণ্ঠ। রামচন্দ্রের দ্বারা তা পূর্ণ হয়নি। নারীর মাতৃত্বের দাবির আশ্বাসও অপূর্ণ থেকে গেল তার কাছে।

কিন্তু আবেগ দমিত থাকে না। সংশয়ের মধ্যেও তার তীব্রতা কমে না। নিজেকে পরমসুখে ভরিয়ে তুলবার আবেগ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় প্রাণের সংগমে। তার আঠারো বছরের দুরন্ত রূপ যৌবন থোকা থোকা ফুলের মত ফুটে থাকা পাপড়ির নিবিড় গন্ধের মত বুক ভরিয়ে রাখত রামের। আর রামচন্দ্র এক নিরাপদ প্রেমখেলা করে তাকে ভুলিয়ে রাখত। রামের এই আচরণ তার কাছে অত্যন্ত হতাশাজনক এবং বিভ্রান্তিকর বোধ হত। স্বামীর পুরুষত্ব সম্পর্কে তীব্র সন্দেহ যে হয়নি মনে তা নয়, কিন্তু প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারেনি। তবু সে জিজ্ঞাসায় মন বাংরবার ক্লিষ্ট ও আলোড়িত হয়েছে। নিজের বয়সের মহিমায় সে তখন বীজের আধার, ফসলের অঙ্গীকার। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে যা বিপদ সংকেত বিস্তৃত। তাই রামচন্দ্র তার ভয়ংকর যৌবনের সামনে কুণ্ঠায় আড়ষ্ট। প্রত্যাশার আবেগ কঠিন সংযমের স্থানুত্বে নিশ্চল হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপে। সেই কপাটের খিল খুলতে না পারার ব্যর্থতা সীতাকে পরাজয়ের আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করে। রামচন্দ্রের আড়ষ্টতায় সে ক্লান্ত। বীর স্বামীর সংযম কঠিন প্রেম তার বুকে অধিকমাত্রায় স্পন্দিত হয়। হতাশার গ্রাসে প্রাণের আশাকে গিলতে গিলতে অভাবিত বিস্ময়ে ঝটিতি অনুভব করে রামচন্দ্রের

* বিবাহের পর ১২টা বছর রামের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সীতার কেটেছে। বনগমনের সময় সীতার বয়স ৩০ হলেও সে জননী হয়নি।

আকাঙ্খা যা শরীরের সান্নিধ্যে থেকেও কখনও শরীরের গভীরতম সংগমের প্রার্থনা করেনি কোনদিন। বরং শরীরের অতীত কিছু প্রার্থনা করে যা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের সেই প্রতিষ্ঠার কোন সাড়া সে কখনো পায়নি।

তবু অবাক মুগ্ধ মুহূর্তে রামচন্দ্রকে মনে হত, অনেক দূরের মানুষ। ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অসাধারণ অস্বাভাবিক মানুষ। তার সঙ্গে রামের এই দূরত্বকে অদৃষ্টের পরিণাম মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিত। আর তৎক্ষণাৎ একটা কষ্ট তার বুকে কাঁটার মত বিঁধত। শূন্যতা, থাবা বসাত মর্মের গভীরে। দেহই নারীর আত্মার অমৃত ঘট। প্রেমের পূজাঞ্জলি দেয় সেই মঙ্গলঘটকে নিবেদন করে। সুতরাং সেই দেহের প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্য, উপেক্ষা সে সহ্য করতে পারে না। একে সে তার পরাজয়ের চোখে দেখে। দেহটাকে তখন বোঝার মত মনে হয়। অনুরূপ একটা পরাজয়বোধে কষ্টে তার বুক টাটাত। অথচ, সুন্দর, সুপুরুষ, বীর্যবান স্বামী তার। তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন, কত আকাংখ্যা রচনা করত সে মনে। রামের নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের শক্ত দেয়ালে প্রতিহত হয়ে তার মুকুলিত আশাগুলি একে একে নিহত হত। মৃগনাভির মত একটা পাগল করা সৌরভ তার বুক থেকে একদিন অকস্মাৎ উঠে এল। আর তাকে আকুল করে তুলল। তবে কি সন্তানের জননীও কোনদিন হতে পারবে না সে? নারী মনের এই আকূতি ক্রমে ক্ষিপ্ত করে তুলল তাকে। নিজেকে তার ভীষণ ব্যর্থ, অযোগ্য মনে হল। অপূর্ণতার বেদনা, হাহাকার তার সত্তার গভীরে ঝংকারে বাজল। কেননা, সব নারীই প্রথম ঋতুদর্শন থেকে নিজেকে জননী ভাবে। সেও ভেবেছে তার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত।

আঠারো বয়স* হলেও তার মধ্যে নারীসুলভ গাম্ভীর্য এবং শালীনতা ছিল বেশি। ভরা যৌবন রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকেও ধারাল ও বিশিষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বটা কি ধরনের তা অবশ্য জানা ছিল না সীতার। কারণ রাম প্রতিদিনকার দেখা ও জানা একটি মানুষ। এত কাছের মানুষের মধ্যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোন গুণ আছে কিনা নববধূর পক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিল। তবু, এই অদ্ভুত মানুষটির নিবিড় সান্নিধ্য, মুখোমুখি কথা বলার সুখ, দেখার তৃপ্তি, নিজের বলে দাবি করার আনন্দ রহস্যময় আকর্ষণ, তাকে আবিষ্কার করার নেশা সীতার শূন্য স্থানটি ভরিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে তার নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের উপর তার প্রচণ্ড রাগ ও দুঃখ হত। ক্রোধে ক্ষোভে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত বুকের ভেতর। আর দুরন্ত আক্রোশে তাকে প্রবল খামচে ধরত হাতের পেশী, শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে তার ভেতরের নিদ্রিত পুরুষ সিংহটির ঘুম ভাঙানোর কত চেষ্টা করত। তাতে তার নিজের শরীরেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যেত। অমোঘ হতাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে প্রমত্ত আবেগে রামের গলা জড়িয়ে ধরে অষ্টাদশী সীতা ঈষদুষ্ণ এবং ভেজা দুটি ঠোঁট

---

* বিবাহের সময় সীতার বয়স ১৮ বছর। বনগমনের সময় ৩০ বছর। বনগমনের পূর্ব পর্যন্ত ১২ বছর রামের সঙ্গে অযোধ্যায় ছিল।

অকস্মাৎ চেপে ধরে ছিল তার ঠোঁটে। এবং বেশ কিছুক্ষণ রামের বুকের ধক্ ধক্ নিজের বুকে শুনল সীতা।

তারপর একটা সময়ে রামের অস্বস্তি টের পেয়ে তাকে ঠেলে দিত রাগে। কেমন একটা ঝাঁজায় অপমানে দুঃখে তার কান্না আসত। বুকের ভেতর কাঁটা ফোটার যন্ত্রণায় টাটাত। অপ্রস্তুতভাবে বলত ঃ আমার শরীরটা যদি ঘেন্না করে তবে বিয়ে করলে কেন? কে চেয়েছে তোমার অনুগ্রহ।

করুণ দৃষ্টিতে রাম সীতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকত। তারপর আস্তে আস্তে বলত ঃ তোমার কষ্ট কোথায় জানি। অনেক অপরাধ আমি জমিয়ে তুলেছি। তার জন্যে আমিও কষ্ট পাই। কিন্তু কঠিন ব্রত পালনের জন্যে আমাকে সংযত থাকতে হবে। শুধু এই জন্যে কৌমার্যের অনাদর করে চলেছি। তোমার শরীর আমার পুজোর মন্দির। তার শুচিতা আমি কেমন করে নষ্ট করি?

সীতা সম্মোহিত। নিজেকে সেই মুহূর্তে অপরাধী মনে হত। দুই চোখে টলটল করত জল। বলত ঃ আমাকে তুমি ধ্যানের দেবী করলে কেন? রক্তমাংসের মানবী আমি। চাই না দেবী হতে। আমার জন্যে তোমার কিছু করতে হবে না। শুধু মনে রেখ আমি একজন রমণী। বিয়ের পর স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কেউ নিজের নয়, আপনও নয়। নিজের সেই পরম আপনজনের কাছে তার চাওয়া শুধু একটু ভালবাসা। আর একটু মমতা। আমাকে তোমার সেই সোহাগটুকু দিও। তাহলেই হবে। আর যখন খুব কষ্ট হবে, বুকটা হাহাকার করবে তখন চোখের জল মুছিয়ে বুকে টেনে নিও, আদর কর। রাগের বশে হয়ত কিল চড় ঘুঁষি মারব। তারপর আবার বুকে পড়ে কাঁদব। ক্ষমা চাইব। এই হল মেয়েমানুষের অসহায় ভালবাসার রীতি। তোমার সীতার জন্য এটুকু করতে পারবে না স্বামী?

রামচন্দ্র সীতার দিকে স্বপ্নমদির চোখে নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। দুচোখের তারা দুটি মমতায় নিবিড় হয়ে উঠল। এক মায়াবী দৃষ্টি তার মুখমণ্ডলে। জীবনে এই প্রথম সীতার সংস্পর্শে অস্বস্তিবোধ করল না রাম। বরং ভাল লাগল। মায়া হল। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সীতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। রামচন্দ্র তাকে মাটি থেকে টেনে তুলে নিল নিজের বুকের উপর। বলল ঃ প্রার্থনা মঞ্জুর। এবার ওঠ রাণী! চোখ খোল। তোমার ভিতর দিয়ে আমি আজ সার্থক হয়ে উঠলাম। আমার তপস্যা পূর্ণ হল। ব্রতভঙ্গের আর কোন আশংকা রইল না।

সীতা চোখ বুঁজে তার শরীরের গভীরে অবসাদ টের পাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে ক্রমেই অধীর করে তুলল। বাইরের নানা দৃশ্যাবলী ভেসে যাচ্ছিল চোখের উপর দিয়ে। রথের গতি মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে যাচ্ছিল। সারথীর সপাসপ চাবুকের শব্দ রথের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে রথটা বিপজ্জনকভাবে ছুটতে লাগল। ঝাঁকুনিতে সর্বশরীর একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আর একবার পিছনের দিকে হেলে যায়। কখনও এর ওর শরীরে ঠোকা-ঠুকি লাগল। নিজেকে সামলাতে সকলে বেশ ব্যস্ত। টাল সামলাতে সীতা রামের

একখানা বাহু শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। তাতেই রাম চমকে সীতার দিকে তাকাল। নীলোৎপল দুই আঁখির দৃষ্টি গভীর, কিছুটা উদাস। সীতার সবল দুই চোখে অগাধ বিস্ময়। রামচন্দ্রের চোখে চোখ রাখল। অমনি তার বুকের ভেতর থর থর করে কাঁপল। মুগ্ধ স্বরে বলল ঃ স্বামী, এখন আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি ? এই বনভূমির নাম কি ?

সীতার আকস্মিক জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক রামচন্দ্রের ভুরু একটু কুঁচকে গেল। কৌতূহলী চোখ মেলে ভাল করে দেখল, অভ্রভেদী পাহাড়, গহন অরণ্য, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, আর বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়ানো শিলাখণ্ড এবং পোড়া ইঁটের ভাঙা টুকরো। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কল্লোলিত যমুনায় নীল বারিরাশি। রামচন্দ্রের চিনতে কষ্ট হল না। এক সুদূর অতীত তার মানসপটে ভেসে উঠল। রামচন্দ্র একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে উদাস গলায় বলল ঃ এই সেই তাড়কাবন। বহুকাল আগে আচার্য বিশ্বামিত্রর সঙ্গে লক্ষ্মণ ও আমি এই বনে এসেছিলাম। সেই আমার প্রথম অরণ্যে আসা। তারুণ্যের অনেকগুলো বছর এখানে অস্ত্রশিক্ষায় কেটেছে। এর পথ, মাঠ, বন, গাছ সব চিনি আমি। এর রহস্যময় আকর্ষণ এবং একে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশা সেদিন আমাকে পেয়ে বসেছিল। রক্তে কলধ্বনিতে আজও তার সুর রিনরিন করে বাজে।

সীতা স্বপ্নাতুর চোখে রামের দিকে চেয়ে বলল ঃ প্রিয়তম, তোমার স্মৃতি সুখের গল্প আমাকে শোনাও।

রামচন্দ্র কিছুক্ষণ সীতার দিকে চেয়ে বিভ্রম বোধ করল। কিন্তু সীতার আবদার প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছে হল না। তবু গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল ঃ সব ঘটনাই'ত শুনেছ।

তৃষিতের মত রামের ঢুলু ঢুলু দুই নয়নের দিকে তাকাল। অধরে টেপা হাসি। বলল ঃ তোমার মুখে গল্প শুনতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। শরীর মন সব অন্য রকম হয়ে যায়। শোনা গল্পও নতুন মনে হয়।

রামচন্দ্র হাসল। বলল ঃ কিন্তু রাণী মাথার ভেতরটা এখন একেবারে খালি। কিচ্ছু মনে আসছে না। ভীষণ ফাঁকা মনে হচ্ছে। কেবল জায়গাটাই চেনা লাগছে।

সীতা চুপ করে রামচন্দ্রের গা ঘেঁষে আরো নিবিড় হয়ে বসল। অপলক দুই চোখে তার মুগ্ধতা নামল। কিছুক্ষণ পর তৃপ্ত স্বরে বলল ঃ পরিবেশ গল্পের প্রাণ। বিশেষ করে সেই স্থান, সেই পরিবেশ যদি হয়। বস্তু বিশ্বের তরঙ্গ এসে লাগে গল্পের গায়। গল্প নবীন হয়ে উঠে। নিজের চলার বেগ নিজেই পায় সে।

সীতার কথায় রামের বিস্মৃতি কাটল। এক ঝটকায় সে যেন তার সব অবসন্নতা কাটিয়ে উঠল। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল। হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ দুনিয়াটা ঠিক এরকমই শিকলে বাঁধা। একটার সঙ্গে আর একটা গাঁথা। একটা বড় কাজের জন্য নেপথ্যে কত আয়োজন, কত ধৈর্য, কত ত্যাগ ও প্রতীক্ষা। তিল তিল করে

জমি তৈরী হয় বহু জনের সাধনায়। লোকচক্ষের আড়ালে থাকে কত নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার ইতিহাস। দেখে গর্ব হয়।

সীতা রামের কথা শুনছিল না। ডান হাতের তালুতে থুতনি রেখে মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল। এক মায়াবী আলো যেন ঠিকরে পড়ল তার মুখমণ্ডলে এক টুকরো উজ্জ্বল হাসির ভাব তার ঠোঁটে ছুঁয়ে রইল। সীতার দেহের গন্ধ এবং নৈকট্যজনিত একটা তাপ রামচন্দ্রের গায়ে লাগছিল। আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে তার অভ্যন্তর টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। আর সমস্ত অতীতের ঘটনা একটু একটু করে মনের ভেতর গল্প হয়ে উঠছিল।

ফাঁকা প্রান্তরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে রইল। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে এক গহীন চিরপ্রদোষের স্নিগ্ধ আঁলো ছড়িয়ে আছে। কত ফুল, কত লতানো গাছ সেখানে ছড়ানো। অসম্ভব রূপময় জগতের বিস্ময় তার দুই চোখের চাহনি দ্যুতিময় করে তুলল। এক মায়াবী আলো পড়ল তার মুখমণ্ডলে। মস্তিষ্কের মধ্যে নানা মানুষও ঘটনার ভীড়। গতিময় রথে প্রকৃতির মত তার মন ছুঁয়ে গেল।

প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতার ভেতর কিছুক্ষণ কাটল। সীতার চোখে চোখ পড়তে রামচন্দ্র হাসল। অমলিন সরল সে হাসি। মুক্তার মত দাঁতের ঝিকিমিকির ভিতর দিয়ে তার হৃদয়খানি দেখা গেল। সীতা মুগ্ধ ও সম্মোহিত। একটা শিহরণ আর ভয় খেলা করে গেল তার শরীরে। অভিভূত গলায় প্রশ্ন করল ঃ স্বামী থামলে কেন ?

রামচন্দ্র উদাস গলায় বলল ঃ আমার জীবনটা কম ঘটনাবহুল নয়। একটা নিরাপদ রাজসুখ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে আমি জন্মেছি। তবু, আমার সব কিছু নির্বিঘ্ন রাখেনি আমার অদৃষ্ট দেবতা। আমার ভিতরে এক ঘুমন্ত আমি'র ঘুম ভাঙাতে আচার্য বিশ্বামিত্র আমাকে এই তাড়কাবনে নিয়ে এলেন। তখন এর নাম ছিল মলদ ও কারুষ। বলতে পার, দশম ইন্দ্রের নির্মিত এই সমৃদ্ধ জনপদে আমার রাজনৈতিক শিক্ষা এবং অস্ত্র শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করি। এই বনে বসে আচার্যের কাছে আমার অতীতকে প্রথম শুনেছি। যার সবটা আমার কাছেও রহস্যে আবৃত। মহৎ কিছু হওয়ার গুপ্ত জ্ঞান, সেও এই মাটির দান। সমরবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা দিয়েছি এই বিশাল অরণ্যের মহাবিদ্যালয়ে। তাই ভাবতে অবাক বোধ করি, ভারতের এত অরণ্য থাকতে আচার্য আমার শিক্ষার জন্যে এই অরণ্য ঠিক করলেন কেন ? মনের উত্তর খুঁজতে নিরালায় আচার্যকে কত প্রশ্ন করেছি, নিজেও তার সত্য সন্ধান করেছি কত ! সব মিলিয়ে তাড়কাবন আমার জীবন নাট্যের প্রথম অঙ্ক। এখানে প্রবেশ ও প্রস্থান চমকপ্রদ।

সীতা ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত স্বপ্নালু চোখে রামের দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ্মণও সম্মোহিত। সেও প্রশ্ন করতে ভুলে গেল।

ক্ষণিকের বিহ্বলতা কাটতে কয়েকমুহূর্ত সময় লাগল। তারপর খুব ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলতে লাগল ঃ এই বনভূমি দেখে কে বলবে এককালে এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। অথচ খুব বেশিকাল আগের ঘটনা নয়। কিন্তু আজ আর কোন চিহ্ন নেই।

তাড়কার বিষনজরে শ্মশান হয়ে গেছে সে দেশ। গোটা অঞ্চলে কোথাও নেই মানুষের বাস। যে দিকে তাকাও শুধু অরণ্য আর শস্যহীন প্রান্তর।

সীতার উজ্জ্বল চোখে বিস্ময়। রামের কথায় তার প্রত্যয় জন্মাল না। অবাক স্বরে প্রশ্ন করল ঃ দু'দুটো জনপদ রাক্ষসীর নজর পড়ে বেমালুম মুছে গেল এই আজগুবি ছেলেমানুষী গল্প আমাকে বিশ্বাস করতে বল? তোমার রহস্য আর রসিকতার সব সময় হিসাব মেলাতে পারি না। লোকালয়, সমৃদ্ধ নগর কখনও মনুষ্যশূন্য হয়?

রামচন্দ্রের অধরে স্মিত হাসি। মৃদু স্বরে বলল ঃ এ হল জীবন রহস্য। মানুষ'ত তুচ্ছ, বিধাতারও সাধ্য নেই নারীমনের রহস্যের তল খোঁজা।

সীতার শান্ত নির্বিকার সরল দুই চোখে আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধতা। তাকে অপরূপ দেখাল।

রাম নিজের মনে বলল ঃ নারী হল তেজ, অগ্নি, পাপ। তার বুকে প্রতিহিংসার আগুণ একবার জ্বললে আর নেভে না। সে আগুণে নগর পোড়ে, সভ্যতার ধ্বংস হয়। নিজের তেজে নারী শুধু উদ্দীপ্ত করে না, নিজেও দগ্ধ হয়, অন্যকেও জ্বালায়। তাড়কার বুকে সেই আগুণ জ্বেলেছিল অগস্ত্য।

উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে লক্ষ্মণ প্রশ্ন করল ঃ অগস্ত্য! মুনি ঋষিদের আশ্রম ভেঙে তছনছ করা, যজ্ঞ নষ্ট করা ছিল রাক্ষুসীর কাজ। তাই মূর্তিমান পাপকে আমরা হত্যা করেছি।

লক্ষ্মণের কথার কি জবাব দেবে রাম? মৃদু মৃদু হাসির আভাস ফুটল তার অধরে। দুচোখের তারায় রহস্যের দ্যুতি উজ্জ্বল করল তার মুখমণ্ডল। মধুর স্বরে বলল ঃ কারণ ছাড়া কার্য হয় না। তাড়কার প্রতিহিংসা, বিদ্রোহের মূলে আছে সুন্দ হত্যা এবং তার প্রেমের শূন্যতা। স্বামীহারা তাড়কার বৈধব্যের কষ্ট যে কি নিদারুণ ছিল তার কাছে সে খোঁজ আমরা কেউ করিনি। শুধু তার বিদ্রোহ দেখেছি তার প্রেমকে দেখিনি।

লক্ষ্মণের এবার অবাক হওয়ার পালা। তাড়কা রাক্ষুসী সম্পর্কে তার মনে যে কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব এতদিন ধরে ছিল হঠাৎ তার বিপরীত প্রবাহে এলোমেলো হয়ে গেল চিন্তাধারা। সংশয়ে প্রশ্ন করল ঃ রাক্ষুসীর আবার কষ্ট! জনজীবন বিঘ্নকারী দস্যু পাপীর জন্যে কেউ কষ্ট অনুভব করে?

রামচন্দ্রের কণ্ঠে সহসা ভর্ৎসনার স্বর ঝংকারে বাজল। ছি! লক্ষ্মণ, পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা কর না। তাড়কা আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ। অঞ্চলভেদে, রক্তে ভিন্নতায় রাক্ষস, অসুর, দেবতা, আর্য আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের সঙ্গে শত্রুতা, বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু তাকে ঘৃণা করব কেন?

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে লক্ষ্মণের দুই চোখ বিস্ফারিত হল। মনের মধ্যে অনেক উল্টো-পাল্টা, যুক্তিহীন কার্যকরণ কাজ করছিল। রামের মুখে এরকম যুক্তি আগে শোনেনি কখনো? অকস্মাৎ তার অনার্য প্রীতি ও দরদের কোন হেতু খুঁজে পেল না লক্ষ্মণ।

অবাক নির্নিমেষ চোখে রামের দিকে তাকিয়ে সে কৌতুক অনুভব করল। মৃদু মৃদু শ্বাস পড়ছিল তার।

রামচন্দ্র স্থির চোখে লক্ষ্মণের দিকে তাকায়, তারপর একটু হাসে। মৃদুস্বরে বলল: এতকাল ধরে তুমি যা জেনেছ বা শুনেছো তা ঠিক নয়।

লক্ষ্মণ হতভম্ভ। বিভ্রান্ত গলায় উত্তর দিল: তোমার কোন কথাই আমি বুঝতে পারি না।

রামচন্দ্রকে খুব বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছিল।

বনভূমির পটে সীতাকে নিষ্প্রাণ ছবির মত মনে হল।

লক্ষ্মণের চোখে মুখেও কোন আবেগ নেই, ব্যাকুলতা, বিহ্বলতাও নেই।

নিশ্চল স্তব্ধতার মধ্যে আশ্চর্য এক দূরত্ব রক্ষা করে রামচন্দ্র স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল: একটু চিন্তা করলে সব বুঝতে পারবে!

রামচন্দ্রের কথার রহস্য লক্ষ্মণের কাছে পরিষ্কার নয়। রামচন্দ্রকে সে ভীষণ ভালবাসে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তার কোন কথা অবিশ্বাস করে না কখনও। আজও করল না। তাহলে কোথায় সত্য? তাড়কাবধের গল্পর নতুন চকমকি পাথরে রামচন্দ্র কোন আগুণ জ্বালাতে চাইছে? কিংবা নতুন কোন অস্ত্র শাণাতে চাইছে? শত্রুকে তার মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ রামচন্দ্র কখনও দেয় না। সে অস্ত্র যদি কোন কারণে কেড়ে নেয়া অসম্ভব হয়, তাহলে অন্ততঃ রাম অকেজো করে দিয়েছে তাকে। এই মত পরিবর্তন তবে কি সেরকম কোন কপট রাজনীতির খেলা তার? লক্ষ্মণ কেমন একটা দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের মুগ্ধ কৌতূহলীত দুই আঁখির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। লক্ষ্মণের হৃদয়ের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পায়। মৃদু মৃদু হাসে রাম।

রামকে খুবই সতর্কভাবে শুধরে দেবার জন্যে লক্ষ্মণ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল: তাড়কাকে এতকাল লোকে যেভাবে জেনে এসেছে তাকে ভেঙে দেবার সার্থকতা কি? এতে তোমার কোন গৌরব বাড়বে? অর্থপূর্ণ চোখে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের দিকে তাকাল।

রামচন্দ্র নীরব। প্রকৃতি দেখছিল।

পিছনে ফেলে আসা তাড়কাবনের উঁচু উঁচু গাছের মাথার উপর অস্তগামী সূর্যের রাঙানো আকাশ। রোদ এখন নিষ্প্রভ। তার উত্তাপ নিভে গেছে। এপাশ ওপাশ থেকে সব আলো যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। গাছপালার ছায়া পড়েছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত। আকাশের স্নিগ্ধ নীল ম্লান হয়ে এল। দমকে দমকে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম থেকে পূবে। দিন ফুরনোর বিষণ্ণতা চরাচর গ্রাস করল।

এই মুহূর্তে রামের মনেও অনুরূপ একটা ছায়া ছায়া ভাব বিস্তার করল। এই অরণ্য তার এক তীব্র স্মৃতিতে গড়া। অথচ, তার অনেক কথাই লক্ষ্মণের অজানা। তাই লক্ষ্মণের সন্দেহ ও প্রশ্নে সে একটু অস্থির ও বিব্রত বোধ করল। কেমন একটা

বিহ্বলতাবোধে তার চিত্ত আচ্ছন্ন। তথাপি, সস্নেহ স্নিগ্ধ হাসি এল রামচন্দ্রের চোখে মুখে। মৃদুস্বরে বলল ঃ তুমি শুনে এসেছ বলে সেটা সত্যি হয়ে যাবে এমন কি কথা আছে ? তুমি যা শুনেছ, সে'ত আমি জানি। আমাদের অযোধ্যার মানুষ এবং অন্য দেশের লোক তোমার চেয়েও আরো বেশি শুনেছে। মানে সে গল্প, তুমি, আমি, মুনি, ঋষিরা যেভাবে শুনিয়েছি, লোকেরা সেইভাবে নিয়েছে। আবার তাদের মুখে মুখে সে গল্প যখন ছড়িয়েছে তখন আরো পল্লবিত হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের মত করে তার ভাল মন্দ লাগা মিশিয়ে তাকে রূপ দিয়েছে। এই ভাবে আয়তন স্ফীত হয়েছে। প্রকৃত সত্য রয়ে গেছে লোক চক্ষের অগোচরে। আমাদের স্বার্থে প্রয়োজনে এমন গল্প রটনা করা হল যা সহজে তাদের বিশ্বাসকে উল্টিয়ে দিতে পারবে না।

লক্ষ্মণ স্থির, নির্বাক। স্তব্ধ হয়ে শুনল। ঐ সময় তার অনুভূতি জুড়ে কত কথা, আশঙ্কা, চাঞ্চল্য, অস্বস্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ইতস্ততঃ করে রামের কথার মধ্যে বলল ঃ তোমার সব কথাই কেমন যেন হেঁয়ালি ?

লক্ষ্মণের কথায় রামচন্দ্র উদারভাবে হেসে বলল ঃ লোকে শত্রু সম্পর্কে কুৎসা এবং অদ্ভুত অদ্ভুত আজগুবি গল্প শুনতে চায় এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু ভাল কথা হলে তা শুনতে আগ্রহ বোধ করে না। মানুষের এই স্বভাব ও আশ্চর্য মানসিক প্রবণতাকে অবস্থা সামলাবার জন্যে নানারকম স্বার্থে সত্যমিথ্যা মেশাতে হয়। সব সময় অপবাদ সত্য হয় না। গৌরবেরও হয় না। জননী কৈকেয়ী পিতার কাছে যখন সিংহাসনে ভরতের ন্যায্য অধিকার দাবি করল তখন তার গৌরব বাড়েনি, সত্যটাই শুধু প্রকাশ হয়েছিল। আমিও তেমনি তাড়কা সম্বন্ধে সত্যকথা বললাম।

লক্ষ্মণ নির্বাক। রামের চোখের উপর তার দৃষ্টি স্থির। নিশ্চল। খানিকটা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণপর আবেগগাঢ় স্বর, স্খলিত, ভেজা, ভাঙা শোনাল। বলল ঃ তোমার মত এত গভীর করে কিছু ভাবতে শিখিনি। এখন মনে হচ্ছে কথা কি আশ্চর্য, অলৌকিক। নিয়তির মত এক অমোঘ সংকেতে রহস্যময়। লক্ষ্মণের স্বর রুদ্ধ হল। শব্দ করে নিঃশ্বাস পড়ল। তার মুখ চোখ গায় আবেশে মগ্ন দেখাচ্ছিল।

রামচন্দ্রের অধরে স্মিত হাসি। চোখের তারায় যেন অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। স্বভাবসিদ্ধ সংযম রক্ষা করে রাম বিহ্বল স্বরে বলল ঃ কথায় সুধা ও বিষ দুই আছে। কথার ধারা কত বলবতী, কি তার বেগ, কত বড় ভয়ংকরকে সে আঘাত করতে পারে বজ্রের মত। আবার কথার অমৃতধারায় বুক ভাসিয়ে নামে করুণা, মায়া, ভালবাসা। এই কথা শেখার বিদ্যাই ছিল আচার্য বিশ্বামিত্র'র প্রথম পাঠ। 'বলা-অবলা'র মন্ত্র শপথ বাণীর মত তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। 'বলা মন্ত্র' হল যার প্রকাশ, প্রচার ও বাধাহীন। আর 'অবলা মন্ত্র' হল যা গুপ্ত ও লুক্কায়িত। একটি রাজনীতির প্রচার যন্ত্র, অন্যটি কুট সমরনীতি, রাজনীতির গোপন কলা কৌশল। বলতে বলতে এক ঘোর লাগা আবেগের আচ্ছন্নতায় তার চোখ দুটি স্বপ্নাবিষ্ট হল। রামকে কেমন অচেনা লাগল।

॥ চার ॥

কিংবদন্তী আছে দশম ইন্দ্র বৃত্রাসুর নিধন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জাহ্নবী এবং সরযূর নিকটবর্ত্তী মনোরম প্রান্তর, সবুজ অরণ্য, বিপুলব্যাপ্ত শস্যক্ষেত্রের ধার দিয়ে মনের খুশিতে একা বেপরোয়াভাবে রথ চালাচ্ছিল।

ভরা দুপুর! বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। মাথার উপর বিস্তৃত নীল আকাশ, দিগন্তনীল মহিষের মত অতিকায় সারি সারি পর্বতমালা, কল্লোলিত নদীর ভয়ংকর বিশাল বিস্তার ইন্দ্রের দুনয়নে এক আশ্চর্য মুগ্ধতা সৃষ্টি করল।

অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ চতুর্দিকে নির্জন। ভরদুপুরে ঘুঘুর গদ গদ স্বরে, উদাস করা ডাক এক অদ্ভুত মায়া তৈরী করল ইন্দ্রের মনে। সংগমক্ষেত্রের তরঙ্গ নির্ঘোষের নিরন্তর সংঘর্ষের শব্দ, প্রমত্ত অস্থিরতা, অবিরাম প্রগলভতা ইন্দ্রকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করল। ইন্দ্র রথ চালানোর বিরতি দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

সংগমস্থলে নদীর বিস্তার এবং তার ভয়ংকর চেহারাটা দেখতে দেখতে কয়েকবার শিউরে উঠল। একের পর এক ঢেউ ধেয়ে এল। উত্তাল কালো জল। ফুরফুরে হাওয়া। ইন্দ্রের কেমন একটা ভাল লাগার নেশা লাগল চোখে। মনে হল, কত দেশ ছুঁয়ে আদিগন্তের ঢেউ যেন দুঃসাহসী যোদ্ধার মত রণহুংকার দিতে দিতে ছুটে আসছে। আর তার পশ্চাতে পঙ্গপালের মত ধেয়ে আসছে অগণিত ঢেউ। কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিপরীতমুখী স্রোতের উপর। বাঁধল লড়াই তরঙ্গে তরঙ্গে। নির্দয়ভাবে নিস্পেষণ করছে। কুম্ভীপাকের চক্র দিয়ে মহাকায় ঢেউ-গুলো যেন ছোট ছোট ঢেউগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তীরে। ভাল করে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগে তেড়ে এল আর একটি তরঙ্গ। তীরের মাটি ছোঁয়ার আগেই বিপরীতমুখী একটি স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল তারে। কেড়ে নিল মাটি। কখনো তীর পর্যন্ত তেড়ে এসে তার টুঁটি চেপে ধরল। কাউকে রেহাই দিল না। নদী বক্ষ থেকে এক ঝলক বাতাস উঠে এসে ফিস্ ফিস্ স্বরে যেন বলল ঃ "ইন্দ্র এই স্থান হল তোমার স্বক্ষেত্র। এখানে তুমি উপনিবেশ স্থাপন কর। প্রীতিমন্ত্র বলে ভোলাও দূরের গ্রামের ঐসব নিরীহ শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের।" বাতাসের ফিস ফিস স্বর যে তার বুকের অভ্যন্তর থেকে উঠে এল, একথা বুঝতে বিলম্ব হল না তার।

ক্ষণিকের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে কয়েকমুহূর্ত্ত সময় লাগল ইন্দ্রর। তারপর রথ থেকে অবতরণ করে শিশু বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় গিয়ে উপবেশন করল। যুদ্ধ সাজ খুলে ফেলল। বিপুল খুশিতে সবুজ ঘাসে গড়াগড়ি দিল। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করল। অনেকদূর পর্যন্ত সাঁতার কাটল। তীরে ক্রীড়ারত ছোট ছোট কৃষ্ণকায় নগ্ন বালক বালিকার সঙ্গে জল ছিটানোর এক মজার খেলা করল অনেকক্ষণ ধরে। স্নানে তার দেহ শীতল হল। মন নির্মল বোধ হতে লাগল।

ততক্ষণ ইন্দ্রের আগমন বার্তা রটে গেছে। নদীর অদূরবর্তী পল্লী থেকে সুদর্শন ইন্দ্রকে দেখার জন্যে দলে দলে লোক এল। তারা নানারকম সুস্বাদু ফল, খাদ্য, পানীয় আনল। ক্ষুধার্ত ইন্দ্র পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করল আহার্য ও পানীয়। একটা খুশি খুশি ভাব ফুটল ইন্দ্রের মুখমণ্ডলে। জনতার সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে ইন্দ্র শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলল ঃ ইলাবৃত্তবর্ষের দেবরাজ ইন্দ্র আমি। জয়ে আমার সুখ, জয়ে আমার উল্লাস। জয় আমার নেশা। জয় ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। আমি জয় করি বাহু দিয়ে এবং হৃদয় দিয়ে। কিন্তু এ দেশের মাটি, জল, হাওয়া আমার দেহের ক্লান্তি জুড়িয়েছে। মনকে নির্মল ও স্নিগ্ধ করেছে। এখানকার মানুষ দিয়েছে আমাকে আহার, মাটি দিয়েছে আশ্রয়। সুতরাং, এই দেশের উপর আমার অধিকার জন্মাল। এখন থেকে তোমরা হলে আমার প্রজা। ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দাও দেবরাজ ইন্দ্র এই রাজ্যের অধিপতি। এর যে নামই থাকুক, আজ থেকে আমার দেয়া নামেই এই ভূমির পরিচয়। শোন জনগণ, জাহ্নবীর পবিত্র জলে আমার দেহ মলহীন অর্থাৎ নির্মল হল বলে এই স্থানের নাম মলদ থাকল। এই নাম যুগযুগান্ত ধরে আমার গ্লানিহীন মনের শুচিতা ও স্নিগ্ধতার পরিচয় পত্র হয়ে থাকবে। আর ঐ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ওপার থেকে যারা এল খাদ্য ও পানীয় বহন করে তারা আমার ক্ষুধা হরণ করল বলে তাদের অঞ্চলের নাম থাকল কারুষ (ক্ষুধা)। এই নাম তোমাদের ইন্দ্র সেবা ও আতিথেয়তার অভিজ্ঞান হয়ে থাকবে চিরকাল।

ইন্দ্রের আশীর্বাদধন্য পাশাপাশি দুটি দেশ দেখতে দেখতে সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হল। ঋষিরা এল জ্ঞানের দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে। ইন্দ্রের কৃপাধন্য বণিকরা এল বাণিজ্য করতে। ভূস্বামীদের আবির্ভাবে জমির দখল নিয়ে বাঁধল সংঘর্ষ। ভূমিহীন হল আদিবাসীরা। শান্তিশৃংখলার তদারকী করতে এল ঋষিবেশে অগস্ত্য।

প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রের নামাঙ্কিত মলদ ও কারুষ জনপদের অধীশ্বর দৈত্যরাজ সুকেতু। অপুত্রক বৃদ্ধ সুকেতুর মাতৃহীন এক কন্যা ছিল। রাজ্য দেখার কেউ ছিল না। সরল ধর্মপ্রাণ রাজা, ইন্দ্রের কৌশল অবগত ছিল না। বণিকের আগমনে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হবে, দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে এই বিশ্বাসে সুকেতু বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিল তাদের। সুকেতুর চোখে মুনি ঋষিরা ছিল শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট সাধক। কিন্তু ধীরে ধীরে এরাই রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। রাজ্যকে রক্ষা করতে বৃদ্ধ অশক্ত রাজা সুকেতু বলশালী জম্ভ দৈত্যের পুত্র সুন্দ'র সঙ্গে তাড়কার বিবাহ দিল। যৌতুকস্বরূপ তার সাম্রাজ্যও সুন্দ'কে দিল। ফলে সুন্দ'র রাজ্য সীমানা দাঁড়াল ঃ কাশী ও কোশলের দক্ষিণের নিম্নভূমি থেকে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরভাগ এবং পশ্চিমে চেদি-রাজ্যের সীমানা থেকে পূর্ব দিকে জাহ্নবী ও সরযুর সংগম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ।

সুন্দ অগস্ত্যর কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হল না। দিন দিন সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল। ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। তাই মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে একা গেল ঋষির আশ্রমে। অগস্ত্য সুন্দর সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি করল না। খাদ্য পানীয় কোন কিছুতে কার্পন্য ছিল না। অগস্ত্যর আপ্যায়ণে সুন্দও মুগ্ধ। তার ক্রোধ, রোষ অন্তর্হিত হল। মনটা

নরম হল। তার উদার আশ্চর্য ব্যবহারে সুন্দ এত অভিভূত হল যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না।

অগস্ত্য ছিল অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী। কূট রাজনীতি মুহূর্তে তার মনের মধ্যে ঝলকে গেল। সুন্দ নিধনের একটা চমৎকার বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার মাথায় খেলল। সুন্দ বিরাট যোদ্ধা, শক্তিমান নৃপতি। কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক, আত্মসচেতন এবং অহংকারী। অগস্ত্য চিন্তা করল ; যদি তার জাত্যাভিমান এবং অহমিকাকে আঘাত করে কোন কথা বলা যায় তা হলে সুন্দ উত্তেজিত হবে। এবং উল্টোপাল্টা অপমান সূচক কথাও বলবে। তাতে তার শক্তি ও তেজ ক্ষয় হবে। সুতরাং, প্রচুর পরিমাণ উত্তেজক সোমরস দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করলে কোন ভাল ফল মিললেও মিলতে পারে। সুন্দ'রও কোন সন্দেহ হবে না।

পরিকল্পনা অনুসারে অগস্ত্য প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডের ভস্ম ও ঘৃতের সংযোগে প্রস্তুত তিলক সুন্দ'র ললাটে এঁকে দিয়ে অতিথি বরণ করল। তারপর হোমকুণ্ডের পাশেই বসল তারা আলাপ আলোচনায়। অগ্নি সাক্ষী রেখে অগস্ত্য বলল ঃ দৈত্যরাজ ! আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে আপনার কি লাভ ? ঋষিরা মিথ্যে বলে না। দৈত্যরাই সত্যের অপলাপ করে। ঘটনাকে বিকৃত করে বিবৃত করা দৈত্যরীতি।

মুহুর্মুহু সুরাপানে সুন্দর দুই চক্ষু এমনিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। অগস্ত্যর কথায় অকস্মাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠল। তার বড় বড় দুই চোখ দিয়ে আগুণ ঠিকরে বেরোতে লাগল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। কৃষ্ণবর্ণ মুখ তপ্ত লৌহের মত গণগণ করতে লাগল। নেশায়, উত্তেজনায় তার শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। নেশায় কথা জড়িয়ে গেল। টানাটানা স্বরে বলল ঃ ঋষিবর আপনার অভিযোগ সরাসরি বলুন। দৈত্যজাতির নিন্দা, অপবাদ শুনলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। কথাবার্তায় সংযম হারিয়ে ফেলি। অতএব এ ক্ষেত্রে রসনা সংযত রেখে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা হওয়া উচিত।

অগস্ত্যর অধরে স্মিত হাসি। চোখে কৌতুক। কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ গম্ভীর। রাজন ! দৈত্যের ঔদ্ধত্য, অহংকার, অসহিষ্ণুতা আপনার রক্তের ধর্ম। দম্ভ হল, বীর্যবান দৈত্যজাতির বিনয়, অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ হল তাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

সুন্দ'র দেহের ভেতর ক্রোধ দপ্ করে জ্বলে উঠল। অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত তার জ্বলে যেতে লাগল। একটা চাপা স্বর আর্তনাদের মত কাঁপতে কাঁপতে বুকের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এল। বলল ঃ ঋষিবর, আমার ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। এখনি যদি তোমার রসনা সংযত না কর, তা-হলে ঐ জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব। অথবা, তোমাকে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে সত্যকে কলংকমুক্ত করব।

সুন্দকে আরো উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করার জন্য অগস্ত্য বলল ঃ মহারাজ, আমাদের সাধনা হল জানা, বিচার করা, লাভ করা আর অবস্থান করা। সংস্কার ও অভ্যাস বশে আপনাকেও সেই আত্ম সমালোচনার পথ ধরে আত্মোপলব্ধিতে আনতে চেয়েছিলাম। ঋষিরা দৈত্যের মত বর্বর কিংবা অমার্জিত অশিষ্ট নয়। তারা

সত্যের উপাসক, ছলচাতুরী, ভেল্কী জানে না। বাহুবলে নয়, প্রীতিমন্ত্র বলে মানুষের অন্তর রাজ্য জয় করা ঋষির ধর্ম। কিন্তু দৈত্যরাজ আপনি ঋষির কর্মের এই সব গুণ অবহিত নন বলেই হীন সন্দেহে কষ্ট পাচ্ছেন। রাজ্য'ত একটা ভূখণ্ড নয়, প্রজা নিয়েই তার অস্তিত্ব। কিন্তু আপনি দেশের বিরাট জনশক্তিকে সম্পদ মনে করতে ভয় পান। রক্ত চক্ষুর শাসনে তাদের অনেক দূরে সরিয়ে রেখে তাদের উপকার করতে চান। কিন্তু আমরা তা করি না। সবাইকে সমান সম্মানে সববেত করেছি। দেশ গঠনের কাজে আগে দরকার জন-জাগরণ। আমরা শুধু সেই কাজ করেছি। আমাদের আশ্রম বহু স্বার্থের একটি মিলিত বেদী। সংকীর্ণ রাজনীতির গভীর পংকে ডুবে আছে দৈত্য রাজনীতি। গোস্পদ কখন সাগর হয় ?

ক্রোধে উত্তেজনায় সুন্দ পুনঃ পুনঃ সোমরস পান করতে লাগল। নেশায় দুই চোখে ঘুম ঘুম ভাব নামল। দেহ শিথিল হল। শরীরকে সোজা রাখতে পারছিল না। তবু মুখ টান টান করে অস্পষ্ট ভাষায় অশ্রাব্য গালি গালাজ করল। টলতে টলতে হোম কুণ্ডের নিকটে এসে অগ্নিতে থুতু দিল। পদাঘাত করল। তপ্তবেদী পায়ের পাতা স্পর্শ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সুতীব্র জ্বালার স্রোত বয়ে গেল তার সর্বাঙ্গে। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। শরীরটা লাট্টুর মত পাক দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে টলে পড়ল।

সুন্দ'র মৃত্যু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু অগস্ত্য তাকে এক অলৌকিক ঘটনায় রূপান্তর করল। ক্রুদ্ধ ঋষির নয়ন বহ্নিতে সুন্দ ভস্ম হয়েছে। লোকের মুখে মুখে বাতাসের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

সুন্দর প্রাসাদেও খবর পেঁছিল।

তখন অপরাহ্ণ।

পেঁজা তুলোর মত সাদা কালো মেঘের সঙ্গে রোদের লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। কালো কালো মেঘগুলো এক জায়গায় জমে স্তূপাকৃতি হচ্ছিল। হঠাৎ, মহিষ কালো মেঘ বাজখাই গলায় হুঙ্কার ছাড়ল। সাঁ সাঁ করে বাতাস ছুটে এল। কাননের নিরীহ গাছ পালার শাখারা ডাক ছেড়ে ছেড়ে কেঁদে উঠল। ঝাপটানো বাতাস গাছগুলোকে মূল সমেত উপড়ে ফেলতে চাইল। ঝটিকার গতি পূব থেকে পশ্চিম সাগর পানে ছুটে গেল দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে।

ঝোড়ো বাতাস ক্ষেপে গিয়ে সঙ্গী বৃষ্টিকে নাচাতে লাগল। কখনও হাত ধরাধরি করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটির বুকের তৃণের উপর। কাঁচ ধানের শিষগুলোকে শুইয়ে দিল মাটিতে। ঝাপ্টাতে লাগল নারকেলের পাতা। গাছের পাতাগুলো ধরে ধরে ঝটকা টান দিয়ে কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছুঁড়ে দিল আকাশে। বাসা ভাঙা পাখীরা ঝড়ে ঝাপ্টায় মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। দূরের কুঁড়ে চালাগুলো মড়্ মড়্ করে ভেঙে পড়ল।

প্রাসাদের প্রশস্ত অলিন্দে সখীদের সঙ্গে তাড়কা ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টির দৌরাত্ম্য দেখছিল। বৃষ্টির ছাটে তার গা ভিজে গেল। তবু স্পর্শ সুখ মধুর লাগল।

মাঝে মাঝে খোলা ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। মুখ ব্যাদান করে বারিধারা গিলতে লাগল। সখীদের সঙ্গে ভিজে ভিজে মজা করছিল।

বাতাসের শাসানিতে কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, গৃধিনী, বায়স ভয় পেয়ে বৃষ্টি ভেজা হয়ে বিকট টানা সুরে চীৎকার করতে লাগল। সহসা তাড়কার প্রাণ অমঙ্গল আশংকায় কেঁপে উঠল। স্তম্ভের গায়ে পিঠ দিয়ে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। চোখ বুজতেই দেখতে পেল সুন্দ'র বীভৎস মুখ। বুকের ভেতর তার হু হু করে উঠল। তাড়কার আর কিছু ভাল লাগল না। খেলা ছেড়ে প্রসাধন কক্ষে ঢুকল। কোন রকমে সিক্ত বসনটা বদলে নিয়ে দ্রুত হাতে চুল আঁচড়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। সুন্দর কক্ষের দরজার কপাটে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। আতঙ্কিত চোখে ঘরের ভেতর তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। একটা গুমরানো কান্না শুনতে পেল শূন্য ঘরে। হঠাৎ খুব শীত করতে লাগল। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল। কান্নার শব্দটা খুবই চেনা। মায়ের মন দিয়ে বুঝতে পারল এ কান্না মারীচ সুবাহুর। কিন্তু পুত্রেরা তার পিতার শয্যায় উপুড় হয়ে অসহায় ভাবে আকুল স্বরে ফুলে ফুলে কাঁদছে! তাদের এত কান্নার মত কি ঘটল?

দরজা ছেড়ে তাড়কা নিঃশব্দে কক্ষে ঢুকল। মাটি মাড়িয়ে পালঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পুত্রেরা তার নিঃশব্দ আগমন টের পেল না। নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে তাড়কার কেমন ভয় ভয় করল।

তবু তাদের শিয়রে বসে মাথায় হাত রাখল। শীতে জমে যাওয়া কাঁপা গলায় জিগ্যেস করল: মারীচ, সুবাহু, তোরা অমন করে কাঁদছিস কেন বাবা?

মায়ের প্রশ্নের কি জবাব দেবে মারীচ, সুবাহু? তাড়কাকে দেখা মাত্র তাদের বুক ঠেলে সজোরে কান্না বেরিয়ে এল। মা গো! দু'ভাই-র কণ্ঠে একসঙ্গে একটা আর্ত্তস্বর বাজল।

কান্নার হেতু বুঝতে খানিকটা সময় লাগল তাড়কার। ফ্যাল ফ্যাল করে মারীচ, সুবাহুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল: অগস্ত্যর নয়নবহ্নি ভস্ম করেছে তোদের পিতাকে?

তাড়কার দুই চোখ খদ্যোতের মত জ্বলতে লাগল। মুখমণ্ডলের কোমলতা মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল। প্রিয়জন হারানোর কষ্টের ছাপ এবং যন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তার মুখের অভিব্যাক্তিতে। তবু চোখ ফেটে এক ফোঁটা জলও গড়াল না। ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র জ্বালা তাকে দগ্ধ করছিল। শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে এক অস্বাভাবিক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। মাথার ভেতর খণ্ড মেঘের মত প্রেমের কত দৃশ্য ও চিত্র ভেসে গেল। কোনটাই বেশিক্ষণ থামে না' মনও ভরে উঠে না। কেবল শূন্যতা বিদ্রূপ করে। বুকের ভেতর তাড়কার মরুভূমির মতই করুণা শূন্য বোধ হতে লাগল।

মারীচ তাড়কার অস্বাভাবিক নীরবতায় আশ্চর্য হল। অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। এক অজ্ঞাত ভয়ে মারীচ অস্থির হচ্ছিল। দারুণ দুঃখ আর কষ্টের যন্ত্রণা

চাপতে গিয়ে তার কণ্ঠ থেকে একটা ককিয়ে উঠার শব্দ বার হল। কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাড়কার মুখের কাছে মুখ এনে ডাকল : মা! মাগো, কথা বল। চুপ করে থেক না। তুমি ছাড়া আমাদের যে আর কেউ নেই। কোনদিন বাবা বলে আর ডাকতে পারব না। মাগো বুকটা আমার জ্বলে যাচ্ছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

এই মুহূর্তে তাড়কা কষ্টে মাথা নাড়ল। তার প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা। সেই দুকূল ছাপানো ভালবাসার স্রোতে তার দুই চোখ আর বাধা মানল না। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে মাতা পুত্র একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাঁদল।

কান্না থামলে তাড়কার স্বরে যন্ত্রণার ঝংকার যেন শপথের মত বাজল। তার উত্তোলিত মুখ মারীচ, সুবাহুর মুখোমুখি স্থির এবং তার দুই চোখ বিস্তৃত হয়ে উঠল। দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় তাকে অপরূপ দেখাল। চিন্তা শূন্য এবং সম্মোহিতের মত তার দৃষ্টিতে দুটি কালো তারা যেন বিঁধে রইল। নির্বাক পরস্পর দৃষ্টি বন্ধ মুহূর্তগুলো কঠিন সংকল্পের মত হঠাৎ রূপ বদলালো।

বজ্রের মত বেজে উঠল তাড়কার কণ্ঠস্বর। পুত্র ঋষিরা দস্যু। আমাদের শত্রু। ওরা তোমাদের পিতাকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে। আমরা তার প্রতি শোধ নেব। দেখব, ভণ্ড ঋষি কোন্ অলৌকিক শক্তি দিয়ে আমার অন্তরের বিদ্বেষ বহ্নিকে নেভায়? ওরা আমাদের শান্তি, সুখ, স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে। আমিও ওদের সুখে শান্তিতে থাকতে দেব না। ওদের সব স্বপ্ন ছিঁড়ে কুটি কুটি করব। অগস্ত্যকে ধ্বংস করব। ইন্দ্রের দেয়া মলদ ও কারূষ নাম মুছে দিয়ে শ্মশান করে দেব। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলবে ঋষিদের আশ্রম, তাদের তপোবন। আমিও মহাবলী। অযুত হস্তীর বল আমার শরীরে। যে কোন পুরুষের সমকক্ষ আমি। যুদ্ধবিদ্যা সমরকৌশলও আমার অধিগত। পুত্র তোমরা নির্ভয় হও। তোমাদের পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে বাস্তু ঘুঘুর ঐ তপোবনে আগুন লাগাও, যজ্ঞের নামে ভণ্ডামি বন্ধ কর, ওদের অপমান. কর। বিনীত মুখোশের অন্তরালে যে লোভ, ঘৃণা রয়েছে তাকে প্রকাশ করে দাও।

তাড়কার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নিশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল। অতি ভয়ংকর তীব্রতা অনুভূতিতে তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল।

বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা।

পরিকল্পিত উপায়ে ঋষিরা নগরবাসীদের ক্ষেপাল। তাদের মনে তাড়কা বিদ্বেষের আগুণ জ্বালাল। নগরে গ্রামে সর্বত্র রটনা করল তাড়কা আর মানবী নয়। সে ডাইনী। তার দুই চোখে আগুণ জ্বলে। নিঃশ্বাসে ঝড় বয়। বুকে দয়া মায়া স্নেহ-মমতা, প্রীতি করুণার মন্দাকিনী ধারা আর বয় না। কাঠ ফাটা রোদের মত তার বুক খাঁ খাঁ করছে। যেখানে চোখ পড়ে, দৃষ্টি যায়, সেখানেই দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলে, শস্যক্ষেত পুড়ে ছাই হয়। মহামারী, মড়ক, বন্যা আসে তার পিছে

পিছে। সে অকল্যাণ, অমঙ্গল, অশুভ। জাতির জীবনে অভিশাপ। দেশে তার মত নারী সর্বদা অবাঞ্ছিত। তার সংস্পর্শে দোষ জন্মে। ছায়া মাড়ালে পাপ হয়। এ হেন ডাইনীকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করাই শাস্ত্রীয় বিধি।

অগস্ত্যর চক্রান্তে তাড়কা নিজের রাজ্যে অবাঞ্ছিত হল। অনুগত প্রজা, দাস-দাসী মিত্র সকলে তাকে ডাইনীর চোখে দেখল। রাজপ্রাসাদের ভিতরে এবং বাইরে তার জীবন নিরাপদ ছিল না। মারীচ, সুবাহু দুই বীরপুত্রই তার বিশ্বস্ত প্রহরী। তাড়কার নিজেকে ভীষণ একা এবং নিঃসঙ্গ মনে হয়। সরল শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রজারা হিংসার ছুরিতে শান দিয়ে ডাইনী আর রাক্ষসী সন্দেহে তাকে হত্যা করার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্বামী হারানোর শোকে তাড়কা এমনিই ভেঙে পড়েছিল। এইসব ঘটনা তাকে অত্যন্ত বিপন্ন এবং অবসন্ন করল। কোন কিছুতে তার মন ছিল না। দিন দিন কেমন যেন হয়ে গেল। বিপদে না পড়লে ঠিক বাস্তব অবস্থা টের পাওয়া যায় না। তাড়কা অনুভব করল ঋষিদের কুটবুদ্ধির তুলনায় তার বাহু বল নগণ্য।

তাড়কাকে ইদানীং অত্যন্ত বিচলিত এবং বিমর্ষ দেখে তারুণ্যদীপ্ত মারীচের বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। জননীর জন্যে তার ভীষণ কষ্ট হল। দুর্ভাবনায় কষ্ট ও আতঙ্ক থেকে জননীকে অব্যাহতি দেয়ার জন্যে বলল ঃ মা গো রাতদিন তুমি এত কি ভাব ? আমরা দু'ভাই থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমাদের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লড়ব।

মারীচ! বলে তাড়কা চমকে উঠে কিছু বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পারল না। বুকের ভেতরটা বড় বেশি ধুক্‌পুক ধুক্‌পুক করতে লাগল। রক্তস্রোত ভীষণ জোরে বইছিল। স্খলিত কণ্ঠে বলল ঃ পুত্র, মৃত্যুর জন্যে ভাবি না। পরাভবের দুঃখ যন্ত্রণাই দুঃসহ। এই বেদনা ভুলি কেমন করে? আমার রোষ সংকল্প যে অগস্ত্য এমন ব্যর্থ আর পঙ্গু করে দিতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কত সহজে এবং অনায়াসে মানুষের সরল বিশ্বাস এবং সংস্কারকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তপোবনের এক বিপর্যয়কে সে শুধু এড়াল না, একটা বড় জয়ও আদায় করে নিল। আর, আমি নিজের বুকে প্রতিহিংসার আগুণ জ্বালিয়ে শুধু জ্বলছি। কি করব আর করব না ভেবে দিশাহারা বোধ করছি।

তাড়কার পাশে দাঁড়িয়ে মারীচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ এ হল কূটরাজনীতির খেলা। বলতে পার, এক নতুন রাজনীতি সবে সূচনা। রাজনীতির কদর্য চেহারা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয়, এমন জিনিষ, একবার পেলে আর কাটে না।

তাড়কা অস্থির হয়ে বলল ঃ সত্যি আমি ভয় পেয়েছি।

মাগো, মিথ্যে প্রচারে কেন বিভ্রান্ত হচ্ছ ? দুর্বলতায় যে তেজ ধ্বংস হয়, একথা'ত তোমার কাছে কিছু নতুন নয়। রাজার মহিষী হয়ে তুমিও জান শঠের সঙ্গে শঠতা এবং মিথ্যের জবাব মিথ্যে দিয়ে করতে হয়।

অবাক বিস্ময়ে তাড়কা মারীচের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে বলল ঃ

দুর্বল আমি নই। বাহুতে আমার অসুরের শক্তি। রণে অপরাজেয়। তবু ঐ রটনার স্রোতকে নিরুদ্ধ করতে পারি এমন শক্তি আমার কৈ ? কিন্তু আমার শ্বশুরের রাজ্যের ভাগ্য বিনা সংগ্রামে অগস্ত্যের হাতে তুলে দেব না।

মারীচ নীরব বিস্মিত চোখে তাড়কার দিকে অপলক স্থির চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসে। বলল ঃ রাজনীতিতে চিরস্থায়ী জয় পরাজয় বলে কিছু নেই। সুতরাং ও নিয়ে তোমার দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। আমি সুবাহু তোমার পাশে আছি। অনর্থক দুশ্চিন্তা ছাড়।

· তাড়কার বুকের ভেতর তোলপাড় করে উঠল। সুখানুভূতিতে দু'চোখ বুজে গেল। কথা বলতে গিয়ে বার কয়েক ঢোক গিলল। বিভ্রান্ত স্বরে চমকে উচ্চারণ করল ঃ মারীচ !

মাগো, অগস্ত্য শুধু একটা লড়াই-র পথ করে দিল। লড়তে আমাদের হবেই। আমরা লড়ব দেশের জন্য। আদর্শ আর ব্যথার অনভূতি আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস যোগাবে। কিন্তু ওরা কি নিয়ে এই মাটি আঁকড়ে থাকবে ? ওদের মাটি ছাড়া করে এই মলদ আর কারুষের নাম দেব তাড়কাবন।

তাড়কা হতাশভাবে মাথা নেড়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলল ঃ পুত্র, তোর কথায় ভয় ভাঙ্গল। কিন্তু সংশয় দূর হয় না। ডাইনী নাম লোকের মনে একবার যখন ঢুকেছে আর তাড়ানো যাবে না। একটা অনর্থ ঘটার আগে যদি প্রতিশোধটা নিতে পারতুম তা হলে মরেও সুখ ছিল। জানিনা আমার অদৃষ্টে কি আছে !

মারীচ একথার জবাব দিল না। চুপচাপ মায়ের কোল ঘেঁষে আরো ঘন হয়ে বসল। তার স্নেহের হাতখানা ধীরে ধীরে জননীর মাথার গভীরে চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে লাগল। তাড়কার ভেতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কাটল। কথা বলার সময় মারীচের বুক থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অস্ফুটস্বরে ডাকল ঃ মা গো !

তাড়কা চমকে ডাকল ঃ মারীচ ! আমি আর মনের ভার সইতে পারছি না। এর চেয়ে মরণ ভাল।

তাড়কার হতাশায় মারীচ একটু থমকে চেয়ে রইল। বুক ব্যথিয়ে উঠল। শ্বাস দ্রুত হল। ভাষাহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জননীর দিকে। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকভরে শ্বাস নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল ঃ তুমি বীরাঙ্গনা। যুদ্ধক্ষেত্রে বীর একবারই মরে।

তাড়কা বিস্ময়বোধে স্তব্ধ হল। দুই চোখে তার জল ভরে গেল। কথা বলতে পারল না। মারীচ চাপা স্বরে বলল ঃ মাগো, যদি মরতেই হয় তবে বীরের মত মরব লড়াই করে। তুমি আমি সুবাহু এই তিনজনেই পারি মলদ কারুষের মাটি কাঁপিয়ে দিতে। ঝটিকার মত অতর্কিতে ঋষিদের আশ্রমে হানা দিয়ে কুটির ভেঙ্গে অগ্নিসংযোগ করে তাদের নিরাশ্রয় করা কিংবা আতংক সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়। ঋষি এবং ঋষি বালকদের লাঞ্ছিত, প্রহৃত করে, যজ্ঞভূমি অপবিত্র করে তাদের

কুন্ধ করে প্রমাণ করব ঋষিরা সাধারণ মানুষ। তাদের ব্রহ্মতেজ মিথ্যে। ভয়ংকর ক্রোধ একটা মিথ্যে ভাঁওতা। ঋষির ক্রোধ ভয়ের কিছু নয়। তাদের ক্রোধে আগুণ জবলে না। মানুষ ভষ্ম হয় না। অভিশাপে জীবন দুর্বিষহ হয় না। বরং আমাদের আক্রমণেই ঋষিরা অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করবে। নিজেদের ক্রোধে তারা নিজেরাই জবলবে। মানুষের যুগযুগান্তরের অর্জিত বিশ্বাস, সংস্কার, ভক্তি শ্রদ্ধা যে কত বড় মিথ্যে ও ফাঁকির উপর দাঁড়িয়ে আছে এই সত্য উপলব্ধিই ঋষিদের পরাভব অনিবার্য করে তুলবে। বিভ্রান্তির ঘোর কেটে গেলে সাধারণ মানুষের সুপ্ত আত্মার ঘুম ভাঙবে। মন্ত্রের যে কোন শক্তি নেই এই সহজ সত্যটা জানাজানি হওয়ার পর ঋষির সর্বতেজ ধ্বংস হবে। তারা উপহাস্য হবে। অপমানে লজ্জায় ছেড়ে যাবে তপোবন। তারপর, নিরীহ নির্বোধ জনপদবাসীর ঘর বাড়ি শস্যভাণ্ডার জবালিয়ে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে জানিয়ে দেব ডাইনী তাড়কার চোখে আগুণ, নিঃশ্বাসে বিষ। নিঃশব্দে মরণ ধ্বংস আসে তার পিছনে পিছনে। এই মহাভয়েই তারা গ্রাম, নগর ছেড়ে চলে যাবে। তোমার শপথ হবে সত্য। লোকশূণ্য হবে এই জনপদ।

তাড়কা নির্বাক, নিশ্চল, স্থির। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। কেবল মৃদু মন্থর ঢেউ-বুকে উঠানামা করতে লাগল।

তাড়কার চোখ স্মৃতি ভারাক্রান্ত। সুন্দর বাঁধনছেঁড়া প্রেমের উল্লাস আনন্দ আজ শুধু স্মৃতি তার। জীবনের ভোগাকাংখা, নর-নারীর জীবনের অনেক অতৃপ্ত অচরিতার্থ বাসনাকে সে কঠিন শাসনে সংযত এবং ব্রতপালনের মধ্যে দিয়ে সেবা-মুখী করে তুলেছে।

সুন্দ'র মৃত্যু চিন্তা তাড়কাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। শয়নে স্বপনে জাগরণে ঘুণ পোকার মত তার মৃত্যুর যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে তাকে ক্ষয় করে চলে। গহন অরণ্যের দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক বিশালতার অনুভূতি জাগে তার মনে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব শেষ হয়ে যায় না। তার কিছু থেকে যায়। জাগতিক অস্তিত্বে আছে, ভিন্ন আর এক সত্তার মধ্যেও আছে। খোলা আকাশের তলায় শুয়ে সেই ভিন্ন জগৎ আর ভিন্ন অস্তিত্বর কথা ভাবছিল তাড়কা। ছাই ছাই অন্ধকারে, অরণ্যের বিশাল গাছগুলো প্রেতের মত দাঁড়িয়ে। তাদের প্রেতাহত চরাচরে এক রহস্যময় অস্পষ্টতা এনে দিয়েছে। পার্থিবতায় লেগেছে এক অপার্থিবরূপ।

সুন্দ নেই, কিন্তু তার বীজ রয়েছে। সে বীজ কোন বৃহতের জটিল সৃষ্টিলীলার ফসল। বস্তুত সে নিজে মারীচ সুবাহুর স্রষ্টা নয়। তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কি করে শরীর ধারণ করল, কোথা থেকে প্রাণ পেল, সে রহস্য তার অধিগম্য নয়। তবু তারা সুন্দের আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এক প্রাণ, তার শরীর থেকে জাত এক সত্তা। তাদের মধ্যে সে সুন্দকে দেখল। মনটা প্রসারিত হয়ে গেল বহুদূর পর্যন্ত।

স্বপ্নাতুর চোখে তাড়কা ঘুমন্ত মারীচের দিকে তাকাল। যেমন দীর্ঘগড়ন, তেমনি রাজপুত্রের মত সুন্দর মুখশ্রী। দেখলে বুক ভরে যায়। সেই মুহূর্তে এক আশ্চর্য

সুখানুভূতিতে তার অভ্যন্তর টৈটম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। আর তার মধ্যে অনুভব করছিল জায়া শব্দের গভীরতা। যার ভিতর দিয়ে তার নারী নতুন করে জন্মগ্রহণ করে তাকেই বলে জায়া। সুন্দ'র ভিতর দিয়ে নারীত্বের নবজন্ম হল। সে জায়া ও জননী হল। তার ভিতর দিয়ে সুন্দ মারীচ ও সুবাহু হয়ে জন্মগ্রহণ করল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মারীচের মধ্যে সুন্দ'র জন্মগ্রহণ বুঝি সবচেয়ে সার্থক হয়েছিল। বাপের মতই বুকে তার কত সাহস! কত তেজ! সুন্দ যেমন তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত, তার ছেলেও হয়েছে ঠিক তেমনি। মায়ের দুঃখ ঘোচানোর জন্যে অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে মারীচ। তাড়কার শরীর কণ্টকিত হল পুলকে, গৌরবে আনন্দে। মন থেকে তার সব অবসাদ দূর হয়ে গেল। মনে হল, একদিন ঋষিদের তাড়িয়ে সে তার প্রতিশোধ নিতে পারবে।

নিশুতি রাত। চারদিক এত নিস্তব্ধ যে পাতার সামান্য খসখস শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। অগস্ত্য তন্দ্রার মধ্যে নিঃশব্দ চলাচলের শব্দ শুনতে পেল। একটা নয়, অনেকগুলো প্রাণীর পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ।

শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল অগস্ত্য। কুটিরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল চারদিক। প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। তারপর মনে হল, কারা যেন আবছা অন্ধকারে ইসারায় কথা বলছে। কেউ যেন কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার নিঃশ্বাস পতনের শব্দ পর্যন্ত অগস্ত্য অনুভব করতে পারল। অজানা ভয়ে গা ছমছম করে উঠল। তবু কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত করে সে একা বাইরে বেরোল।

দু'পা এগোতেই কালরূপী ভয়ংকরী তাড়কা অস্পষ্ট অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত তার পথরোধ করে দাঁড়াল। চকিত ভয়ে অগস্ত্যর বুকের ভেতর থর থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল: কে তুমি? অগস্ত্যর পথ আগলে দাঁড়ানোর সাহস, স্পর্ধা তুমি কোথায় পেলে নির্বোধ রমণী? তুমি অগস্ত্যর নাম শুনেছ, কিন্তু তার অসাধারণ শক্তির কোন পরিচয় পাও নি।

একটা হাল্কা হাসি তাড়কার কণ্ঠে বেপরোয়া হয়ে উঠল। ঘোলা জলের ঘূর্ণির মত কণ্ঠনালিতে আবর্তিত হতে লাগল তার ঝংকার। হাসির পাকে পাকে ফেরে ফেরে একটা দুরন্ত, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা যেন অগস্ত্যকে পেঁচিয়ে ধরল। আর একটু একটু করে তাকে ভয়ের দিকে টানতে লাগল। অগস্ত্যর বুক শির শির করে উঠল। ছায়ামূর্তির দিকে অপলক স্থির চোখে চেয়ে বিভ্রম বোধ করল। অগস্ত্যের মাথার ভেতর ঘন কুয়াশা। ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল। বিস্মৃতি এক ঝটকায় কেটে গেল। অগস্ত্যকে চিন্তিত দেখাল। উদ্বিগ্নস্বরে বলল: তুমি কে, না জানালেও, অনুমানে চেনা কঠিন নয়। কিন্তু এত রাতে তুমি তপোবনে কেন?

তাড়কা খুব হাসল। রঙ্গ করে প্রশ্ন করল, বলত কে?

অগস্ত্যর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল ঃ তুমি সুন্দ মহিষী তাড়াকা সুন্দরী।

তাড়কার দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। কেমন ঘোলাটে আর হিংস্র। তার বুকে হৃৎ-স্পন্দনের শব্দ বেড়ে গেল। শ্বাস একটু জোর হল। অগস্ত্যর সম্ভ্রমপূর্ণ বাক্যে বিস্মিত হল। আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করল ঃ কেমন করে জানলে?

ঋষিরা যোগবলে সব জানতে পারে।

যোগবল! ঋষিদের? তাড়কার দুই চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রূপে ঝলকে উঠল। যোগবলে রাক্ষস, অসুর, দৈত্যের সমকক্ষ নও তোমরা। ঈশ্বরকে তপস্যায় আমরা জয় করি। যুগ যুগান্তর ধরে মানুষের কীর্ত্তি, গৌরব, মর্যাদা, বীরত্ব, তেজ, সাহস শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকার গৌরবে আমরা মহীয়ান। আর তোমাদের তপস্যা নক্ষত্রের ক্ষীণদীপ্ত। গর্ব করার মত তোমাদের আছে কি? মিথ্যে ভণ্ডামি আর ছলচাতুরী করে তোমরা সরল মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা কর আর নিজেরা একটা নিজেদের তৈরী জালের মধ্যে বাস কর। তোমাদের সেই জাল আমি ছিঁড়ে কুটি কুটি করব।

অচেনা তাড়কাকে অগস্ত্যর কেমন ভয় ভয় করল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সাহস করে বড় বড় চোখ দুটো তাড়কার চোখের উপরে রাখল। অগস্ত্য তীক্ষ্ণ চোখে তাড়কাকে দেখে বুঝবার চেষ্টা করল। আবছা অন্ধকারে ভাল করে তার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু তার দুই চোখের দীপ্তি অন্ধকারের ভেতর খদ্যোতের মত জ্বলতে দেখল। আর তার হাতে আছে কোষমুক্ত অসি। তবে কি তাড়কা প্রতিশোধ নিতে চায়? প্রতিশোধ স্পৃহা তার থাকতেই পারে। কারণ সুন্দ যে একদিন তার চক্রান্তেই নিহত হয়েছে, এই সত্য তাড়কার অজানা নয়। তাড়কার জীবনের বাসনা কামনা স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে, তবে কি সেই শোধ নিতে এসেছে সে? বিবর্ণ ভয়ে অগস্ত্য চারদিকে তাকাল। হতাশ হয়ে চোখ বুঝল। চুপ করে ভাবল কি করে তাড়কার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে সে।

অগস্ত্যর লোকচরিত্র জ্ঞান প্রবল। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানে নারীরা স্বভাবত প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। বিশেষ করে, পুরুষের মুখে রূপের প্রশংসায় তার মন ভরে যায়। তাড়কাকে খুশী করার জন্যে অগস্ত্য বলল ঃ পুরুষের বেশে তোমায় চমৎকার দেখাচ্ছে সুন্দরী। এতক্ষণ আমি প্রাণ ভরে দেখছিলাম। তোমার রূপ মাধুর্য পুরুষের সাজ পোষাকে ঢাকা পড়েনি। আরেকটু চাঁদের আলো হলে ভাল হত। নয়ন সার্থক হত।

আমার হাতে কি আছে দেখতে পাচ্ছ ঋষি? শান্ত কণ্ঠে তাড়কা বলল।

তাড়কার কথা শুনে অগস্ত্য মনে মনে একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু মুখে সহজ হাসি এনে উত্তর দিল ঃ হাঁ দেখেছি। ভীষণ ভাল লাগছে দেখতে।

তরোয়াল কিন্তু দেখানোর জন্যে নয়। এর কাছে তোমার যোগবল খাটবে না। তরোয়াল কখনও মিথ্যে বলে না।

নিঃসহায় দৃষ্টিতে অগস্ত্য তাকিয়ে দেখল তাড়কাকে।

তাড়কা কৌতুক করে জানতে চাইল ঃ ভয় করছে না ?

অগস্ত্য বিস্মিত হয়ে তাকাল। কণ্ঠস্বর যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে মোলায়েম হল ঃ বলল ঃ ভয় কেন ? তোমার সঙ্গে'ত আমার কোন শত্রুতা নেই। ঋষিরা কারো সঙ্গে সংঘর্ষে আসে না।

তাড়কার মুখচোখে রাগে লাল হল। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। দাঁতে দাঁত ঘেষে চাঁপা গর্জন করে বলল ঃ স্তব্ধ হও ভণ্ড তপস্বী। আমার জীবনের সুখ স্বপ্ন তুমি কেড়ে নিয়েছ। রাজ্য, গৃহ, সম্পদ, ঐশ্বর্য ছাড়া করে তুমি আমাকে বনবাসী করেছ। তোমার জন্য প্রিয়তম স্বামী হারিয়েছি। তোমার যজ্ঞের আগুনে সুন্দ পুড়েছে। তার দাহে আমার মন শুকিয়ে গেছে। তাতেও তুমি থামনি। নারীর মমতার সাগর ছেঁচে তুমি আমায় ডাইনী করেছ। আমার সব দুর্ভাগ্যের জন্য তুমি দায়ী। তোমার ক্ষমতালোভ নিষ্ঠুর অহঙ্কার আমার যতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার সঙ্গে লড়াই শেষ হবে না।

যে ঘেন্নার বীজাণু তুমি ছড়িয়েছ লোকের মনে একদিন তা তোমরাও ঘেন্না অপমানের কারণ হবে।

কথাগুলো বলে তাড়কা আর দাঁড়াল না। অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে সেখানে একা অগস্ত্য বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত ধরে তাড়কার কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করল। ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আগুনে ফুঁসছে সে। সে আগুন বেরোনোর পথ পাচ্ছে না বলেই এমন করে তাকে ভয় দেখিয়ে গেল, শাসিয়ে গেল। সেজন্য তাড়কার উপর রাগ হল না তার। বরং, সুন্দ'র মৃত্যুতে সে ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় বোধ করার জন্য তার প্রতি একটা করুণা জাগল। মনে মনে তার অবশ্যম্ভাবী দুর্ভোগ এবং পতনের জন্যে খুশি হয়ে চাপা উত্তেজিত স্বরে বলল ঃ এইতো চাই।

অনেকক্ষণ ভূতের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল অগস্ত্য। অন্ধকারের জোনাকি পোকারা উড়ছিল চারদিকে শ্বাপদের চোখের মত। অগস্ত্য তেমন কিছুই ভাবতে পারছিল না। মাথাটা অস্থির এলোমেলো।

তীব্র মশালের আলো হঠাৎ ঝলকে উঠল অন্ধকারে। প্রস্তরীভূত অন্ধকারকে ছুরির ফলার মত কাটল। আলোয় ঝলমল করতে লাগল তপোবন। কুটিরগুলো এক একটা জ্বলন্ত মশালের মত প্রতিভাত হল। মুহূর্তে অগ্নিশিখা প্রলংকারী দাবাগ্নির রূপ ধারণ করল। অন্ধকার অপসারিত হল। অরণ্য উদ্ভাসিত হল। পাখিরা শাখায় শাখায় আর্তরব করে উঠল। বন্য প্রাণীরা দলে দলে অরণ্য কাঁপিয়ে ছুট দিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। মানুষের আর্তনাদে, ক্রন্দনে তপোবন যেন রাতের বিভীষিকা হয়ে উঠল।

অগস্ত্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই অন্ধকারে। কষ্টে তার দুই চোখ প্রায় বুজে এল। শব্দ করে জোরে নিঃশ্বাস পড়ল। নিজেকে তার অত্যন্ত অপরাধী লাগল। তাড়কার নীরব বিদ্রোহ যে এত ভয়ংকর আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে

ভুলেও মনে উদয় হয়নি কখনো। বিরাট জয়ের আত্মতৃপ্তি পরাজয়ের অসহ্য লজ্জায় গ্লানিতে, ক্রোধে, দুঃখে, আঘাতে তার বুক খামচে ধরল। মুখে যেন নীলাভ কালিমা মাখিয়ে দিল। শরীরে ঘাম ফুটে উঠল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সর্বাঙ্গে অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে এক অসহ্য বেদনা বোধ করতে লাগল বুকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল: যে গৌরব, সম্মান, মর্যাদা মুনি ঋষিরা এতকাল পেয়েছে তার সব তেজ তাড়কা নিঃশেষ করে দিল। ঋষিদের মানবকল্যাণের কাজকে সরল মনে যারা বিশ্বাস করে এসেছে তাদের সে বিশ্বাস যখন ভাঙবে; অবজ্ঞা, অনাদরের উল্লাসে তাদের চিত্ত বিত্তহীন না হওয়া অবধি নিবৃত্ত হবে না প্রতিশোধের আকাংখা। তাড়কার নির্মম নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়া মুনি ঋষিদের প্রবঞ্চনার দুঃখ যন্ত্রণাকে শুধু বাড়িয়ে তুলবে। মানবকল্যাণকে, দেশকল্যাণকে রাজনীতি করে তোলার যে মিথ্যে খেলা তারা শুরু করেছিল আর একটা বড় মিথ্যে দিয়ে তাড়কা তার শোধ নিল। এই ভুল থেকে মুক্তির পথ আর খোলা নেই। অগস্ত্যর গলা বুজে কেমন যেন হাহাকার বেজে উঠল।

অগস্ত্যর স্বপ্নের তপোবনকে তাড়কা নিঃস্ব করে দিয়েছে। ভয়ংকর রিক্ততার মধ্যে নিজেকে সব দিক বাঁচিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা যে কত বিড়ম্বনা এই মুহূর্তে অগস্ত্য তা অনুভব করল। প্রতিমুহূর্তে বিবেকের কশাঘাত তার কাছে দুঃসহ হল। সত্যান্বেষী ঋষির প্রবঞ্চনার বৃত্তি তার অন্তর্দাহের কারণ হল। মিথ্যে এমন জিনিষ যার মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলার বিষ থাকে। মিথ্যেকে আরো বড়ো মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে হয়, আবার হঠাতেও হয়। তাড়কা তাই করে দেখাল, ঋষির যোগবল কত মিথ্যে অলৌকিক শক্তি যে কত বড় বিভ্রান্তি এবং ছলনা এই বোধে কষ্ট পেল সে। চোখের উপর এতবড় একটা মিথ্যেকে সে সহ্য করতে পারল না। মনের শান্তি, স্বস্তি সব গেল। নিদারুণ মনস্তাপে চিরকালের জন্যে তপোবনের মায়া মোহ ত্যাগ করে বিন্ধ্য-পর্বত অতিক্রম করে সে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। আর ফিরল না।

তাড়কার প্রতিহিংসার নগ্ন আক্রমণে মলদ কারুষ জনশূন্য হল। অধিবাসীদের পুনঃ প্রত্যাবর্তনের পথ চিরতরে বন্ধ করতে তাদের বাসস্থান ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিল। পরিত্যক্ত এলাকা আগাছা এবং জঙ্গলে ভরে গেল। সমৃদ্ধ জনপদ ঘোর জঙ্গলে পরিণত হল। নাম হল তাড়কাবন।

অগস্ত্য বিদায়ের পর অনেকগুলো বছর কাটল।

একদিন মারীচ জঙ্গলে ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেল তাড়কাবনের সীমান্ত ঘেঁষে একটা নতুন তপোবন উঠছে। হঠাৎ চমকে সে থমকে দাঁড়াল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তার নিঃশ্বাস আটকে রইল। বুকের ভেতর ধক্ ধক্ শব্দ ঝংকারে বাজতে লাগল। নতুন আশ্রম তার মস্তিষ্কে চিকুরহানা বিদ্যুতের মত একটা অতি ভয়ংকর শত্রুতার সংকেতে ঝিলিক দিল। একটা তীক্ষ্ন বিশ্ধ সন্দেহ বুকের ভেতর সাঁড়াশির মত চেপে ধরল।

অবাক বিভ্রান্ত চোখে গাছ আড়াল করে সে খুব কাছে এল। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল আশ্রমের ভেতরের পরিবেশ।

বিভিন্ন বয়সের মুনি ঋষি তপস্বীরা আশ্রমের নানা কাজে ব্যস্ত। আশ্রম বালকরা কুটীর ছাইছে, জঙ্গল সাফ করছে, সদ্যরোপিত তরুমূলে জল সেচন করছে, পুষ্প চয়ন করছে, মালা গাঁথছে, শরীর চর্চা করছে, অস্ত্র শিক্ষার মহড়া দিচ্ছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন কত কি দেখল মারীচ। দেখে ভয় হল তার।

পাহাড় ঘেরা শ্বাপদশূন্য অরণ্যের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আশ্রম স্থাপনের একটি আদর্শ স্থান মনে করে বিশ্বামিত্র এই তপোবন নির্মাণ করল। কিন্তু সংবাদের সত্যতা নিয়ে মারীচের মনে সংশয় দেখা দিল। স্থান, কাল ও পরিস্থিতির এই মুহূর্তে তপোবন যেন নিয়তির এক অমোঘ সঙ্কেত রূপে আবির্ভূত হল।

গৃহে মারীচকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং চিন্তিত দেখে তাড়কার কেমন ভয় হল। নানা রকম আতঙ্ক ও আশংকায় থর থর করে কাঁপল বুক। অবাক বিভ্রান্ত চোখে অন্ধকারে মারীচের মুখ দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। নিজের হাতে তার মুখখানি দীপাধারের দিকে তুলে ধরল। ভেজা ঠাণ্ডা কম্পিত স্বরে ডাকল ঃ মারীচ! কী হয়েছে তোর? আমি তোর মা। আমাকে কোন কথা লুকোতে নেই। মায়ের চোখ দিয়ে আমি তোর বুকের ভেতরটা দেখতে পাই। কি যেন বলতে এসে, বলতে পারছিস না। চুপ করে থাকিস না। তাড়কার তপ্ত নিশ্বাস পড়ল মারীচের গায়।

জননীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে মারীচ কেঁপে উঠল। তার অন্যমনস্ক আচ্ছন্নভাবটা মুহূর্তে কেটে গেল। বিব্রত গলায় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ঃ তোমার চিন্তার মত কিছু হয় নি। আমাদের তাড়কা বনের সীমানার ধারে বিশ্বামিত্র এক তপোবন নির্মাণ করেছে। অগস্ত্যের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। অকস্মাৎ তার আগমনের হেতু নির্ণয় করতে পারছি না। মনটা সেজন্য একটু অস্থির হয়েছে।

আকস্মিক বিস্ময়কর চমকে তাড়কা চমকে উঠল। বুকের মধ্যে তার একটু অধীরতা জাগল। দিশাহারা হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ঝাপসা আকাশে চাঁদের আলোর ম্লানতা, অস্পষ্ট কয়েকটি তারা দূরে দূরে দেখল। নিচে গাছপালার ছায়ায় অন্ধকার যেন নিবিড় হয়েছিল। তাড়কার চোখের সামনে এই প্রকৃতি ও চরাচর যেন এক নিমেষের জন্যে অলৌকিক হয়ে উঠল। একটা শংকার ভাব জাগল। বলল ঃ পুত্র, বুঝতে পারছি নিয়তির ছদ্মবেশ ধরে বিশ্বামিত্র এসেছে আমাদের তাড়কাবনে। সীমানার ধারে আশ্রম নির্মাণ করে সে আমাদের হৃদয়ের সংকট ও সংঘাতের এক আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে চায়। ওরা আমাদের সুখে শান্তিতে থাকতে দেবে না। বিবাদ শত্রুতা প্রতিশোধকে ওরা জীইয়ে রাখতে চায়। এই কথাটা নতুন করে স্মরণ করে দেবার জন্য সে এসেছে ঋষিদের প্রতিনিধি হয়ে। অস্বস্তিকর দুর্ভাবনায় আমাদের ব্যস্ত রেখে সে মনের অভ্যন্তরে সংঘর্ষকে নিয়ে যেতে চায়। শুধু কি তাই? প্রতিবেশী কোশল সাম্রাজ্য সীমার মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করে পরোক্ষভাবে আমাদের সঙ্গে কোশলের বিবাদ ও বিরোধ সৃষ্টি করা একটা মতলব হতে পারে তার। আমাদের মুনিঋষি

বিদ্বেষের ইন্ধন দিয়ে কোশল রাজ্যসীমায় একটা বড় ধরণের কোন্দল পাকিয়ে তোলার কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধিও থাকতে পারে তার। বিশ্বামিত্রের মত খল স্বভাবের মানুষকে বিশ্বাস করা সুকঠিন।

এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে মারীচ তাড়কাকে দেখল। তার দু'চোখে বিস্ময়। নির্বিকার মুখে চতুর হাসি। মারীচও বোঝে বিশ্বামিত্রের চতুর উদ্দেশ্য। বিশ্বামিত্রের ধমনীতে ক্ষাত্রিয় রক্তধারা। ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ অপেক্ষা রজঃগুণ তার স্বভাবে ও আচরণে প্রকট। রাজনীতিতে বিশ্বামিত্রের মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। তার অসাধারণ মনীষা, বুদ্ধিবল, ব্যক্তিত্ব, কূটবুদ্ধি, রাজনীতির কোন তুলনা নেই। রাজা বিশ্বরথের ক্ষাত্র তেজ, এখন উপকথা। লোকের মুখে মুখে সে গল্প এখনও থেমে যায়নি। বিশ্বামিত্র আগমন বিনা প্ররোচনায় ও বাক্যব্যয়ে তাড়কার চিন্তাধারাকে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করবে। মনেতে অবিরাম সংঘাতে বীজ ছড়াবে। খণ্ডিত সত্তার জ্বালায় চিত্ত জ্বলে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হবে। নিরালা মুহূর্তে সংশয়, সন্দেহ, জমাট অন্ধকারের মত মনে চেপে বসে মনের অভ্যন্তরে সংঘাতের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী করবে। এ সব চিন্তায় মারীচের অন্তর ক্লিষ্ট হতে লাগল। মারীচ ভাল করেই জানে, বিশ্বাস একবার দুর্বল হলে আর তাকে ফেরানো যায় না। সব তলিয়ে যায়। জননীর অন্তর অনুরূপ এক আত্মক্ষয়ী উত্তেজনায় অশান্ত। তাই তাকে শান্ত ও সংযত করার জন্য উল্লসিত স্বরে বলল ঃ ঠিক বলেছ মা। এ হল কূটবুদ্ধির লড়াই। স্নায়ুযুদ্ধের আয়োজন। এখানে বিশ্বাস আর মানসিক বল হল বড় জয়। একবার তার হার হলে বাইরের পরাজয়কে ঠেকানো যায় না।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তাড়কা বলল ঃ পুত্র, সেই পরাজয় কোন গোপন পথে আসবার আগে প্রতিশোধের উল্লাসে আবার চিত্ত জাগাতে হবে। যতদিন না আমরা নিঃস্ব হয়ে যাই ততদিন মনের অভ্যন্তরে সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখব। মহাবল দানবের মত ভয়ংকর বিক্রমে তাদের আঘাত হানার আগেই আমরা তাদের বিতাড়িত করব। ক্ষুধিত হায়নার মত তাড়কার দুই চোখে লোলুপ রক্তের তৃষ্ণায় জ্বল জ্বল করতে লাগল।

মাতঃ, তোমার চিত্ত ক্ষুব্ধ। শরীরের প্রতি কোষে কোষে প্রতিশোধের উল্লাস আর যাতনা তোমাকে ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের থেকেও দুর্দম, দুর্বার আর শক্তিময়ী করে তুলেছে। তোমার দু'চোখে ক্রোধের ভয়ংকর আগুণ। ওই আগুণ শুধু সর্বনাশ ডেকে আনে। তুমি শান্ত হও। ক্রোধ সংযত কর। আমি জানি, একটা দুরন্ত ব্যথা, যন্ত্রণা, অভিমান তোমার বুকে তীরের মত বিঁধে আছে। ব্যথায় বিদ্যুৎ চমকের মত একবার জ্বলে নিভে গিয়ে, কি লাভ হবে তোমার ?

তাড়কা সহসা কোন কথা বলতে পারল না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অনুসন্ধিৎসু চোখে মারীচের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বুকের মধ্যে তার অশুভ শঙ্কায় আর উদ্বেগে টনটন করছিল। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত আর চোখ দুটি রাঙা হল। নিজেকে তার ক্ষ্যাপা আর উন্মাদ মনে হচ্ছিল। মারীচের কথায় কেমন যেন হঠাৎ সে

বদলে গেল। কণ্ঠে তার বিব্রত অপরাধীর স্বর শোনা গেল। বলল ঃ মারীচ, তোর পিতার সাম্রাজ্য হারানোর ভয় আমাকে বিদ্রোহী করে রেখেছে। এই আতঙ্ক বোধ হয়, আমাকে মানুষের জগৎ থেকে অনেকদূরে নিয়ে গেছে। আমার মধ্যে নারীর প্রেম, মমতা, করুণার পাত্র শূন্য হয়ে গেছে। সত্যি আমি রাক্ষসী হয়ে গেছি। বলতে বলতে তার বুক ভাসিয়ে এল কান্না।

জননীর আকস্মিক কান্নায় মারীচ অসহায় বোধ করল। মনের এই অবস্থার সঙ্গে জননীকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন সংকেত সূত্র সেই মুহূর্তে সে খুঁজে পেল না। অভিভূত আচ্ছন্নতার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কাটল। নিজের মনে কথা বলার সময় তার গলার স্বর ভারী ও গম্ভীর শোনাল। অদ্ভুত শান্তভাবে সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল ঃ মা গো তোমার উদ্বেগের হেতু নেই, একথা বলব না, কিন্তু তার নিরাময়ের দাওয়াইও আছে। তুমি ভাবছ কেন ?

মারীচ !

রাজনৈতিক নিরাপত্তা এবং অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য আমরা যদি কোন শক্তি শালী নির্ভরযোগ্য সম্রাটের শক্তি শিবিরে যোগ দিই অথবা ছত্রচ্ছায়ায় আসি, তা-হলে উল্টে বিশ্বামিত্রর শিরঃপীড়ার কারণ হব আমরা। লঙ্কেশ্বর রাবণকে ভারতবর্ষের সব নৃপতি সমীহ এবং ভয় করে। অনার্যকুলচূড়ামণি লঙ্কেশ্বর আমাদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় ও সহায় হতে পারে। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে আমাদের গৌরব কিছুমাত্র কমবে না। বরং তার সমাদরের অংশীদার হব। রাবণকে অবহেলা করার কোন শক্তি ভারতে কারো নেই। তাঁর রক্ত আঁখির ভয়ে বিশ্বামিত্রকে সংযত রাখবে। আর্যাবর্তের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে বিশ্বামিত্রও বৃহত্তর কোন সংঘাতের মধ্যে যাবে না। নির্লিপ্তভাবেই সে সংঘাত থেকে সরে দাঁড়াবে। আশ্রমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেলে স্থান পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও তাকে যেতে হবে।

তাড়কার উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা মারীচ প্রাণের উদ্বেলতায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার ঘুমহীন দু'চোখ ভরে আবার জল এল। এখন আর তাড়কার বুকে কোন আক্রোশ নেই। বুক জুড়ে এক অভিমানের সমুদ্র গজরাচ্ছে।

আকাশের দিকে মুখ করে কার উদ্দেশ্যে তাড়কা বিড় বিড় করে বলল ঃ তোমার মৃত্যুর কষ্ট আমি ভুলে থাকতে পারি না। তোমার মৃত্যুটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন মুনি ঋষির সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হবে না। তোমার জন্যেই আমার বুকটা খাঁ খাঁ করছে। মরুভূমির মত আমি শুধু তাপ আর জ্বালা ভোগ করছি। স্বস্তি পাচ্ছি না।

বিশ্বামিত্র তাড়কার মনের অভ্যন্তরে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে নবনির্মিত আশ্রমকে অস্ত্রশিক্ষা ও শরীরচর্চার পীঠস্থান করে তুলল। আর, প্রচার করল, অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশের নৃপতি দশরথের পুত্র রামচন্দ্র হতে তাড়কার সর্বনাশ হবে। সে হল নররূপী মহাকাল। তার হাতেই মরণ তাড়কার।

এইরূপ জনশ্রুতিতে তাড়কার মনের গহণে মৃত্যুর নীরব আতংক একটু একটু করে তার সব শক্তি, তেজ, বিশ্বাস, আত্মবলকে হরণ করবে। এক চির জিজ্ঞাসার কাছে উৎকর্ণ বোবা উৎসুক চোখে তাকিয়ে সে শুধু নিজেকে খুঁজবে। অজান্তে অদৃশ্য চক্রের দ্বারা বন্দীবোধে আক্রান্ত মন এক দুঃসহ অসহায়তা এবং ভয়ংকর একাকীত্ববোধের যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে অর্ত্তনাদে মাথা কুটবে। এরকম একটা মানসিক সংকট ও সংঘাত নিয়তির অমোঘ সংকেতের মত তাড়কার গোটা ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে। সেদিন তাড়কার দুঃসময়।

কিন্তু কয়েকমাস যেতে বিশ্বামিত্র বুঝল তাড়কা সাধারণ রমণী নয়। তার রাজনৈতিক জ্ঞান প্রখর। তাকে নারী বলে, অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা করে রাখা যায় না। সামান্য প্রতিপক্ষ বলে ভাবাও বিপদ। নিজের স্বার্থ নিরাপদ করতে কি করা উচিত, তার কর্তব্যনির্ধারণে তাড়কার অসামান্য ধূর্ততা, সিদ্ধান্তে ও কর্মে ক্ষিপ্রতা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বিশ্বামিত্রকে অবাক করল। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে তাড়কা স্পষ্ট বুঝেছিল আর্যদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি যদি কেউ বেশ কিছুটা শাসনের মধ্যে রাখতে পারে সে হল রাবণ। তাই, বিশ্বামিত্রর শত্রুতা ও সংঘাত এড়ানোর কৌশল হিসাবেই তাড়কা রাবণের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত করল। রাবণের বিশাল সৈন্য-বাহিনী তাড়কার সাহায্যে যে প্রস্তুত বিশ্বামিত্র এবং তার সহোযোগিদের সেকথা বোঝানোর জন্যে রাবণের দুই সেনাপতি খর ও দূষণকে তাড়কাবন দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করল। একটা পরোক্ষ রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রর সমস্ত কার্য ও পরিকল্পনাকে গন্ডীবদ্ধ করল। কিন্তু নিজেকে তাড়কা কোন গন্ডীতে বেঁধে রাখল না। বিশ্বামিত্রর বিভ্রান্তকর প্রচার তাকে মৃত্যুভয়ে বিচলিত কিংবা অস্থির করল না। বরং একটা দুরন্ত বেপরোয়া মনোভাব আরো বেশি উচ্ছৃংখল এবং স্বেচ্ছাচারী করল। তাড়কার মধ্যে কোন সংযম ছিল না। বিশ্বামিত্রর উদ্দেশ্য ও মতলব ব্যর্থ করতে আশ্রমের মুনিঋষিদের সে নানাভাবে উত্যক্ত ও বিরক্ত করত। আর আশ্চর্য হত তাদের সহিষ্ণুতা দেখে। তাদের নিরীহ ভালমানুষী নিয়ে ছিল তার নিষ্ঠুর কৌতুক। এক ধরনের মজা করা। কিন্তু এই বিদ্রূপ ঋষিদের কাছে দুঃসহ হল। শান্তিতে তপোবনে বাস করা অসম্ভব হল।

তাড়কা বিশ্বামিত্রর শিরঃপীড়ার কারণ হল। তাকে নিবৃত্ত কিংবা সংযত করার কোন শক্তি ছিল না বিশ্বামিত্রর। রাজর্ষির নীরবতা সে পরাজয়ের চোখে দেখল। উৎপাতের মাত্রা বাড়িয়ে ঋষিদের ধৈর্যভঙ্গ করতে চেষ্টার কসুর করল না। তবু, কোন ঋষির নয়ন থেকে বহ্নি নির্গত হল না। পাপ কি জানতে, আশ্রম নোংরা ও অপবিত্র করল। ঋষিদের গৌরব ও তাদের অলৌকিক ক্ষমতাকে হেয় করা ছিল তাড়কার উদ্দেশ্য।

বিশ্বামিত্রর পরিকল্পনার বাস্তব পরিণতি সম্পর্কে তপোবনের মুনি ও ঋষিরা চিন্তিত ও বিমর্ষ ছিল। নিরীহ, নিরস্ত্র মুনিঋষিদের শান্তিপূর্ণ কূট সংগ্রামের যে নয়া ইতিহাস বিশ্বামিত্র রচনা করতে চেয়েছিল তা আরম্ভের আগেই শেষ করতে হল।

এতবড় একটা ব্যর্থতার জন্য বিশ্বামিত্র প্রস্তুত ছিল না। তাই কেমন একটা বিভ্রান্ত বিস্ময়ে সে ও তার সহযোগীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাতে ভেঙে পড়ল না।

সহযোগী ঋষি ও বান্ধব গৌতম তাকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ করার জন্যে নিজের মনের অধৈর্যকে প্রকাশ করল। বলল ঃ রাজর্ষি, এভাবে মুখ বুজে, অত্যাচার সয়ে আর কতকাল এখানে থাকতে পারবে ?

গৌতমের সঙ্গে আশ্রমের অন্যান্য ঋষিরাও ছিল। বিশ্বামিত্রর দৃষ্টিতে কেমন আচ্ছন্নতা। তার ললাটে, নাকের ডগায়, মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘোর দুপুর। মেঘ ছেঁড়া রোদের ঝলক বাইরের উত্তাপকে দুঃসহ করে তুলল। ভিতরে গরমের এক অস্বস্তিকর জ্বালায় ছটফট করছিল তারা। তবু, প্রচণ্ড গরমে ঘর্মাক্ত কলেবরে কোন অস্বস্তি তাদের কারো ছিল না। বিশ্বামিত্র নিজের ছায়াকে পদদলিত করে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করল। শান্ত ভাবলেশহীন মন তার কিছু চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত। গৌতমের প্রশ্নে চোখে হঠাৎ একটু বিস্ময়বোধ ফুটে উঠল।

বিশ্বামিত্রকে চুপ করে থাকতে দেখে জাবালি গলায় সামান্য একটু শব্দ করে বলল ঃ গৌতম মিথ্যা বলেনি। সত্যি এখানে বাস করা অসম্ভব। আমাদের পরিকল্পনা এখনও ভ্রূণ অবস্থায়। এইরকম চলতে থাকলে কি করে কাজ করব। রাক্ষুসীকে জব্দ করতে এসে নিজেরাই জব্দ হয়েছি।

বিশ্বামিত্র নির্বিকার।

ভরদ্বাজ মুনি বলল ঃ রাজর্ষি চুপ করে থেক না, আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও। রাজ্য ও রাজনীতিতে মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব অটুট রাখার শুভ সংকল্পকে প্রশংসা করে বলছি, শুধু ব্রাহ্মণ্যশক্তির তেজ দেখানোর জন্যে এ লড়াই টিকিয়ে রাখা যায় না। স্থান ও পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমাদের নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মার্কণ্ডেয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল ঃ আমরা শান্ত সংযত থাকলেও তাড়কা আমাদের শান্তিতে ও স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। সে আমাদের দুর্বলতা ছল চাতুরী ধরে ফেলেছে। আমাদের আশ্রম উঠিয়ে শান্ত হবে।

বিশ্বামিত্র তার সহযোগীদের কথা বিশ্বাস করল কিনা বলা শক্ত। তবে চুপ করে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বুকের ভেতর এক দুরন্ত অস্থিরতা তাকে বিপন্ন ও অসহায় করে তুলল। কিন্তু বাইরে তার প্রতিক্রিয়া ছিল না কোনো। দেহখানি নিস্পন্দ, এবং স্থির। তীক্ষ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টিতে তাকে বড় বেশী স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল লাগল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু এভাবে নীরবে সরে দাঁড়ালে মুনি-ঋষিদের পায়ের তলায় মাটি থাকবে না। তাড়কার ভয়ংকর অত্যাচারের অতীত ইতিহাস আমাকে আতঙ্কিত করছে। তবু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

জাবালি শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনায় কাঁপা গলায় বলল ঃ রাজর্ষি, তাড়কা নারী হলেও, অত্যন্ত বর্বর, নিষ্ঠুর। তার দয়া মায়া, শ্রদ্ধা, সৌজন্যবোধ কিছু নেই। সে অশিষ্ট,

দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ। আশ্রম ছাড়তে দেরী করলে হয়ত সে রাক্ষস সৈন্য লেলিয়ে দেবে। আমাদের হত্যা করবে।

ভরদ্বাজ উদ্বিগ্ন স্বরে বলল: আপনার এই অহেতু জঙ্গী মনোভাবের অর্থ বুঝি না।

বিশ্বামিত্রর কণ্ঠস্বর গম্ভীর। বলল: অহিংস উপায়ে তাড়কাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়, সে আমি জানি। তার মত মহাবল দানবীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রয়োজন বাহুবল। আর্যাবর্তের কোন রাজাই জটিল রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায় না। তাদের আঁচল ধরা রাজনীতি তাড়কার স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের এই অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বাহুবলের দরকার। অস্ত্রশিক্ষার নামে সেই মুক্তি বাহিনীই তৈরী করছি। যতদিন না তা শেষ হয়, ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ভিতরের প্রচণ্ড উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মার্কণ্ডেয়'র গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল: আশ্রমের মানুজনকে এভাবে একটা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া কোন বীরত্ব নয়। কেউ একে নেতার দায়িত্বসচেনতা কিংবা কর্তব্যের কঠোরতা বলবে না। এই একগুঁয়েমি হল নির্বোধের আত্মহত্যা।

পাষাণের মত স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার বিশ্বামিত্র মার্কণ্ডেয়র উষ্মায় ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হল। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রেখে রূঢ়স্বরে উচ্চারণ করল: অধিকার একবার ত্যাগ করলে ফিরে পাওয়া কঠিন হয়। তাই ভীরু কাপুরুষের মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করার কোন বাসনা নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কখনো তা করেনি। উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে জয়যুক্ত করতে তারা প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করেছে। অনেক দুঃখ ত্যাগ স্বীকার করে তাঁরা আর্যধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছে। তুচ্ছ জীবনের মায়ায় তাঁদের স্মরণীয় গৌরবকে কলংকিত করতে পারব না। তাঁদের বংশধর আমরা। তাঁদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ আমাদের যাত্রা পথের পাথেয়। এই সংকল্প থেকে আমি বিচ্যুত হতে পারি না। হব না।

বিশ্বামিত্রর দৃপ্ত ভাষণে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হল সকলে। উন্মুক্ত ওষ্ঠে তাদের বোবা জিজ্ঞাসা। সহযোগিদের সকল তর্ক নিষ্ফল করে দেওয়ার সুখানুভূতিতে বিশ্বামিত্রর মন রাঙিয়ে উঠল। একটা খুশি খুশি ভাব ফুটল মুখমণ্ডলে।

জাবালির দিকে চোখ পড়তে সে কেমন ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল। ধনুকের মত বাঁকা অধরে জাবালির বাঁকা হাসির ধার। নিজের অজান্তে চমকেও উঠল বিশ্বামিত্র। খদ্যোতের মত জ্বলছিল জাবালির দুইচোখ। উপায়হীন এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর, জাবালি সকলকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে চাপা ক্রোধের গণগণে গলায় বলল: মহাত্মন্, আমরা কেউ শস্ত্রজীবী নই; শাস্ত্রজীবী। অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্র বুঝি বেশি। মূর্খের মত অস্ত্র আস্ফালন করাকে বীরত্ব বলে না। দৈহিক বলপ্রকাশে বীরত্ব অর্জনের যুগও শেষ হয়েছে। এখন কিসে জয় হয় তাই নিয়ে ঝগড়া যত, তার চেয়ে অনেক বেশি পথ নিয়ে। কৌশল, কূটনীতির

নিপুণ খেলা যুদ্ধ জয়ের সোপান। আমরা যুদ্ধ চাই না, জয় চাই। আপাত পরাজয় স্বীকার করে বৃহত্তর জয় আদায়ের পর সুগম করার নামই রাজনীতি। সংঘর্ষ অনিবার্য না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে নেই।

জাবালির বাক্যে বিশ্বামিত্র স্তম্ভিত হল। একটু বিব্রত বোধ করল। নিজের মনে প্রশ্ন করল অন্যতম সহযোগিদের মতান্তর, বিভেদ, অবিশ্বাস এবং বিদ্রোহের রকমটা এরকম বিদ্ঘুটে কেন? কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম ঘটল তার। বুকটা একটু কেমন করছিল। স্তব্ধতার ভেতর সকলের শ্বাস পতনের শব্দ একটা বিপদ সংকেতের মত বাজতে লাগল। তার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ বিশ্বামিত্র টের পেল। কিন্তু কি করবে সে? বরাবরই সে একটু অসহায়। আজ আরও বেশী অসহায় লাগছিল। নিজের মর্যাদার কথা ভেবে নয়, আর্যাবর্তের বিপন্ন গৌরবের কথা ভাবছিল সে। কিন্তু তেমন গভীর করে ভাবতে পারছিল না। বিশ্বামিত্রর মাথাটা অস্থির, এলোমেলো।

গৌতমের তীব্র বিরাগের কথা ছুরির ফলার মতো তার মর্মে এসে বিঁধল। বলল: তাড়কার নজর পেঁছয় না, এমন জায়গায় আশ্রম উঠিয়ে নিয়ে যেতে বাধা কোথায়? শুধু লঙ্কায় নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র রাবণের প্রভাব ছড়ানো। আমাদের আর্ত চীৎকার সুখসাগরে মগ্ন, ভোগ বিলাসী রাজাদের কানে কোনদিন পেঁছবে না। তাদের উপর কোন নির্ভর করাও চলে না। দেশ কাল পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আমরা এই স্থান ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পারি যাব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বলল: সংগ্রামের বিপজ্জনক পথে সহগামী এবং অনুগামীদের ঠেলে দেয়ার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। আমাদের মধ্যে কোনরকম মতবিরোধের সংঘাত কাম্য নয়। জাবালি এবং গৌতমের প্রস্তাবে যদি সৌভাগ্য ফেরে বলে তোমাদের সকলের ধারণা এবং বিশ্বাস হয় তা হলে বাধা দেব না। কিন্তু এই আশ্রম তুলে দেয়ার কোন সার্থকতা নেই। বরং, এই আশ্রমকে রেখে তাকে বোকা বানানো সহজ। কুটনীতির খেলার প্রয়োজনে অনেক জোড়াতালি দিয়ে কাজ সারতে হয়। এই আশ্রম হবে সেই কৌশলের ক্রীড়াক্ষেত্র।

বিশ্বামিত্রর বক্তব্যের বাস্তবতাকে সকলে অনুমোদন করল। কিন্তু একটা তীব্র তীক্ষ্ন ভয়ে চঞ্চল হল তাদের মন। মার্কণ্ডেয় শ্মশ্রুগুম্ফের মধ্যে ঢাকা বড় বড় চোখ বিশ্বামিত্রর মুখে স্থিরভাবে স্থাপন করে বলল: প্রস্তাব উত্তম। কিন্তু ফল হবে না কোন। তাড়কার মত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মহিলাকে যে এরকমভাবে বোকা বানানো যায় না তা তোমরা নিয়তি, অদৃষ্ট, মৃত্যুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেই বুঝেছ। তাড়কার মত ধূর্ত ও চতুর মহিলা একদিন তোমাদের সুগোপন রাজনৈতিক মতলবটি ঠিক আঁচ করে নেবে। সুতরাং তোমার ওই কূটনীতির কানাকড়ি মূল্য নেই। মাঝখান থেকে রাজনীতির খেসারত দিতে মূল্যবান কতকগুলো জীবন নষ্ট হবে।

বহুদূর হতে অকস্মাৎ আর্তরব বাতাসে ভেসে এল। উৎকর্ণ হয়ে সকলে শুনতে

লাগল। কতকগুলো বালকের মিলিত অসহায় আর্তস্বর বাতাসে আঁ আঁ ছুটে এল। মুহূর্তে সকলের মুখ-চোখের চিরকালের চেনা রূপটা বদলে গেল। সবাই খুব বিস্বাদ অনুভব করল মনটায়। বিশ্বামিত্র গলার স্বর নরম করে বলল : তাড়কা আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জাবালি উচ্চারণ করল—ভয়? এখনও সন্দেহ, অবিশ্বাস? বাস্তব অবস্থা আমাদের কোথায় নামিয়ে এনেছে দ্যাখ। আমাদের ছেলেগুলো চোখের উপর মার খাচ্ছে আর আমরা তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসছি না। এমন কি তুমিও না রাজর্ষি! দৌরাত্ম্য প্রতিহত করার মনোবল আমাদের গেছে, তাই এই ভীরুতা সহিষ্ণুতা।

একটু হেসে বিশ্বামিত্র জাবালির দিকে মুখ তুলে বলল : তাড়কা আমাদের মেরে একরকম উপকারই করছে। বিপদে না পড়লে তো মনটা ঠিক সংগ্রামের জন্য তৈরী হয় না। তাড়কার মারে ছেলেদের উপকারই হবে। একটু একটু করে ভয় ডর কেটে যাবে। মনটা শক্ত হবে। দুর্বলতা, ভীরুতা ঝেড়ে মনটা ঝর ঝরে হয়ে উঠবে।

জাবালি স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এই বিপদের ভেতরেও রসিকতা।

বিশ্বামিত্র ক্ষীণ হেসে বলল : বিপদে পড়েই জীবন রহস্যকে জানা যায়। ভয়ের বাসা শরীরে। শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মৃত্যু, ভয় এবং আতঙ্ক। দেহ নিয়ে যতদিন দুশ্চিন্তা থাকবে ততদিন ভয় কাটবে না। মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত ভিতরের সত্তাটা মারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। মৃত্যুর ক্ষণিক নৈকট্য ছাড়া জড়ত্ব কাটে না। বাঁচাই জীবনধর্ম। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সেই উপলব্ধি ঘটে। তখন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। মনে হচ্ছে, তাড়কার মারে জর্জরিত হয়ে একদিন সাহসের সঙ্গে এর মোকাবিলা করবে। আমাদের ছেলেরা মারের জবাব সেদিন মার দিয়ে শোধ করবে তার খুব বেশি দেরী নেই আর।

বিশ্বামিত্রর কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি এবং এমন একটা অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ ছিল যা প্রত্যেকের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। সহযোগী ঋষিরা বোবা বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাড়কা দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। কত চেষ্টা করল তবু ঘুম এল না চোখে। কান জ্বালা করতে লাগল। মাথার ভেতর কিসের দুঃসহ প্রদাহ মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। শয্যা যেন তার দেহে সূচের মত বিঁধতে লাগল। একটা কষ্টকর অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল। কখন যে শয্যা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল নিজেও জানে না।

প্রকৃতি শান্ত ও সীমাহীন। নির্মেঘ নীল আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে। স্থির নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে ঋষিদের শত শত ক্রুদ্ধ অগ্নিময় চোখ যেন তাড়কা

নিরীক্ষণ করল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাড়কা বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল আকাশের দিকে। বুকে পুঞ্জীভূত অভিমান। নিথর স্তব্ধতায় অকস্মাৎ তা দুলিয়ে উঠল। তারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে সে আপন মনে প্রশ্ন করে আর বলে, ওগো ঋষি, আমি কি করেছি? আমার উপর তোমাদের এত আক্রোশ কেন? কেন-বা এত চক্রান্ত? দোষ ত তোমাদের। হ্যাঁ, তোমরাই আমার সুখ কেড়ে নিয়েছ, স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছ। আমার বুকে এই যে মরুভূমির দাহ, আগ্নেয়গিরির বহ্ন্যুদ্গার—এ-কার সৃষ্টি? এত তোমরাই তৈরী করেছ। তোমাদের ঘৃণার বিষে আমার শরীর মন জর্জরিত। অথচ, আমরা ত তোমাদের ভাল চোখে দেখেছিলাম, ভালো চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমরাই আমাকে পাগল করে তুললে। কোন্ রন্ধ্র দিয়ে নিয়তি আসে জানি না। কিন্তু আজ জীবন সায়াহ্নে এসে বেশ বুঝতে পারছি তোমরাই সেই নিয়তির রূপ ধরে এলে আমার প্রতিহিংসার রন্ধ্র পথ দিয়ে। এখন আর ফেরার কোন পথ নেই।

অন্ধকারের মধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিঃসঙ্গতার ব্যথায় তাড়কার বুক টনটন করে উঠল। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। তাড়কার নিজেকে বড় একা মনে হল।

অকস্মাৎ স্তব্ধ প্রকৃতি চপল হয়ে উঠল। কোথা থেকে হু হু করে এক ঝলক হাওয়া ছুটে এসে তার মুখে চোখে লাগল। চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে সে তখন গ্রহণ করছিল তৃপ্তিদায়ক ফুরফুরে হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শ। অসহনীয় সুখবোধে তার দেহ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। দেয়ালের উপর পিঠ রেখে মাথা হেলিয়ে দিয়ে আরামে সে চোখ বুজল। চারদিক থেকে উন্মাদ হাওয়া ছুটে আসছে। লয় করে দিচ্ছে সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তি।

পাখীর ডাক আর সূর্যের আলো তাকে সকালে জাগাল। চোখ মেলে দেখল বাইরের বারান্দায় সে রাত কাটিয়েছে। মাথার ভেতর সেই সুতীব্র জ্বালাটা আর নেই। কিন্তু সারা শরীর জুড়ে কেমন একটা অবসাদ টের পাচ্ছিল।

তাড়কাকে শয়ন কক্ষে দেখতে না পেয়ে মারীচ চুপি চুপি গোটা মহলটা খুঁজল। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় তাকে আবিস্কার করল। নিস্পন্দ তাড়কা সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছিল।

মারীচকে অকস্মাৎ দেখে একটু চমকাল তাড়কা। বারান্দার দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে খুব অপ্রতিভ মুখে একগাল হেসে বলল: রাতটা এখানে বসে বসে কাটিয়ে দিয়েছি।

মারীচ কোন কথা বলল না। চুপ করে থাকল। ছেলের অভিমানের কথা তাড়কার অজানা নয়। দু'হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে তাকে মুখোমুখি বসাল। ম্লান হলেও হাসিটা তার বুকের গভীর থেকে উঠে এল। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল: আমার উপর সত্যিকারে রাগ করতে পারছিস? বল—

মারীচ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: আমার সব রাগত এখন তোমার উপরেই।

পাগল ! সে রাগের কোন দাম নেই । যে রাগের দাম দেয়, রাগ করা তার উপরে সাজে !

মারীচের দীর্ঘশ্বাস পড়ল । জননীর মনের অবস্থা এবং তার মনের গ্লানিকে সে অনুভব করতে পারল নিজের মনের মধ্যে । বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ সত্যিই, তোমার মনের আগুনে আর ক্রোধ জ্বলে না । তার সে নেভা আগুনে তেজ কোথায় ?

মারীচের কথা শুনে তাড়কা খানিকটা অসহায় চোখে তাকাল । বিব্রত বোধ করল । কথা বলতে গিয়ে ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল, চোয়াল দুটি শক্ত দেখাল এবং দৃষ্টি কঠিন হল । বলল ঃ আগুন নিভবে কোথা থেকে ? বল, ইন্ধনের অভাব হয়েছে । আমি কি সে দৃশ্য ভুলতে পারি ? চোখে না দেখলেও কল্পনা করতে পারি, সারা গায়ে তার আগুন । দাউ দাউ করে যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলছে তার তাজা রক্ত মাংসের শরীর । আর কি ভয়ংকর আর্ত্ত চিৎকার করছে বাঁচাও ! বাঁচাও !

মারীচ সম্মোহিত । হঠাৎ কথা খুঁজে পেল না । কেমন একটা অপরাধ বোধে কষ্ট তার বুকে থাবা গেড়ে বসল । তাড়কার শক্ত মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কয়েক পলক মারীচকে ছুঁয়ে রইল । আস্তে আস্তে তার মুখের অন্যমনস্ক কঠোরতা কেটে গেল । বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ পুত্র তোর জননীর বুকটা পাথর দিয়ে গড়া । তার কাছে শুধু ব্যথাই জুটবে, আর কিছু নয় ।

বিচিত্র দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল মারীচ ! অস্ফুট স্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল ঃ এসব বলে কেন দুঃখ দাও, দুঃখ পাও । তীব্র একটা জ্বালায় বুকের ভেতরটা তার চিন্‌চিন্‌ করে জ্বলে যেতে লাগল । সেই অসহ্য যন্ত্রণা চেপে শক্ত আর মৃদু গলায় ডাকল, মা !

মারীচ ! চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল তাড়কা ।

থালার মত রাঙা সূর্য গাছের মাথায় উঁকি দিল । যতদূর চোখ যায় রোদ ঝলমল করছিল । ছোট বড় পাহাড়ের সারিতে দিগন্ত বিসারী ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা সূর্যের আলো বুকে নিয়ে তখনও স্বপ্নে বিভোর । তেমনি তাড়কার উদ্বেলিত মাতৃস্নেহ মারীচের মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কয়েক মুহূর্ত্ত । মহৎ ও বিশাল অনুভূতির ভেতরে আবিষ্ট হয়ে যাওয়ার সুখে তার দুচোখ বুজে গেল ।

মারীচের বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের রাগিনী বাজতে লাগল । থমথমে গলায় বলল ঃ বিশ্বামিত্রর ভাবগতিক ভাল বুঝছি না । শোনা যাচ্ছে, গোপনে অযোধ্যায় রাজা দশরথের কাছে দরবার করতে গিয়েছে ।

তাড়কা উদাস অন্যমনস্কতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বলল ঃ যতদিন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে বিশ্বামিত্র সাধারণ মানুষ নয় । ষোলটি বসন্ত ঋতু তার উপর অকথ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও তার মনোবল চিড় খায়নি, আত্মবল ক্ষয় হয়নি । ধৈর্য সহিষ্ণুতা বিশ্বামিত্রের গৌরব যত উজ্জ্বল করেছে, আমার কলঙ্কের পাল্লা তত ভারী হয়েছে । এখন বেশ বুঝতে পারি, এই ঋষিই আমার নিয়তি । এর হাতেই আমার মরণ । নইলে, স্বপ্নের ঘোরে কেন দেখতে পাব অপাপবিদ্ধ

নররূপী মহাকাল রামচন্দ্রকে ? ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে আমি নব দূর্বাদলশ্যাম রামের কাঁচ ঢল ঢল মুখখানা দেখি। কি গভীর মায়া তার নীল নবঘন আঁখির ছায়ায়। দেখলে তাপ জুড়িয়ে যায়। মন শান্ত হয়। নিজের মনে পাগলের মত তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি ঃ

মরণরে,

তুঁহু মম নবদূর্বাদলশ্যাম সমান
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।

তাড়কার কণ্ঠস্বর তীব্র তীক্ষ্ন যন্ত্রণার ঝংকারে বাজতে লাগল। মনে হল বুকের অনেক নীচ থেকে গুর গুর করে উঠে আসছে একটা কান্না। আর তাকে চাপা দিতে গিয়ে জীবনের এক অমোঘ সত্যের কাছে নিজেকে নিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার কণ্ঠে। নিজেকে আর সামলাতে পারল না তাড়কা। বদ্ধ উম্মাদিনীর মত এক তীব্র অসহায়তায় সে ভেঙ্গে পড়ল। দুহাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

মারীচ বিস্ময়ে স্তব্ধ। জননীকে সে কখনও এত চঞ্চল, এত অস্থির আর অশান্ত হতে দেখেনি। এমনকি পিতার মৃত্যুতেও নয়। তাড়কার বুকের ভেতর যেন বেদনার সমুদ্র হঠাৎ উথাল পাথাল করে উঠল। তাড়কার কান্নায় তার নিজের বুকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। পরম আদরে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ভেজা গলায় বলল, মা-গো, এত উতলা হচ্ছ কেন ?

আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে তাড়কার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। বিভ্রান্ত চোখে মারীচের দিকে তাকাল। তখনও নিজের চিন্তায় বিমর্ষ সে। নিজের মৃত্যুর ভাবনায় বিচলিত। চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ঃ রামের হাতে আমার মরণ। কয়েক মুহূর্ত থেমে কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল ঃ বিশ্বামিত্র আমার সেই মৃত্যুর পরোয়ানা আনতে গেছে অযোধ্যায়। আমার মৃত্যু দূত আসবে সোনার রথে চড়ে। খুব শীগ্‌গীরিই আসবে।

—না, না ওসব কথা বল না মা। সভয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠল মারীচ। কয়েকমুহূর্ত তাড়কার নিটোল গোল মুখখানার দিকে বিভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল ঃ অযোধ্যার সব কথা জানলে কখনও ওই সব অসার চিন্তা মাথায় আসত না। রাবণের বিরুদ্ধাচরণের কোন ইচ্ছাই দশরথের নেই। অথচ, পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসদের বিবাদ সংঘর্ষ লেগেই থাকবে। এ নাকি রামচন্দ্রের বিধি-লিপি। তাই স্নেহময় পিতা দশরথ রামের ভাগ্যলিপি বানচাল করতে তাঁর সব স্নেহমমতা উজার করে দিয়ে তাকে নিবিড় স্নেহপাশে বন্দী করেছেন। এই মায়া-মোহে রামচন্দ্রর সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন। কিছুতেই এই বন্ধন তার কাটবে না আর।

রামের আনুগত্য ও বাধ্যতায় দশরথ খুশি। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজেই রাম উৎসাহ বোধ করবে না। পিতাই তার জীবনের বড় গুরু। পিতা ছাড়া অন্য কিছু জানে না সে। দশরথেরও রাম সব। রাম বিহনে দশরথ একটি মুহূর্ত বাঁচবে না। •তার অদর্শন তাঁর কাছে দুঃসহ এবং ক্লান্তিকর। একটি দিনও রামকে ছেড়ে কখনও থাকেনি। তাই'ত বলছি রামের অযোধ্যা ছাড়া অসম্ভব। আবার রামের সঙ্গে দশরথকে নিয়ে তপোবনে প্রবেশের পথ বন্ধ। দশরথের উপস্থিতি একটা রাজনৈতিক রূপ নেবে। লড়াইটা তখন রাবণ আর দশরথে হবে। বিশ্বামিত্র প্রাজ্ঞ নেতা হয়ে এই রাজনৈতিক ভুল কখনও করবে না।

কথার মধ্যে অবাকস্বরে তাড়কা প্রশ্ন করল : তপোবনে রাম একা এলে, তার দোষ হবে না কেন ?

মারীচ শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল : ষোল বছরের তরুণ রামের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই। সে রাজা নয়, রাজপুত্র মাত্র। যুদ্ধ অভিলাষ নিয়েও তপোবনে আসছে না সে। বিশ্বামিত্রর বিশ্বাস, তাড়কার মৃত্যুর জন্যে তার পদার্পণই যথেষ্ট।

তাড়কার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। বিবর্ণ ভয়ে এবং আতঙ্কে তার চোখের দীপ্তি নিভে গিয়ে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়—তা-হলে ? উপায়।

জননীর উৎকর্ণ বিবর্ণ গোল মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে বলল : রাম পিতার অত্যন্ত অনুগত ও বাধ্য• পিতা ছাড়া আর কাউকে জানে না সে। পিতাকে মান্য করে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না। জননীর কষ্ট দুঃখ জেনেও পিতার কাছে জননীর হয়ে কখনও কোন আবেদন করেনি। তাড়কার তেজ, সাহস, বিক্রম, অত্যাচারের বিপক্ষে দশরথ রামকে কখনও পাঠাবে না। ঋষির ভয়ংকর ক্রোধেও স্নেহময় পিতার সংকল্প ভ্রষ্ট করতে পারবে না। তাই রামের তপোবনে আগমন একটা অবাস্তব চিন্তা।

বিধিলিপি মিথ্যে হয়ে যাবে ? অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল তাড়কা।

একটা চাপা হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারীচের মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল : বিধিলিপি বলে কিছু নেই। তবে কথাটার একটা দুরন্ত আকর্ষণ আছে। চতুর লোকেরা একে নিয়ে যাদুর খেলা দেখাতে পারে। লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্যে চতুরলোক ঢিলের মত কথাটাকে ছোঁড়ে। জলের উপর ঢিল ছুঁড়লে, ঢিলটা যেমন নিঃশব্দে তলদেশে পেঁছানোর দ্রুততম পথ বেছে নেয়, তেমনি বিধিলিপি কথাটা মানুষকে মৃত্যুর গহ্বরে পেঁছে দেয়। বিশ্বামিত্র তোমাকে সেই ছলপলায় বিভ্রান্ত করেছে। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।

॥ পাঁচ ॥

রথ চলেছে উদ্দাম গতিতে। তবু চৈত্রের আকাশ থেকে সব রোদটুকু মুছে গেছে। সামান্য আভা পর্যন্ত নেই। থালার মত গোল চাঁদ পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। সবুজ গাছের পাতায় পাতায় রুপোর পাতের মত ঝকমক করছে জ্যোৎস্না। কাছে দূরে যতদূর চোখ যায় মাঠ নদী গাছপালা বনভূমি শুভ্র আলোয় উদ্ভাসিত।

সীতার মুখের উপর পড়েছে তার স্নিগ্ধ আলো। সীতার চোখে চোখ রাখল রামচন্দ্র। রথের দারুনির্মিত অলংকৃত আচ্ছাদনীর জন্যে সব কটি মুখের উপর ছায়া পড়েছিল। তবু সব কটি মুখ চোখ যে তার দিকে সাগ্রহে চেয়েছিল বুঝতে কষ্ট হল না রামচন্দ্রের।

ছুটন্ত রথের ধারাল বাতাস তার মুখে লাগছিল। প্রান্তরে বড় বড় তৃণের উপর দিয়ে তার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। হিমমিশ্রিত হাওয়ায় মন স্নিগ্ধ হল। সীতার শরীরের কোমল স্পর্শ চুলের গন্ধ, শরীর এবং নিঃশ্বাসের মিশ্রিত গন্ধ রামচন্দ্রের স্নায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে চুঁইয়ে পড়ছিল এক অভূতপূর্ব ঝংকারে। অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে দেহ মন ভরে উঠল। তৎক্ষনাৎ কিছু একটা করতে গিয়েও থমকে গেল। জীবন নয় কর্তব্যের কঠিন অনুশাসনে রাম নিজেকে সংযত করল। সীতার নরম হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুপ করে প্রকৃতি দেখতে লাগল!

ঝিঁঝি ডাকছে বনের ভেতর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে খোলা প্রান্তরে জোনাকি জ্বলতে লাগল। থেকে থেকে আসতে লাগল পাখির ডানা ঝাপটের শব্দ। ঝাউর সাঁ সাঁ শব্দ। কালো অন্ধকারের বুকে জ্যোৎস্নার সমুদ্র যেন পৃথিবীকে অনির্বচনীয় সুষমায় রূপময়ী করে তুলল। সেই দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামচন্দ্রের উৎকর্ণ মুখেচোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা স্বপ্নালুতা সৃষ্টি হল। নিজের অতীতের মধ্যে অবগাহন করে। চোখের চাহনি স্মৃতিতে নিবিড় হল। বিস্মৃত জীবন অধ্যায়ের অনুদ্ঘাটিত রহস্য একটু একটু করে গল্পের মত বলতে লাগল।

লণ্ডভণ্ড কিংখাপ বিছানো মস্ত শয্যায় দশরথ কনুইতে ভর দিয়ে বাম হাতের উপর মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে শুয়েছিল। কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতায় তার দেহ অবসন্ন, মুখ ম্লান, চোখ দুটি শ্রান্ত এবং কাতর। দৃষ্টি শূন্য। মাথার অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশগুলি হাওয়ায় এলোমেলোভাবে উড়ছিল। কখনো-বা উড়ে চোখে মুখে পড়ছিল। মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল।

ঘরে ঢুকে দশরথকে এরকম একটা অবস্থায় দেখতে হবে রামচন্দ্র স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। দৃশ্যটা দেখে শিহরিত হয়েছিল।

দশরথ কেমন একটা অদ্ভুত বোবা ভাব নিয়ে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল।

দু'জনের কেউ কথা বলছিল না। যদিও ভিতরে ভিতরে তাদের অস্বস্তি [illegible]লভাবে নাড়া খাচ্ছিল। তাদের ভাবনা চিন্তা কিছুক্ষণের জন্যে থমকে ছিল।

দ্বারের মুখে রামচন্দ্র অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হাওয়ায় তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল উড়ছিল। দশরথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। রামচন্দ্র দেখতে পেল পিতার চোখের তারায় উপছে পড়া খুসি, খুসি ভাবের সঙ্গে একটা কষ্ট ও বেদনা মিশে আছে।

কয়েকমুহূর্তের সংজ্ঞাহীনতা কাটিয়ে উঠল রামচন্দ্র। এক অফুরন্ত কৌতূহল তাকে ভিতরে ভিতরে সাহস দিল। মধুর স্বরে প্রশ্ন করল ঃ পিতা! তোমাকে এত অশান্ত দেখিনি কখনো? রামের কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

পুত্রের জিজ্ঞাসায় দশরথের ভুরু কুঁচকে গেল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকের ভেতর প্রগাঢ় যন্ত্রণা খামচে ধরল। কষ্ট দমন করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর সহসা স্খলিত হল। ভয়চকিত আর্ত্তি নাভির কাছ থেকে উঠে এল গলায়। বলল ঃ না, না, পুত্র, আমি পারব না।

দিশাহারা চোখে রামচন্দ্র তাকাল দশরথের দিকে। তাকে নিয়ে পিতার সবসময় একটা উদ্বেগ আছে। এই উৎকণ্ঠার রহস্য কোথায় সে জানে না। পিতাকে আশংকার গ্রস্ত হতে দেখে তার ভীষণ কষ্ট হল। কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করল। মায়া হল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দশরথের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল। ঠিক হাসি নয়, বিষণ্ণ হাসির ভাব ফুটল অধরে। বলল ঃ পিতা ঘরে একলা বসে রাতদিন ভাবছ কি? কার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে তোমার হৃদয়? তোমার কষ্ট কি? দুশ্চিন্তাই বা কি, আমায় খুলে বল।

দশরথ উঠে দাঁড়াল। রামচন্দ্রের দু'বাহু ধরে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে আকুল কণ্ঠে বলল ঃ বাবা রাম, সব কথা খুলে বলার আগে আমাকে ছুঁয়ে শপথ কর বল ; অযোধ্যা ছেড়ে যাবি না, আমার কাছে থাকবি।

কথাটা বিঁধল তাকে। একটু দ্বিধায় পড়ল। ষোল বছর বয়স হলেও রামচন্দ্র নিজস্ব মেধা দিয়ে বুঝতে পারল পিতা তার বাধ্যতার সুযোগ নিয়ে কোন কিছুর জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করছে তাকে। অথচ সব না শুনে পিতার কথায় অঙ্গীকার করে কেমন করে? নিজের অনিচ্ছার কথাটাও মুখের উপর স্পষ্ট বলতেও কষ্ট হল তার। কিন্তু একটা গভীর প্রত্যাশা নিয়ে পিতা তার দিকে তাকিয়ে রইল। ষোল বছরের পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের পক্ষে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল হল। একটা দুর্বল ভাবাবেগে তার চিত্ত ক্লিষ্ট হতে লাগল।

রামচন্দ্র নিরুত্তর।

দশরথের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতাশ গলায় আর্তনাদের মত ডাকল ঃ রাম !

রামচন্দ্র খুব শান্তভাবে দশরথের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে বলল ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর, পিতার গর্ব ও গৌরব, মহত্ত্ব ও ত্যাগের কোন ক্ষতি হবে আমায় দিয়ে?

ন[illegible]ত্র।

তা-হলে তোমার মনে আশঙ্কা কেন? তোমার যশ গর্ব গৌরব বাড়িয়ে তোলার জন্য যা যা করলে ভাল হয় আমি সব করব। আমার জীবন দিয়ে অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরব রক্ষা করব।

রামের কথায় দশরথ চমকাল। কেমন একটা অস্বস্তি জাগল তার ভিতরে। বিস্ময়ে রামের দিকে তাকিয়ে রইল। হতাশভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। অনেকক্ষণবাদে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধীর স্বরে বলল: রাম, আমি যে কিরকম সংকটে আছি তা যদি একবারটি তোমাকে জানাতে পারতাম।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল দশরথ। তারপর শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলল: আসলে ঋষি বিশ্বামিত্রর আকস্মিক আগমন আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। আমি দ'দণ্ড স্বস্তিতে থাকতে পারছি না। আমার মন বলছে এর ভেতর একটা বড় গণ্ডগোল কিছু আছে। বাতাসের গন্ধে বিশ্বামিত্রর উদ্দেশ্য ছড়ানো। পিতার মন নিয়ে বুঝতে পারছি আমার ঘরের সব ওলোট পালোট করে দিতেই বিশ্বামিত্র এসেছে।

রামচন্দ্র অবাক হল। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে পিতাকে দেখল। তারপর মৃদুস্বরে বলল: পিতা, বিশ্বামিত্র ঋষি। তাঁকে তোমার ভয় কেন? সে তোমার সিংহাসন কিংবা রাজক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তোমার সঙ্গে শত্রুতাও নেই। তাহলে অনর্থক দুশ্চিন্তা কেন?

দশরথ ফাঁপড়ে পড়ল। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে অস্ফুট স্বরে ডাকল: পুত্র!

পিতা, শুনেছি একদিন তিনিও মহীপতি ছিলেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য ছেড়ে যিনি ঋষির মত জীবনযাপন করতে পারেন, তাঁর দ্বারা কখনও ছোট কাজ হয় না।

দশরথের অধর মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হল। গম্ভীর ঘুম ঘুম চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল: তোমার অনুমান যথার্থ। তাঁর ত্যাগের কোন উপমা নেই। তিনি মহাপ্রাণ বলেই এক মহৎ কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বোধ হয় তার গুণগারি আমাকে দিতে হবে। তার হাত থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই। কথাগুলো দশরথ বিষণ্ণ হয়ে বলল।

রামচন্দ্র পিতার দিকে চেয়ে সকৌতুকে বলল: তাহলে তাঁকে ভয় পাচ্ছ কেন?

দশরথের ফাঁদে পড়া পাখীর মত অসহায় অবস্থা তার। বেশ কিছুক্ষণ গভীর একদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চেয়ে স্নেহভরে বলল: ঠিক ভয় নয়, দুর্বলতা।

দুর্বলতা মহারাজকে মানায় না।

পুত্র, আগে আমি স্নেহবৎসল পিতা, তারপর অযোধ্যার রাজা।

দশরথের মুখেতে এমনিতে একটা কষ্টের ছাপ লেগেছিল। মুহূর্তে তা কত গভীর মায়ায় ছলছলে আর করুণ হয়ে উঠল। সহসা বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস নামল। চকিতে একখানা হাত এগিয়ে এসে রামচন্দ্রের মাথা স্পর্শ করল। ভারী কোমল স্নেহের সে হাত। সে হাতের ছোঁয়া পেয়ে রামচন্দ্র এক অন্য মানুষ হয়ে উঠল। সজল সুন্দর দীর্ঘ আয়ত দুই চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে দশরথের দিকে চেয়ে ডাকল: পিতা!

পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজল দশরথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ধীর স্বরে বলল : তোমার জন্যে আমার চিন্তা হয়। বিশাল পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাই তোমার সম্পর্কে আমি বিশেষ সাবধান। আমার স্নেহ, আদর সতর্কতা তোমাকে ঘিরে।

রামচন্দ্র খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীচু ও অদ্ভুত গলায় বলল : জানি পিতা।

দশরথ তার মায়াবী চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব রামকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। চোখ দুটিতে গভীর মায়া জড়ানো। একবার তাকালে আঠার মত লেপ্টে থাকে, আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। রামচন্দ্রেরই ইচ্ছা হচ্ছিল না পিতার নয়ন মণি থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে। সে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকল।

দশরথের ভুরু কিছু কুঞ্চিত। মুখে যথাযথ উদ্বেগ। কণ্ঠস্বরে কেমন একটা আচ্ছন্নতা। বৎস, আজ আমার মন ভীষণ অশান্ত অস্থির। তোমাকে আমার মনের অবস্থা বোঝাতে পারব না। আমার হৃদয়ের মধ্যে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছে! আমি সইতে পারছি না। বিশ্বামিত্র দস্যুর মত আমার হৃদয়রাজ্য থেকে তোমাকে লুট করতে এসেছে। তার স্পর্ধা আমি সইব না। আমি তাকে হত্যা করব।

দশরথের ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় রামচন্দ্র বিচলিত হল। তার উদ্বেগ দুশ্চিন্তা বাড়ল। মুখে চোখে বিহ্বল ভাব। একটু অবাক হয়ে বলল : পিতা, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, তোমার অনিষ্ট করা ঋষিবরের উদ্দেশ্য?

পুত্র, বিশ্বামিত্র রাজরক্ত চায়। রাজরক্ত ছাড়া তার যজ্ঞ হবে না। তোমাকে ও লক্ষ্মণকে সেজন্যেই দরকার তার। কিন্তু তোমাদের ছেড়ে আমি কাকে নিয়ে থাকব? এমনিতে আমি কত নিঃসঙ্গ, কত একা। এই পুরীতে। নিজের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করছি। আমার সেই আত্মক্ষয়কারী সংগ্রামে ভীষণ ক্লান্ত আমি। তোমার বিচ্ছেদ আমি সইতে পারি না। বেশ বুঝতে পারি আমার জীবনের একপিঠে তুমি, একপিঠে মরণ।

দশরথের বাক্যে রামচন্দ্র সম্মোহিত। স্তব্ধ। নির্বাক। সেই মুহূর্ত্তে বুক ভাসিয়ে এল অপার শ্রদ্ধা, করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা। কিন্তু আবেগটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বিদ্যুৎ চমকের মত একটা তীব্র অতৃপ্তি তাকে ব্যাকুল করে তুলল। আস্তে আস্তে বলল : পিতার স্নেহ ভালবাসা পাওয়ার ভেতর একটা সুখ আছে। কিন্তু তা চিরকাল মানুষকে তৃপ্ত করে কি? পূর্ণতা দেয়? বিশাল সাম্রাজ্য অতুল ঐশ্বর্যর অধীশ্বর হয়েও বিশ্বামিত্র সুখ পেল না কেন? সাধারণ ঋষির মত জীবন কাটাল না কেন? কোন্ অতৃপ্তি নিয়ে তিনি চলেছেন অনন্তের অভিমুখে? আচার্য বিশ্বামিত্র নিজের পথে যাত্রা করেছেন। আর্যাবর্তের মশালচী তাঁর যাত্রাপথের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর করে যদি আমাকে পেতে চায়, তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে? জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্য পাওয়া'ত ভাগ্যের কথা। পিতা হয়ে আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করে তোমার কি কোন সুখ বাড়বে?

রামের কথা শুনে দশরথের মুখ সাদা হয়ে গেল। তার সংকল্প কঠিন মুখে স্থির সিদ্ধান্তের রেখা পাঠ করেন দশরথ। আশ্চর্য হল, রামচন্দ্রের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ তার নিজের পথে নিজের নিয়মে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার সাধ্য কি তাকে বাধা দেয়? দশরথ বহুক্ষণ নীরবে বসে রইল। রামচন্দ্র নিশ্চল পাথরের মত তার চোখের উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, রাতের আকাশে তারার দল সরে সরে নতুন দৃশ্যপট রচনা করছে। এক সময় ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দশরথ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত স্বরে বলল: তোমার মুখ থেকে এ ধরণের কথা আমাকে কোনদিন শুনতে হবে ভাবিনি। আর যেন শুনতে না পাই।

তারপর, দশরথ আর সেখানে দাঁড়াল না। রুষ্ট হয়ে কক্ষত্যাগ করে চলে গেল।

সেদিন সারা রাত ঘুমোয়নি রাম। দশরথের করুণ ছলছল মুখখানি শুধু স্বপ্নে দেখেছে। বিচ্ছেদের আশংকায় পিতার অন্তরের উদ্বেগ ও কষ্ট তাকে এক প্রবল সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পিতার প্রতি তার একটি ভালবাসা এবং সমবেদনা জেগেছিল বুকে। পিতাকে ত্যাগ করা কিংবা ছেড়ে থাকা সেই মুহূর্তে অত্যন্ত দুঃসহ এবং অসম্ভব মনে হয়েছিল। পিতা নেই, এরকম একটা অনভূতি জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল অসহায়তাবোধের কষ্ট তাকে পীড়া দিচ্ছিল। একটা অপ্রতিরোধ্য কষ্টে তার শরীর মন দুই টাটাচ্ছিল।

বিছানায় শুয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, সত্যি কি, দশরথের সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে বিশ্বামিত্র দস্যুর মত হানা দিতে এসেছে? বিশ্বামিত্রর কোন কাজই পিতার খারাপ মনে হয়নি। তবু পিতা তাকে শত্রুর চোখে দেখছে—কেন? বিশ্বামিত্রর সঙ্গে পিতার কোন শত্রুতা নেই, কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না মনে। তাহলে বিশ্বামিত্রকে ভয় পাওয়ার কি আছে? মহাযজ্ঞের বোধন করতে বিশ্বামিত্রর রাজরক্তেরই বা দরকার কেন? এই বিশেষ শব্দটি নিশ্চয়ই গূঢ় রহস্যের কোন সংকেত। কিন্তু তার সাংকেতিক অর্থটা কি?

নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে বারংবার তার মনে হয়েছিল, লোকে তাকে অবতার বলে কেন? একজন সাধারণ মানুষ বৈ'ত কিছু নয় সে। অবতারের অসাধারণ অলৌকিক শক্তি সামর্থ্য তার কোথায়? তবু জ্ঞান হওয়া থেকেই সে শুনছে, দুঃখী মানুষের আশ্রয় ও সান্ত্বনা, দুর্গত মানুষের বন্ধু ও পরিত্রাতা অত্যাচারীর যম। অথচ এরকম রটনার মত কোন কিছু করেনি সে। কিন্তু এই রটনা লোকের চোখে সার্থক পুরুষ হয়ে জন্মানোর গৌরবে তাকে প্রত্যয়বান করেছে। বড় আদর্শের আলো আরো বড় হয়ে উঠেছে তার অন্তঃকরণ। মহান সাহসে বড় হওয়ার উদ্দীপনা হয়ে উঠেছে তার ব্যক্তিত্ব। বিশ্বামিত্রও হয়ত সবাকার সামনে তাকে আরো বড় করে তোলার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। মানে, সম্মানে, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় শুধু বড় হওয়া নয়, ত্যাগে, দুঃখে বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মহান সাহসে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে যে বড় হওয়া সেই কার্যের আহ্বান জানাতেই হয়ত তার অযোধ্যায় আসা। সারারাত ধরে এই অনুভূতিতে তার বুক টনটন করল।

অন্যমনস্কতার মধ্যে সেই পুরনো অনুভূতি রামকে নতুন করে নাড়া দিল। রামচন্দ্র যেন অবাক মুগ্ধ। আত্মবিস্মৃত রথে বসে আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন বলল কিছুক্ষণ। তারপর মুগ্ধ মন, দৃষ্টি নিয়ে সে স্মৃতিচারণা করতে লাগল।

অযোধ্যায় মন্ত্রণাকক্ষ।

স্বর্ণ সিংহাসনে দশরথ নির্বিকার। বিশ্বামিত্র ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত। মুষ্টিবন্ধ আঙ্গুলগুলো দুরন্ত আক্রোশে আর অস্থির রাগে বন্দী মুঠোর মধ্যে ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হচ্ছিল। আর, বোকা বোকা চোখ মেলে সেই দৃশ্য দেখছিল সে।

বিশ্বামিত্র দশরথকে চুপ করে থাকতে দেখে রুক্ষ গলায় বলল ঃ মহারাজ! আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। সেজন্যে আমার বক্তব্য পরিস্কার করে বলতে চাই। নিজের কর্ত্তব্যে আপনি উদাসীন। সংগ্রাম করে দুটো রাজ্য জয় করে কৃতিত্ব অর্জন করা যায়, কিন্তু তাতে দেশের লোকের কোন কল্যাণ কিংবা মঙ্গল হয় না। সাধারণ মানুষকে প্রতিমুহূর্ত্ত লড়তে হয় তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। কিন্তু রাক্ষসের উপদ্রবে তাদের সংগ্রামদীপ্ত জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। এ সব জেনেও আপনি নির্বিকার। প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করেননি। আপনার দুর্বলতায় তাদের দৌরাত্ম্য আরো প্রশ্রয় পেয়েছে। নীরবতা তাদের সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। তাই দুর্বৃত্তেরা নির্ভয়ে মুনি ঋষিদের আশ্রমের উপর হামলা করছে। তপোবনের শান্তি ও পবিত্রতা বিঘ্ন করছে। ঋষির তপোবনকে উপহাস করছে। ঋষির সম্ভ্রমের মর্যাদাহানি করাই তাদের সুখ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আর্যাবর্তের ছোট বড় কোন নৃপতি আমাদের পাশে দাঁড়াল না। মুনি, ঋষিরা আজ রাক্ষস শক্তি দ্বারা আক্রান্ত এবং বিপন্ন। নৃপতিদের এই অবজ্ঞা বা অবহেলার কোন কারণ বুঝি না।

দশরথ বিশ্বামিত্রর দিকে তাকাল। তার মুখ একটু গম্ভীর, কপালে চিন্তার বলিরেখাগুলো স্পষ্ট এবং গভীর। চোখের চাহনিতে ছিল নিবিড় জিজ্ঞাসার সংকেত। গম্ভীর গলায় বলল ঃ দিনকাল বদলেছে। রাক্ষস অসুর একজোট হয়ে রাবণের নেতৃত্বে আর্যাবর্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় প্রস্তুত। একথা জেনেও দক্ষিণ অযোধ্যার নরপতি অনরণ্য রাবণের স্যাম্রাজ্য সম্প্রসারণে বাধা দেবার জন্য যুদ্ধ করল। কিন্তু রাবণের বিক্রম সহ্য করার শক্তি ছিল না তার। রণক্ষেত্রে নিহত হল। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ কেউ রাবণকে পরাস্ত করতে পারেনি। এরপর আর্য-নরপতিরা কোন্ সাহসে রাবণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে?

বিশ্বামিত্র নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল ঃ জানি রাজা। আর্যাবর্তের রাজাদের সংগ্রামের সে গৌরব আর নেই। বর্ত্তমান রাজপদ হল সুখী ভোগবিলাসীর পদ। তাদের তেজ, সাহস, বিক্রম, পৌরুষ আজ অন্তর্হিত। সুরা, নারী, সিংহাসন, বিলাস ঐশ্বর্য সম্পদ ভোগের সুখ ও আরামে নিমজ্জিত। আত্মকামী, স্বার্থপর আর্য নরপতিদের কাছে ঋষিদের কোন প্রত্যাশা নেই। স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও কল্যাণের কার্যে মুনি ঋষিরা চিরদিনই নিজেদের উৎসর্গ করেছে। একদিন তাদের

আত্মত্যাগে এবং প্রচ্ছন্ন গোপন দেশসেবাতেই আর্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ঋষিরা এখনও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়নি। স্বজাতির মঙ্গলের জন্যে সাধ্যানুসারে তারা কিছু করবে। কিন্তু ঋষি বলেই অস্ত্র ধারণ করতে পারছে না। তাই, আমি সমস্ত মুনি ঋষির হয়ে চাই নতুন রক্ত, ফুটন্ত যৌবন। রাক্ষস নিধন যজ্ঞের বোধন পুজায় রাম লক্ষ্মণের মত তাজাদুটি রক্ত শতদলকে নিবেদন করব। মহারাজ আপনি শুধু অনুমতি করুন।

তৎক্ষণাৎ দশরথের একটা মুগ্ধ মুহূর্ত্ত আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠল। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকের কাছে রুদ্ধ রেখে সহসা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। অসম্ভব!

কেন রাজা?

রাম লক্ষ্মণ বালক।

তাদের সব দায়িত্ব আমার।

কিন্তু যুদ্ধে রাক্ষসদের সমকক্ষ তারা নয়। যুদ্ধের কিছুই বোঝে না তারা। সম্মুখযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোন কৌশল তারা জানে না। আপনার কোন কাজে লাগবে না তারা। তাদের অংশগ্রহণ অকারণ এক রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে। রাবণ কখনই এই ঘটনাকে তুচ্ছ করে দেখবে না। অযোধ্যার প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ বলে মনে করবে। রাবণের রোষে ছারখার হয়ে যাবে অযোধ্যা।

রাজা, মহাযজ্ঞের ঋত্বিক আমি। কি করলে ভাল হয় তার চিন্তা ভাবনা আমি করব। আপনার কোন উপদেশ চাই না। কেবল সহযোগিতা কাম্য।

উত্তম। তাই হবে।

মহান রাজা।

বিবাদ যখন রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে তখন তাদের হয়েই আমি যুদ্ধ করব। আর সে যুদ্ধে—

মাপ করবেন রাজা। আপনি এলে রাজনৈতিক সংকট আরো জটিল হয়ে উঠবে। এত জানেন, এটুকু বোঝেন না, আপনার এবং রামের মধ্যে তফাৎ অনেক। রাম বালক। রাজনৈতিক চেতনা, বিবেচনাবোধের কিছুই হয়নি তার। সে যাবে আমার সঙ্গে একা। তাতে কোন রাজকীয় সমারোহ থাকবে না। কিন্তু আপনার যাওয়া সেভাবে হবে না। রাজার মর্যাদা ও গৌরব বাড়ানোর জন্যে আপনার আগে আগে থাকবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। আপনি যুদ্ধ করলে সে হবে অন্য রাজ্য আক্রমণ। আপনার অংশ গ্রহণে হয়ে উঠবে এক প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিবাদ। এরকম কোন সংঘর্ষের ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়া আমাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত। কিন্তু রাম গেলে এর কিছুই হবে না। তাড়কা যদি তার তীরে নিহতও হয় সে হবে একটি সাধারণ ঘটনা। একজন বালকের হাতে তাড়কার মত বীরাঙ্গনার মৃত্যু ললাট লিখন ছাড়া কখনই হয় না। আর এই ঘটনা রাজনৈতিক কোন গুরুত্বও পাবে না। রাজনীতির বাইরে থেকে সংঘর্ষ করে এক বিরাট জয় আদায় করে নেয়ার জন্যেই রাম লক্ষ্মণকে আমার দরকার।

দশরথের বিরাগ ও বিরক্তি ভরা গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে একটা ভাবান্তর নেমে এল। সে একবার রামচন্দ্র আর একবার বিশ্বামিত্রের দিকে অসহায় করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। উত্তেজনায় তার মুখ অধিকতর আরক্ত। উৎকর্ণ চোখে মুখে দশরথের যন্ত্রণা এবং অস্থিরতা ভুরু কুঁচকে গেল। রুদ্ধশ্বাস গম্ভীর নিচু স্বরে বলল ঃ ঋষিবর আমি পিতা, মূঢ়ের মত দুরন্ত রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণকে বীরত্ব বলে না। পুত্রদের হঠকারিতা করার জন্যে আপনার সঙ্গে পাঠাই কোন প্রাণে? রাক্ষসেরা কুটযোদ্ধা। যুদ্ধ কালে তারা বীর্য হরণ করে।

বিশ্বামিত্র সবেগে ঘাড় তুলে তাকাল তার দিকে। চোখের কোলে এবং দৃষ্টিতে বিদ্যুতের ঝলক। বলল ঃ আপনার কথায় কোন যুক্তি নেই রাজন। তাড়কার মনের অভ্যন্তরে পতনের, এবং অবিরাম আত্মক্ষয়ের যে বিষবৃক্ষটি বপন করেছি, আজ শাখা প্রশাখায় তার আয়োজন হয়েছে বিরাট। নিজের ভার নিজেই বইতে পারছে না। শরীরী মৃত্যুটার জন্যে সে রামচন্দ্রের অপেক্ষা করছে। যা অনিবার্য তাই হয়েছে।

বিশ্বামিত্রর কথায় রামচন্দ্রের প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। তার অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল।

তীব্র আতঙ্কে শক্ত হয়ে উঠল দশরথের শরীর। তার মুখ একটা রক্তাক্ত ক্ষতের মত হল। তার চিন্তা ভাবনা বিশ্রস্ত, এলোমেলো। মস্তিষ্ককে নানাবিধ অনুভূতি আঘাত করল, হৃদয় মথিত করল। তীক্ষ্ন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হল মুখ। নিঃশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হল। স্তিমিত গলায় বলল ঃ তাড়কার বিক্রমের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি, সাহস আর্যাবর্তের বড় বড় বীরদের নেই। সেখানে দুই বালক কি করবে?

অধরে বিচিত্র হাসি বিদ্যুতের মত খেলে গেল বিশ্বামিত্রর। বেশ খানিকটা পরিতৃপ্তি নিয়ে মৃদু স্বরে বলল ঃ মহারাজ, দুই বালককে নিয়ে যে আমাদের আগামী-কালের চিন্তা ভাবনা; এ কথা আপনার চেয়ে বেশি কে জানে? তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে বলল ঃ রাজন, দিনে জীবন বড় বেশি ছড়িয়ে থাকে, সন্ধ্যা তাকে গুছিয়ে আনে। রাত্রির অন্ধকারে জীবনরহস্য ঘন হয়ে উঠে। অন্ধকারে বেশি করে তাদের কাছে পাওয়া যায়। তেমনি তাড়কার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ছড়ানো পরিকল্পনার জাল একটু একটু করে টেনে তুলতে হবে। তাড়কার মৃত্যু তুচ্ছ সামান্য ঘটনা নয়। রাবণের কুটনীতি রাজনীতির উপর তার ধাক্কা লাগবে। দেশময় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। বলাবাহুল্য, ঘটনার শেষ এখানে নয়, রাবণের মনের অভ্যন্তরে ও সংঘাতের এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। বড় বড় বীরেরা যা পারল না, একজন বালক যখন সেই কাজ পারবে তখন রাবণকে গোটা ব্যাপারটা ভাল করে পর্যালোচনা করতে হবে। রাবণের রাজনীতি কূটনীতি নির্ধারণে রামের গুরুত্ব বাড়বে। বাইরে যে আচরণ করুক রাবণ, মনের মধ্যে রাম সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া থাকবেই। এর সঙ্গে রামের নিজস্ব লাভের কথাটাও স্নেহবৎসল পিতাকে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তাড়কার মৃত্যু রামকে লোকের চোখে এক মহান আদর্শে বড় করে তুলবে। দেশে দেশে তার খ্যাতি ও গৌরব বাড়বে।

দশরথের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হল। বজ্রাহতের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে বিশ্বামিত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় তার কোন অনুভূতি ছিল না। শুকনো অধর কেবল থর থর করে কাঁপছিল। মুখে বিবর্ণ ভয় ও উৎকণ্ঠার স্পষ্ট ছাপ। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গলাটা সামান্য বিব্রত স্বরে স্বগতোক্তি করল : বিধাতা বড় রসিক ঋষিবর, তিনি শুধু দেন না নিয়েও নেন কৌশলে। আমাকেও দিতে হবে। কিন্তু রামকে আমার জীবন থেকে চলে যেতে দিতে পারি না।

বিশ্বামিত্র উৎফুল্ল হয়ে বলল : চমৎকার। রামের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যে মুনি ঋষিরা যজ্ঞ করছে।

দশরথের মুখ গম্ভীর এবং থমথমে। নিঃশব্দ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

রামচন্দ্রের বুকের ভেতর রিণ রিণ করে বাজছিল তার অলৌকিক শব্দ।

॥ ছয় ॥

বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে পদব্রজে যাত্রা করল। রাজপথ এবং লোকালয় এড়িয়ে বিশ্বামিত্র চলতে লাগল। গাছপালার ছায়ার ভেতর দিয়ে সরু পায়ের হাঁটা রাস্তা চলে গেছে বনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সেই পথ রেখা ধরেই তারা চলল।

নিঃশব্দে হাঁটছিল তারা। শ্বাপদসংকুল বনভূমিতে এক গভীর স্তব্ধতা থমথম করছিল। মৌন গম্ভীর নিশব্দর মধ্যে হাঁটতে তাদের দু ভাই'র গা ছম ছম করছিল। অথচ বিশ্বামিত্র নির্বিকার। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে উঠল তারা। ঝোপের নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে একপাল হরিণ। অবোধ বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তারা নবাগত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কি ভেবে চকিত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্যে দৌড়ে গেল। গাছপালার ফাঁকে সরযুর নীল জল তার উপর উপুড় হয়ে পড়া দূরের আকাশ, দিগন্ত নীল শৈল শ্রেণী দেখা যেতে লাগল।

বিশাল অরণ্যের শত সহস্র বৈচিত্র্য আর রহস্য রামচন্দ্রকে অভিভূত করল, কখনও ভয়ের ছাপ, কখনও একটা নিস্পৃহ উদাস, গম্ভীর মনোভাবের ছাপ। গণ্ডীবদ্ধ জীবনে এ সব গভীর করে ভাববার সুযোগ হয়নি রামচন্দ্রের। মাঝে মাঝে অরণ্যে শিকার করতে এসে উত্তেজনা আর আর আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু অরণ্যের চমক, তার ভয় লাগানো রহস্য, শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা নিজের অস্তিত্বকে নিয়ে নানা সমস্যা ভাবনা ও জিজ্ঞাসার উপলব্ধি ও অনুভূতি তার এই প্রথম।

মুগ্ধ চোখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে রামচন্দ্র বনের শোভা দেখছিল। এক একটা অতিকায় গাছ সাপের মত গায়ে গা দিয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝির ঝির

বাতাস তাদের শ্বাস হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ছে অরণ্যময়। পাতারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। রামচন্দ্রের চোখ দুটো বিস্ময়ে ছটফট করছিল। প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতর বনজ গন্ধ দুরন্ত ভয় লাগা রহস্যের ভেতর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

কতক্ষণ ধরে তারা তিনজন ছায়ার মত পাশাপাশি আদিম অরণ্য ভূমিতে নিঃশব্দ পায়ে চলছিল জানে না। বিশ্বামিত্রর আহ্বানে অকস্মাৎ তার ঘোর কাটল। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ গম্ভীর। বৎস, রামচন্দ্র আমরা সরযূ নদীর দক্ষিণভাগে এসে পড়েছি। তোমরা সরযূর জলে স্নান করে দেহ স্নিগ্ধ কর।

স্নানে দেহ শীতল হল। শরীরের গ্লানি ও ক্লান্তি কিছুটা কাটল। লক্ষ্মণ শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায়।

অপরাহ্নের রোদ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পুণ্যের আলোর মত ঝড়ে পড়ল বিশ্বামিত্রর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের উপর। আর তাতেই তার শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত মুখের চারিদিকে জ্যোতির্শিখার মত একটা দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য ফুটে বেরোতে লাগল। সেই অপার্থিব অলৌকিক দিব্যকান্তির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রাম।

সম্মুখে তার শান্ত নদী, নীল ও গভীর আকাশ, দিগবলয়ে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, সূর্যের আলো, সব মিলিয়ে এক অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ।

বিশ্বামিত্রর মুখে মৃদু হাসির আভাস। এক গম্ভীর প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেছে তার চেতনা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিশ্বামিত্র নিজের মনে বলল ঃ রাম, একটু পরেই আমরা কোশল জনপদের সীমা ছেড়ে যাব। যাওয়ার আগে এই মাটিতে বসে এক অঙ্গীকার করতে হবে তোমাকে। জননীরূপা সরযূ সাক্ষী থাক তোমার অঙ্গীকারের।

সম্মোহিতের মত রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের দিকে তাকাল। অনুভূতি সমূহ তখন অতি তীব্র আলো অন্ধকারে নিকষ এবং ঝলকানো যা অনেকটা দ্রুত প্রবহমান স্রোতস্বিনী সরযূর জলধারার মত চঞ্চল, মৌন এবং কলকলিয়ে বাজল। অস্ফুট স্বরে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কথাগুলো হুবহু পাঠ করল। বলল ঃ যারা এই নদী বেষ্টিত দেশের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির অন্তরায় তারা আমার শত্রু। শত্রুকে বধ, করব, সন্ধি করব না। দেশ ও জাতির মুক্তির জন্যে সরযূর জলে উৎসর্গ করলাম আমার ব্যক্তিগত সুখ, আরাম, বিলাস। এখন থেকে অধঃপতিত আর্য জাতির গৌরব পুনরুদ্ধার করাই আমার জীবন ব্রত। রাক্ষস, অসুর নির্মূল করে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব আমি। রাক্ষস বধ আমার রাতের স্বপ্ন, দিনের ধ্যান! এই শপথ বর্ণে বর্ণে পালন করব।

কথাগুলো উচ্চারণের সময় সে টের পাচ্ছিল শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। উদভ্রান্ত উত্তেজনায় তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল। বারবার শিহরিত হচ্ছিল সর্বাঙ্গ। দিশাহারা আনন্দে, গর্বে তার হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল এক দামামা।

রোমহর্ষ, রহস্যময় এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে রইল রামচন্দ্রের চেতনা।

আত্মোৎসর্গের আবেগ তার তারুণ্যকে বিশিষ্ট করে তুলল। বিশ্বামিত্র অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে রামের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং আস্তে আস্তে তার ঠোঁটের কোণে এক তৃপ্ত প্রশান্ত হাসি ফুটল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল: বৎস রামচন্দ্র, ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষী মহর্ষি নিশাকর দেশকাল পরিস্থিতি এবং তোমার জন্ম নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে দেখেছেন, তুমি কালপ্রেরিত, মানুষের মুক্তিদূত। সময়ের অগ্নিগর্ভে তোমার জন্ম। কালচক্রের নিয়মে ধ্বংসোন্মুখ আর্যজাতির পরিত্রাণের জন্যে তোমার আবির্ভাব। তোমার মধ্যে মহাকালের ক্রোধ শক্তি সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন। মহামায়ায় তুমি ভুলে আছ। তোমার ব্যক্তিত্ব গঠনের কোন চেষ্টাই অযোধ্যা করেনি। তাই, তোমার মনের জানলার কপাট খুলে বাইরে উদার মুক্ত, আলো হাওয়ার পথটুকুকে অবারিত করে দেয়াই আমার কাজ। তোমার ধারণার বাইরেও আছে এক অচেনা পৃথিবী, অজানা মানুষ, অদ্ভুত চরিত্রের লোকজন। তাদের ভাল করে চেন না তুমি। অথচ এই সব মানুষের দুঃখ, কষ্ট, আর্ত্তি, যন্ত্রণা, বেদনার অনুভূতি না থাকলে মহাপ্রাণ হওয়া যায় না। দুনিয়াকে দেখতে, মাটি ও মানুষের নিবিড় সংস্পর্শ লাভের জন্যে তোমায় এই নির্জন অরণ্যের মধ্যে টেনে এনেছি। কেন জান? ভারত নৃপতিদের মধ্যে মহারাজ দশরথের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। তাঁর মত বিখ্যাত প্রভাবশালী নৃপতির পুত্র হওয়া বিড়ম্বনা। পিতার কৃতিত্বের পাশে পুত্রের তেজ বিক্রম যদি দ্বিগুণিত না হয় তা হলে তার কোন প্রভাব পড়ে না লোকের মনে। প্রদীপ শিখার মত মিট মিট করে তার ব্যক্তিত্ব। নিজের ভেতর সত্যিকারের যদি কোন প্রতিভা, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, তেজ, বিক্রম থাকে তা পিতার জন্যে স্বীকৃতি পায় না। লোকেও আমল দেয় না তার স্বকীয় শক্তিকে। সবই পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়। তাই, পিতার সান্নিধ্য থেকে, রাজকীয় পরিবেশ থেকে তোমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও আলাদা করে তোমার শিক্ষা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করব। তোমার নিজের পথে, নিজের মতো করে গড়ে উঠবে তোমার ব্যক্তিত্ব, মন, ক্ষমতা, প্রতিভা। কিন্তু পিতার স্নেহচ্ছায়ায় তোমার সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক পিতাই তার নিজের প্রভাব খাটিয়ে সন্তানকে নিজের মত করে গড়ে। অযোধ্যায় থাকলে তুমি বড়জোর দ্বিতীয় দশরথ হতে পারতে, কিন্তু রামচন্দ্র হতে পারতে না। আর্যাবর্তে ওরকম হাজার দশরথ এসেছে গেছে, কিন্তু সর্বস্তরের মানুষের মনে তারা কেউ ছাপ এঁকে যায় নি। এটাই বিস্ময়! মহাকালের সেই বিস্ময় তোমাকে দিয়ে করব আমি। যুগান্তেও শেষ হবে না তোমার নামের কীর্ত্তি। তোমার বিশাল কীর্ত্তির পাশে লুব্ধকের মত আমিও থাকব চিরকাল।

বিশ্বামিত্রের কথাগুলো রামচন্দ্রের কিশোর প্রাণে এক আনন্দ ও বিশ্বাসের গাঢ়তায় দাগ কাটল। বিস্ময়ের ঝংকারে বাজতে লাগল তার কানে। পিপাসিত অনুভূতির প্রতি রন্ধ্রে অনুভব করল তার শরীরের রক্তস্রোতে কি যেন উষ্ণ প্রস্রবণের মত গড়িয়ে পড়ছে। তার সুখকর আবেশে রামের দু'চোখ বুজে এল। মনে হল, এক ঝলক আলোয় যেন উদ্ভাসিত হল তার অতীত ও ভবিষ্যৎ। জ্ঞান হওয়া থেকে যা শুনে

আসছে এতদিনে তার অজ্ঞাত রহস্য যেন কিছুটা উন্মোচিত হল। তার আত্মা এতকাল যে গুহায় লুকিয়ে ছিল তা অবারিত হয়ে গেল। সুখকর মুক্তির স্বাদ উপভোগ করল। এই মুহূর্তে মুক্ত অরণ্যে তার চিত্ত উল্লসিত হয়ে উঠল। এক দীর্ঘ নিশ্বাসে সে নিজের এই মুক্তির আনন্দ প্রকাশ করল। প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল ঃ আচার্য।

কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাল বিশ্বামিত্র। রামের মনের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেল। নিজের মনে ভাবল, এই নির্জনতায় তার জয় নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নি। তার নিস্তেজ চোখের গভীরতা দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। আত্মগত চিন্তার মধ্যে তার উদাস অন্যমনস্ক স্বর শোনা গেল। সেই স্বর ভ্রমর গুঞ্জনের মত, একটা অতি স্তিমিত গুরু গুরু শব্দের সংমিশ্রণে তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হল। বৎস রামচন্দ্র, নিজের গৌরবের ও আনন্দের দর্শক হতে মানুষ ভালবাসে। এটা তার স্বভাবের অন্তর্গত। সকলের চোখে অভিনব গৌরবে নিজেকে উদ্ভাসিত করে তুলে নায়ক হওয়া কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তার ভেতর শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ কিছু নেই। শ্রেষ্ঠত্ব জিনিসটা অনেক বড় অনেক বেশি মূল্যবান। তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। এক মহান সংকল্পে যোগদান করার আগে তোমাকেও মনে রাখতে হবে, যারা আদর্শের এবং সত্যের পূজা করে তাদের গায়ে কিছু কলঙ্ক লাগে। সে কলঙ্ক তাদের গৌরবের। চাঁদ শুভ্র, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক নয়। কলঙ্কই চাঁদের গৌরব। যা দিয়ে সে রূপের ঔদ্ধত্যকে প্রকাশ করে।

বিশ্বামিত্রের কথার তাৎপর্য না বুঝে রাম এক অপরিসীম ঘৃণায় রাক্ষসদের কথা ভাবল। এই ভাবনার মধ্যে একটা উন্মাদনা পেল। ঘৃণ্য কোন অসৎ স্বভাবের মানুষ সম্পর্কে যে অনুভূতি হয় সেই অনুভূতি নিয়ে রাক্ষস অসুরদের দেখল এবং ঘৃণা করল। এলোমেলো চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব তার রক্তে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ মহাত্মন্, যাত্রার সময় পিতা আমাকে আদেশ দিয়েছিল, আপনার সমস্ত আজ্ঞা বিনা তর্কে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে। পিতার সে আদেশ কোন অবস্থাতে আমি অমান্য করব না।

অনেকগুলো ঋতু বিশ্বামিত্রর আশ্রমে রামচন্দ্রের কাটল। এখানে পা দেয়ার সঙ্গে তার নবজন্ম হল। পৃথিবী যেন নতুনরূপে ধরা দিল তার চোখে। প্রতিদিন নতুন নতুন বিস্ময়ে তার দুই চোখ অভিভূত। পাহাড় ও বনের মাথার উপর দিয়ে সূর্য উঠে. কাস্তের মত বাকা চাঁদ আকাশের নীলিমায় নৌকার মত ভেসে চলে। আকাশের চন্দ্র তারা কত সুন্দর। ঘুরে ঘুরে দেখল, অরণ্যের গাছ গাছালি, ঝরণা, স্রোতস্বতী, ভোরের সবুজ ঝোপঝাড়ের উপর শিশির মুক্তার ঝলমলানি, দূরে অস্পষ্ট নীল পাহাড়ের তরঙ্গ। শিশুর মত প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করার মন নিয়ে দেখল, পৃথিবীর কত অপরূপ। কোথাও প্রখর রোদ জ্বলন্ত আগুণ ছিটোয়। কোথাও অরণ্য বিতরণ করে স্নিগ্ধ ছায়া। ধাত্রীর মত জীবকুলকে আশ্রয়, বাসস্থান এবং আহার যোগাচ্ছে আবার আনন্দ ও সুখ দিচ্ছে। গাছের ডালে বানরের দল লাফালাফি করছে, পাখিরা কিচির মিচির করে

তাদের উৎসাহিত করছে।. বনে ভ্রমণ করতে করতে রাম আরো দেখল বন্য একটি জন্তুর মা'র পেছনে পেছনে তার ছানাও ছুটে চলেছে। আবার কখনও বা মমতা উজার করে দিয়ে জন্তুর মা তার ছানাকে স্তন্য পান করাচ্ছে। আর একটা নিবিড় সুখের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে তার সমস্ত চেতনা। গাছের কোটরে লুকোন ছানাকে সাপের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্যে পক্ষী মা তীক্ষ্ম চঞ্চু আর নখর দিয়ে আক্রমণ রচনা করে শত্রুকে বাধা দিচ্ছে। সাপের ক্ষত বিক্ষত শরীরে আক্রমণকারীর জিঘাংসা ও দীপ্ত শক্তির স্বাক্ষর। হ্রদের জলে একটা ক্ষুধার্ত বোয়াল হন্যে হয়ে তাড়া করে চলেছে—ছোট ছোট ভয়ার্ত্ত মাছের ঝাঁক ছুটে পালাচ্ছে প্রাণের মায়ায়। কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে তাদের দেহের আঁশ চিক চিক করে উঠছে। আর আক্রমণকারীর অব্যাহত আক্রমণের মুখে বিভ্রান্ত এবং অসহায় হয়ে পড়েছে পলায়মান মাছের ঝাঁক।

অনেকদিন ধরে এ সব দেখল। অনেক কিছু শিখল। নিজেই উপলব্ধি করল : বাইরের কারো নির্দেশে শেখা হয় না, অন্তরের আহ্বানে শিক্ষা সম্পন্ন হয়। জীবন ও পরিবেশ থেকে প্রতিমুহূর্ত্ত মানুষ কিছু না কিছু শেখে। মনন ও অনুভূতি দিয়ে শেখার কাজকে উৎকর্ণ করে তুলতে হয়।

এসব দৃশ্য ও ঘটনা নতুন নয়, চিরদিনই আছে। কিন্তু ছিল না শুধু দেখার. চোখ, অনুভব করার মন। এখন এসব দৃশ্যের মধ্যে সে নিরীক্ষণ করল জীব জগতের সত্য ও ধর্ম, বাঁচার রহস্য, জীবন সংগ্রামের বৈচিত্র্য এবং অস্তিত্বরক্ষার নিদারুণ সংকট ও সমস্যার তীব্ররূপ।

জীবন ও পরিবেশের পাঠের সঙ্গে শরীর শিক্ষা ও অস্ত্রশিক্ষাও চলল সমানভাবে। নিজস্ব মেধাবলে রামচন্দ্র অল্পকালের মধ্যে পারদর্শী হয়ে উঠল। লক্ষ্মণ রামের সমকক্ষ না হলেও অস্ত্র চালনায় সেও পারদর্শী।

কিন্তু রামকে নিয়ে বিশ্বামিত্রর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সে আর লক্ষ্মণ বনের যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ায়। দু'জনেই সমান বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী। কোন কিছুতে তাদের ভয়ডর নেই। গহণ অরণ্যে তাদের একা চলাফেরা যে আদৌ নিরাপদ নয় এই সত্যটা চেষ্টা করে বিশ্বামিত্র তাদের বোঝাতে পারল না। বিশ্বামিত্রের উৎকণ্ঠা সংশয় নিরসন করার জন্যে বলল : মহাত্মন, কতদিন হল আমরা এখানে এসেছি। কোথাও তাড়কার অনুচর কিংবা রাক্ষস দেখলাম না। আমাদের ভয়ে তারা নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়েছে।

বিশ্বামিত্র সংশয়ে মাথা দোলাতে লাগল। নিঃশ্বাস ফেলে বলল : তোমার অনুমান যথার্থ নয়। রাক্ষসেরা প্রচ্ছন্ন আছে। প্রতিপক্ষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার জন্যে তারা তোমার আগমনের আগেই কৌশল পাল্টেছে। আপততঃ অনেককাল তাদের দৌরাত্ম্য এবং উৎপাত বন্ধ। তার মানে এ নয় যে তারা শত্রুতার পথ ত্যাগ করেছে। কার্যতঃ তাড়কার আত্মবল ভেঙে পড়েছে। মৃত্যু ভয়ে সে দিশাহারা। কারণ, সে জানে তুমি তার নিয়তি। মানুষী ত্রুটি বিচ্যুতির রন্ধ্রপথ দিয়ে নিয়তি প্রবেশ করে। তাই উত্যক্ত করে তোমার বিরাগভাজন হতে চায় না। তোমার বিরাগ, বিদ্বেষ, ক্রোধ থেকে

সে তফাতে থাকতে চাইছে। থাকবেও। নির্বোধের ধারণা, দ্বার বন্ধ রাখলে নিয়তি দ্বার ঠেলে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু নিয়তির ধর্ম চুম্বকের মত সবেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করা। অদৃশ্য সেই ভয়ংকরের সঙ্গে কোন যুদ্ধ চলে না। কোন প্রতিরোধও নয়। নিজের অজান্তে একদিন সে হাজির হয়। তবু নিয়তি নির্দ্দিষ্ট পতন ও ধ্বংস অনিবার্য করতে তাকে ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট করার পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বামিত্রের দিকে তাকাল রাম। বলল : নির্যাতিত মানবাত্মার মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা বিধাতা আপনাকে দিয়েছেন। আপনার এই কৃতিত্বের অংশীদার হওয়ার পরম সৌভাগ্য আমার জীবন ধন্য করেছে।

বৎস, বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ করার শক্তি ক্ষমতা আমার কিছু নেই। তুমি তাঁর অস্ত্র, আমি ইন্ধন।

রাম তাড়াতাড়ি বিশ্বামিত্রর পদধূলি নিয়ে বলল : আচার্য আশীর্বাদ করুন আপনার অভিলাষ, বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ করার ইচ্ছা থেকে আমি যেন ভ্রষ্ট না হই কখনো।

বৎস, আমার সমস্ত তপস্যাফল, শিক্ষা তোমাকে সাফল্যের জন্যে উৎসর্গ করলাম। বিধাতা তোমার সহায়। তুমি কাল প্রেরিত পুরুষ। তা-ছাড়া তোমার মেধা, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, পারদর্শিতাও অসাধারণ।

আত্মপ্রশংসা রামকে একটু বিব্রত করল। বক্তব্যকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল : আচার্য আপনি বলেছেন প্রশংসায় দম্ভ ও অহংকার হয়। এ তেজ সঞ্চার করে আবার তেজ হরণও করে। এর একপিঠে জয় আর একপিঠে ক্ষয়।

এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে গেল বিশ্বামিত্রের হৃদয়। রাম এক আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ হয়ে উঠল তার নয়নপটে। চেহারার এমন দীপ্তি চুলের বাহার চোখের দ্যুতি, দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গী, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তারুণ্য বিশ্বামিত্রের দু'চোখ জুড়িয়ে দিল। বিধাতার আশীর্বাদে সে জন্মেছে, নিজের আবির্ভাবের কারণও জেনেছে। আত্মদানের আলোয় উজ্জ্বল তার চোখ, গর্বভরা বুক। মশালের মত সারা তপোবন আলোয় ভরে উঠেছে। আলোর মতই মিথ্যা ভয়ের তমিস্রাকে অপহরণ করেছে। আশ্রমের অস্ত্র শিক্ষার্থীদের মরা প্রাণে জীবনের ছোঁয়া লেগেছে। রাম লক্ষ্মণের মত তারাও আজ দামাল হয়ে উঠেছে। বিশ্বামিত্রের বুক পুলকে মোচড় দিয়ে উঠল। সত্যি বলে একে বিশ্বাস করতে কেমন অবাক লাগে। পরিতৃপ্তির সুখে তার অধর মৃদু হাসিতে রঞ্জিত হল। গদগদ কণ্ঠে বলল : হুঁ, একথা তোমার মুখেই শোভা পায়।

কেন আচার্য ? সরল শিশুর মত প্রশ্ন করল রাম।

বিশ্বামিত্র রামের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। তার চোখের তারায় কৌতুকের ঝিলিক যেন জিজ্ঞাসার নিবিড়তায় সরল হয়ে গেল। বলল : দুষ্টু ছেলে। চালাকি করে, আমার মুখে তোমার প্রশংসা শুনতে চাও।

চকিতে কেমন একটা লজ্জা রামকে রাঙিয়ে দিল। বিশ্বামিত্রর কথার মধ্যে এমন

একটা ইংগিত ছিল যা তার আশ্রমের কার্যকলাপ এবং ভাবনা চিন্তাকে তার চোখের পটে উদ্ভাসিত করে তুলল।

আশ্রমে পা দিয়েই রাম বুঝতে পারল মুনি ঋষিরা অত্যন্ত অসহায়। তাদের পাশে দাঁড়ানোর মত কোন মানুষ নেই। অথচ তাদের দুঃখ দুর্ভোগ, লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের বিড়ম্বনার কষ্টকর গ্লানি থেকে নিষ্কৃতির জন্য দরকার একজন মরমী সহযোগী। বলবীর্য সম্পন্ন একজন প্রাজ্ঞ নেতার। আশ্রমে পা দিয়েই সে সহানুভূতি বশে এই দুটি অভাব দূর করার প্রতি মনোযোগী হল। তার সমস্ত একাগ্রতা, নিষ্ঠা, মেধা অধ্যবসায় দিয়ে বিশ্বামিত্রর শিক্ষাগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজে অধিগত করতে চেষ্টা করল। জ্যোতিষীর গণনা তাকে এই কার্যে আরো দায়িত্বশীল এবং বাস্তব সচেতন করে তুলল। মানুষের আস্থা, বিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে তার নিজেরই মনে হতে লাগল সে তাড়কার নিয়তি, পৃথিবীর পরিত্রাতা। আর্যাবর্তের সব মানুষ সেই চোখে দেখে তাকে। বিশ্বামিত্র তার মনে সেই অনুভূতিকে বাস্তবায়িত করতেই যেন কৃত সংকল্প।

বিশ্বামিত্রর দৃষ্টি রামচন্দ্রের বিব্রত মুখ ছুঁয়ে রইল। তাকে সংকুচিত দেখাল। কেমন একটা সংকোচের হাসি তার অধর কোণে ব্যাপ্ত হল। বিশ্বামিত্র রামকে কিছু জিগ্যেস করতে গিয়েও থমকাল। কয়েকপলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। মনের ভেতর তার নানা মিশ্র অনুভূতির জিজ্ঞাসার ভীড়। রাম কোন চোখে তাকে দেখবে কি ভাবে তার বক্তব্য গ্রহণ করবে এ সব নানা প্রশ্নে সে একটু অস্থিরতা বোধ করল। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে শুকনো গলায় বলল ঃ শুনতে পাই, তাড়কার সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষ তুমি চাও না। কিংবা তার ধ্বংসও নয়।

আচার্য, তাড়কা নারী। তাকে বধ না করে কি করে পঙ্গু করে রাখা যায় তার কথাই সর্বক্ষণ চিন্তা করি। সর্ববঞ্চিতা দুঃখিনী অসহায় নারীকে প্রাণে বধ করতে ইচ্ছা হয় না। তার মানসিক মৃত্যু অনেকদিন আগেই হয়েছে। এখন তার স্থূল শরীরের মৃত্যুর জন্যে আমাকে একটা নারী হত্যা করতে হয়। কিন্তু নারী বীরের অবধ্য।

বিশ্বামিত্রের মুখ উত্তেজনায় লাল হল। বলল ঃ রাক্ষুসী তোমাকে যাদু করেছে। তার মায়াতে বিভ্রান্ত তুমি। তাই, এসব অদ্ভুত আর উদ্ভট কথা তোমার মুখে আসে। আমি বুঝতে পারছি না, এ সব কথা বলে তোমার কোন গৌরব বাড়ছে? সত্যভঙ্গ হওয়ার আশংকা তার কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়ার অপরাধই কেবল তাতে বেড়ে যাচ্ছে।

আচার্য, শাস্ত্র বলে, নারী হত্যা করলে পুরুষের বল গর্ব এবং যশ ক্ষয় হয়। সত্য মিথ্যা জানি না। তবে আমার বীরত্ব প্রকাশের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি অসহায় অসুস্থ অপ্রকৃতিস্থ নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, জয়ী হয়েছি, এইসব কাহিনী যুক্ত করতে চাই না। এতে আমার অপযশ হবে কিনা জানি না, তবে কথাটা বলতে কইতে আমার আত্মসম্মানে এবং অহংকারে লাগবে।

বিশ্বামিত্রর সমস্ত মুখ রাগে ক্ষোভে পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ বিচলিত

বোধ করছিল। তবু বিশ্বামিত্র নিজেকে খানিকটা সংযত এবং সচেতন করে নিয়ে অবস্থাটা সামলে দেবার জন্যে বলল : নানারকম স্বার্থে মানুষ অপবাদ দেয়। আর তার সব সত্য নয়। প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সত্য বড়। সরযূতীরে তুমি শপথ করেছিলে রাক্ষস তোমার চিরশত্রু। কোন অবস্থায় তাদের সঙ্গে সন্ধি করবে না। কিন্তু রাক্ষসীর মায়ায় তুমি নিজের ধর্ম ভুলেছ, সত্য ত্যাগ করেছ। কোন মুখে দশরথের সামনে দাঁড়াবে? বৃদ্ধ রাজা উৎকর্ণ কৌতূহল নিয়ে যখন প্রশ্ন করবেন, বৎস রামচন্দ্র, বীর সৈন্যদলকে জড়ো করে কি ভাবে তোমার ব্যূহ সাজালে? কখন আক্রমণের নির্দ্দেশ দিলে? লড়াইটা জমল কেমন? কে কিভাবে যুদ্ধ করল? তোমার স্থান কোথায় ছিল? রাক্ষসীর বক্ষ শাণিত তীরে কেমন করে বিদ্ধ করলে? তাড়কার মৃত্যুর পর কতক্ষণ যুদ্ধ চলেছিল? তাড়কার দুই বীর পুত্র তারাই বা কি করল? তারাও কি তাড়কার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে? এত জিজ্ঞাসার কি জবাব তুমি দেবে? বলতে পারবে পিতা আমি তো যুদ্ধ করিনি। তোমার জন্যে "ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে।" অমন দেবতার মত পিতার কাছে নির্বোধের মত নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার আত্মসম্মানে লাগবে না? পিতার সেই অপদস্থ হওয়ার ছবি, বাধ্য অনুগত পুত্র হয়ে তোমার দেখতে কষ্ট হবে না? মন পুড়বে না? সত্যভঙ্গ হওয়ার কলঙ্ক থেকে তোমার চরিত্র তখনও কি নিষ্কলুষ থাকবে? শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে নিজের কথা চিন্তা করে স্বার্থপরের মত কর্ত্তব্যের অবহেলা করছ।

অসহ্য কোন লজ্জা গ্লানি, রামের মুখটাকে নীলাভ কালিমা মাখিয়ে দিল। তার শরীরে ঘাম ফুটে উঠল। চোখ মুখ জ্বালা করছিল। অসহায়ের মত রামচন্দ্র দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে মাথা নিচু করে সেখানে বসে পড়ল। কিছু বলবার চেষ্টা করছিল।

বিশ্বামিত্র রামের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল : তাড়কাকে যুদ্ধে পঙ্গু করলে তোমার গৌরব তাতে কতখানি হবে? তাড়কা বীরাঙ্গনা। তাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা সাধারণ বীরের কর্ম নয়। আর্যাবর্তের শক্তিশালী বীর রাজারাও তার সঙ্গে রণে পরাঙ্মুখ দুর্বল। নারী বলে নয়, পরাজয়ের আতঙ্কে কেউ অগ্রসর হয় নি। অজেয় বীরাঙ্গনা তাড়কাকে বধ করলে তোমার বীর খ্যাতি অমলিন হবে। তোমার গৌরব, সম্মান, সমাদর আরো বাড়বে। রাক্ষস ও আর্যাবর্তের রাজনীতিতে তুমি হবে সর্বাপেক্ষা আলোচ্য ব্যক্তি।

আচার্য!

বৎস রাম, তাড়কাকে যুদ্ধে পঙ্গু করে রাখলে কোন মর্যাদাই তুমি পাবে না। তাছাড়া সমকক্ষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচিয়ে রাখা বীর ধর্ম নয়। বীরের কাছে জয়ই একমাত্র সত্য। তাড়কার শারীরিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে জয়ের গৌরব তুমি পাবে না। বালক বলেই তোমার শরীরে দয়া মায়া আছে। কিন্তু শত্রু কাল সাপ। শত্রুকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলে কোনরকম অবহেলা করতে নেই। দুর্বলতাবশে

কোন দয়া, মায়া, করুণা কিংবা সহানুভূতিও দেখাতে নেই। ভুলের এই রন্ধ্র পথ ধরে একদিন সে নিঃসাড়ে এসে টুঁটি চেপে ধরে। ভুলের সেই মাশুল কার স্বার্থে, কি জন্যে দেবে? রাজা, প্রজাপালক। অত্যাচারী দস্যুকে হত্যা করে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা করা রাজধর্ম। দস্যুর কোন নারী পুরুষ ভেদ নেই। নিয়মভঙ্গকারী অপরাধীকে শাস্তি দেয়া, দমন করা রাজার কর্ত্তব্য। এতে রাজার কোন দোষ কিংবা পাপ হয় না। তাড়কাকে বধ করলে স্ত্রীহত্যাজনিত কোন পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তাড়কা লোকের চোখে নারী নয়, সে মূর্তিমান পাপ। সে দেশের শত্রু, দশের অভিশাপ।

রামের বুকের অভ্যন্তর থেকে অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল খুব ধীরে ধীরে। খানিকক্ষণ চুপ বরে থেকে নীচু ও অদ্ভুত গলায় বিশ্বামিত্র বলল: বৎস রাম, তাড়কা রাবণের আশ্রিত। তাড়কার পরাজয় রাবণের পরাজয়ের সমতুল, যে রাবণ গোটা ভারতবর্ষ শাসনের স্বপ্ন দেখে। দক্ষিণাঞ্চলে নিরীহ আর্য ঋষিদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত সে সইতে পারে না। তার প্রবল আর্য-বিদ্বেষ অন্য রাক্ষসদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে অত্যাচারে, অনাচারে, উচ্ছৃংখলায়। বিশাল ভারতবর্ষে এখনও মুষ্টিমেয় আমরা। রাবণের এই কৌশল যদি প্রশ্রয় পায় তা-হলে ভারতের অন্যান্য অনার্য শক্তিগুলোও অনুরূপ বিরোধিতায় এমনি স্পর্ধা পাবে। তখন আর্যদের দাঁড়ানোর পায়ের তলায় মাটি থাকবে না। সুতরাং একটা কিছু করা দরকার। সেই করাটা তাড়কাকে দিয়ে সূত্রপাত করব।

রামচন্দ্রের মনের জিজ্ঞাসা থমকে যায়। বিশ্বামিত্রর কথাগুলো কানে একটা আদেশের মত শোনাল। স্বপ্নের মধ্যে উচ্চারণ করল: আচার্য, আমার অঙ্গীকার সত্য হোক।

রামচন্দ্রের সামান্য গাম্ভীর্য এবং বিষণ্নতা বিশ্বামিত্রর দৃষ্টি এড়াল না। ঠোঁটের ফাঁকে বিজয়ীর গর্বভরা হাসি, কিন্তু সে হাসির ঔজ্জ্বল্যে তার মুখের মালিন্য কাটল না।

তাড়কার মৃত্যু রাবণের মানসিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনল। বহু আশায় সে তাড়কাকে সমর্থন করেছিল। উত্তরাপথ থেকে দক্ষিণাপথে প্রবেশের পাহারা ব্যবস্থাকে জোরদার ও নিশ্ছিদ্র করতে তাড়কা ও মারীচকে দিয়ে প্রতিরোধের যে চারাগাছটি রাবণ নিজের হাতে রোপণ করেছিল তার মূলোচ্ছেদ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। অথচ, বাস্তব বড় আশ্চর্য! তাড়কার পরাভবের অপমান রাবণের মনে গভীরভাবে বাজল। লোকের চোখে তার দম্ভের মিনারের উচ্চতা যেন ছোট হয়ে গেল। সম্ভ্রমহানির বিব্রত লজ্জায় এবং সংকোচে সে এ ধরনের রাজনীতি থেকে দূরে

সরে দাঁড়াল। বিশ্বামিত্র এই সুযোগকে হেলায় হারাল না। তার নীরব পশ্চাদপসরণ যে অসহায় মনের প্রতিক্রিয়া এই সহজ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে বিশ্বামিত্র দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রাক্ষসদের স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যের উপর সজোরে আঘাত হানার এক পরিকল্পনা করল। সীমান্ত বরাবর ছোট ছোট রাক্ষস রাজ্যগুলিকে আক্রমণে ব্যস্ত রেখে এক দুঃসহ রাজনৈতিক অসহায়তাবোধ তাদের মনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করে রাবণের কুল থেকে তাদের নিজের কুলে টেনে আনার এক চিন্তা বিশ্বামিত্রর মাথায় এল।

আর্যাবর্তের সীমান্তের কাছাকাছি রাক্ষসরাজ্যগুলি ছোট ছোট সামন্তরাজ্য। এগুলি অধিকার করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। পরাজিত রাজার ভুসম্পত্তি ও ঐশ্বর্য গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলে রামের উদারতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা অদূর ভবিষ্যতে রামচন্দ্রের বিরোধিতা থেকে দূরে থাকবে। এ তার কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। রাম তাদের চোখে শত্রু না হয়ে মিত্র হয়ে উঠবে। হৃদয় পরিবর্তনের পর্বের সূচনা হবে। দুঃসময়ে রাবণ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এই অপমানের বেদনা তারা কোন কালে ভুলবে না। রাবণের দুঃসময়ে তারাও সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবে না। রাবণের লোকবলের এই অস্ত্রটিকে অকেজো করে দেয়াই বিশ্বামিত্রর উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে রামচন্দ্রের উপর। কিন্তু তাড়কা হত্যার গোটা ব্যাপারটা তার সরল নিষ্পাপ মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। তার শান্ত ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ দেখে অন্তরের প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় ছিল না। রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে কেমন একটা আচ্ছন্নতা, মুখে কঠিন সংযমের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মেশানো। চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না, মনের ভেতর তার কি খেলা চলছে। মুখের এ ভাবকে গর্বমিশ্রিত পৌরুষ বলে ভুল হতে পারে, আবার দুঃখী মানুষের নীরব প্রতিবাদের ভাষাও হতে পারে। তার নীরব দৃষ্টিপাতের অর্থ স্থান, কাল ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বামিত্র সঠিক নির্ণয় করতে অক্ষম হল।

আঠারো বছরের ছেলেদের আত্মমর্যাদা জ্ঞান একটু বেশি। শুধু তাই নয়, স্বাধীন মত প্রকাশও করে একটু জোরের সঙ্গে। তাদের কথার সুর চড়া মেজাজ উদ্ধত, কিন্তু বুকভরা পরের জন্য মায়া, দয়া, করুণা। জাতি ও দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার উন্মাদনা। তারুণ্যের এই উন্মাদনাকে দেশমাতৃকার সেবায় পুরোপুরি নিবেদনের ইচ্ছায় রাম ও লক্ষ্মণকে অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্র প্রয়োগের কলা-কৌশল শেখাতে লাগল। শুধু তাই নয়, দিব্যাস্ত্র নির্মাণের কৌশলও বিশ্বামিত্র তাদের শেখাল।

রামচন্দ্রও নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল। যুদ্ধের কথা চিন্তা করলে জয়ের আনন্দে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আর্যত্বের গর্বে ভরে উঠে বুক।

শস্য ক্ষেতের উপর সঞ্চারমান কালো মেঘের ছায়ার মত তার মনেও নানাভাবের ছায়া আনাগোনা করে।

পিপুল গাছের নীচে বসেছিল রাম আর লক্ষ্মণ। চারদিক নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধতা ভেদ করে কানে ভেসে আসে জাহ্নবীর মৃদু-মন্দ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় পাশে বসেছিল লক্ষ্মণ। দুজনের কেউ কথা বলছিল না।

ভরা জোয়ারে জাহ্নবীর জল স্থির। গাঙ ফড়িংরা স্থির ঢেউর উপর রেখার মত কাঁপে আবার সাঁ করে খানিকটা উড়ে গিয়ে আবার দাঁড়ায়। পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না বলেই, বোধ হয়, এমনি উড়ে উড়ে চলা। রামচন্দ্রের দুচোখে মুগ্ধতা।

অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সূর্যের কোমল আলো কোথাও ছায়ায় স্থির, কোথাও ঘন। দক্ষিণের দূরে বাঁকে ছায়া পড়া আয়নার মত নদী অদৃশ্য, সামনে ভরা জোয়ারের নিবিড়তায় নদী যেন স্বপ্নের ঘোরে নিশ্চুপ। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে রামচন্দ্র প্রকৃতির রূপে মগ্ন হয়ে থাকে।

রামচন্দ্রের প্রিয়তম স্থান এই নদীর তীর। এই নদীর ধার তার সুখ দুঃখের জায়গা। এখানে এলে সে নিজেকে খুঁজে পায়। বেশি করে আত্মোপলব্ধি ঘটে। নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্যে চুপ কবে বসে রামচন্দ্র উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল তার মনে এখন কিসের পালা? দুঃখের না সুখের? আনন্দের না বিষাদের? কোনটাই বোধ হয় না। সুখ আনন্দ দুঃখ বেদনা ছাড়া মানুষের আর কোন অনুভূতি আছে? দুঃখও নেই, সুখও নেই এরকম অবস্থাকে কি বলে? রামচন্দ্র তার কোন উত্তর খুঁজে পেল না। নিজের অন্যমনস্কতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আচ্ছন্ন গলায় স্বগতোক্তি কবল: এক এক সময় মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়। আমারও বোধ হয় সেই অবস্থা। মস্তিষ্ক অসাড়, মন জড়বৎ। কঠিন অসুখে, বিকারের মত আমার অবস্থা। চারদিকে যা দেখছি তা যেন স্বপ্নবৎ এবং অপ্রাকৃত। পৃথিবীর দুঃখ, সন্তাপ, দুর্দৈবের সঙ্গে আর কতকাল সংগ্রাম করতে হবে আমাকে বলতে পার?

রামচন্দ্রের কথাগুলো অসংলগ্ন মনে হলেও তা নয়; এই বক্তব্যের ভেতর তার উদ্দিষ্ট অর্থ গোপন ছিল না। রামচন্দ্রের মনের গতি অনুধাবন করতে লক্ষ্মণের কোন অসুবিধা হল না। অস্ফুটস্বরে বলল: তাড়কার মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় নি। মারীচ পলাতক। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সে রণাঙ্গণ ছেড়ে পালিয়েছে। মারীচের মত চতুর, কপট, সাহসী, বুদ্ধিমান ব্যক্তির রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যে কোন প্রতিবেশী রাক্ষস রাজা তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করবে। কাজেই, এখনও বিপদ কাটেনি। যে কোন সময় একটা বড় আঘাত আমাদের উপর আসবে। তুমি রাতদিন তার কথা ভেবেই বিচলিত বোধ করছ। তোমার কণ্ঠে এই হতাশার সুর আমি শুনতে চাইনা।

রামচন্দ্র খুব বিস্বাদ অনুভব করল মনটায়। মৃদু একটু হাসি তার অধরে খেলে গেল। বলল: আমাকে কখনও বিচলিত কিংবা হতাশ হতে দেখেছ? তবে, তাড়কার মৃত্যুতে যে ব্যাপারটা চুকেবুকে যায়নি এই অনুভূতিটা আমার নতুন। মারীচ সহজে

ছাড়বার পাত্র নয়। সে যে একটা অনর্থ বাঁধিয়ে তুলবে আমাদের মত আচার্যেরও তা নিয়ে উদ্বেগের অন্ত নেই।

লক্ষণ মাথা নেড়ে বলল ঃ আচার্যর স্বদেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের কোন তুলনা হয় না। ভাবলে, আশ্চর্য লাগে কি অনায়াস কৌশলে বিজিত রাক্ষস রাজ্যগুলি অধিকার না করেও আমাদের অনুকুলে এক বিরাট জয় তিনি আদায় করে নিলেন।

তীক্ষ্ন চোখে রাম লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল ঃ একটু গভীর করে ভাবলে বুঝতে পারবে, ভবিষ্যতের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্ত ও মজবুত করার দিকে নজর রেখেই গোটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের অস্ত্র শিক্ষাও সেইভাবে চলছে। এসব অস্ত্র নতুন এবং অদ্ভুত ধরনের। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণামের দিকে নজর রেখে আচার্য নিজেই এই সব অস্ত্রের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করছেন। অস্ত্র যুদ্ধের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ যুক্ত করে তিনি এক নতুন রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেন, যা এতাবৎকাল ভারতের রাজনীতিতে ছিল না। এর ইন্ধন যোগাতে বিশেষ বিশেষ উপদ্রুত এলাকাগুলোকে নির্বাচন করেছেন অস্ত্রের মহড়ার জন্যে। বিশ্বামিত্রের তাৎপর্যহীন কর্মকান্ড স্বভাবত রাক্ষসদের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাদের স্নায়ুর উপর এক প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। দুঃসহ মানসিক অসহায়তার শিকার হয়ে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু আচার্যর অস্ত্র শিক্ষক তাদের পরাজয়কে অনিবার্য করে তুলেছে। আমাদের বলবীর্যকে তুচ্ছ কিংবা অবহেলা করার নয়, এরূপ একটা প্রত্যয়ে সকলকে সচেতন করা সম্ভবত আচার্যর উদ্দেশ্য।

লক্ষ্মণ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রামের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখ টান টান করে অবাক স্বরে উচ্চারণ করল ঃ আ-চ্ছা—!

লক্ষ্মণের কৌতূহলিত উত্তরের জবাবে রামচন্দ্র বলল ঃ আরো দেখ, আমরা যেসব স্থান পরিভ্রমণ করেছি, করছি এখনও, সেই সব অঞ্চলে এককালে মনুর পুত্রেরা পদার্পণ করেছিল। কিন্তু তাদের কীর্তির কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। কিংবদন্তির সেই গল্পে আর্যত্বের ঘ্রাণটুকু ছাড়া আর সব লুপ্ত হয়ে গেছে। আর্যাবর্তের সেই অতীত গৌরবকে স্মরণ করে দিয়ে এক মহান কর্তব্য বোধে আমাদের দায়িত্বশীল করে তোলা তাঁর আর এক অভিপ্রায়। এমনি করে স্থান কাল পরিস্থিতির ভেতর আমাদের এক অসাধারণ আর্য সন্তান করে তোলার স্বপ্ন তাঁর।

লক্ষ্মণ অবাক জিজ্ঞাসু চোখে সহসা প্রশ্ন করল ঃ এই কঠিন দায়িত্বে আচার্য শুধু আমাদের বাঁধতে চাইছেন কেন? আমরা দু'জন বিশাল ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান কতটুকু-বা করতে পারি?

বৎস!

অকস্মাৎ পরিচিত কণ্ঠে সস্নেহ আহবান শুনে রাম ও লক্ষ্মণ পিছন ফিরে তাকাল। বিশ্বামিত্র চুপি চুপি নিঃসাড়ে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার প্রকৃতির শোভায় এবং নিজেদের কথায় এমনি মগ্ন ছিল যে বিশ্বামিত্রর আগমন টের পায়নি। বিশ্বামিত্র তাদের সামনে এসে বসল। নিজের মনে কৈফিয়তের সুরে

বলল ঃ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় আস্তে আস্তে এই পথে আশ্রমে ফিরছিলাম, সহসা তোমাদের দুটিকে এখানে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। তোমাদের প্রখর রাজনৈতিক সচেতনতায় আমি প্রীত ও চমৎকৃত হয়েছি। তোমরা আমার সস্নেহ, উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ কর। আজ জীবনকে জানার ও চেনার মহালগ্ন উপস্থিত। আমি তোমাদের কাছে সে রহস্য উন্মোচন করব।

বিস্ময়ে রাম ও লক্ষ্মণের দুই চোখ স্থির। অপলক নেত্রে তারা বিশ্বামিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিশ্বামিত্রর মধ্যে কোন জড়তা কিংবা কুণ্ঠা নেই। অবিচলিত কণ্ঠে বলল ঃ বৎস রাম, নিজের ভাগ্য তোমাকে নিজের হাতে গড়তে হবে। বিধাতার অভিপ্রায়ও বোধ হয় তাই। অদৃষ্ট তোমাকে যশ, খ্যাতি, তেজ, বীরত্ব, সাহস, দরদ, মমতা, প্রীতি সুহৃৎ সব দিয়েছে, কেবল দেয়নি অযোধ্যার সিংহাসনে তোমার অধিকার।*

বিশ্বামিত্রর কথা শুনে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ একসঙ্গে চমকে উঠল। বিশ্বাসের ভিতটা ভূমিকম্পে যেন অকস্মাৎ নাড়া খেল। বুকের ভেতর উচ্চকিত রক্তস্রোত হঠাৎ চলকে উঠল। মুখের ভঙ্গী বদলে গেল, রূপ ও রঙের পরিবর্তন হল। ক্ষণিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে কয়েকমুহূর্ত সময় লাগল। তারপর, আত্মসংবরণ করে বলল ঃ ঋষিবর আপনি হঠাৎ চুপ করলেন কেন? রামের কণ্ঠস্বরে কোন কুণ্ঠা নেই।

বিশ্বামিত্রর মুখে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি। রামের সরোবরের মত নীল টৈ টুম্বুর দুই চোখের উপর তার দৃষ্টি স্থির। শান্ত মাদকতাময় দুই চোখের চাহনিতে এমন একটা নিবিড় তন্ময়তা আছে যা তার মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাল। নীল আকাশের মত স্তব্ধ মৌন নিথর দুই চোখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের অভ্যন্তর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল ঃ বৎস, অবলা মন্ত্র'র শপথ মনে মনে স্মরণ করে শোন সে গল্প। হ্যাঁ গল্পই। তোমার জীবনের গল্প। কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ীর রূপজ মোহে মুগ্ধ নিঃসন্তান দশরথ শুধুমাত্র সন্তানের মুখদর্শনের আকাংখায় কেকয়াধিপতির প্রস্তাব ও সর্তে রাজি হল। সর্ত হল, কৈকেয়ীর পুত্র হবে অযোধ্যার রাজা। আর অন্য রাণীরা যদি সন্তানবতী হয় কখনও, তা-হলে অভিষেকের দিন তাদের নির্বাসন দিতে হবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস যে দশরথের জীবনে এত মর্মান্তিক হবে সেদিন কেউ চিন্তা করেনি। প্রকৃতপক্ষে, কৈকেয়ীর আগমনের পর দশরথের ভাগ্য পরিবর্তন হল। চার পুত্রের জনক হল দশরথ। বিধাতার রসিকতা বড় নির্মম বৎস! তুমি ও ভরত একদিনে এক সময়ে জন্মেছ। দশরথের জীবনে এক নতুন সংকট তোমরা। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য দশরথ তোমাকে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দিতে চায়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি, সত্য ও ধর্ম তার অন্তরায়। তবু, অনার্যা রমণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে বঞ্চিত করে তোমাকেই মহারাজা সিংহাসনে অভিষেক করার জন্য মনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে।

* জননী কৈকেয়ী দ্রষ্টব্য।

অযোধ্যার সিংহাসনে শ্রীরামের অভিষেক রাক্ষস অসুর বিজয়ের পথ ধরে জনপ্রিয়তার রথে চড়ে আসুক তার কাছে।

চোখের সবটুকু জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বামিত্র ভবিষ্যতের সেই ছবিটাকে যেন দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হল। বিচিত্র কৌতুক বোধে অধর বক্র হল। বলল: মহারাজের স্বপ্ন খুব সামান্য। এদাবি কেবল তাঁর একার নয়, আমারও এবং সমগ্র অযোধ্যার। রাক্ষস, অসুর—দেশ শাসনের কি জানে? তারা পারবে রাজত্ব করতে? তারা জানে লুটতরাজ করে জনজীবনকে বিপন্ন অসহায় করতে। তারা দস্যু, বর্বর। তারা চাক না চাক, রাজত্ব করব আমরা। অতীতে করেছি, ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানেও করব। বিশাল ভারতবর্ষে আমাদের সংকল্পে কেবল তারাই বাধা সৃষ্টি করছে। আমরাও ঝঞ্ঝার মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনাশ করব, ধ্বংস করব। তোমার বিক্রমের কাছে তাদের অসহায় আত্মসমর্পণ এবং ধ্বংস গোটা রাক্ষসজাতিকে স্তম্ভিত করে দেবে। তখন কেকয়রাজ অশ্বপতি নিজের লোভ সংবরণ করবে।

রাম লক্ষ্মণের দুই চোখে মুগ্ধতা। বিশ্বামিত্রর কথা শুনে তাদের কাছে এক নতুন জগতের দরজা খুলে দিল। জ্ঞান ও উপলব্ধির স্নিগ্ধ মহিমায় দীপ্ত তাদের মুখমণ্ডল।

পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনের ভেতর একটু একটু করে অন্ধকার ঘন আর নিবিড় হয়ে আসছে। কেমন একটা লুকোন আশংকা ও উদ্বেগে রাম ও লক্ষ্মণের চেতনা বিবশ ও আচ্ছন্ন হয়ে এল। বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয়ে তারা বসে রইল। ভুলে গেল ঘনায়মান আসন্ন রাত্রির আবির্ভাবের কথা।

মায়ামুগ্ধ দশরথের স্নেহবৎসল পিতৃহৃদয়ের অনেক ঘটনাই রামের, তরুণ প্রাণের মধ্যে তখন যে যন্ত্রণায় ক্রিয়াশীল তা নানারকম অনুভূতির মিশ্রণে জটিল। বিশ্বামিত্রর কোন কোন কথা তার বুকের মধ্যে গতিময় তীরের মত এতো গভীরভাবে বিঁধে গিয়েছিল যে, তৎক্ষণাৎ একটা চকিত বিদ্ধ কষ্টের সন্দেহ যেন রাক্ষসদের সঙ্গে সংগ্রামের অপরাজিত ছবি তার চোখে ভেসে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, মুগ্ধ আলোর ছিটায় অযোধ্যার সিংহাসন যে চঞ্চলতাস্পন্দনে এনেছিল তা যেন রাক্ষস জয়ের পুরস্কার হয়ে উঠল তার কাছে। সেই সব ঘটনার ছবি কল্পনায় যেন দেখতে পাচ্ছিল। এবং চকিত বিদ্ধ কষ্ট তার আচ্ছন্নতার মধ্যে স্থায়ী হল।

রাক্ষস রাজ্যগুলি একের পর এক রামের হাতে পরাজিত হতে লাগল। রামের সাফল্য বিশ্বামিত্রকে গর্বিত করল। বহুকাল পর আর্যাবর্তকে পরম গৌরবে উদ্ভাসিত করে তুলল। রামের কৃতিত্ব এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও আনন্দে ও উল্লাসে বিশ্বামিত্রর

হৃদয় ভরে গেল। রামকে প্রশংসা করার কোন ভাষা নেই তার। বিশ্বামিত্রর চোখে রাম এক অসাধারণ পুরুষ। তার ব্যক্তিত্বের এবং কর্মের কোন তল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের স্বপ্ন, আদর্শ, কল্পনা, সংকল্প, সিদ্ধান্ত এবং কর্তব্যবোধকে তার মনে সঞ্চারিত করার জন্য বিশ্বামিত্রর আত্মশ্লাঘা হয়। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না মনে। নিজের মনে প্রশ্ন করে, এমন কি যোগ্যতা আছে তার, যে রামকে সে নিজের হাতে তৈরী অস্ত্র মনে করতে পারে? মাটির পৃথিবীর কর্মশালায় এক অদৃশ্য কর্মকার নিঃশব্দে তৈরী করেছে তাকে। স্থান কাল পরিস্থিতি তাকে তিল তিল করে গড়েছে। আর সে কালের পুতুলকে বিশ্বের রঙ্গশালায় উপস্থিত করেছে। সে তার শিক্ষক পথ প্রদর্শক। রামকে নিজের বলে দাবি করতে গিয়ে আবার একটা খটকা লাগল। চিন্তাটা প্রবলভাবে নাড়া খেল। রামের নিজস্ব মহিমা ও শক্তিকে তুচ্ছ করে দেখার কোন অধিকার নেই। সে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। তার সব কাজ অদ্ভুত। সে মুক্ত পুরুষ। বসুন্ধরার প্রার্থনায় বিধাতাই তাকে তৈরী করেছে। মহর্ষি 'নিশাকর' এর গণনাই একমাত্র সত্য ও নির্ভুল।

রামের বয়স এখন বিশ। তবু ভারতবর্ষে সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি। তার সম্পর্কে লোকের নিজস্ব কতকগুলো ধারণা এবং বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। রাম তাদের চোখে এক আশ্চর্য সুন্দর মহান মানুষ। ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে তার। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করার অলৌকিক শক্তি সে রাখে। তাদের বিশ্বাসে রামের নেতৃত্বের বড় গুণগুলো প্রকাশ পেল। রামের অসাধারণ শক্তি, মনোবল, সাহস, দৃপ্ত তেজ, বীরত্বের সঙ্গে লোকরঞ্জনের অসীম ক্ষমতা এবং বলবীর্য সম্পন্ন একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের কথাও প্রকাশ পেল। সাধারণের এই বিশ্বাস ও ধারণা সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিকল্পনায় রাবণ বধের যে কর্মসূচী আছে তার এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। রাবণের মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারানো ও নির্মূল করার জন্যে আগে দরকার তার মানসম্মান মর্যাদার ধ্বংস। লোকের বিশ্বাসের দুর্গকে, মোহের আকর্ষণকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা। রামের ত্যাগ তিতিক্ষা, নিঃস্বার্থ, নির্লোভ কর্ম এবং ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ, লোকের অন্তরকে মোহে রাঙিয়ে তুলেছে। রামের জনপ্রিয়তা যে রাবণকে আতঙ্কে অস্থির করছে, রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত করছে তা রাবণের নির্লিপ্ততা থেকেই অনুমান করতে পারল বিশ্বামিত্র।

বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিশ্বামিত্র আরো বুঝতে পারল, জনগণের গল্প লতায় পাতায় যত বেড়ে যাবে রামচন্দ্র ততই এক অলৌকিক মানুষ এবং প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠবে। রামের হাতে যে বিধাতা অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে, এই সত্য প্রমাণের দায়িত্ব তার নিজের। সৃষ্টি ও বিনাশের ক্ষমতা দিয়ে বিধাতা যে এক ছোটখাট বিধাতা বানিয়েছে তাকে এই প্রত্যয় জাগানো আর কোন কঠিন কাজ নয় তার। তার অন্তর্দৃষ্টিতে সহসা একটা গোপন কৌতুক হাস্য রঞ্জিত হল। চোখের তারায় ভেসে উঠল বিদেহরাজ জনকের দেবমন্দিরে বিশাল প্রকোষ্ঠে রক্ষিত এক অদ্ভুত হরধনু।

মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ জনক তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রূপবতী কন্যা সীতাকে বীর্য-

শুল্কা করার জন্য এই ধনুটি বিশেষভাবে নির্মাণ করেছিলেন। ধনুটি গৃহদেবতা "হর"কে উৎসর্গকৃত বলে এর নাম হরধনু। লৌহনির্মিত অতিকায় এই হরধনুটি অষ্টচক্র এক শকটের উপর লৌহ-নির্মিত মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপিত ছিল। এর গোপন কারিগরী রহস্য বিশ্বামিত্রর অজানা নয়। রামচন্দ্রকে সে সম্পর্কে অবহিত করে তাকে নিয়ে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করল।

স্নেহবশে সীতার বিবাহ দিতে কেবলই দেরী হচ্ছিল সীরধ্বজ জনক-এর। সীতা অষ্টাদশে পদার্পণ করল। জনক খুব বিচলিত। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কন্যাকে বীর্যশুল্কা করে তার নাম গৌরব ও আকর্ষণকে যুগপৎ বাড়িয়ে এই পরামর্শ তাঁকে দিলেন ঋষি গৌতম। বয়োবৃদ্ধির জন্যে সীতা উপেক্ষা কিংবা করুণার পাত্র নয়, আবার সহজলভ্যও নয়। তার মত রমণীকে বধূরূপে লাভ করা এক দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রার্থীদের শুধু কুলশীল মানে নয়, বুদ্ধিতে, কৌশলে, অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে, শৌর্যে-বীর্যে তাদের হতে হবে অসাধারণ। পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে তবেই তাকে অর্জন করা যায়। যতদিন না উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান মিলছে ততদিন পর্যন্ত এক যজ্ঞ করবেন।

ঋষি গৌতমের আশ্রমে অবস্থানকালে বিশ্বামিত্র হরধনু রহস্য এবং সীরধ্বজের যজ্ঞ কথা অবগত হল। বিশ্বামিত্র শুনে অবাক হল, জনকরাজ রামকে মনে মনে জামাতার আসনে বসিয়ে এই যজ্ঞ করে চলছেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে কোন অন্তরায় যাতে না হয়, সেজন্য কুলগুরু গৌতমকে তিনি সব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। গৌতমও এমন একটি সুযোগকে হেলায় হারালেন না। বিবাহের গোটা ব্যাপারটাতে এক অলৌকিক ছাপ লাগানোর জন্য পরশুরামকে দিয়ে এক অদ্ভুত ধনু নির্মাণ করলেন। ধনু এবং তার আসন অষ্টচক্র শকট দুইই শক্তিশালী চুম্বকে প্রস্তুত। দৈহিক বলে কারো সাধ্য নয় ঐ চুম্বকত্বকে বিচ্ছিন্ন করা। শুধুমাত্র বুদ্ধিবলে এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারাই তাকে বিযুক্ত করা যায়। সমমেরুর বিকর্ষণ ঘটলে ধনু ও শকট আলাদা হয়ে যাবে। এই গুপ্ত রহস্য জানে মাত্র তিনজন ঃ জনকরাজ, পরশুরাম আর গৌতম।

সীতার রূপ সৌরভ বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানতে পারল সীতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু রাজা এবং রাজপুত্র এল। কেউ রাজার সাজে, কেউ যোদ্ধার বেশে। কত বীর এল, গেল, কিন্তু কারো সাধ্যে কুলোল না ধনুক নাড়ায়। মুখ আঁধার করে, মাথা হেঁট করে ফিরে গেল তারা। রাক্ষসাধিপতি রাবণ পরাভবের অপমান থেকে নিজের গৌরবকে বাঁচানোর জন্য কোনরকম প্রতিযোগিতা না করেই চুপি চুপি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল।

ধানীরঙের রোদ এক সুন্দর আবহ রচনা করেছে। ভারী নির্জন। নিরিবিলি স্থান। রোদের আল্পনার আঁকিবুকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে। কুঞ্জবনের বেদীতে বিশ্বামিত্র চুপ করে বসে নিঃশব্দে প্রকৃতি দেখছিল। নির্জনতার মধ্যে সে অনেক বড় একটা কিছু অনুভব করছিল। উপলব্ধির স্নিগ্ধ মহিমা তার মুখমণ্ডলে মাখানো।

বিশ্বামিত্রর বুকের ভেতর নানা চিন্তার বিস্ফোরণ চলছিল। সীতাকে রামচন্দ্র বীর্যশুল্কায় জয়ী হলে কতখানি বাস্তব লাভ হবে, এই চিন্তায় তার সমস্তক্ষণ কাটল। বিদ্যুৎ চমকের মত সহসা তার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হল। নিজের অজান্তে এক অজ্ঞাত রহস্যসূত্র তার মনকে ছুঁয়ে গেল। পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দশরথ দেবতাদের মিত্ররূপে পাওয়া থেকে আর্যাবর্তের নৃপতিকুল তার সঙ্গে সকল রকম রাজনৈতিক অসহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছিল। জনকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে দশরথ লাভবান হবে। নিঃসঙ্গ অবস্থা অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পারবে। একজন শক্তিশালী মিত্র রাষ্ট্রের সমর্থন এবং সহযোগিতা দশরথের শক্তি বৃদ্ধি করবে।

মেঘের মত কত ছবি তার চোখের উপর [illegible] ভেসে গেল। অকস্মাৎ সীতাকে রাবণের নিয়তি মনে হল। সীতা সুন্দরী বলে নয়, বীর্যশুল্কার আকর্ষণে সে এক দুর্লভ রমণী। পুরুষের বিজয়লক্ষ্মী [illegible] সে পুরুষের লোভ, মোহ, দম্ভ, অহংকার-অপমান বাসনা, কামনার দাহ ও যন্ত্রণা। তাকে লাভ করবে যে, সে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। তার গর্বের, দম্ভের আনন্দের শেষ থাকবে না কোনদিন। সীতা জয়লব্ধ হওয়া কি কম সৌভাগ্যের? কিন্তু যারা ব্যর্থ, পরাজিত হল তাদের চেয়ে রামচন্দ্র শুধু শক্তিতে বড় নয়, রিপুর আকর্ষণেও বড়। এ'রকম একটি ধারণা সৃষ্টি করতে যজ্ঞের আয়োজন অব্যাহত রাখল জনক। যজ্ঞে আহূত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে রামের শৌর্য প্রদর্শন করানো হল তার উদ্দেশ্য। আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গকে শুধু দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষসিংহ রাবণকে আকারে ইংগিতে জানিয়ে দেওয়া যে, রামচন্দ্রই একমাত্র বীর যে আপন বীর্য ও পৌরুষ বলে পৃথিবী শাসন করতে পারে। রাবণের বিক্রম তার কাছে তুচ্ছ। জনকের কূট অভিসন্ধি বিজিতদের মধ্যে এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাদের অনুগত ও সংযত রাখার এক মস্ত সাফল্যময় পদক্ষেপ। রাবণের মনের অভ্যন্তরে পরাজয়ের গ্লানি, লোভ, মোহ, দম্ভ, ক্রোধ, কামনা-বাসনা, মদ মাৎসর্যর নানাবিধ অনুভূতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাকে কখনও সুখে শান্তিতে থাকতে দেবে না। রামের সৌভাগ্যে সে ঈর্ষান্বিত হবে। তাকে শত্রুর চোখে দেখবে। তখন থেকে একমাত্র চিন্তা, রামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিহিংসাবশে রামের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে। সেদিন আসার আগে রাবণের অন্তঃকরণে দ্বেষ, হিংসা ও অবমাননায় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আত্মক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের রুদ্ধপথ দিয়ে সেদিন তার নিয়তি আসবে সীতার রূপ ধরে। জনক যেন সেই বৃহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সীতাকে নিবেদন করছেন। সীতাও তার দেশমাতৃকার পূজার আর এক রক্তশতদল। জনকের কূটনীতির সাফল্য বিশ্বামিত্রকে অবাক করল। হাসিতে অধর রঞ্জিত হল।

সীতাকে রাবণের নিয়তি মনে হল। জ্যোতিষীরা সীতার ভাগ্যফল বিচার করে বলেছে. তার স্বামী হবে অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর অসাধারণ এক মানুষ। যার স্বভাব, আচরণ এবং গাত্রবর্ণ আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত নয়। তার ভাগ্যে স্বামীর সঙ্গে বনবাস আছে। কিন্তু রামের অদৃষ্ট লিপিতেও আছে নির্বাসন। উভয়ের

ভাগ্যফলের এই মিল যেন কোন এক রহস্যের ইংগিত। জ্যোতিষীর গণনা কখনও মিথ্যে হয় না, বিধিলিপিও যায় না মুছে ফেলা। সুতরাং সীতার সঙ্গে রামের বিয়ের মধ্যে দৈব ইচ্ছাকে দেখতে পেল বিশ্বামিত্র। দৈবের উপর মানুষের কোন হাত নেই। কোন শক্তি নেই সে ইচ্ছাকে অবহেলা করার। রাবণের ভাগ্যে দৈব ইচ্ছার ফল যে সীতা তাতে বিশ্বামিত্রর আর কোন সন্দেহ রইল না। মিথিলায় যাওয়াই স্থির করল।

ভবিষ্যতের কোন ছবিই বিশ্বামিত্র দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু বাতাসের উন্মাদ সাঁ সাঁ শব্দ কানে আসছিল। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে তার উন্মাদনা-অনুভব করতে লাগল বুকের খুব গভীরে। এক উপচানো আনন্দ, এক অসহনীয় সুখবোধে তার চিত্ত আবিষ্ট হল। নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল এবার বোধ হয় রামের দ্বিতীয় জন্মের সূচনা হয়েছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের জীবন-যাপন কেমন হবে? বিশ্বামিত্র তার উত্তর খুঁজে পায় না। অনুমান করে শুধু, রামের জীবনটা সুখেরও নয়, শান্তিরও নয়। সুন্দরীর স্ত্রীর সঙ্গে ঘর-সংসার সাজিয়ে রাজ্যপাট করতে পারবে না সে। একটা ঘূর্ণিবায়ু এসে হয়ত নিমিষে সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এ'ত তার ইংগিত।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

গহন অরণ্যের পথে পথে

॥ সাত ॥

তিনদিন তিনরাত্রি জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি। ক্ষুধা হরণের জন্য লক্ষ্মণ অবশ্য হরিণ শিশু এবং বরাহ বধ করেছিল। কিন্তু আগুনে ঝলসানো অরন্ধন মাংস কেউ ভক্ষণ করতে পারল না। চলার পথে সামান্য ফলমূল যা সংগ্রহ হয়েছিল মোটামুটি তাই আহার করে দিনগুলো কাটাল। তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় নিশি যাপন করল, কিন্তু নিদ্রা হল না। ক্লান্তিতে অবসাদে তাদের দেহ যেন নুয়ে আসছিল। এত শারীরিক কষ্ট ভোগ করতে তারা অভ্যস্ত ছিল না। তাই লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে একটু অসহিষ্ণু ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কোন সময়ের জন্য বলতে পারল না।

চোখের উপর সীতার কষ্ট ক্লিষ্ট শুকনো কালিমাখা মুখখানা তার বুকে প্রগাঢ় যন্ত্রণার থাবা গেড়ে বসল। সীতার শরীর কৃশ এবং কিছু দীর্ঘ। চোখ দুটি বড় এবং মাদকতাময়। সামান্য হাসিতেও তার মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। কিন্তু তার ক্লান্ত মুখে কেমন একটা নিস্তেজ নিঝুম ভাব। মনে হচ্ছিল কেমন একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা তার দুই চোখে।

লক্ষ্মণের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল, আর একটা প্রবল অস্বস্তিতে সে ছটফট করছিল। সীতাকে তার সহমর্মীর চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল লক্ষ্মণ। তারপর রুক্ষস্বরে আপন মনে উচ্চারণ করলঃ শরীরের আর দোষ কি? পুরুষ মানুষ তাই কাহিল হয়ে পড়েছে, আর তুমি'ত মেয়ে। কখনও কষ্ট কি বস্তু জান না!

লক্ষ্মণের স্বগতোক্তির কোন জবাব দিল না রাম। কিন্তু লক্ষ্মণের মুখের দিকে তাকাতে সংকোচ বোধ করল।

অকস্মাৎ অস্ফুট একটা শব্দ বার হল সীতার কণ্ঠ দিয়ে। তবে, বোবা শব্দ, ভাষা ছিল না তাতে। সেই অস্পষ্ট কাতর স্বর লক্ষ্মণের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিল। রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে গেল তার মুখ। কিন্তু সে রাগ প্রকাশ করল না রামচন্দ্রের উপর। কথা বলার সময় গলার স্বর কেবল থর থর করে কাঁপল। বললঃ ভাইয়া এই নিদারুণ কষ্ট ও ক্লেশের মূলে যে আছে; তার সুখ শান্তির পথ সুগম করে দিয়ে নিজেকে অরণ্যে নির্বাসিত করার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। কোন ক্ষাত্র তেজও নেই। গৌরবও নেই। এ যেন নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে যাওয়া।

রাম কিছুক্ষণ শূন্য চোখে লক্ষ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চুপ করে সম্ভবত পরিস্থিতি এবং তার কথার তাৎপর্যটি একটুখানি ভেবে নিল। তারপর স্নিগ্ধ হাসল। তার হাসি বরাবর সুন্দর, অমলিন, সরল। আস্তে আস্তে বলল

রাম ঃ পালাবো কেন ভাই ? ঘেন্নার পরিবেশ থেকে শুধু মুক্ত করেছি নিজেকে। বনবাস আমার অদৃষ্টের লিখন। সাধ্য কি অদৃষ্টকে ফাঁকি দিই।

লক্ষ্মণের ভুরু কুঁচকে গেল। দপ্ করে জ্বলে উঠল রাগে। নাভির কাছ থেকে একটা উত্তেজনা যেন কাঁপুনি দিয়ে উঠে এল। রুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করল ঃ অদৃষ্ট ! দুর্বল মানুষের সান্ত্বনা বাক্য। কিন্তু বীর্যবান মানুষের কাছে ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট কিছু নেই। পৌরুষ দিয়ে সে তার বাইরের বাধা জয় করে। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা সৃষ্টি করে চলে পুরুষকার।

রামের স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। উজ্জ্বল চোখে কৌতুক খেলা করে গেল। মৃদুস্বরে বলল ঃ তাইত আমরা চলার মন্ত্র নিয়ে পথে বেরিয়েছি। একদিন আমরাও সকল সংকট কাটিয়ে উঠব, বাধা জয় করব, পৌরুষ দিয়ে অর্জন করব ভাগ্য-ফল। তবে সব কিছুর জন্যে সময় দরকার হয়। ফল পাকলে তবেই ভক্ষণ করা যায় তাকে। আমাদের এখন সেই অবস্থা। প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে। নির্বোধের মত বীর্যের আস্ফালন ক্ষাত্র ধর্ম নয়, হঠকারিতা।

জবাব দেবার কথা খুঁজে পেল না লক্ষ্মণ। ভুরু কুঁচকে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে রামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তিতে বিস্ময়ের পরিবর্তে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। লক্ষ্মণের প্রতিক্রিয়ায় রামের দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে রাম কারোকে বিশ্বাস করে না। নিজের মনের অভিপ্রায় ঘূণাক্ষরে বুঝতে দেয় না অন্যকে। এমনকি লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত হয়েও রামের সব কার্যের প্রকৃতি ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারে না। লক্ষ্মণের ধৈর্য অল্প। একটুতেই অধৈর্য এবং ক্রুদ্ধ হয়। ক্রোধ ও উত্তেজনা বশে যদি গোপনীয়তা নষ্ট হয় তাই এ সাবধানতা। কিন্তু ভ্রাতার অভিমান সম্বন্ধে উদাসীন নয়, বরং বেশ সচেতন। তার মনকে প্রসন্ন করার জন্যে রাম উদাস গলায় বলল ঃ অযোধ্যার প্রাসাদে শত্রুতা আর চক্রান্তের যে বিষাক্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছে তা থেকে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখতেই অজ্ঞাতবাস মেনে নিয়েছি। তোমার মনে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া। এটাই'ত স্বাভাবিক। এজন্যে পারিবারিক বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে দেশ ও জাতির উন্নতি কিংবা মঙ্গল কোনটাই করতে পারব না। এই ভাবনাটা আমার মনে ছিল বলেই সিংহাসনের আকর্ষণ আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মুক্তি আনন্দ শান্তির জন্যে যদি কিছু করতে না পারলাম তা হলে এই মানুষ জন্ম নিয়েলাম কেন ? অরণ্যের পশুর মত নিজের সুখ সুবিধা স্বার্থ, সন্তুষ্টি নিয়ে থাকা কি খুব গৌরবের ? মৃত্যুর পরেও যা বেঁচে থাকে মানুষের সে হল কীর্ত্তি, খ্যাতি। সেই কীর্ত্তির মালা গাঁথতে দরকার হয় তার চতুস্পার্শের পরিবেশ। কত ঘটনা, কত মানুষ এসে মেশে সে কাহিনীর সঙ্গে। আমি যে সুদূরকালের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছি লক্ষ্মণ।

ঘুমের মধ্যে সীতার অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেল। স্বা-মী-বড়-তিষ্-না।

ঠোঁটের পাশে খানিকটা গেঁজলা জমেছে। সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে রাম দিশাহারা বোধ করল।

রাম লক্ষ্মণ দুজনে একসঙ্গে চমকে উঠল। বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল তাদের শিরায় উপশিরায়। দু'জন দুজনের দিকে তাকাল। চোখে মুখে তাদের উদ্বেগ ও শঙ্কার ছায়া নামল। কারো মুখে কথা নেই। উৎকণ্ঠায় তাদের দুই চক্ষু বড় বড় হল।

সীতার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে রাম থুতনিটা ধরে মৃদু মৃদু নাড়াল। আর্ত্ত স্বরে ডাকল ঃ জানকী! তোমার কি হয়েছে? অমন করছ কেন? কী কষ্ট হচ্ছে?

লক্ষ্মণ উৎকর্ণ উদ্বেগে অস্থির। কাঁপা গলায় সে প্রশ্ন করল ঃ বৌঠান তুমি কথা বল!

সীতা আস্তে আস্তে চোখ মেলল। ঘোলা ঘোলা চোখে তাকাল। দুই চোখে ক্লান্তির ঘোর। চোখ টান টান করে দেখল রামের মুখ, লক্ষ্মণের চোখ। মুখে কষ্টের হাসি। তাতে হাসি আরো বিবর্ণ, মলিন হল। কথা বলার জন্যে থরথর করে তার ঠোঁট কাঁপছিল, কিন্তু গলা থেকে কোন স্বর বার হল না। সর্বনাশের ভয় রামকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করছিল। সীতা রামের বুকে মুখ গুঁজে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল।

সুমন্ত দেরী না করে রথ থামাল।

সীতাকে ধরাধরি করে ইঙ্গুদীবৃক্ষের ছায়ায় শুইয়ে দিল। লক্ষ্মণ বায়ুবেগে একটা ঝর্ণা থেকে পাত্র ভরে জল আনল। আঁচলা করে চোখে মুখে জল দিল। অর্ধচেতন সীতা তাতে যেন কিছু সুস্থ হল। চোখ মেলল। জল পান করল।

ঝর্ণার ধারে কৃষিক্ষেত্রে একদল চাষী কর্মরত ছিল। লক্ষ্মণকে ঐভাবে দৌড়ে জল আনতে ও নিয়ে যেতে দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্মণকে অনুসরণ করল। বিদেশী সন্দেহে কয়েকজন গেল রাজাকে খবর দিতে।

এই অঞ্চল ছিল নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা গুহর। সংবাদ পেয়ে গুহ তার ঝটিকা বাহিনী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পেঁছিল। ইঙ্গুদী বৃক্ষের অদূরে সৈন্যদের প্রচ্ছন্ন রেখে একাকী গুহ রাম সমীপে উপস্থিত হল। সবিনয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে বলল ঃ মহাত্মন, আমি নিষাদরাজ গুহ। এ রাজ্যের অধিপতি। আপনারা কে? কোথা থেকে, কি অভিলাষে এই রাজ্যে পদার্পণ করলেন? আপনার সঙ্গে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের রথ। এসব নিয়ে একা কোন দিগ্বিজয়ে চলেছেন?

নিষাদের বাক্যে রাম স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিস্ময়টাকে নিজের ভেতর চেপে রেখে বলল ঃ ভদ্রে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমরা অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। আমার পিতা আপনার বন্ধু। আমরাও। কোন রাজনৈতিক মতলব নিয়ে আসিনি। সহসা আমার সহধর্মিনী অসুস্থ হওয়ায় এখানে তার শুশ্রূষা করছি মাত্র।

সীতা চোখ বুজেছিল। কথাবার্ত্তা শুনে উঠল এবং ব্যাপারটা বুঝতে একটু

সময় নিল। তারপর, লজ্জায় আঁচলটা মাথার উপর টেনে দিয়ে মুখখানি আড়াল করল এবং মাথা নিচু করল।

নিষাদাধিপতি সীতার কৃশ মলিন বিবর্ণ মুখ দেখে সহসা চমকে উঠল। হতভম্বের মত চেয়ে রইল অপরূপা মহিলার দিকে। মহিলাটির ক্ষুধা ক্লিষ্ট মুখখানি দেখে ভীষণ করুণা হল। বুকের ভেতর করুণার সাগর কলকল করে উঠল। কিন্তু রাজবধূ উপবাস কাতর কেন, এর রহস্য ভেদ করতে পারল না। আত্মানুশোচনায় বুকটা তার খামচে ধরল। গম্ভীর থমথমে গলায় বলল: রাজপুত্র আমার সন্দেহ মার্জনা করবেন। মহারাজ দশরথ আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। আজ তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে একসঙ্গে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। এ তৃণভূমিতে রাজবধূকে মানায় না। আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে অনুগৃহীত করুন। আপনারা সকলে পথশ্রান্ত এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট। নিকটেই রাজগৃহ।

এই কৃষ্ণকান্ত দীর্ঘকায় লোকটির রাজপুত্র সুলভ চেহারা। তার মুখশ্রীতে একটা রুক্ষ ভাব আছে। তবু, উদ্ধত, বদমেজাজী নয়। বরং এক ধরণের বন্য সরলতা যুক্ত হয়েছে তার স্বভাবের সঙ্গে। গুহ শুধু সজ্জন, অতিথি পরায়ণ নয়, বন্ধুবৎসলও বটে। তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র ভাবতে লাগল, গুহর মত মানুষই নিঃস্বার্থভাবে তার জন্যে অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলে এদের মতই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় দুর্ধর্ষ উপজাতি নাগ, কিরাত, বানরের সংখ্যা অগণন। এইসব উপজাতীয়দের কেউ সাম্রাজ্যলোভী ক্ষমতাপ্রিয় নয়। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতা নিয়ে তারা অনন্য। যে কোন মূল্যে সার্বভৌমকে রক্ষা করতে কৃতসংকল্প। তথাপি, রাক্ষসরা এদের কৃপার চোখে দেখে। তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। আবার বন্ধুও ভাবে না। বরং কিছু অনাদর আর উপেক্ষার গ্লানি এবং বেদনা লেগে আছে তাদের প্রবল জাত্যাভিমানবোধের গায়ে। নিষাদরা জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তাদের নিশানা অব্যর্থ। যুদ্ধপ্রিয়, দুঃসাহসী সৈনিকের জাত তারা। গুহের মিত্রতায় তার গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাই গুহর প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে বলল: রাজন, আপনার সুমিষ্ট ভাষণে ও আন্তরিকতায় আমি চমৎকৃত। এই বনভূমিতে আপনার মত সজ্জনের দর্শন পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। পিতৃধর্ম রক্ষার জন্যে বনে নির্বাসিত হয়েছি। পিতার হিতকামনায় সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে তাপসের অনুরূপ জীবনযাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রলোভনের বশে আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমি ব্রতভঙ্গের অপরাধে দোষী হব। মহারাজ! জীব মায়াবদ্ধ। এই সজন পরিবেষ্টিত বনে আর কিছুক্ষণ কাটালে আমি মোহপাশে বদ্ধ হব। সেই দুঃসময় আসার আগে এস্থান ত্যাগ করে যেতে চাই।

রাজপুত্র! চমৎকার বিস্ময়ে উচ্চারণ করল গুহ।

রাম নির্বিকার ভাবে বলল: নিষাদরাজ, বন্ধুর জন্যে একটা কাজ করলে বড় উপকার হয়। আপনার দক্ষ নাবিকেরা যদি তরণী করে এই তরঙ্গ সংকুল গঙ্গাবক্ষ পার করে দেয় তা-হলে বড় মঙ্গল হয়।

রামের কথা শুনে গুহ স্তম্ভিত। বুকের ভেতর কেমন একটা উথলে উঠা ভাব হল তার। এ যেন এক স্বপ্ন দৃশ্য। এরকম যে সত্যি বাস্তবে হয় গুহ বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাথাটা তার কেমন করছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে রামের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: রাজপুত্র, আপনার প্রস্তাব মঞ্জুর হল। কিন্তু এখন'ত আপনার যাওয়া হবে না। আপনারা সকলেই পথশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত। অগ্রে ইঙ্গুদীবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম করুন এবং ফলমূল গ্রহণ করে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করুন। এবং এই উন্মুক্ত ভূমিতলে আমার লোকজনের পাহারায় নির্ভয়ে নিশিযাপন করুন। তারপর কল্য প্রভাতে জোয়ার এলে আমি নিজেই আপনার গন্তব্যস্থলে পেঁাছে দেব।

রামের নির্দ্দেশে সুমন্ত্র এবং অন্যান্য সারথীরা বাধ্য হল একা একা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে। গুহকের সহায়তায় সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ভাগীরথী নদী পার হয়ে বৎস দেশে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হল। রামচন্দ্রকে দেখে ভরদ্বাজ কিছুমাত্র বিস্মিত হল না। বরং এই আগমন তার কাছে একান্তই প্রত্যাশিত ছিল এরকম একটা ভাব প্রকাশ পেল তার কথায়। রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বলল: তোমার অযোধ্যা পরিত্যাগের বৃত্তান্ত আমি পূর্বেই অবগত আছি। এখন বিশ্রাম নাও। যথা সময়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

তারপর ভরদ্বাজ মুনি আর সেখানে দাঁড়াল না। ঋষি পত্নী সীতাকে নিয়ে তাদের কুটীরে প্রবেশ করল। ঋষি বালকরা রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে অতিথিশালায় ঢুকল। একজন তাপস গিয়ে কুটীরের জানলা খুলে দিল। ভাগীরথীর হিমশীতল বাতাস হু হু করে ঢুকল ঘরে। লক্ষ্মণ জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

রামচন্দ্র একটি কাঠের চৌকির উপর বসল। বেল আর জুঁই ফুলে সাজানো ঘর মাতাল হয়ে উঠেছিল গন্ধে। অগুরুর সুবাসের সঙ্গে ফুলের গন্ধ মিশে শব্দহীন ঘরে এক অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি হল। ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। নির্জ্জনতা ক্রমে ভারী, দুঃসহ বোধ হতে লাগল। দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ হঠাৎ বলল: ভাইয়া কাল থেকে মনটা ভাল নেই। পিতার জন্যে মন চঞ্চল হয়েছে। জননীর কথা মনে পড়ছে। পিতাকে অসুস্থ জেনেও এইভাবে ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি। রাগের বশে কত মর্ম্মবিদারী বাক্য বলে তাকে আঘাত করেছি। অনুশোচনায়, কষ্টে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। জানি না, তোমার বিহনে তিনি কেমন আছেন? আমার মত তুমি কি অস্থিরতা বোধ করছ?

লক্ষ্মণের প্রশ্নে রামের গায়ে কাঁটা দিল। লক্ষ্মণের নিকট সান্নিধ্যে এসে বলল: সত্যি বলেছ। তবু মুখে ওসব কথা আনতে নেই। মায়া মোহ একটা মানসিক

দুর্বলতা। মানুষের জন্মগত অভিশাপ। পায়ের বেড়ী। ছোঁয়াচে রোগের মত মারাত্মক ব্যাধি। জীবনের গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে মনের উপর উপদ্রব ঘটায়। আমাকেও অশান্ত করে। কিন্তু কর্ত্তব্য, ধর্ম, সত্য আরো বড়।

লক্ষ্মণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে ছিল রামের দিকে। অস্ফুটস্বরে জিগ্যেস করল: পিতাকে সুখী করার জন্যে একটা রাত কাটাতে তোমার আপত্তি হল কেন? যে পিতাকে একদিন না দেখলে তুমি অধীর হয়ে পড়, তাকে এত সহজে কেমন করে ত্যাগ করলে? এ তোমার কেমন বিদ্রোহ।

রাম চমকে উঠল। সহসা কোন কথা বলতে পারল না। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বুকের ভেতরটা মথিত হয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আচমকা একটা অনুভূতি হল তার। স্তিমিত কণ্ঠে বলল: বিপদ নিঃশব্দে চুপি চুপি আসে। একটা রাত কাটানোর অর্থ আমার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া। নিজের কাছে হেরে যাওয়ার আতঙ্কে আমি শুধু মনকে কঠোর করেছি। জননী কৈকেয়ীর মন সংশয়ে ভারাক্রান্ত হোক এ আমি চাইনি। ভরতের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোটরাণী কোন করুণা কিংবা ক্ষমা প্রদর্শন করত না। বরং রাতের ঘন কালো অন্ধকারে গুপ্তঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরিই আমাকে অভ্যর্থনা করতে পারত। প্রতিপক্ষকে তার মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দেব না বলেই আমি কঠোর হয়েছিলাম লক্ষ্মণ।

তাহলে তুমি ছোটরাণীর কোন কাজকেই নিন্দে করলে না কেন?

রাম ঠোঁট কামড়াল। লক্ষ্মণের দিকে মুখ তুলে তাকাল। ভ্রাতার কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে রাম কি করে কবুল করে যে সব মানুষ নিজের দাবি আর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যা যা করে থাকে ছোটরাণীও করেছে। সিংহাসন নিয়ে যে বিরোধ তা শুধু স্বামী স্ত্রীর নয়, মাতায় পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, এক কুৎসিৎ আত্মঘাতী লড়াই সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যত, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ে। একদিকে পুরোহিত সমাজের বশিষ্ঠ, অন্যদিকে ক্ষাত্রে তেজ সম্পন্ন বিশ্বামিত্র। সামগ্রিক প্রশাসনে এই বিরোধের কোন ছায়া পড়েনি। কিন্তু নিঃশব্দে পরিবরের অভ্যন্তরে তার শিকড় বিস্তার করেছে। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা রাজা দশরথের অতীতের এক প্রতিশ্রুতিকে নিয়ে ভরত ও তার মধ্যে একটা উঁচু দেয়াল তুলেছে। নিরপরাধিনী কৈকেয়ীকে ভরতের নাম করে বিরোধের মধ্যে টেনে এনেছে। ভেদ আর বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতির তরঙ্গ এসে লাগল মাতৃস্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে। গোষ্ঠীস্বার্থ এক ভয়ংকর ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ঘটনা হয়ে উঠল। দেবর্ষি নারদের মুখে সেই নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়ার পর মনটা রামের বিষাদে ভরে গিয়েছিল। সিংহাসনের উপর সত্যাই বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। এসব কথা এতই গোপন যে লক্ষ্মণকে বলা যায় না। তাই তার প্রশ্নাতুর চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল:

কি হবে সিংহাসনে? পিতার সম্পত্তির উপর সকল পুত্রের সমান দাবি। চিরকাল একটা জিনিস চলে আসছে বলেই তাকে মেনে নিতে হবে, কেন? ভরত ও

আমি এক দিনে এক সময়ে জন্মেছি। ছোট রাণীর দাবিকে তাই নিন্দা করা যায় না। ভেবে দেখেছি, সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে এ লড়াই ক্ষতিকর। যেই জিতুক, তাতে ইক্ষ্বাকুবংশের ক্ষতি হবে। আমার সুনাম নষ্ট হবে। মানুষের যে বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা আমাকে যশস্বী করেছে, জনগনমন অধিনায়ক করেছে সে আমার নিজের অর্জিত, তার পাশে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া ক্ষমতা অত্যন্ত নগণ্য। নিজের সেই সম্মান গৌরবকে অটুট রেখে যে আমি অযোধ্যা ছাড়তে পেরেছি সে আমার সৌভাগ্য। এক পরমকে পাওয়ার বাসনা নিয়ে বনে এসেছি। এই আকাংখা প্রাণে উদ্যম, মনে উৎসাহ, কর্মে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলেছে। অরণ্যবাস আমার নির্বাসন নয়, এ আমার অজ্ঞাতবাস। এই যে কাজের জন্যে প্রাণ মেতে উঠল, আত্মবল সৃষ্টি হল, শক্তি বিকশিত হল এই তো প্রাণায়াম। সাধক একেই কেন্দ্রস্থ করে সিদ্ধিলাভ করে। সেই সিদ্ধি আমিও অর্জন করব।

লক্ষ্মণ নির্বাক, নিশ্চল। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না। কেবল মৃদু মন্থর ঢেউয়ে বুক উঠা নামা করতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, লক্ষ্মণ রামের কোন উদ্দেশ্যের কথা অনুভব করতে পারে না। তার আধাচেতনায় রামকে এক মহাবৃক্ষের মত মনে হল। তাঁর স্নিগ্ধ ছায়া আছে, আছে সুনিশ্চিত আশ্রয়। তার শান্ত সমাহিত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে যেন সমস্ত অন্তর হয়ে উঠে স্নিগ্ধ ও রূপময়। তাকে ঘিরে তার অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনন্দ আবর্ত্তিত হয়।

সন্ধ্যে বেলায় ভরদ্বাজ মুনি এল খোঁজখবর নিতে। দরজাটা ভেজানো ছিল। খুব সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ফাঁক করল। তারপর থমকে দাঁড়াল। দেখল, রামচন্দ্র ঘরে একা চুপ করে বসে চৌকির উপর। শিরদাঁড়াটা সোজা। চোখ মুদ্রিত। ধ্যানস্থ। মশা ছেঁকে ধরেছে তাকে। কিন্তু সে বোধ হয় টের পাচ্ছিল না। লক্ষ্মণকে কুটীরে কোথাও দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ পর ভরদ্বাজ মৃদুস্বরে ডাকল ঃ বৎস রাম, রামচন্দ্র !

কোন জবাব নেই। ভেজানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভরদ্বাজ একটু দ্বিধা করল। ভিতরে ঢুকতে তার কেমন লাগল। তারপর কি ভেবে ভরদ্বাজ নিঃশব্দে মাটি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর রামের মুখোমুখি বসল। চৌকি নড়ে যেতে রাম চোখ খুলল। চোখে তদ্‌গত দৃষ্টি, যা সাধকের থাকে। তবে বৈরাগ্যও নিস্পৃহতা নয়। চোখে এক ধরনের ধিক ধিক আগুন আছে রামচন্দ্রের।

অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! মনে মনে বারবার বলল ভরদ্বাজ। এক পরিপূর্ণ আনন্দে তার হৃদয় মথিত হতে লাগল।

ভরদ্বাজ মুনিকে দেখে রাম একটু হাসল। ভারী লাজুক সে হাসি। কুণ্ঠিত গলায় ডাকল ঃ ঋষিবর !

রামের দিকে প্রশ্নাতুর চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল ঃ বৎস, লোভ মোহ, মায়া জয় করার যে কঠিন মনোবল তুমি দেখিয়েছ, তা শুধু সন্ন্যাসীই পারে। বোধ

হয়, বিধিলিপি ফলতে সুরু করেছে। এখনও অনেক ক্লেশ ভোগ করতে হবে তোমার।

রামচন্দ্র একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে বলল ঃ তা-হলেই ভাল। অবলা মন্থর কথা খুব ভাবি। একটু বেশিই ভাবি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু ও অদ্ভুত গলায় বলল ঃ সকলে মিলে আমাকে ভাবতে বাধ্য করে। তারা ভাবে আমি বুঝি নরদেহে নারায়ণ। অবিচার, অত্যাচার, অন্যায়, অধর্ম, শোষণ, নির্যাতন থেকে আমি তাদের উদ্ধার করতে অবতীর্ণ হয়েছি। কিন্তু আমি যে তাদের মতই রক্তমাংসের মানুষ একথা আমার ঘরের লোকেরাও পর্যন্ত ভাবে না। এটাই হল আমার জীবনে সবচেয়ে পরিতাপের ঘটনা।

ভরদ্বাজ একটু অবাক হয়ে উদাস গলায় বলল ঃ দেশের সংকট, মানুষের বিশ্বাসে গড়ে উঠে নেতার ব্যক্তিত্ব। মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নেতাকে দায়িত্ব সচেতন করে।

রামের মুখ ভীষণ খুশিতে উজ্জ্বল হল। ভরদ্বাজের পায়ে ধুলো নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু ভরদ্বাজ তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে সরে গেল। এরকম আত্মনিবেদিত তেজী ও প্রাণভয়হীন নির্লোভ যুবকের প্রণাম নেয়াটা তার পক্ষে পাপ হবে মনে করে, কেমন একটু সংকোচে জড়সড় হয়ে গিয়ে বলল ঃ থাক, থাক।

সাগ্রহে রাম জিগ্যেস করল ঃ ঋষিবর এই বিশাল অরণ্যে আমার বসবাসের উপযুক্ত একটি স্থান নির্বাচন করে দিন আপনি।

এই বনও তোমার পক্ষে নিরাপদ। ইচ্ছা করলে এখানেও তুমি নিরাপদে শান্তিতে সুখে বসবাস করতে পার।

রাম খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়। ভরদ্বাজের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে কি যেন লক্ষ্য করল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল ঃ মুনিবর বনে অবকাশের সুখ ভোগ করতে'ত আসিনি। বনবাসের উদ্দেশ্য শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে শক্তি সংগ্রহ করা। আর্যাবর্তের স্বার্থেই আমি নিরাপদ রাজ্যসুখ ছেড়ে স্বেচ্ছায় বনবাসের নামে রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস বরণ করে নিয়েছি। এর পরেও আমার উপর সংশয় হল কেমন করে, ভাবতে অবাক লাগছে।

ভরদ্বাজ একটু থমকে চেয়ে থাকে। আচমকা তার মুখ লাল হয়ে উঠল। নিজের মনেই মাথা নেড়ে বলল ঃ ঠিকই বলেছ। কিন্তু এত গভীর করে ভেবে কথাগুলো বলিনি। স্নেহবশে বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো উৎসাহিত হয়েছিল। নিজের জন্যে কিছু যে তোমার আকাংখিত থাকার কথা নয়, এটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

ভরদ্বাজের কথা শুনে রামচন্দ্রের বুক ব্যথিয়ে উঠল। শ্বাস দ্রুত হল। আর কেমন একটা অপরাধবোধে তার কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল ঃ আমাকে নিয়ে বহু জলঘোলা হয়েছে। নানারকম বিপদে বিপাকে পড়ত হয়েছে। নিজের উপরেই একটা বিতৃষ্ণা জেগেছে। মনটাও ভাল নেই। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল, কেন বললাম জানি না।

ভরদ্বাজের বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করে উঠল। রামচন্দ্রের করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে হেসে বলল ঃ কিন্তু তুমি এ নিয়ে ভাবছ কেন? আমার মনে হয় তোমার পক্ষে এ জায়গা খুব নিরাপদ হবে না। কাছেই অযোধ্যার লোক পরম্পরায় এখানে তোমার অবস্থানের খবর চাউর হয়ে গেলে তারা ভীড় করবে। অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে। তখন বনে আগমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তুমি বরং চিত্রকুট পর্বত শিখরে গমন কর। ঐ স্থানে বহু ঋষির বাস। তাদের বিবিধ সহযোগিতা তুমি অনুক্ষণ লাভ করবে।

চিত্রকুট পাহাড়। ঘন সন্নিবন্ধ তরুশ্রেণীতে আচ্ছন্ন ছায়া সুনিবিড় পাহাড়। গাছে গাছে পাখী ডাকছে। অলিরা ফুলে ফুলে গুঞ্জন করছে। ময়ূর এখানে ওখানে পেখম তুলে মনের সুখে ময়ূরীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে শাল, অর্জুন পিপুল গাছের শাখা, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, আম্রের মুকুল। যতদূর চোখ যায় শুধু ঘন অরণ্যের এক শান্ত সমুদ্র যেন নিথর হয়ে পড়ে আছে। চিত্রময় এই পাহাড়ের উচ্চভূমিতে রামচন্দ্রের কুটীর একখানা ছবির মত নয়নাভিরাম।

দিনের পর দিন কেটে যায়। কেমন করে রাবণকে ধ্বংস করা যায় তার ভাবনায় রামচন্দ্রের কাটে সমস্তক্ষণ। এই চিন্তা কোন নতুন নয়। অযোধ্যায় থাকতেও রামচন্দ্র আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গকে রাবণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। নেতৃত্বের অগ্রভাগে থেকে নিজে সংগ্রাম পরিচালনার দায় দায়িত্ব পর্যন্ত নিতে চেয়েছিল। কিন্তু দূরত্বের জন্যে রাবণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কাজটা তার সফল হয়নি। উদ্যোগ বিফল হওয়ার লজ্জায় এদের চোখে সে কিছুটা ছোট হয়ে গিয়েছিল। তাদের চোখে নিজেকে সার্থক পুরুষ করে তোলার এবং সকলের সামনে বড় হবার এক অপূর্ব সুযোগ তার এই বনবাস থেকে আদায় করে নেবে।

বনবাসকে রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস করে তোলার মহান সংকল্পে সে সমুদয় অস্ত্রকে নিষাদ রাজ গুহক এর কাছে সঞ্চিত রেখে এসেছে। বনবাসের আসল উদ্দেশ্য তার শক্তি সংগ্রহ। কারণ এখানে তার একার পথে সরাসরি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা খুব সহজ নয়। আবার অযোধ্যা থেকে কোন রাজনৈতিক সাহায্যকে অব্যাহত রাখাও দুঃসাধ্য। সুতরাং রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ তাকে এই বনভূমিতে তৈরী করে নিতে হবে।

রামচন্দ্র জানত অনার্য অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলের নিষাদ, কিরাত, নাগ, গৃধ্র, শবর, বানর, যক্ষ উপজাতিরা রাবণ বিদ্বেষী। এদের দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে রাবণ বধের উর্বর জমি তৈরী করার জন্য নিজেকে সে নিরস্ত্র করেই চিত্রকুট পাহাড়ে এসেছে। অস্ত্র বহন করলে মিত্রতার পরিপন্থী কোন আচরণ হলে, বিনাযুদ্ধে তাদের

রাজানুগত্য আদায় করে নেয়ার সব কুট নৈতিক প্রয়াস এক মস্তবড় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই বহু বিচার বিবেচনা করে আগেভাগে নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে মিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে নিয়েছে। এখন দক্ষিণাঞ্চলের বাকী সহায়ক শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় নিজেকে স্থাপন করে রাবণের উপর একটা প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে যাবে। কিন্তু কি ভাবে একটি অনুগত সংগঠন তৈরী করা যায় তার বাস্তব সমস্যায় রামচন্দ্র বিভ্রান্ত। দিন যত যায় রামচন্দ্রর অস্থিরতা তত বাড়ে।

ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য অযোধ্যা থেকে নিস্ক্রান্ত হল। ইলাবৃত বর্ষের দেবতাদের কাছে এই সংবাদ পেঁছিতে বিলম্ব হল না। কিন্তু বার্ত্তাটি দেবতাদের কাছে মোটেই শুভ ছিল না। তীক্ষ্ন বিদ্ধ সন্দেহ এবং উদ্বেগের মধ্যে তাদের দিন কাটতে লাগল। কারণ, রাম তাদের আশার প্রদীপ। রাক্ষসদের কর্তৃত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী সে। প্রবল রাক্ষস বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে দক্ষিণ দেশের অভ্যন্তরে এক নীরব বিপ্লব ঘটাতে সে এসেছে। দক্ষিণের রাক্ষস বিদ্বেষী উপজাতিগুলো ঐক্যবদ্ধ করে যে বিরাট শক্তি জোট গঠনের পরিকল্পনা তা যেমন আর্যাবর্ত এবং দেবরাজ্যের সঙ্গে লঙ্কার দূরত্বজনিত অসুবিধা দূর করবে তেমনি রাক্ষস শক্তির আঘাতে এক আতংক হয়ে উঠবে। কিন্তু ভরতের আগমনে তার সব ওলোট পালোট হওয়ার সম্ভাবনার আশংকা। রাম অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল। ভরতের ভ্রাতৃভক্তিতে রামের অতিমুগ্ধতা যে কি ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনবে তার কথা ভেবে ব্রহ্মা আকুল হল। ভরতের আবেদন নিবেদনে বাধ্য হয়ে যদি রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে তা-হলে, এতকালের সব আয়োজন, প্রতীক্ষার ইতি ঘটবে। কোন কারণে যদি এই উদ্যোগ বিফল হয় তা-হলে দক্ষিণ দেশ থেকে রাবণের কতৃত্ব, আধিপত্য এবং প্রতিপত্তিকে আর কখনও উৎখাত করা যাবে না। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে আর পাঁচ জন সাধারণ নৃপতির মত জীবন যাপন করবে। রাবণের হাত থেকে দেবতারা আর কোন দিন মুক্তি পাবে না। রাক্ষসের দাসানুদাস হয়ে তাদের জীবন কাটাতে হবে। তাই, ব্রহ্মার পরামর্শে, ইন্দ্র, নারদকে তাদের দূত করে চিত্রকূটে রামের কাছে পাঠাল। যে কোন উপায়ে ভরতের আগমনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার দায়িত্ব দেয়া হল তার উপর।

দেবতাদের আদেশ মাথায় করে নারদ ইলাবৃতবর্ষ থেকে গোপনে একদিন চিত্রকূটে গেল। একটা সংকট সময়ে নারদকে পেয়ে রাম মনে মনে উৎফুল্ল হল। চেতনার ভেতর তার মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। খুশির আভাসে উজ্জ্বল হল তার মুখ খানা। নিজের মনের ভেতর অবাক বিস্ময়ে ডুবে গিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রামের বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নারদ মুগ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ আমি আবার এলাম, না এসে পারলাম না।

রামের অধরে স্নিগ্ধ হাসির আভাস। মৃদু স্বরে বলল ঃ কি এমন জরুরী দরকার পড়ল দেবর্ষি।

নারদ স্থির দৃষ্টিতে রামের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে মৃদু একটু হেসে বলল ঃ তুমি বোধ হয় জান না, ভরত তোমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে আসছে। সঙ্গে আছে তার ছোটরাণী কৈকেয়ী, বশিষ্ঠ এবং অযোধ্যায় সশস্ত্র চতুরঙ্গ বাহিনী, আরো আছে অযোধ্যার কিছু বিশিষ্ট জনগণ। তাদের আগমনের সেই শুভ সংবাদ আমি দিতে এসেছি।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে নারদের মুখের দিকে তাকাল রাম। তাকে খুব চিন্তিত এবং বিমর্ষ লাগল। নারদের আগমনে তার মনে যে রহস্যময় অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন এক ফুৎকারে উড়ে গেল। তীব্র অপমানে বুকটা তার টাটাতে লাগল। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার মুখখানা। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল তার মনের ভেতর। হঠাৎ একটা অস্বস্তি, অজানা ভয়ে তার সর্বশরীর কণ্টকিত করে তুলল। নারদের 'শুভ সংবাদ' কথাটা উচ্চারণে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ টের পেল সে। তাতে মনটা ফুঁসে উঠল। কিন্তু নিজের সে অসন্তোষকে দমন করল। ললাটে চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হল। ভুরু কুঁচকে গেল। আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল শু—ভ—সং—বাদ কেন? চিন্তিত কথাগুলো শেষের দিকে অত্যন্ত কঠোর শোনাল।

রামের কথার ঝাঁঝে তার মনের অবস্থাটা টের পেয়ে বোধ হয় নারদ কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল ঃ তাদের আগমনে ভয় পেওনা। এই পরিদর্শনের আড়ালে আছে এক প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

অবাক স্বরে রাম জিগ্যেস করল ঃ তাহলে এই সংবাদ আমার কাছে কোন্ শুভ সমাচার বহন করে আনল দেবর্ষি?

রামের প্রশ্নে নারদ বিব্রত বোধ করল। ভুরু কুঁচকে গেল তার। আরক্ত অস্বস্তিকর মুখে রামের দিকে তাকিয়ে কথা খুঁজতে লাগল। ঠোঁটের কোণ দুটি শক্ত দেখায় এবং দৃষ্টিতে কেমন একট অসহায়তা ফোটে। তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরীর দ্বার খুলে যায়। সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটি স্ফুরিত ঝংকার বেজে উঠে যেন। অমনি একটা পরম স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল মুখে। মৃদু মৃদু হেসে বলল ঃ জনরোষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃংখলা ভরতের জীবনে অভিশাপ হয়ে উঠেছে। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়ে অনুগত ভ্রাতার মত সে তোমার করুণা প্রার্থনা চাইতে আসছে। তোমার বিজয়ের এই শুভ সমাচার বহন করে এনেছি রামচন্দ্র।

তবু চিন্তার ঘোর কাটল না রামের। নানা আতঙ্কিত সংশয় ও জিজ্ঞাসা তার মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে উঠল। অন্যদিকে তাকিয়ে রাম চিন্তিত স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল ঃ সৌহার্দ্য সফর করতে ভরতের চতুরঙ্গ বাহিনীর দরকার হল কেন? রামের স্বরে

যুগপৎ দ্বিধা ও উদ্বেগ, পরমুহূর্তে গলার স্বর বদলে বলল ঃ রাস্তাটা ভাল নয়, রাক্ষস অসুরের আক্রমণ আশঙ্কায় হয়ত সসৈন্য আসছে।

রামের অনুভূতি সমূহ তখন অতি তীব্র আলো অন্ধকারে নিকষ এবং ঝলকানো যা অনেকটা দ্রুতগামী মেঘের মত পলকে পলকে আকৃতি বদলায়, স্থির থাকে আবার চাঁদের আলোয় ঝলকিয়ে উঠে। নারদ রামের উদ্বেগ, দুর্ভাবনা লক্ষ্য করে বলল ঃ শত্রুতাব সন্দেহে নিষাদরাজ গুহ নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করে সন্দেহহীন হয়ে তবে ছাড়পত্র দিয়েছে। তোমার যাত্রাপথের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু তাতে করেও ভরতের মনের আসল অভিপ্রায় ধরা পড়ে না।

রামকে এমনিতে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। নারদের কথায় তার উদ্বেগ বাড়ল। অসমাপ্ত কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। নারদের কথা থেমে যাওয়ার মুহূর্তের নীরবতার মধ্যেই রাম উৎকর্ণ বিবর্ণ মুখে অস্ফুট উচ্চারণ করল ঃ দেবর্ষি!

নারদের অধর প্রান্তে একটা অদ্ভুত হাসি হাসি ভাব ফুটে উঠল। বলল ঃ বিনা প্রতিবাদে নির্বাসন মেনে নিলেই, সে অন্যের চোখে মহান হয়ে উঠে না। তুমিও মহান ভ্রাতা হতে পারলে না ভরতের চোখে। তোমার বনবাস গ্রহণকে সে হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারে রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস বলে মনে করে।

রাম গম্ভীরভাবে কথাগুলো ভাবছিল। আচ্ছন্নতার মধ্যে চোখ টান টান করে মাথা নাড়ছিল। যার অর্থ নানাবিধ এবং অপরিচ্ছন্ন। নারদ রামের মুখের দিকে স্থির অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। রামের মনের প্রতিক্রিয়ার ইন্ধন দেবার জন্যে বলল ঃ ভরতের বিশ্বাস, রাবণের বিরুদ্ধে আর্যাবর্তের রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করতে কার্যতঃ তুমি ব্যর্থ হয়েছ। তোমার সুনাম তাতে কিছু ক্ষুন্ন হয়েছে। নিজের এই অগৌরব এবং রাজনীতি ব্যর্থতা গোপন করতে তুমি কৈকেয়ীর নির্বাসন প্রস্তাবকে আত্ম গোপনের একটি সুন্দর উপায় করে তুলেছ। ভরত তার বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে বনবাসের উদ্দেশ্য শক্তি সংগ্রহ করা। আর্যাবর্তের যেসব নৃপতিকুল তোমার রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা মনে করেছে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই তুমি রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাসে এসেছ।

রামচন্দ্র চমকে উঠল। অবাক ভ্রূকুটি চোখে নারদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় ব্যাথায় দুঃখ যন্ত্রণায় তার বুক মোচর দিচ্ছিল। এতো তার মনের অভ্যন্তরের কথা, যা সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মনের কথা বাইরে কেমন করে রাষ্ট্র হল? নিঃশব্দ আর্তনাদ যেন একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস হয়ে বুক থেকে উঠে এল। দীর্ঘশ্বাস মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ ভরত আমার জীবনের দুরন্ত অভিশাপ। মহা পৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তাতে সবচেয়ে বড় বাধা ভরত। রাজ্য, প্রাসাদ, ঐশ্বর্যর অদ্ভুত মোহ ত্যাগ করে বনে এলাম সে কি শুধু কলঙ্কের জন্য।

নারদের মুখ অনির্বচনীয় হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। মৃদু স্বরে বলল ঃ বিষ ঢালার একটা জায়গা'ত চাই। তোমার সরল অকপট ভ্রাতৃপ্রেম মূলধন করে সে তোমাকে

অযোধ্যায় নিয়ে যেতে আসছে। তুমি তাকে ফিরিয়ে দেবে না এই বিশ্বাস তার আছে। কেন তোমাকে ফেরাতে চায় এই প্রশ্ন করবে না, তুমি সে তা জান। এ হল ভ্রাতৃভক্ত ভরতের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি।

রামের মুখ চোখে ভ্রূকুটি সন্দেহ। চোয়ালের হাড় বড় শক্ত হওয়ার উপক্রম হল। গলার স্বরে প্রস্ত জিজ্ঞাসু অভিব্যক্তি। কি রকম ?

নারদ রামের মনের প্রতিক্রিয়া এবং গতি পরিমাপ করে স্থান কাল ও পরিস্থিতি থেকে কথাগুলো বলছিল দেবতাদের প্রত্যাশার অনুকূলে রামের মনোভূমি তৈরীর জন্য। রামের প্রশ্নে নারদ একটু থামল। বলল ঃ তুমি এত সরল যে সাধারণ কথাটাই বুঝতে পার না। অযোধ্যায় তুমি ফিরবে না, এই কথাটা তোমার মুখ দিয়েই কবুল করতে চায়। এতে তার সিংহাসনের অধিকার অযোধ্যার সব অসন্তোষের একটা সন্তোষজনক সামাল দেখা যাবে। ভরত অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং চালাক। তার আগমনকে এবং আবেদনকে আন্তরিক এবং অকপট করতেই ছোট রাণী, বড় রাণী এবং অমাত্য বর্গকে সঙ্গে এনেছে। মিথ্যে মায়ায় তোমাকে বিভ্রান্ত করার কৌশল সম্পর্কে তোমাকে সজাগ এবং সতর্ক করার জন্যে পরম মিত্র হয়ে এসব কথা বললাম। কিন্তু দেব-লোকের গুপ্তচরের ধারণা একটু স্বতন্ত্র। অজ্ঞাত বাসের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার নেপথ্য চক্রান্ত করছে রাবণের ঘনিষ্ঠ বান্ধব কেকয় অধিপতি। ভ্রাতৃত্ববোধের মায়া-ডোবে বিভ্রান্ত করার নীতি সত্যিই যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে তোমার যথার্থ সতর্ক এবং সাবধান হওয়ার দরকার আছে।

দেবর্ষি ! চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল রাম।

এমন সময় লক্ষ্মণ হন্ত দন্ত হয়ে সেখানে এল। নারদকে অগ্রজ রামের সঙ্গে আলাপরত দেখে একটু বিস্মিত হল। কয়েকমুহূর্ত্ত থাকার পর বলল ঃ আকাশে ধুলোয় ঝড় উড়িয়ে ভরত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছে। খাঁড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে উচুঁতে উঠা কষ্টকর এবং বিপজ্জনক ভেবেই সৈন্যবাহিনীকে অরণ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে সে ছোট রাণী বড় রাণীকে নিয়ে পদব্রজে এদিকে আসছে। সঙ্গে কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং কেকয় রাজ্যের অমাত্য প্রধান সুবীব। ভাইয়া, শঠ কপট, ভ্রাতার মুখ দর্শন করাও পাপ। সে আমাদের বড় শত্রু। শত্রুর সঙ্গে কোন সন্ধি আমি করব না। তাকে বধ করলেও ভ্রাতৃহত্যার কোন পাপ আমাদের হবে না। অগ্রজের আদেশ পেলে এখনই তাকে শমন ভবনে পাঠাব।

লক্ষ্মণের বাক্যে রাম চমকে উঠল। একটা সুনিবিড় ব্যাথায় তার বুক টনটন করে উঠল। মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করে বলল ঃ ছিঃ লক্ষ্মণ এ কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারলে ? একটু কষ্ট হল না ? তুমি কি রক্ত মাংসের তৈরী পাষাণ মূর্ত্তি ? একবারও মনে পড়ল না, আমরা এক পিতার সন্তান। আমাদের দেহে একই রক্ত ধারা বইছে। তবু কোন রক্তের টান অনুভব করলে না ? ভয়ংকর স্বার্থের দ্বন্দ্বে তুমি'ত আমাকেও হত্যা করবে ?

ভাইয়া ! লক্ষ্মণ আর্ত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করল। ভরত ও ছোট রাণীর ভালবাসা,

সমবেদনা ও স্নেহের ফাঁক ও ফাঁকিতে আমি অসহিষ্ণু বিদ্রোহী। মনটা সত্যিই ঘৃণায় পাথর হয়ে গেছে। তাই বোধ হয়, এত মমতাহীন আর নিষ্ঠুর হয়েছিলাম।

ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙাব বলে বনে আসিনি। স্বার্থ নিয়ে যুদ্ধ করতেও নয়। সংঘাত ভাইয়ে ভাইয়ে নয়, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, অত্যাচারের সঙ্গে বিবেকের। অথচ, সেই বিবেককে বিভ্রান্তি বশতঃ তুমি হত্যা করতে উদ্যত। মনে রেখ বনবাস আমাদের অনুশাসন পর্ব। অনেক ধৈর্য্য, সংযম, অধ্যবসায় এবং কঠিন দুঃখ বরণের বহু পরীক্ষা দিতে হবে। বিভ্রান্তি শুধু শত্রুর হাত শক্ত করবে। আমাদের লক্ষ্য আর্যাবর্তের বিস্তৃতি, উন্নতি, সমৃদ্ধি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষস শক্তিকে পদানত করা আমাদের শপথ। রাক্ষস ছাড়া আর কেউ শত্রু নয় আমাদের। অরণ্যকে আমাদের অনরন্য হত্যার প্রতিশোধের মুক্তাঞ্চল করে তুলব।

লক্ষ্মণ অপরাধীর মত মাথা হেঁট করল।

নারদের স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল।

আশ্রমের খুব কাছাকাছি হতে কৈকেয়ীর কেমন একটা দ্বিধা আর জড়তা দেখা দিল। তাকে মোটেই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না। কৈকেয়ী পাহাড়ের উপরে উঠতে বেশ হাঁফিয়ে পড়েছিল। বড় বড় শ্বাস পড়ছিল তার। এক আচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে করতে সে যেন টলতে টলতে হাঁটছিল। মাণ্ডবীকে ধরে সে আসছিল।

গাছের ফাঁক দিয়ে নির্নিমেষ চোখে তার অবস্থাটা দেখতে লাগল রাম। ভরত কুঞ্জবীথি দিয়ে আগে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করল। রাজকীয় পরিচ্ছদে আর অলঙ্কারে শোভিত তার তনু। সেই পোষাকে ভরতের দেহের সব কিছু ঢাকা। সূর্যের আলো পড়েছে তার গায়ে, চোখকে ঝলসে দেয় তার দীপ্তিতে। ঢুকবার আগে বার দুই তাকাল।

সীতা বড়রাণী ছোটরাণী এবং মাণ্ডবীর আগমনের সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হল। কুটীর থেকে ছুটে গেল তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে।

রামচন্দ্র এক স্থবির বৃক্ষের মত নিজের জায়গায় অবিচল বসে থেকে তাদের আগমনের দিকে চেয়ে রইল। তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই, অনুভূতি নেই, চোখে দৃষ্টি নেই।

স্নিগ্ধ ছায়ার মত স্নেহময়, মোহময় এবং জড়বৎ। মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব কখন যেন নেমে এল। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন, না অনেক কালের অনেক ঘটনা ও দৃশ্য তাকে স্মৃতি ভারাক্রান্ত করেছে বোঝা গেল না।

ভরতকে দেখে রামচন্দ্রের বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল। তবে কি পিতা নেই? পিতৃবিয়োগের এই খবর জানাতে ভরত এত পথ কষ্ট করে তার কাছে আসছে?

রামের মুখে গভীর বিষাদ ও শোক থমথম করতে লাগল।

ভরত রামের কাছাকাছি এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথায় বিরাট জটাভার রামের রূপ বদলে দিয়েছে। মুনিঋষির মত সৌম্য শান্ত, গম্ভীর। সে চেহারায়

চুম্বক আকর্ষণ প্রেমোপলব্ধির গভীরে নিয়ে গিয়ে মন প্রাণকে অভিভূত করে দেয়। ভরতও আচ্ছন্ন। কি করবে তা ভেবে স্থির করতে পারল না।

রামের দিকে সাপের চোখের মত তীক্ষ্ন এক জোড়া কুটিল চোখ চেয়ে ছিল। সে চোখ নারদের। ঘটনায় আকস্মিকতায় রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের আশঙ্কা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে সামাল দেয়ার জন্যে নরুণের মত ধারাল চোখ মেলে সে রামের দিকে তাকিয়েছিল। নারদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। নারদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি তীরের ফলার মত বিঁধল। রাম দৃষ্টি সরিয়ে নিল ভয়ে। লজ্জায়? কে জানে? রামচন্দ্র হাহাকারের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল ঃ পিতা?

ভরতের বুক কাঁপল। সে আঁখি নত করল। বিবশ হয়ে মাথা নাড়ল। ভরতের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র কেমন দিশাহারা হয়ে গেল। আচমকা শিয়াল ডেকে উঠল। বায়স কর্কসস্বরে ডাকতে ডাকতে গাছের শাখা দুলিয়ে উড়ে গেল। রামচন্দ্রের মনে হচ্ছিল তার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন খামচে ধরেছে। চোখে জ্বালা। বুকের ভেতরটা পাথরের মত ভার। ভরত তাকে যেন এক গহ্বরে ঠেলে নিয়ে গিয়েও ফেলে দিল না শেষ অবধি।

মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বার হল না আর। যত সময় যাচ্ছিল, ততই বুকের ধক্ ধক্ বাড়তে লাগল। চোখে জল এল। এক বুক ভালবাসা টলটল করে উঠল তার হৃদয় সাগরে। স্নায়ুগুলো টান টান স্পর্শকাতর হয়ে উঠল। পিতার মৃত্যুর মধ্যে সে তার নিজের নিষ্ঠুরতাকে দেখতে পেল। এই মুহূর্ত্তে চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলতে ইচ্ছে করল ঃ আমি খুনী। পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমি। অসুস্থ, রুগ্ন, মুমূর্ষু পিতার প্রতি মানবিক কর্ত্তব্যটুকু পর্যন্ত করিনি। আমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান তাঁর মৃত্যুর একমাত্র কারণ। আমিই তাকে বেঁচে থাকতে দিইনি।

ভরত একটু স্থির চোখে রাম এবং আশ্রমের পরিবেশ লক্ষ্য করল। রাম একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ভারী অদ্ভুত অবস্থা তার। চোখের পাতা ভারী। মুখ থমথমে। ভরতের ভিতর নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। বিহ্বল, হতভম্ব চোখে রামের মুখের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ তার মনের ভেতর একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। বিনীত মুখোশ এঁটে রাম পিতৃভক্তির অভিনয় করেছে। পুত্রবৎসল পিতা তাই তার অবহেলা সইতে পারল না। পরক্ষণেই অবশ্য ভরতের মনে হল একথা ঠিক নয় যে কেউ তাঁর বেঁচে থাকা চায়নি। চেয়েছিল কেউ কেউ। তবে তাদের চাওয়ার ভাব ছিল অন্যরকম। কিন্তু দশরথ চেয়েছিল একজনের। মাত্র একজন তাকে চাক। সে রাম। হায়রে, সে না চাইলে দশরথ বেঁচে থাকে কি করে? ভরতের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। নিজের মনে একসময় রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ প্রাণ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যদি কেউ চাইত তবে পিতার মৃত্যু হত না। আমরা সকলে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তাঁর স্নেহ প্রেমের অপমান করেছি।

ভরত! সংজ্ঞাহীনতার গভীর সমুদ্র থেকে যেন চেতনার বেলাভুমির উপর

আছড়ে পড়ল রামচন্দ্র। বুক থেকে সহসা একটা আর্ত্তনাদ যেন হাহাকারের দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল ভরতকে। বুকের ভেতর তার অভিমানের সাগর উথলে উঠল। ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় অভিমানে সে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সংযম হারিয়ে বলল ঃ পিতার উপর তোমার এত ঘেন্না কেন? এত ঘেন্না কি একজন পুত্র তার পিতাকে করতে পারে? অথচ জীবনে এত স্নেহ, মমতা, আদর, ভালবাসা তাঁর কাছ থেকে আর কোন পুত্ররা পাইনি। ভাগ্যবান সেই পুত্রের নিদারুণ অবহেলার দুঃখ স্নেহ বৎসল পিতার মৃত্যুর কারণ। স্বর্গত পিতার মৃত আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যে তোমাকে অযোধ্যায় যেতে হবে।

মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সে শুকিয়ে যায়। তাম্রাভ হয়ে উঠে। রামের মুখে চোখে সেইরকম একটা ভাব। চোখ দুটোয় তার একটা আবির্ভাব ফুটে বেরোল। কথা বলার মত মনের অবস্থা ছিল না। ইচ্ছেও হল না। একটা অপরাধবোধে এমনিতে বুকের ভেতর টনটন করছিল। ভরতের অভিযোগ, সেই অস্বস্তি ও গ্লানিবোধ প্রগাঢ় হল। চিত্ত আচ্ছন্ন করল। সে কোন কথা বলল না।

ঘটনার নীরব দর্শক নারদ। ভরতের বাক্যে রাম কেমন যেন হয়ে গেল। তার দুটি ছলছল চোখ পেতে রাখল ভরতের মুখের উপর। আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠায় নারদ বিব্রতবোধ করল। নারদ অনুভব করতে পারছিল, রামের সমস্ত সত্তার একমুখীস্রোত দুরন্ত এক গতি নিয়ে ভরতেব দিকে চলেছে। উজান বইবার শক্তি তার যেন নেই। অথচ সে এক অমোঘ লক্ষ্য পূরণ করতে বনবাসে এসেছে। নিয়তির নির্দেশ। কিন্তু ভরত তার দুর্বল ভাবপ্রবণতার উপর যে মোক্ষম আঘাত হেনেছে তাতে তার অন্তরের সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। কী করবে রাম, কে জানে?

নারদের ভিতরকার বুদ্ধিমান বিবেচক কূটজ্ঞ মানুষটি একটা কিছু ঘটনার আগে তাকে সতর্ক ও সাবধান করে দেবার উদ্দেশ্যে বলল ঃ যা ঘটার ঘটেছে। অযোধ্যায় ফিরলেও তার ক্ষতি পূরণ হবে না। বরং রামচন্দ্রের গৌরব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। লোকের চোখে সে ছোট হয়ে যাবে। রামের নিজস্ব আদর্শ, ধর্ম, মহত্ব বলে কিছু থাকবে না। অনেক কলংক লাগবে চরিত্রে। নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়ানো রামের আর উচিত নয়।

নারদের চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। নারদের চোখের ফাঁদে ধরা পড়ল রাম। সম্মোহিত অবস্থা তার। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর টের পাচ্ছিল, তার ভিতরের আগুনটা ভরতের এক ফুৎকারে নিভে গেছে। কিছুতে সে উত্তপ্ত হতে পারছে না। কিন্তু কি নিবে গেল? কিসের আগুণ? এমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন ভেতরটা? নারদের কথায় হঠাৎ টান টান সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভিতরকার নিবন্ত আগুণের উপর এক ঝলক বাইরের বাতাস লাগলে যেমন তা গণগণে হয়ে উঠে তেমনি নারদের কথায় তার মনমরা ভাবটা এক নিমেষে অন্তর্হিত হল। ভরতের চোখের উপর নিষ্প্রভ দুটি

চোখ রেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত গম্ভীর গলায় বলল: পিতৃহীন অযোধ্যায় ফিরে যেতে আমি পারব না। কোন মুখে ফিরে যাব সেখানে? জনতাকে কি বলব? জীবিত অবস্থায় পিতা যা দেখেছেন, জেনেছেন, মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা কি দেখতে পায়, অবাধ্য পুত্র তার কথা রাখার জন্যে অযোধ্যায় ফিরেছে? মৃত্যু মানেই এক বৃহৎ অন্ধকারে ডুবে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, নিঃস্ব হওয়া। জীবদ্দশায় যা পারিনি, মৃত্যুর পর তা কেমন করে করব? তুমি ফিরে যাও! তুমি ফিরে যাও! পিতার রাজ্য শাসনের সব কর্তৃত্ব দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। আমার আশীর্বাদ, স্নেহ, সহযোগিতার কখনও অভাব হবে না।

ভরত নির্বাক বিস্ময়ে রামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রামের পক্ষে কথাটা বলা যত সহজ হল, তার পক্ষে ব্যাপারটাকে হজম করা অনেক শক্ত হল। কারণ রামের প্রত্যাখ্যান অযোধ্যায় তার অস্তিত্বের ভিত্তিমূলকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। কেমন করে সে রাম ছাড়া অযোধ্যায় ফিরবে সেই চিন্তায় বিমর্ষ এবং হতবাক হল। প্রজারা কেউ তার বশে নেই। অথচ তাদের মনোরঞ্জনের জন্য, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য ভরত করেনি এমন কোন কাজ বাকি নেই। তবু তার কর্তব্যের প্রতি তাদের সন্দেহ, অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত ছিল। অথচ রামচন্দ্র তার কোন সংবাদই রাখে না। রামের কাছে অকপটে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করতে তার সরমে বাঁধল। সম্ভ্রমে লাগল। ভরতের মুখে গভীর বিষাদ ও একটা নিরুপায় অসহায়তা থমকে ছিল।

রাম ও দশরথের অবর্তমানে ভরতকে রাজ্যের হাল ধরতে হল। ইচ্ছেয় অনিচ্ছায় তাকে শাসনকার্যে জড়িয়ে পড়তে হল। রাজ্যে অশান্তি, বিশৃংখলার আশু নিষ্পত্তি সাধনে তাকে দীর্ঘকাল ধরে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হল। একটা দারুণ সংকট থেকে রাজ্য ও রাজনীতিকে টেনে দাঁড় করাল। আর তারই পুরস্কার স্বরূপ তাকে জড়িয়ে প্রজারা একটা রটনা শুরু করল। রামচন্দ্রর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ভরতের কাম্য নয়। তার মনে এখন ক্ষমতা লোভের বাসনা প্রবল। মুকুটের প্রতি তার অসীম মোহ, তাই রাজদণ্ড হাতে পেয়ে আর ছাড়তে রাজী নয়। রামের মাথা থেকে রাজমুকুট নিজের মাথায় সরিয়ে নেয়ার জন্য সে ব্যাকুল। তাই, রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টাই করছে না। জনতার চিত্তকে রামচন্দ্র থেকে সরিয়ে আনার জন্য বহু জনকল্যাণকর কাজ করছে। অনেককাল ধরে অযোধ্যা থেকে চিত্রকুটে যাওয়ার দীর্ঘ সড়ক রাস্তাটা সে তৈরী করছে। এ সবই জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল। ক্ষমার উত্তাপে তার ভিতরের ঘুমন্ত রাজাটা তার সকল আকাংখ্যা নিয়ে জেগে উঠেছে। তাই, অকারণে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে সে দেরী করছে। এমনি করে ভরত রাজনীতির দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ল। তার সৎ প্রচেষ্টা ও উদ্যমের মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক ছিল যা কোন কিছু দিয়ে সে ঢাকতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের ভাল এবং জনতার মঙ্গল ও উন্নতি করতে গিয়ে সে নিজের অজান্তে ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। জিতবার জন্যে নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্যে এমন মূল্য

নেই যা ভরত দেয়নি, তবু অযোধ্যার জনগণের চোখে সে অপরাধী, দোষী। এই বেদনা রামচন্দ্রের প্রত্যাখ্যানে ভরতের বুকে আরো গভীর ঝংকারে বাজল। এখন যে কী করবে ভেবে স্থির করতে পারল না। রামচন্দ্রের কথার কোন জবাব দিল না ভরত। অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর বুকের ভেতর থেকে অবরুদ্ধ জিজ্ঞাসাটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এল। মৃদুস্বরে বলল ঃ আমার অপরাধ কি? ভাগ্য আমার অন্যপথে নিয়ে গেল কেন? আমার জীবনে অনিচ্ছুক আত্মনির্যাতনের পালা কেন আরম্ভ হল? কার দোষে তার সূচনা? আমিও চাইনি তবু কেন রাজ্যের বোঝা আমার উপর চাপল? দেশ শাসনের জন্যে আমি'ত নিজেকে তৈরি করিনি। তবে কিসের মোহে এই ভার বয়ে বেড়াব? কার স্বার্থে? শাসন করতে গিয়ে প্রতিপদে নিজের দীনতা বুঝতে পারি। অনেক সমস্যার প্রকৃত অর্থই আমি বুঝতে পারিনি। প্রতিদিন প্রকাশ্যে সবার কাছে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে ঢাকতে নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেছে। রাজনীতিতে রুচি নেই। শাসনে উৎসাহ নেই।

রামচন্দ্রের অধরে বিচিত্র কৌতুক হাসি স্ফুরিত হল। মধুর কণ্ঠে বলল ঃ ভরত, তুমি নিজের উপর আস্থা হারিয়ো না। একবার যদি হারিয়েছ তা-হলে তলিয়ে গেলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ভরত বলল ঃ আমারও তাই মনে হয়। জনতার আস্থা, শ্রদ্ধা, ভয় আমার আয়ত্তে নেই। অথচ এগুলি হল রাজ্য পরিচালনার চাবিকাঠি। আমি এখন কি নিয়ে তোমার শূন্যস্থান পূরণ করব? শাসনকার্যে আমি আর নিজের গৌরবে অধিষ্ঠিত নেই। তুমি ছাড়া অযোধ্যার রাজকার্য অসম্ভব।

রাম জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। বলল ঃ বহু সাধ্য-সাধনায় যে মায়া, মোহ, লোভ আমি কাটাতে পেরেছি তার মধ্যে আমাকে ফিরে যেতে অনুরোধ কর না। দেশ চালনার দায়িত্ব ঈশ্বর তোমাকেই দিয়েছে। তোমাকে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি জানি, অযোধ্যার শাসন দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা একমাত্র তোমার আছে।

তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এখনও আমার উপর রাগ করে আছ বলেই, এমন করে পরিহাস করতে পারছ।

রামচন্দ্র নীরব। কিছুক্ষণ চিন্তার মধ্যে কাটল। তারপর আস্তে আস্তে বলল ঃ শকুন্তলার আংটির গল্প মনে আছে? আংটি শকুন্তলার পরিচয়পত্র। আংটি হারাল'ত শকুন্তলাও রাজার স্মৃতি থেকে মুছে গেল। আবার যখন হারানো আংটি ফিরে পেল তখন দুষ্মন্ত বলল ঃ প্রিয়ে আংটি দেখে তোমাকে মনে পড়ল, তোমাকে চিনলাম।

রামের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভরত বলল ঃ দুষ্মন্তের আংটির মত তোমার পাদুকাদ্বয় আমাকে দাও। সিংহাসনে তোমার নিজের গৌরব পাদুকা অধিষ্ঠিত করব। তখন রাজাদেশ মান্য করতে কারো আপত্তি থাকবে না। সবাই রামের পাদুকা চিনবে, মানবে, ভয় পাবে এবং শ্রদ্ধা করবে। রাজকার্যে কোন বিঘ্ন হবে না। আমিও কৈফিয়ৎ থেকে নিস্কৃতি পাব।

রামচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। ভরতের

ক্ষমতা লিপ্সা রামচন্দ্রকে আশ্চর্য করল। ভরতের শাসনে অনেক দোষ, স্খলন, জনগণ জানতে পেরেছে। তবু ক্ষমতা ত্যাগের প্রশ্ন তার মনে তেমন দানা বাঁধেনি, খর্বিত জনশ্রদ্ধা নিয়েও সে পাদুকার জোরে ক্ষমতায় আসীন থাকতে চায়। ক্ষমতার নেশা এমনই যে একবার পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। এক নিদারুণ মোহে রাজ-ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য ভরত তার পাদুকা প্রার্থনা করল। ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেনি বলেই সে মোহ কাটিয়ে উঠতে পারল না। ক্ষমতার অনির্বাণ নেশা সে পাদুকা নিয়ে চরিতার্থ করতে চায়। পাদুকা তার দুর্বলতা, ব্যর্থতা ঢাকার রাজনৈতিক হাতিয়ার।

ভরতের প্রস্তাব শুনে রামচন্দ্র হ্যাঁ না কিছুই করল না। নীরবে পাদুকাদ্বয় খুলে ভরতের হাতে সমর্পণ করল।

॥ আট ॥

মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে ছিল রাবণের অবাধ কর্তৃত্ব। রাক্ষসভূমি দণ্ডকারণ্য দেখা-শোনা করত রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই খর ও দূষণ। চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে এই অঞ্চল পাহাড়া দেয়। তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে বাইরের কোন শত্রুর প্রবেশের সাধ্য ছিল না। তথাপি ঋষিরা এই অরণ্যের অন্তর্গত চিত্রকূটকে রাবণ বিরোধী কার্য-কলাপের এক গোপন রাজনৈতিক যোগসূত্র করতে রামকে পাঠাল সেখানে।

একজন সাধারণ তাপসের বেশে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করল। মাথায় তাদের জটাভার, পরণে সাধারণ বসন, গায়ে উত্তরীয়। আর, বন্য-প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে একটি ধনুর্বাণ রেখেছিল। সীতারও অঙ্গে ছিল না আভরণ। তাদের দীন, হীন নগণ্য সাধারণ তাপসের ছদ্মবেশ দেখে কারো পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না এরাই সেই ভাগ্য বিড়ম্বিত অযোধ্যার রাজপুত্র এবং রাজবধূ। প্রত্যেকে নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখতে যত্নবান ছিল। সাহস, বিক্রম পাছে প্রকাশ হয় এজন্য ভুলেও বনের পশু বধ করল না। ফল-মূল অন্বেষণের সময় কোন রাক্ষস তাদের উত্যক্ত এবং বিরক্ত করলে দৈহিক বলপ্রকাশ থেকে বিরত থাকত। সংঘর্ষ সংঘাতকে সব সময় এড়িয়ে চলত কৌশলে। ফলে আগন্তুকের প্রকৃত পরিচয় গুপ্তচরেরা পায়নি। সন্দেহ তাদের মনে কখনও দাগ কেটে বসেনি। কিন্তু ভরতের আগমনে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। এতকাল ধরে যা ছিল প্রচ্ছন্ন তা হয়ে গেল প্রকাশ্য। রামের চিত্রকূটে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

ঋষিরা ভীষণ সমস্যায় পড়ল। রামকে রক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা তারা করল। তরুণ তাপসরা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসদের প্রতিক্রিয়া ও তাদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ন নজর

রাখল। কিন্তু দিনে দিনে অবস্থা দুঃসহ হয়ে উঠল। রাম সব দেখে শুনেও নীরব রইল।

দণ্ডকারণ্যে রামের আগমন সংবাদ রাবণও জানল। কিন্তু নিরস্ত্র নির্বান্ধব রাম লক্ষ্মণ তার কোন শত্রুতা করতে পারে এরকম কোন ভাবনা তার মাথায় ঢুকল না। রামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্যেই তার আগমন এবং কার্যকলাপের কোন গুরুত্ব দিল না। তার ওপর নজর রাখার অর্থই হল তাকে যে ভয় করে সে এবং তার শক্তিকে সমীহ করে এরূপ একটা ধারণা তৈরী হওয়া। এতে শত্রুর সুবিধে হয়। কালক্রমে তার নিজেরও স্নায়ু সংকট দেখা দিতে পারে। ভয় থেকে এক ধরনের স্নায়ু দুর্বলতা জন্মে ; যা মনোবলকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। তাই, রামের কোন চিন্তাই রাবণ মনে স্থান দিল না। বরং, রামকে বেশি উপেক্ষা করে নিজেকে সে ভয়মুক্ত করতে চাইল। ভরতের আগমন ও প্রত্যাবর্তন তাই কোন গুরুত্ব পেল না।

রাবণের মনে রামের দণ্ডকারণ্যে আগমন নিয়ে যে নানা প্রশ্নের যন্ত্রণা হয়নি তা-নয়। কিন্তু তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো তার স্বভাব নয়। আগের মত সামান্যতেই দম্ভ কিংবা ক্রোধ দেখায় না। বরং, কেমন যেন একটা ভয় পেয়ে গেছে। রামের হাতে তাড়কার অবিশ্বাস্য মৃত্যু তার মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে। রামের সৌভাগ্য সাফল্য, লোকশ্রুতি ক্রমেই তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। একা রামচন্দ্র তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন কায়দায় তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে চায়। যা এর আগে কখনও আর্যাবর্তে কিংবা দক্ষিণাপথের রাজনীতিতে কোন নরপতি করেনি। মানে এখনও পর্যন্ত করতে সাহসী হয় নি। রামের স্পর্ধা ও সাহস মন্ত্রীবর সারণকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। কয়েকদিন ধরেই তার অস্বস্তিতে কাটল। রাবণকে সতর্ক সাবধান না করা অবধি সারণ মনেতে শান্তি পাচ্ছিল না। কথা বলতে গিয়ে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। সমগ্র যুক্তিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রিত করে বলল: রাজন, রাজনীতিকে অমন ভয়ংকর ঔদাসীন্য দিয়ে গ্রহণ করতে নেই। খোলাখুলিভাবে আপনি কখনও আমার কথা শুনতে চান না। শুনলেও তার গুরুত্ব দেন না। যদিও আমি সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি, আপনাকে আগলে বেড়াই।

সারণের সহানুভূতি রাবণকে মুগ্ধ করল। মনটা যে তার এত গভীর মমতায় পরিপূর্ণ আগে কখনও টের পায়নি, আজ পেল। সরল দুই চোখে তার কৌতুক। সহাস্যে জিগ্যেস করল: কি রকম?

কারুর কথায় উঠ-বোস করার মানুষ যে আপনি নন, ভাল করে জানি। তবু দেশকে ভালবাসতে বাসতে দেশের রাজাকেও ভালবেসে ফেলেছি। একদিন যে দায়িত্ব, কর্তব্য মাথায় করে নেয়ায় দুঃসাহস আপনার কাছ থেকে পেয়েছিলাম এবং যোগ্যতা অযোগ্যতা সব কিছু নিয়ে যে দায়িত্ব এতকাল আনন্দের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধ্য মত পালন করেছি। আজ সেখানে বিশ্বাসে সন্দেহ, ভালবাসায় অবিশ্বাস জেগে উঠেছে। এ-সব কার সৃষ্টি? কে করছে? কেন করছে—কখনও জানতে চেয়েছেন?

অবনিবনার যে আহ্বান শুনেছি তা কার স্বার্থে, কারা করছে—এ সব অবগত হয়েও আপনি নীরব কেন ?

রাবণের ঠোঁটে অনাবিল হাসি। বলল ঃ কার কথা বলছেন মন্ত্রীবর ? কে সে ? তাকে নিয়ে আপনার দুর্ভাবনা কেন ?

সারণ ঘেমে উঠল। রাবণের সঙ্গে কথা বলাও শ্রমসাধ্য। হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, এমন চিন্তাকুল হল তার মুখচ্ছবি যে রাবণের কথাগুলি তৎক্ষণাৎ জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কাটল। নিস্তব্ধতা জুড়ে রইল রাবণের কক্ষে। সারণের কন্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন শঙ্কা। বলল ঃ খর ও দূষণ আপনার সুনাম ও স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তবু, তাদের চেষ্টায় কাজ হল না। ভরত বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীর সঙ্গে অনায়াসে চিত্রকূট পেঁছিল। খরের উপায় ছিল না তাদের ফেরায় কিংবা প্রতিবোধ করে। ভরতের আগমন নিগমনকে আমি ছোট করে দেখতে রাজি নই।

আমিও কদাচ ভাবি না। রাম আমাকে পছন্দ করতে না পারে, কিন্তু ভরতকে একেবারে বিপক্ষের লোক বলে মনে করি না। ভ্রাতৃভক্তি দেখাতে চিত্রকূটে ভরত আসেনি। রামের মতিগতি জানতে বুঝতে সে বনে এসেছিল।

আপনার অনুমান যথার্থ। কিন্তু ভরত অপেক্ষা রাম চতুর। ভরতের কুম্ভীরাশ্রু-তে তার মন গলেনি। ভরতকে পাদুকা দিয়ে রাম কার্যতঃ অযোধ্যার উপর তার নিজের স্বত্ব-স্বামীত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর ভরতের কোন দাবি রইল না। সে তার মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে শাসনকার্য দেখবে। এর অর্থ রাজনীতিতে সে আর নির্বান্ধব এবং নিরস্ত্র হয়ে থাকল না। অযোধ্যার বিশাল সেনাবাহিনী যে তার পিছনে আছে এই কথাটা শত্রুকে জানান দেবার জন্যে ভরতকে পাদুকা অর্পণ করল। তার কূট রাজনীতির কাছে ভরত কার্যতঃ পরাজিত হল।

ভীরু মানুষের গোপন বিশ্বাসঘাতকতা রামচন্দ্র করেছে। তাকে রাজনীতিতে বিশ্বাস করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। রামচন্দ্রের মত লোকদের ছোট করে যত দূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। তাকে সমকক্ষের সম্মান দিলে সে আরো পেয়ে বসবে। ভয় একবার মনে গেড়ে বসলে তাকে আর তাড়ানো যায় না।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সারণ রাবণের দিকে তাকিয়ে রইল। রাবণ যে কোন ব্যাপারে উদাসীন কিংবা অসতর্ক নয় এই সত্যটা জেনে তার ভাল লাগল। রাবণের তুলনায় রাম নিতান্তই চুনোপুঁটি। সুতরাং তাকে পাত্তা দেয়ার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। কিন্তু শত্রু ছোট বলে তাকে অবহেলা করাও ঠিক নয়। সন্ধানী চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা উচিত রাবণের। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে তার নিঃশব্দ চলাফেরার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বিচার বিবেচনার আবশ্যক। সারণের চিন্তান্বিত দুই চোখের ভুরু কুঁচকে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ রাজন, আপনি তো রামের সব কার্যকলাপের খবর রাখেন না। সে না হয় নাই রাখলেন, কিন্তু চিত্রকূটের মুনি-ঋষিদের অন্তুতঃ বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকবেন না।

রাবণ একটু মুচকি হাসল। কিন্তু তার চোখে মুখে এমন একটা নীরেট গাম্ভীর্য আছে যাকে সকলে সমীহ করে। তার মুখের দিকে চেয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলতে কেউ সাহস পায় না। সারণেরও কথা বলতে বাধ বাধ লাগে। তবু কর্তব্য পালন করতে হয় তাকে। বলল ঃ রামের সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। পিতাকে অসম্মান এবং অপমান থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রাম পিতার কোন অনুরোধ রাখেনি। অথচ ভরতের সামান্য পীড়াপীড়িতে গলে গিয়ে রাম সেই রাজ্য সিংহাসন গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করল না। রামের আশ্চর্য ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়ে ভাবি, এ তার কি ধরনের সত্যরক্ষা ? ভরতের অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করা যায়, বনবাস ছাড়া যায় না। ছাড়লে ধর্ম রক্ষা পায় না। আশ্চর্য তার নীতিজ্ঞান।

রাবণের অধরে মুচকি হাসি। কৌতুক করে বলল ঃ নীতিজ্ঞান বল না, বল, তার রাজনীতিজ্ঞান প্রখর। দশরথ রামের মত রাক্ষসদ্বেষী নয়। অনার্য জননীর পুত্র ভরতও নয় রামের মত বিদ্বেষী। তাই দশরথকে প্রত্যাখ্যান করে রাজনৈতিক সংকট আনল। ভরতের প্রস্তাব গ্রহণ করে সে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিল। অযোধ্যার সামরিক শক্তির উপর ভরতের পরিবর্তে রামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেল।

আর বনবাস ? সারণের উৎকণ্ঠিত রুদ্ধশ্বাস চিন্তা থেকে সহসা কথাগুলো উৎসারিত হল।

সহসা রাবণের কণ্ঠে হাসি যেন উচ্ছকিত হয়ে উঠল। হাসির বেগ সামলাতে সামলাতে বলল ঃ রাবণের পতনের চক্রান্ত করতে সে থেকে গেল বনে। বুঝেছ সারণ, এ তার বনবাস নয়, রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস। উদ্ভিদের মত মাটির গভীরে সে বহু-দূরে পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে।

সারণ অবাক চোখে রাবণের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ঃ রাজন, তবু আপনি নীরব কেন ? কণ্ঠস্বরে আপনার মুগ্ধতাবোধের প্রশান্তি। আশ্চর্য আপনার রাজনীতিবোধ। বনবাসের পেছনে রামের কূট অভিসন্ধিকে অবহেলার চোখে দেখলে একদিন মহা অনর্থ ঘটবে।

রাবণের মুখ শক্ত হল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ রামের মত নগণ্য মানুষকে রাজনৈতিক গুরুত্ব দিতে আমার গর্ব ও অহংকারে লাগে। সে যে আমার ভয়, উদ্বেগ, আশংকা, দুশ্চিন্ত. এই সত্য একেবার প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার লজ্জার অবধি থাকবে না। তাই, নিঃশব্দ নীরবতা আর ঔদাসীন্য দিয়ে তার মনের অভ্যন্তরে আমার সম্পর্কে এক দারুণ ভয় আর ভীতি সঞ্চার করছি। নীরবতা অনেক সময় কার্যর থেকেও তীব্র, গভীর এবং প্রত্যক্ষ।

সারণ হতাশভাবে অনেকক্ষণ ধরে মাথা নাড়ল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে বলল ঃ এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। বাঘের মত সে নিঃশব্দে শিকারকে তাক করে ছুটছে।

রাবণের নির্বিকার মুখে চতুর হাসি। বলল ঃ সমুদ্র পেরিয়ে এসে গোষ্পদে ডুবে মরব এই কি আপনার ধারণা ? রাম সামান্য মানুষ। সমগ্র দক্ষিণাপথের মানুষও

যদি একজোট হয় তাহলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, রামের জন্য আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। এলাকার নিরাপত্তার জন্য খর, দূষণ ও মারীচ যথেষ্ট। তারা যা ভাল বিবেচনা করে, তাই করবে। কিন্তু আমি তার কাছে ছোট হয়ে যেতে পারব না।

॥ নয় ॥

অনেকটা পাহাড়ী পথ হেঁটে বাল্মীকি হাঁফাতে লাগল। জোরে জোরে তার শ্বাস পড়তে লাগল। রামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। রামের মুখ দৃষ্টি আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল : রামচন্দ্র কেমন আছ ? এই অরণ্যভূমি তোমার ভাল লেগেছে'ত ?

রামচন্দ্র খুব বিস্মিত হয়ে বাল্মীকির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। মৃদু মৃদু হাসল। চোখের দৃষ্টিতে তার বুদ্ধির দীপ্তি।

বাল্মীকি গম্ভীর এবং আন্তরিক গলায় বলল : লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্য-নির্বিকার ও আত্মসুখী। নির্জনতার জগতে তার বাস। এই অচেনা দুনিয়ার লোকজনও বড় অদ্ভুত। তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে সেই দুনিয়াকে কতখানি জানলে ? আশা করব, অনেকগুলো মাস ধরে তুমি এখানকার পরিবেশ, মানুষ ও প্রকৃতি দেখেছ এবং বুঝেছ।

রাম তীক্ষ্ম একটা কটাক্ষে দেখে নিল বাল্মীকির মুখ। গম্ভীর হয়ে বলল : আপনাদের সেবা করতে পেরে আমি ধন্য। আপনাদের অপার স্নেহ, মমতা, সহযোগিতা আমার পাথেয়।

বাল্মীকি কি যেন বলবে তা তার মাথায় আসছিল না। রুদ্রাক্ষের মালা গুনতে গুনতে সংকোচে বলল : মুনি ঋষি সকলে তোমার জন্য উদ্বিগ্ন। আমাদের জন্য তোমার অবস্থাটা যে কি রকম তাও জানি। চিত্রকুটের সব মুনি ঋষি তোমার কথা সব সময় বলাবলি করে।

রাম একটু লজ্জা পেল। কুণ্ঠিত স্বরে বলল : ওসব প্রসঙ্গ থাক। আপনি কাজের কথা বলুন।

তুমি কাজের লোক। কর্তব্যবোধে মনটা শক্ত হয়ে গেছে।

রাম মাথা নাড়ল। কোন উত্তর করল না।

বাল্মীকি দিশাহারা হয়ে গেল। বুকটা হঠাৎ ভার ঠেকল। বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে বলল : বৎস চিত্রকুটে মুনি ঋষির প্রতিনিধি হয়ে আমি এসেছি। আমাদের দু'একটা সমস্যার কথা বুঝতে চেষ্টা কর। চিত্রকুট বর্তমানে একটা রাজনৈতিক জট পাকিয়ে উঠেছে। যদিও তুমি আমি বা চিত্রকুটের আশ্রমবাসীরা তার কেউ নয়। তবু আমাদের মধ্যে অনেকেই বলছে তোমাকেই নিয়ে গণ্ডগোল। ভরতের সসৈন্য

আগমনকে রাক্ষসরা ভাল চোখে দেখেনি। খর ও দূষণ মারীচের পরামর্শে এবং ইন্ধনে একটা বড় সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করছে। আমাদের উপর তাদের নানারকম উৎপাত, অত্যাচার লেগে আছে। তুমি সে সব গণ্ডগোলে মাথা ঘামাও না দেখে রাক্ষসদের সাহস আর মনোবল বেড়ে গেছে। তোমার নীরবতাকে তারা দুর্বলতা ভেবেছে। তাই ধৈর্যভঙ্গের জন্য তোমার সহিষ্ণুতার উপর কুঠারাঘাত করছে। আসলে তারা একটা বড় রকম সংঘর্ষ বাঁধিয়ে তুলতে চায়। এ স্থানে থাকা তোমার নিরাপদ নয়।

রাম ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নিজের হাত এবং পেশী দেখল। চুপচাপ বসে রইল। জীবনের সংকট সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা জরুরী ব্যাপার। কিন্তু রামচন্দ্র একা নিজের দায়িত্বে কোন সিদ্ধান্ত কখনও গ্রহণ করেনি। তাই, খর ও দূষণের দৌরাত্ম্যকে নির্বিবাদে সহ্য করেছে। এসব ঘটনা তার চিত্তকে যে স্পর্শ করেনি তা নয়। প্রতিকারের কঠোর ভাবনা মনে এলেও কার্যে অনুসরণ করেনি। তাতে গোটা উদ্দেশ্য এবং সংকল্প বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একটা বিরাট যুদ্ধ তাতে যে কোন সময় লেগে যেতে পারে। তাই কোন ঘটনাতেই সে উত্তেজিত হল না। মৃদু স্বরে বলল ঃ সব সময় তরুণ তাপসদের কেউ না কেউ আমাকে পাহারা দেয়, তাই না ?

আর সেজন্য তারা ভীষণ লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হয়। তথাপি তুমি তাদের প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে যাওনা। নীরবে সহ্য কর। কেন রামচন্দ্র ?

উৎকণ্ঠা এবং দ্বিধায় জোরে জোরে মাথা নাড়ে রামচন্দ্র। বহুক্ষণ ধরে তার একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল, চিত্রকূট ছেড়ে কোথাও তার যাওয়া দরকার। কাছাকাছি নয়। একটু দূরে কোথাও। যত দিন যাচ্ছিল ততই তার এই প্রয়োজনটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ঋষিদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে আর্যাবর্তের গৌরব বৃদ্ধি করতে হলে এরকম অন্য কোন পাহাড়ে তার যাওয়া দরকার। তার নিজের গৌরব এবং মর্যাদাকে ফিরে পেতে হলে কিছু হারানো দরকার। নিজেরও দরকার হারিয়ে যাওয়া। এক আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হল রামচন্দ্র। মাথায় তার এলোমেলো হাজার চিন্তা। চোখবুজে ক্লান্তস্বরে বলল ঃ আজই একটু আগে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

বাল্মীকি কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল। আপনমনে একটু মাথা নাড়ল। তারপর বলল ঃ রাম, আমাদের উপর অভিমান নিয়ে তুমি এসব কথা বলছ না'ত।

না। আমার এবং আপনাদের বিপদের কথা ভেবে এসব বলছি। অনেকদিন ধরে ব্যাপারটা কোন গোলমেলে ছিল না। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। আমি চাই বা না চাই অনেক অন্যায়কে আমার প্রশ্রয় দিতে হবে। আমার চলে যাওয়াই এখান থেকে ভাল। কোথায় গেলে ভাল হয়, সর্বদিক রক্ষা পায় আপনি তার উপদেশ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন।

হঠাৎ শিহরিত হল বাল্মীকি। মুক্তির উল্লাস চোখ মুখকে উজ্জ্বল করে দিল। বলল ঃ অল্পদূরে শবরভঙ্গ মুনির আশ্রম আছে, তুমি সেখানে যাও। ওই বন অত্যন্ত

দুর্গম, মনোরম এবং প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়। ঐ স্থানে তুমি কাজের অবাধ সুযোগ পাবে।

অরণ্যের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল সীতার। অরণ্যকে তার আর ভয় করেনা। প্রথম প্রথম আকাশ আড়াল করা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছপালা দেখলে বুক দুর দুর করত। এর নির্জনতা গভীরতা, বিস্তৃতি তার মনে এক অজানা ভয় সৃষ্টি করত। সব সময় মনে হত এই অরণ্যই একদিন তার কাল হবে। অদৃষ্টে অরণ্যবাস লেখা থাকলেও কোনদিন তার মুখোমুখি হবে না ভেবে রেখেছিল। তবু, অদৃষ্ট দৈত্যের মত হানা দিয়ে তাকে ঘোর অরণ্যে নির্বাসন দিল। বিশাল বনের গাছপালা জীব জন্তুর ডাকের সঙ্গে অরণ্যের নিঃশব্দ বার্ত্তার সংকেতের সঙ্গে রামচন্দ্র তার পরিচয় করে দিল। এখন আর অরণ্যকে তার ভয় করে না। গাছের ভাষা সে বুঝতে পারে, গাছ তাঁর মনের কথা বোঝে। তারা পরস্পরের সখী।

এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্যে রামের ঘন ঘন বাসা পরিবর্ত্তন সীতার মনকে স্পর্শ করে। তার খুব কষ্ট হয়। বাসা ছেড়ে যাওয়ার সময় কেমন জমাট, শক্ত পাথরের মত অমোঘ এক শীতলতা তার দুই পা'কে অনড় এবং অবশ করে রেখে দেয়। চোখের উপর সূর্য উঠা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নানা দৃশ্যাবলী ভেসে উঠে। তার সবটারই কোন অর্থ নেই। তবু মনের মধ্যে তার বাস্তব অস্তিত্ব তাকে প্রতিমুহূর্ত্ত কষ্ট দেয়। কিন্তু রামকে এসব কিছুই স্পর্শ করে না। কাছে থেকেও সে যেন অনেক দূরের মানুষ। তবু অরণ্যে তাকে অন্যভাবে পেয়েছিল। সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে সেভাবে পাওয়া কল্পনাও করা যায় না। অঢেল প্রশংসাবাক্য, চাটুকারিতা আর মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে রাম তাকে বিধৌত করে দিয়েছিল প্রতিদিন। আর সীতাব অন্তর দাক্ষিণ্য গোপন আকাংখা ইংগিতময় হয়ে উঠেছিল।

কুমারী বয়স থেকে যে পিপাসা তার বুকের মধ্যে ছিল তা আজও রয়ে গেছে। রামচন্দ্র সে পিপাসা মেটাতে পারেনি। সেই আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে বনবাসের স্বপ্নের দিনগুলো পার হচ্ছে সে। আর আশ্চর্য হয় এখনও পর্যন্ত কেন যৌন সংসর্গ হল না? সীতা অনেক করে সেকথা রামকে বুঝিয়েছে। উত্তরে রাম বলেছে এখনই কিছু নয়। আর একটু সময় দাও লক্ষ্মীটি। পায়ের নিচে শক্ত মাটি না পাওয়া পর্যন্ত প্রেম সন্তান চাইতে নেই। দাঁড়ানোর মাটি না পেলে প্রেম সন্তান নিয়ে দাঁড়াবে কোথায়?

কিন্তু আমি আর কতকাল অপেক্ষা করব। আমি যে পাগল হয়ে যাবো।

পাগল হতেই তো বারণ করছি।

বারণ করলেই কি হল?

জন্ম দেয়ার জন্য জায়ার আর এক নাম জননী। নারীর রূপ জননীতে বিকশিত

হয়। আমার দুর্ভাগ্য তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। ভালবাসলে কখনও দুঃখ দিতে না। আমার সাধ পূরণ করতে।

আমি যে সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে চাই রাণী।

কিন্তু আমার মনে যে ঝড় উঠেছে তার সামাল দেই কি করে?

সে'ত শরীর দেখেই বুঝতে পারি। চেহারায় ক্ষ্যাপামির ছাপ পড়েছে। একটু রোগা হয়ে গেছ! গায়ের রঙ রোদে জলে একটু মলিন আর তামাটে হয়ে গেছে। সব সময় কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। একটা ওলট পালট করতে চাইছ এটা অরণ্যে পা দিয়ে বুঝেছি। এখানে তুমি অরণ্যের মত আদিম। তোমাকে দেখে আমার হৃৎকম্প হয়। পাছে বহুকালের তপস্যা বিঘ্ন হয়, এই জন্যে তোমার কাছ থেকে তফাতে থাকতে চাই।

রামের উপর খুব অভিমান হয়েছিল সীতার। একা একা অনেকক্ষণ বসে কেঁদেছিল, অনুশোচনার সমুদ্র উথলে উঠেছিল বুকে। রামের একটু আদর ভালবাসা পেয়ে কেন সে গলে গেল? বুকের ভেতরটা তার অমন খাঁ খাঁ করে কেন? কি জন্যে এত লোভী হয়েছিল? কার জন্যে? কি করে বুঝবে, রামচন্দ্র হৃদয়ের দরজাটা বন্ধ করে মনের জানলায় বসে তার সঙ্গে আলাপ করেছে? সে যে মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষ চিরকালই একটু বোকা। ভালবাসার কাঙাল। অল্পেতে বড় বেশি বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ঠকে। আঘাত পায়। তবু আবার ভুলে যায়। মেয়েমানুষের স্বভাব'ত আর বদলায় না। চিরকাল স্বামী সংসার সন্তান চায়। নিরাপদ ঘরের আশ্রয়ে শুধু সুখ আর ভালবাসা খুঁজে বেড়ায়। পুরুষের কাছেও সে নিরাপত্তা খুঁজে এসেছে। সে তো আর ব্যতিক্রম নয়। তবু মনেতে কোথায় যেন নিরুপায় অসহায়তা এবং আপোষের আত্মগ্লানির দাগ লেগে থাকে। যা মন থেকে মুছেও সম্পূর্ণ মোছেনা।

চিত্রকূট ছেড়ে আসা থেকে সীতার মনটা ভাল ছিল না। রামের ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তন সীতার মোটেই ভাল লাগছিল না কোথাও একমাস কোথাও কয়েকদিন বাস করে সে দক্ষিনারণ্য পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগল।

চিত্রকূট ছাড়ার সময় তার বাঁ চোখের পাতা লাফাতে লাগল। ভীষণ জোরে কার যেন হাঁচি পড়ল। অমনি মেয়েমানুষের সংস্কার তার মনকে দুর্বল করে দিল। বনে বাস করতে গেলে এসব অলক্ষণ চিহ্নগুলো মানতে হয়। কিন্তু রাম যুক্তিহীন কতকগুলো ধারণা দিয়ে নিজেকে নিষেধের ডোরে বেঁধে রাখতে চায় না, এই মানায় মন দুর্বল হয়। কাজ পণ্ড হয়। জীবনকে অনেক গুনোগার দিতে হয়। অলস, অকর্মণ্য জীবনে এর যা কিছু মূল্য। প্রথা, বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে গেলে জীবনের চাকা এগোয় না। সীতা এসব রামের মুখে বহুবার শুনেছে। তবু মেয়েমানুষের মনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারল না। সীতা যাত্রা বদলের জন্য কিছুক্ষণ বসে রইল, রাম লক্ষ্মণ এগিয়ে গেল।

সাতপুরা পর্বতের চড়াই উতরাই ভেঙে তারা এগিয়ে চলল। রাম আগে লক্ষ্মণ

পিছে, মধ্যে সীতা। দিনের পর দিন ধরে তারা চলল। রাতটা শুধু চটিতে অথবা কোন দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে কাটিয়ে তারা সারা দণ্ডকারণ্য পরিভ্রমণ করতে লাগল। এমনি করে তারা ছাড়িয়ে যায় পাঁচমারি অরণ্য, মহাষবা নদী (বর্ত্তমান নর্মদা) বেলগঙ্গা নদী পার হয়ে যায়।

সীতার মনে ভরসা দেবার জন্যে বলল ঃ এইবার আমরা শরভঙ্গের আশ্রমে পেঁছব। সেখানেই বাস করব।

সীতার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল খুশিতে আনন্দে। যাযাবরী জীবনটা তার মোটেই ভাল লাগছিল না। কেমন যেন ক্লান্ত আর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বহুদূর নির্মেঘ আকাশের গায়ে লেপ্টে থাকা মেঘের মতো কালো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রাম বলল ঃ আমরা মহর্ষি শবরভঙ্গের আশ্রমের খুব নিকটে এসে পড়েছি। আর ঐ যে পশ্চিম আকাশের গায় অতিকায় পাহাড়, ঘন সবুজ গাছ-গাছালির সমারোহ, যেখানে ফুলকির মত সূর্য জ্বলছে ঠিক ওখানটাতে ঋষিবর সুতীক্ষ্ণের আশ্রম। এঁরা দুজনেই অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম।

রামের অঙ্গুলি নির্দেশক প্রসারিত হাত অনুসরণ করে সীতা নীলাভ সমুদ্রের মত বিস্তৃত আকাশ আর সবুজ অরণ্যের দিকে মুগ্ধ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। কেমন একটা বিবশ আচ্ছন্নতায় বিভোর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেতে যেতে থেমে গেল সে। সূর্যাস্তের রঙের অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য যেন কোন সুদূর অজানা রূপকথা হয়ে উঠল তার কাছে। তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠল যেন কোন অদৃশ্য দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের বিনম্র আকূতি। সীতার শান্ত নীরবতা দেখে রামের মনে হল, সীতা যেন কোন সুদূর বিস্মৃতকালের অবলুপ্ত অতীতের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত। রামের উদাস চোখদুটো সীতার মধ্যে কি যেন খুঁজছিল। নিশিপাওয়া মানুষের মত সেও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

লক্ষ্মণের চোখ রামের দিকে নিবদ্ধ। কয়েকমুহূর্ত কাটার পর কি ভেবে উদ্‌ভ্রান্তের মত নিম্নস্বরে বলল ঃ জায়গাটা ভাল নয়। একটু পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামার আগে সুমুখের ঐ প্রান্তর আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।

লক্ষ্মণের মুখের কথা শেষ না হতে বনের ভেতর থেকে কে যেন বজ্রকণ্ঠে হেঁকে বলল ঃ কোথায় যাস নরাধম ?

বুনো মহিষের মত বলিষ্ঠ দুটো পায়ের প্রবল চাপে জঙ্গল মাড়িয়ে নির্ভয়ে রাম-লক্ষ্মণের সামনে এসে দাঁড়াল মিশকালো এক মানুষ। শালতরুর মত সে দীর্ঘ তেমনি পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারায় উদ্দীপ্ত। কালো পাথর কুঁদে কুঁদে তৈরী যেন সেই বলিষ্ঠ মূর্তি। পাথরের একটা চাঙড়ার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখছিল সীতাকে। লোভ লালসায় জ্বলজ্বল করছিল তার চোখ। উৎসুক চোখ দুটি সীতার দেহ লেহন করছিল। তার বিক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত মনের ভেতর সীতার নরম কমনীয় সুডোল মুখ, রঙীন বক্ষোবাসের আড়ালে আন্দোলিত দুটো পুষ্ট স্তন, মোমের

মত পেলব দেহশ্রী, সুস্পষ্ট নিতম্ব বিরাধের স্নায়ুকে বিকল করে দিল, বিশৃংখল হয়ে গেল তার চেতনা। অরণ্যের হিংস্র বাঘের মত যেন সে শিকারের দিকে এগিয়ে গেল। সীতা রাক্ষসের উপর চোখ রেখে সভয়ে আছড়ে পড়ল রামের বিশাল বুকের উপর!

পশ্চিমে আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনের ভেতর একটু একটু করে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে শুরু করেছে। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলছে, শৃগালের ডাক ভেসে আসছে। ছাই ছাই অন্ধকারে জেগে উঠল আদিম অরণ্যের বিভীষিকা।

রামচন্দ্র ভয় পেল না। ক্রোধে চোখ মুখ রাঙা হল না। শরীর থর থর করে কাঁপল না। সাধারণভাবে সব মানুষদের যা হয়ে থাকে রামের তা হল না। সে সাধারণ নয়—অসাধারণ। তাই দারুণ বিপদেও ধৈর্য হারাল না। বিরাধের আস্ফালন দেখতে লাগল।

রামকে নির্বিকার, শান্ত এবং মৌন দেখে লক্ষ্মণ অবাক হল। বড় বড় দুই চোখে তার অপার বিস্ময়। রামের চোখের উপর তার দৃষ্টি স্থির। একটা স্তম্ভের মত লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে রইল।

বিরাধ সীতাকে লক্ষ্য করে তার দিকে ধেয়ে গেল নির্ভয়ে। সে যে একা, নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র এসব ভ্রূক্ষেপ করল না। ভাববারও প্রয়োজন বোধ করল না। দীর্ঘ দুবাহুর ভাঁজে ভাঁজে ফুলে উঠা পেশীর দিকে বারবার তাকাল। হিংস্রতায় দপ দপ করছিল হাতের শিরাগুলো। রামকে চুপ করে থাকতে দেখে বিরাধ নিজের পরিচয় দিয়ে বলল: আমি বিরাধ রাক্ষস। রাবণের অনুগামী ও বন্ধু। ঋষিমাংস আমার খুব প্রিয়।

রাম তার প্রজ্ঞাবলে বুঝতে পেরেছিল বর্বর অসভ্য রাক্ষস এই মুহূর্তে রাক্ষসের জন্মশত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার শত শত বলিষ্ঠ সশস্ত্র যুবক। তাদের জ্বলজ্বলে উৎসুক চোখ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেল। তাদের প্রত্যেকের হাতে তীক্ষ্নধার বিষাক্ত তীর আর চকচকে বল্লম। শুধু একটা ইশারা মাত্র। এইরকম একটা বিবাদ বা সংঘর্ষের প্রত্যাশা নিয়েই সে এখানে এসেছে। কিন্তু কোন সূত্র না পেলে হঠাৎ খুন জখম ঘটিয়ে কোন অনর্থ করা ঠিক নয়। তাই সে অসভ্য বর্বরগুলোর আমলে শান্ত সংযত রয়েছে। রহস্যটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তাই দেখাত রাম নীরব রইল।

বিরাধ রামের মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রশ্ন করল: তোরা কে? কি চাস এখানে? তপস্বীর মত মাথায় তোদের জটাভার। নিরাবরণ দেহ, পরিধান চিরবাস। তবু তোরা যে সত্যিকারের তপস্বী না সে তোদের কার্মুক, পৃষ্ঠে তূণ আর সঙ্গের এই মেয়ে মানুষটা দেখে বুঝেছি। তোরা দু'জনে বুঝি এই মেয়ে মানুষটা ভোগ করিস?

হো, হো করে হেসে উঠল বিরাধ। জঙ্গলে প্রচ্ছন্ন সঙ্গীরা বিরাধের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের অট্টহাসির শব্দ চারদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতার বুক চিরে বয়ে গেল লহরে লহরে। নির্জন অরণ্যভূমিতে প্রতিধ্বনিত

হতে হতে তা বহুদূরে পর্যন্ত বিস্তৃত হল। হাসি থামলে বিরাধ সীতার তন্বী সুঠাম অবয়বের দিকে ইসারা করে বলল ঃ মেয়েটা ভারি সুন্দর। আগুনের মত রূপ। আর মোমের মত শরীর। কবুতরের মত হাল্কা দেহটাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বড্ড আদর করতে ইচ্ছে করছে। তারপর খুব অন্তরঙ্গ গলায় বলল ঃ তোকেই আমার বউ করব। ওদের মত অযত্নে রাখব না।

সীতার বুকের ভেতর গুরগুর করে উঠল। ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ। রামের বুকের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে রইল সীতা। চোখের কোণায় কোণায় তার জল টলটল করতে লাগল।

বিরাধের রক্তবর্ণ চোখের কঠোর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লোভ ও লালসায় জ্বলতে লাগল। জঙ্গলের বাঘের মত শিকারের ওপর নজর রেখে সে একটু একটু করে সীতার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল ঃ তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন সুন্দরী? ওদের হত্যা করে তোমাকে বৌ করব।

সীতা কানে আঙুল দিল। লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে তার বুক জ্বালা করতে লাগল। নিজেকে সে শান্ত করতে পারছিল না। থর থর করে কাঁপছিল ভয়ে। জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিরাধের দিকে।

অসহ্য একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যায় রামের বুকের ভেতরটা। সারাটা মুখ হয়ে উঠল লাল আগুনের মত গণগণে। তবু এক নিশ্চল ধৈর্যে নিজেকে শান্ত এবং সংযত রাখল সে।

উত্তেজনায় ক্রোধে লক্ষ্মণের দেহের শিরায় শিরায় যৌবনের রক্ত উন্দাম হয়ে বয়ে যাচ্ছিল। এমন করে নিবীর্যের মত বিরাধের বেলেল্লাপনা নীরবে সহ্য করতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। অপমানের বেদনায় তার পুরুষ প্রাণটা চিন্‌চিন্ করে জ্বলছিল। দুর্ভাগিনী সীতার বুকচাপা করুণ কান্নার আওয়াজ তাকে সহসা অসহিষ্ণু করে তুলল। আহত বাঘের মত গর্জন করে বলল ঃ বর্বরের বর্বরতা চুপ করে আর কতক্ষণ দেখবে ভাইয়া? মাংসাশী নরপশুর কুৎসিত ভাষা, কদর্য আচরণ কানে শোনা, চোখে দেখা পাপ।

বিরাধের চোখ বিদ্যুতের মত দপ করে জ্বলে উঠল। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হাঁ করে তোরা দেখছিস কি? লক্ষ্মণকে দেখিয়ে বলল ঃ প্রভুভক্ত কুকুরটাকে বেঁধে রাখ।

অমনি বিরাধের সঙ্গীরা চারদিক থেকে কাতারে কাতারে ছুটে এসে লক্ষ্মণকে ঘিরে ধরল। মজবুত লতা দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে তাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধল।

ধক্ করে উঠল সীতার বুকের ভেতরটা। কাতর কণ্ঠে দীন প্রার্থীর মত বলল ঃ রাক্ষসরাজ ক্ষমা কর। এনো না সর্বনাশ ডেকে।

সীতার কান্না থর থর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরাধের ভারী মাংসল মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। বলল ঃ সুন্দরী তোমার ঐ লোভনীয় দেহের একটু স্পর্শ লাভের নেশায় মনটা আমার মাতাল হয়ে উঠেছে। আমি তোমার কোন নিষেধ শুনব না।

কথাটা কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় চিন্ চিন্ করে জ্বলে গেল মনটা। কিন্তু কোন উপায় নেই, কোন প্রতিকার নেই—প্রতিরোধ নেই। এত বড় একটা ঘটনার নীরব দর্শক সে। চোখের উপর স্ত্রীর অপমান দেখেও রামচন্দ্র নির্বিকার। স্বামীর কোন কর্তব্য সে করল না। এমন কি প্রাণাধিক প্রিয় লক্ষ্মণকে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করল না। স্বামীকে তার ভীষণ স্বার্থপর এবং কাপুরুষ মনে হল। তার বীরগর্ব ভেঙে গেল। তবু লজ্জায় অপমানে রামের বুকে মুখ লুকোয়। তাকেই তার একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয় ভেবে আরো জোরে চেপে ধরল।

থম থম করছে কাননের নির্জনতা। যতদূর চোখ যায় থৈ থৈ করছে জ্যোৎস্না। বিরাধের দুই চোখে কামনার আগুন লক লক করতে লাগল। রামের বাহুবন্ধন থেকে একটানে সীতাকে ছিনিয়ে নিয়ে বিরাধ নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরল। অন্ত-হীন সমুদ্রের প্রমত্ত ঢেউর মত সীতাকে নিষ্পেষণ করতে লাগল। তীব্র আবেগে অস্থির হয়ে তার ঘন চুল ভরা মাথার উপর নিজের মুখ ঘষতে লাগল। সীতা দু'হাত দিয়ে তাকে প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগল। মরীয়া হয়ে তাকে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। দাঁত বসিয়ে দিল মাংসল হাতে।

বিজন অরণ্য পরিবেশে বিরাধের কামনার যে আগুন জ্বলে উঠল সীতার সাধ্য কি তাকে এক ফুৎকারে নেভায়? বিরাধের কবল থেকে সীতা যত মুক্ত হতে চেষ্টা করল ততবেশি করে বিরাধ তাকে জড়িয়ে ধরল। সীতার নখদন্তের আক্রমণে তার সারা শরীরের কঠিন পেশীস্তবকের প্রতিটি কণিকা যেন কাতুকুতুতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গলে গলে তরল হয়ে গেল। আর একটা কৌতুক সুখের উল্লাসে হো হো করে পাগলের মত হাসতে লাগল। তার হাসির চোটে চারদিকে নিস্তব্ধতা শিউরে উঠল।

দু'হাতে বুক খামচে ধরল রামচন্দ্র। এ দৃশ্য সে দেখতে পারছিল না। সহসা বুকের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদের স্বর বেরোল। —না—আ—আ! তার সেই তীক্ষ্ন মর্মভেদী আওয়াজ নিস্তব্ধতার বক্ষ চিরে বেরিয়ে এল। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে বলল: পাপিষ্ঠ তোর স্পর্ধা আমার সহ্য সীমা অতিক্রম করেছে। বিবেক ও কর্তব্য বুদ্ধির মর্মযন্ত্রণা দীর্ঘক্ষণ ধরে ভোগ করেছি। এবার তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

কথা শেষ না হতে রামচন্দ্র কার্মুক দিয়ে সজোরে আঘাত করল বিরাধকে। চমকে উঠল বিরাধের চোখের দৃষ্টি। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল দস্যু। কপাল কেটে দর দর করে রক্ত ঝরতে লাগল। নিমেষে রক্ত আর চোখের জল লেপ্টে তার মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল। বিরাধের দেহে জেগে উঠল আসুরিক শক্তি। মূর্ছিত সীতার শিথিল শরীরটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে সে উন্মাদের মত চীৎকার করতে করতে রামের দিকে ছুটে গেল।

রামের ঠোঁটের কোণায় কোণায় নিষ্ঠুর প্রতিশোধের ধারাল হাসি ছুরির ফলার মত লক লক করতে লাগল। চোখের পলকে তীর ধনু দিয়ে আক্রমণ রচনা করল রাম।

ভাল করে বুঝে উঠার আগে বিরাধের অনেকে অনুচর মাটিতে পড়ে গেল। জখম রাক্ষস চমুদের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর মরণ-যন্ত্রণা নির্জন অরণ্যকে ভয়াবহ করে তুলল। রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আক্রমণে বিরাধের সৈন্য ও সঙ্গী ছত্রভঙ্গ হল।

বিরাধ টাঙ্গি আর শূলহাতে লক্ষ্মণকে বধ করতে ছুটলে রাম এক শরে তার বাহু ছেদন করল। দ্বিতীয় শরে সে লক্ষ্মণকে লতাবন্ধন থেকে মুক্ত করল। বিরাধ উঠে দাঁড়াতেই বুকের ভেতরে আর একটা তীর বিঁধে গেল। ভয়ংকর আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না তার। রক্তে মাটি ভিজে জায়গাটা কাদা কাদা হয়ে গেল। কাদা আর রক্তে মাখামাখি বিরাধের সারা শরীরটাকে দেখতে বীভৎস লাগল। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ওলোট-পালোট খেল। ধীরে ধীরে বিরাধের দেহ নিস্তেজ হয়ে এল। চোখের পাতায় মরণের ঘুম নামল। কন্ঠস্বর বেদনায় ভাঙা ভাঙা। অস্পষ্ট আর অস্ফুট স্বরে থেমে থেমে উচ্চারণ করল : রামচন্দ্র, হীনবৃত্তিধারী দস্যু আমি। তোমার মহিষীর সম্ভ্রমহানি করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তবু অপরাধ, দোষ আমার। ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু যার প্ররোচনায় আমি এ জঘন্য কাজ করলাম সেই দশাননকে তুমি ক্ষমা কর না। চোখে আমার অন্ধকার নেমে আসছে। পৃথিবীর আলো মুছে যাওয়ার আগে, একবারটি বল : আমি নির্দোষ। আমাকে তুমি ক্ষমা করেছ।

সীতার মূর্ছা ভাঙলে দেখল, রাম তার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে। লক্ষ্মণ তার শিয়রে বসে উত্তরীয় দিয়ে ব্যজন করছে। চেতনা ফিরে পেতে সে লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি শাড়িটাকে টেনে টেনে ঠিক করল। উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু রাম তাকে ধরে শুইয়ে দিল মাটিতে।

জ্যোৎস্নার আলোয় থৈ থৈ করছে বনভূমি। পিপুল গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর ওরা তিনজন বসা। সীতা কাৎ হয়ে শুয়ে আছে ঘাসে। রামের একখানা হাত তার হাতের মুঠোয় টেনে নিল। তৃপ্তিতে আনন্দে চোখ বুজল। আস্তে আস্তে বলল : তুমি ! তোমার কিছু হয়নি'ত ? বাকী কথাটা আর বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। প্রবল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল : দেবর, আমার জন্যে কত লাঞ্ছনা তুমি পেলে।

লক্ষ্মণ মৃদু হেসে বলল : আর তুমি ? তোমার নিজের জন্যে বুঝি একটু উদ্বেগ নেই। তোমার কথাগুলো এত সহজ যে ভেতরে টনটন করে গিয়ে লাগে। কিন্তু এসব কথা থাক। তোমাকে যে লোকটা সবচেয়ে বেশি অপমান করল তার কথা জিজ্ঞেস করলে না'ত।

সীতা মাথা নেড়ে বলল : সব কথা জিজ্ঞেস করা দরকার হয় না। সেই তোমাদের কাছে দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিয়েছি রাক্ষসের পরিণতি। আমার জন্যে কত বড় একটা অন্যায় অঘটন তোমরা করলে বল'ত ?

রাম ব্যস্ত হয়ে বলল : অন্যায়, অঘটনটা আবার এর মধ্যে কি করলাম ?

মাথা নিচু করে সীতা আচমকা বলল : অযোধ্যা থেকে অজ্ঞাতবাসে আসার আগে

কত শপথ করেছ, ভয়ংকর বিপদে কিংবা চরম দুর্দিনেও শত্রুকে জানতে দেবে না নিজের পরিচয়। তাদের চোখে তুমি গৃহহীন, আশ্রয়হীন নিঃসম্বল এক সাধারণ মানুষ। তেরো বছর ধরে সকল সন্দেহের বাইরে তুমি আছ। নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার শপথ রক্ষা করেছ। কিন্তু আজ এ ভুল করলে কেন? বিরাধকে হত্যা করার পর তোমার ছদ্মবেশ উদ্দেশ্য আর গোপন থাকল না। তুমি এখন শত্রুর কৌতূহল হলে।

সীতার কথা রামকে ছুঁয়ে গেল। তার পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ভাবনা রামকে অবাক করল। মনে হল, সীতা যেন তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা বলল। ভাবতে গিয়ে শরীর কণ্টকিত হল পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। এর পরেও রামের মনে অনেক প্রশ্ন ও চিন্তা উদয় হল। রামচন্দ্র আনমনা চোখে সীতার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। আর, তাতেই সীতার বুকের অভিমানের সাগর উথলে উঠল। ধীরস্বরে উচ্চারণ করল: তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধন আমি। মহা-পৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তার বাধা হয়ে আমি নিমিত্তের ভাগী হলাম।

না! নিঃশব্দ এক আর্তনাদ বুক থেকে উঠে এল রামচন্দ্রর। বলল: ও আবার কি কথা। তোমার জন্যে ছিল অন্য এক পৃথিবী। কিন্তু স্বেচ্ছায় তুমি তা ত্যাগ করেছ আমার জন্য। আমার কষ্টের দুঃখের অঙ্গীকারের মূল্য ঐটুকু। তোমার প্রতি আমার কর্তব্য করেছি। রাক্ষসের মৃত্যু তার নিয়তি। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত।

সীতা রামের দিকে মোহমুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকল। মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। রামের ভিতরেও এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল।

এসব ঘটনার ভেতরেও রাম অন্যমনস্ক। তার মনে অনেক প্রশ্ন উদয় হল, কিন্তু সেসব কিছু বলল না। চূড়ার মত বাঁধা চুলে সে নিয়ত হাত বোলাতে লাগল। কখনও বা হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল আপনা থেকে। একটা চাপা অস্থিরতায় তার শ্বাস ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। রাম বেশ বুঝতে পারছিল, নরপশুর প্রাণহীন দেহটা তার রাজনৈতিক অভিসন্ধির একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। কূট রাজনীতির দিকে শত্রু মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাতে অত্যন্ত সহজ হবে রাবণের। এখনও তাকে বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করে পৌঁছতে হবে। দেবানুগৃহীত এমন একটি অঞ্চলে যে দেশের রাজা মনে মনে রাবণের প্রতি গভীর বিদ্বেষভাব পোষণ করে। অতএব সেই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কালে বিরাধ হত্যা তার সাহায্যলাভের পথে অনেক বাধা এবং অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। এই দেহ লুকিয়ে ফেললে তার হত্যার কোন প্রমাণ থাকবে না।

খুব ধীরভাবে চিন্তা করার পর রাম লক্ষ্মণকে বলল: নরপশুর আত্মীয়স্বজন জানার আগেই তার প্রাণহীন দেহ সৎকারের জন্য একটি গর্ত খনন করে তাকে নিক্ষেপ কর। রাক্ষসদের অন্ত্যেষ্টির এই সনাতন রীতি।

সুতীক্ষ্ণর আশ্রমে সুন্দর সুন্দর রথ দাঁড়িয়েছিল। এগুলির আকৃতি ও গঠন একটু স্বতন্ত্র ও অদ্ভুত। এ ধরণের রথ ইলাবৃতবর্ষ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। বজ্র, অগ্নি, হংস, চক্র চিহ্ন অঙ্কিত রথ একমাত্র দেবরাজ্য ইলাবৃতবর্ষের নরপতিরা ব্যবহার করে। তাই, রামচন্দ্র অনুমান করল নিশ্চয়ই দেব-নরপতিরা এই আশ্রমে অবস্থান করছে। অমনি তার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কি যেন একটা বিপদ সংকেতের মত বাজতে লাগল। দুর্গম গিরিপর্বত অতিক্রম করে দেবনৃপতিরা ইলাবৃতবর্ষ থেকে এখানে গোপনে এল কেন? কিসের আশায়? এই গহন অরণ্যে তাদের কোন স্বার্থ রক্ষা পাবে? সুতীক্ষ্ণর সঙ্গে দেবতাদের সম্বন্ধ কি? শবরভঙ্গই বা তাকে এখানে পাঠাল কেন? শস্ত্রধারী ঋষিদের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন দেবতাদের তাহলে একটা গোপন যোগসূত্র আছে? কি সে? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসায় সে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

এই আশ্রমে রামচন্দ্র সম্পূর্ণ নতুন। এর আগে কখনও এখানে আসেনি সে। ঋষিবর সুতীক্ষ্ণকেও চেনে না। দেবতাদেরও কখনও চোখে দেখেনি। তার জন্মের আগে গোটা স্বর্গরাজ্যের দেবনরপতিরা অযোধ্যায় এসেছিল। দেবলোকের এবং মনুর পুত্রদের স্বার্থ সুরক্ষার এক পরিকল্পনা তৈরী করেছিল। এবং তাকে কার্যে পরিণত করার ভার ছিল মুনি ঋষির উপর। ঘটনাচক্রে তার অদৃষ্ট লক্ষ্য সাধনের পথে নিয়ে গেল তাকে। কিন্তু সে মহান কর্তব্য সাধনের অনুকূল পরিবেশ কতখানি করতে পেরেছে তার হিসাব করেনি কখনও। দেব নরপতিদের আগমন হঠাৎ তাকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলল।

আশ্রমে প্রবেশ করতে রাম থমকে দাঁড়াল। অমনি বিশ্বামিত্রর কাছে অঙ্গীকারের কথাগুলো ঝংকারে বাজতে লাগল কানের ভেতর। "ঋষিদের স্বার্থ ও জীবন রক্ষাই আমার ধর্ম। ঋষিদের রক্ষা করতে যা যা করা দরকার—আমি করব। কারো প্ররোচনায় কিংবা মায়ামোহে বিভ্রান্ত হয়ে শপথ ভঙ্গ করব না। ঋষিবাক্যকে ধ্রুবতারা জ্ঞানে অনুসরণ করব।" রামচন্দ্রর বুক কেঁপে উঠল। অবুঝ অবোধ কিশোরের একটি ভুলে গোটা জীবনটা তার অর্থহীন হয়ে গেল। আপন ব্যক্তিত্ব হারানোর লজ্জা গ্লানিতে তার মন পোড়ে। বিশ্বামিত্রের কূটনীতির নাগপাশে বন্দী ব্যক্তিত্বের অসহায়তা তাকে গভীরভাবে পীড়া দেয়। অপমান বোধ যেন আগুনের ফুলকির মত রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল। দেবতাদের নেপথ্য তদারকিকে সে ভাল চোখে দেখল না। নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে সে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে এগোচ্ছিল। কিন্তু সে জানতে পারল না; দূরে সুতীক্ষ্ণর কুটীরের গবাক্ষ থেকে একজোড়া চোখের খরদৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে।

আশ্রমের একটি বৃক্ষের বেদীমূলে তারা বসল। রামচন্দ্রের শান্ত ভাবলেশহীন মন, আজ কিছু চঞ্চল।

তেরোটা বছর সে রাক্ষস, অসুর, নাগ, যক্ষ, নিষাদ, বানর, ঋক্ষ, গন্ধর্ব, গৃধ্র প্রমুখ উপজাতি পরিবৃত অনার্য অধ্যুষিত দক্ষিণ দেশের অরণ্যে কাটাল। বহু পর্বত, বন নদী অতিক্রম করে গোটা দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ করেছে। দেখেছে এর জনপদ, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রশাসন ব্যবস্থা, কূটরাজনীতি, বিদেশনীতি। বহু গোষ্ঠীর মানুষের নিবিড় সাহচর্যে ও সংস্পর্শে এসেছে। তাদের সেবা, আতিথ্য, বন্ধুত্ব, সাহচর্য তাকে মুগ্ধ করেছে।

সেই মুগ্ধতার কথা বলতে গিয়ে সীতা কতবার বলেছে অরণ্যের মানুষগুলো বড্ড ভাল। এ পর্যন্ত যত মানুষ দেখলাম তারা কেউ খারাপ লোক নয়। কেউ রাক্ষস সম্পর্কে মন্দ কথা বলল না। কিংবা তাদের কোন ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা ক্রোধও প্রকাশ করল না। কেবল তোমারই তাদের উপর জাতক্রোধ। কয়েকজন বদমাস খারাপ লোকের জন্যে তুমি গোটা জাতটাকে দায়ী করতে পার না। তারা রাক্ষসও নয়, অসুরও নয়। তাদের স্বভাব ও প্রকৃতিই ওই। তারা দুষ্ট জাতের মানুষ। তুমিও একদিন তাড়কার ক্রোধ বিদ্রোহের নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হতে।

রাম অত্যন্ত গম্ভীর হল। আন্তরিক গলায় বলল: তুমিও খুব বেশি খবর রাখ না। তোমার অভিজ্ঞতাও অল্প। সাধারণ মানুষ যে জাতের হোক তারা খুব দোষী বা অপরাধী নয়। তারা শান্তিপ্রিয় গোছের মানুষ। কিন্তু এদের গণ্ডগোল এবং হাঙ্গামা করার জন্যে উস্কে দেয় দুষ্টু প্রকৃতির লোক। তাদের ঠেকানোই আমার কাজ।

সীতা একটু কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে। বাস্তবিকই সে সমাজ সংসারের তেমন খোঁজ রাখে না। তাই বিব্রত গলায় বলল: স্বামী, যারা উসকে দেয় তারা মতলববাজ। রাজনৈতিক মুনাফা লাভের জন্য সাধারণ মানুষকে মূলধন করে। অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাদের খপ্পরে পড়ে নাকাল হয়। কিন্তু তাদের দোষ কি বল?

ধর, মুনি ঋষিরা যে আশ্রমে শান্তিতে, নিরাপদে বাস করতে পারছে না, এ ত বাস্তব সত্য। তাদের অশান্তি—

রামকে বাধা দিয়ে সীতা বলল: কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। ঋষিদের উপর রাক্ষসদের কোন আক্রোশ নেই। একদল স্বার্থান্বেষী মতলববাজ ঋষিই কেবল মিথ্যা প্রচার করছে। তুমি এদের খপ্পরে পড়েছ। তাই, তোমাকে দেখলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করে। রাক্ষসদের সন্দেহ থেকে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ মুক্ত রাখার জন্যেই তোমাকে তাড়াতাড়ি আশ্রম ছেড়ে তারা চলে যেতে অনুরোধ করে। ভরদ্বাজ মুনি তোমাকে এক রাতের বেশি কাটাতে দেয়নি, অত্রি মুনিও নয়। শরভঙ্গও নয়। কেন? কখনও চিন্তা করেছ?

সীতা, তুমি রাজনীতির কিছুই বোঝ না।

স্বামী, আমি ত রাজনীতি করতে আসিনি। গৃহকপোতের সুখাসন ছেড়ে স্বামীর ধর্মপথের সহযাত্রিণী হয়েছি। দু' চোখ খোলা রেখে বনের অফুরন্ত সৌন্দর্য ও জীবন

দেখেছি। আর নয়ন ভরেছি তোমায় দেখে। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বুঝতে চেষ্টা করেছি।

রামচন্দ্র সীতার আহম্মকী কথার কি উত্তর দেবে? জবাব দেবার মত কোন কথাই তার নেই। তাই চুপ করে রইল। সীতা তাকে নিরুত্তর দেখে বলল: তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হৃদয়ের, কখনও স্বার্থের নয়। তোমার কাজের ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমার আছে।

সীমা লংঘন করে নয়।

স্ত্রীর অধিকারে সীমা ছাড়িয়ে আমি তোমার কূট রাজনীতির জগতে প্রবেশ করতে যাব না। আমার কাছে যা দুঃসহ এবং যন্ত্রণার তা আমাকে বলতেই হবে। স্বামী ঋষির বেশে রাজনীতি করা তোমার শোভা পায় না। ঋষিত্বকে রাজনীতির ঘোলা আবর্তে টেনে আনার পরামর্শ যারা দিল তারা তোমার বন্ধু নয়। স্বার্থসিদ্ধ করতে ধর্মকে তারা অস্ত্র করে তুলেছে।

একটা বিদ্যুৎস্পর্শ করে গেল রামকে। দ্বিধা করে বলল: তোমার কথা শুনতে ভীষণ মজা লাগছে।

লাগবেই। কারণ, তুমি ভাল করেই জান ভারতীয়দের মনে ধর্মের প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। এ প্রভাবকে যে ভাল করে ব্যবহার করতে জানে, জয়লক্ষ্মী তার। তাইত পরণে ঋষির পবিত্র গেরুয়া বসন, অনাবৃত দেহ, মস্তকে কৃত্রিম জটাভার, চন্দন-চর্চিত কপাল, নিজেকে নিষ্ঠাবান তপস্বী বলে প্রমাণ করার জন্য, ধ্যান, যজ্ঞ, পরিমিত ফল মূল আহার, ইন্দ্রিয় সংযম সব কিছুই পালন কর। শুধু তাই নয়, তুমি সদালাপী ও মিষ্টভাষী। ভুলে কখনও কারো সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার কর না, কাউকে প্রত্যাঘাত পর্যন্ত কর না। ঋষির ধৈর্য, ক্ষমা, প্রেম, ত্যাগ, সংযম তোমার চরিত্রের অলংকার। তোমার ছদ্মবেশ ধরতে পারা কি সহজ ব্যাপার? কিছু চিন্তা করতে গেলে দৃষ্টিপটে ভেসে উঠে ধ্যানিমগ্ন সাধকের মুদিত আঁখি। কিন্তু রাজপুত্র, জনগনমন অধিনায়ক রামচন্দ্র যে রাজনৈতিক নেতা, ঋষি নন, এ সত্য উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ঋষির ছদ্মবেশে তুমি কুট রাজনীতি করে ভারতীয় সাধকের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছ। ঋষির ধর্মপরায়ণতা, মহানুভবতার গৌরব অনেক নামিয়ে এনেছ। তোমার কার্যকলাপ অনেক ঋষি মেনে নিতে পারেনি। তাই আশ্রমে স্থান দিতে সংকোচ করেছে। তোমার এই অনাদর আমি সইতে পারছি না।

রামচন্দ্র প্রতিবাদ করে না। অমলিন হাসি ঝরতে থাকে তার মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। সীতা বিস্ময়ে রামের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে অনেকখানি রহস্যময় মনে হয়। যেন অন্য কোন পরিমণ্ডল থেকে আসা এক অচেনা মানুষ। মুহূর্তের জন্য সীতা খেই হারিয়ে ফেলে কথার। বিমূঢ়ের মত চেয়ে থেকে বলল: এসব শুনেও তুমিও স্থির থাকতে পারছ। তোমার প্রতিবাদ করতে হচ্ছে করছে না।

রামচন্দ্র হাসি হাসি মুখ করে তাকাল সীতার দিকে। নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলল: এসব'ত তোমার মনের কথা নয় রাণী। তুমি যা বললে তার কোন ভিত্তি নেই।

নানা কারণে তোমার মন উত্তপ্ত। তাকে কারণ বলে না ভাবলেই হল। প্রতিবাদ নিরর্থক। তর্ক করে কাউকে বোঝানো যায় না। তাতে শুধু বিরোধ জমে উঠে। ব্যবধান বাড়ে। বাইরের অশান্তিকে আমাদের মনের অশান্তি করব কেন রাণী?

সীতা চুপ করে রইল। খুব সংশয়পূর্ণ এবং বিষন্ন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রামচন্দ্রের দিকে। সীতাকে খুব অস্থির অশান্ত এবং অসহায় মনে হচ্ছিল।

দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল রাম। ভেতরটা দুশ্চিন্তায় বোবা হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে চিন্তার ঘূর্ণিঝড় তাকে অসহায় করে তুলল। এমনি এক আচ্ছন্নতার মধ্যে কতক্ষণ যে কাটল তার কোন হদিস ছিল না।

অকস্মাৎ সেখানে এক ঋষি বালক প্রবেশ করতে চিন্তাটা থমকে গেল। বালকটি তার দিকে তাকিয়ে মিটমিটু করে হাসছে। নম্র গলায় বিনীত বচনে বলল: মহাত্মন, আচার্য আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। অনুগ্রহ করে আপনি তাঁকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন। আপনার সংগীরা আশ্রম কুটীরে সেবা ও বিশ্রাম করুন। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন।

সুতীক্ষ্নর কুটীরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হল রামচন্দ্র। কক্ষ শূন্য। কেউ সেখানে নেই। দারুনির্মিত চৌকিতে বৃহৎ শার্দ্দুলের একটি চর্ম ছাড়া আর কিছু ছিল না। আস্তে আস্তে রামচন্দ্র তার উপরে বসল।

ঋষিকুমার কক্ষান্তরে গেল। নির্জন কক্ষের শূন্যতা রামচন্দ্রর সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করল। বিস্ময় ও বিশ্বাসভরে নিজের দু'খানা হাতের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। জীবনের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে দেখল গোটা জীবনটাই তার ফাঁক ফাঁকিতে ভরা শূন্য আর অর্থহীন। এই বয়সে জীবন তাকে কি দিল? মানুষের সুখ, শান্তি, মঙ্গলের জন্যে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা, অনুভূতি, প্রেম, স্নেহ, মায়া ও মমতা ত্যাগ করে সে কোন স্বর্গ গড়ল তাদের জন্যে? অথচ, একদিন বিশাল পৃথিবীর টানে নিজের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অবসান ঘটাতে দেশের কাজে, মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রাজকার্যে সারা দিন কাটবে, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ দুঃখ, উপেক্ষিত হবে, এবং উদ্দেশ্যকে একমুখী করে তোলা বাধা হবে, এই আশংকায় শাসনের দায়িত্ব নিল না। কিন্তু আজ সবটাই অর্থহীন মনে হল তার। পরিশ্রম, ত্যাগ পণ্ডশ্রম বোধ হল। জীবনটা অকস্মাৎ লক্ষ্যহীন, অর্থহীন হয়ে গেল। এরকম মনে হওয়া তার অবশ্য কারণ ছিল। নিজের স্বাধীন চিন্তায় ও যোগ্যতায় কিছু করার সুযোগ হয় নি তার। যদিও সে যোগ্যতা তার ছিল। ঋষি ও দেবতাদের মুখ চেয়ে তাদের পরিকল্পনা মত অনেক অভিপ্রেত গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়েছে। ফলে, নিজত্বের স্বাভাবিক বিকাশ হয় নি। হবে কোথা থেকে? রাজপরিবারে জন্মানোর জন্য সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিলাস প্রভৃতির ভেতর তার জীবনের বেশীরভাগ কেটেছে। আবেগ প্রবণ হওয়া তার স্বাভাবিক ছিল।

বিশ্বামিত্রর আহ্বানে তার কল্পনাবিলাসী মনটা হঠাৎ জেগে উঠল। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে মহৎ কিছু করার আবেগে একটা বালকোচিত শপথ করে বসেছিল তার

কাছে। সেই প্রতিশ্রুতিই তার জীবনে অভিশাপ হয়ে উঠল। তবে, বিশ্বামিত্র'র জন্যে মানুষের জীবন কি ধরনের সংকটের ভেতর কাটে তা জানার সুযোগ হয়েছিল। গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সে বিশ্বামিত্রর চোখ দিয়ে দেখেছিল। একটা বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়েছে রাক্ষস ও দেবতাদের। আর ভারতগ্রাসী যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রাবণ ও আর্যাবর্তের পারস্পরিক দ্বেষ-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিরূপতার ফলে। লঙ্কেশ্বর পূর্বাহ্নেই তাড়কার সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করে কার্যতঃ আর্যাবর্তের রাজন্য-বর্গের ঐক্য সংগঠনের উপর একটা বড় আঘাত হানল। একে তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের অভিনব কৌশল বলে বিচার করা হল। রাবণের আগ্রাসী রাজনীতি রুখতে তার নির্ভীক অরণ্যকে উদ্দীপ্ত করল বিশ্বামিত্র। সব ত্যাগ করে দেশকাল ও পরিস্থিতির মধ্যে নেমে এল। পিতার অকৃপণ অসীম স্নেহ, অনিচ্ছা, নিষেধ, জননীর মায়া বন্ধন তার যাত্রাপথের বাধা হয়নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, এক কূটরাজনীতির ফাঁসে তার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

রামচন্দ্রের মুখ চোখ অসহায় যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। সীতার কাছে ভর্ৎসিত হওয়া থেকে একটা পাপবোধ অহরহ তাকে ক্লিষ্ট করছিল। মানসিক শক্তিতে টান ধরল।

কিন্তু সুতীক্ষ্ম কক্ষে প্রবেশ করতে সে খুব শান্ত হয়ে গেল। কেমন একটা ঔদাসীন্য সুতীক্ষ্নর সঙ্গে তার অপরিচয়ের দূরত্ব রচনা করল। ডাগর দুই চোখের নিচে বিমর্ষ বেদনায় ঘন কালো ছায়া তার চাহনিকে সুনিবিড় করল।

সুতীক্ষ্ন মুগ্ধ চোখে দেখছিল রামচন্দ্রকে। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেও কি গভীর ধারাল। চেহারা দেখলেও ভয় হয়। আবার ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। এক অপরূপ আবেগে তার বক্ষস্থল মুহুর্মুহুঃ শিহরিত হল।

আশ্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মন্দিরে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। কক্ষে প্রদীপ দিয়ে গেল ঋষি বালক। ধূপের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠল কক্ষ। সেই অদ্ভুত মাদকতাময় ঘরে একটি ছোট চৌপায়ার উপরে পা তুলে সুতীক্ষ্ন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে রামকে লক্ষ্য করছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল রামচন্দ্র। সুতীক্ষ্ন দেখল রামের মুখে রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণাও নেই। এক ধরণের তীব্র ও গভীর বিষণ্নতা আছে। সুতীক্ষ্ন মৃদুস্বরে জিগ্যেস করল: তোমার নাম'তো রামচন্দ্র?

সুতীক্ষ্নর প্রশ্নে রামচন্দ্র অবাক হল। বেশ একটু মুষড়ে গেল। এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন আগে তাকে কেউ করেনি। অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আশ্রম অধ্যক্ষরা অত্যন্ত চেনা ব্যক্তির মতই আচরণ করত। কেউ ভুলেও তার বনবাসী হওয়ার কারণ জিগ্যেস করত না। সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন প্রশ্ন করত না। কিংবা দুর্ভাগ্যের জন্যে দরদ অথবা সমবেদনাও দেখাত না। এ থেকে বোঝা যেত, তারা সব ঘটনাই জানত। তাদের সংকুচিত ও কুণ্ঠিত কুশল জিজ্ঞাসায় রাম তা অনুভব করতে পারত।

কিন্তু সুতীক্ষ্ণ তার ব্যতিক্রম ছিল। জিজ্ঞাসু চোখে রামচন্দ্র তাই চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

রামচন্দ্রের মুখ একটু গম্ভীর। কপালের ছোট্ট রেখা একটু গাঢ় হয়। নিঃশ্বাস বুকের কাছে আটকে থাকে। চাহনিতে অব্যক্ত কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। কিছুক্ষণ বিরতির পর রাম চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল।

সুতীক্ষ্ণর কণ্ঠস্বর সহসা আন্তরিকতায় গাঢ় হল। বলল ঃ বৎস, তোমাকে না চিনলেও তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার আগমনের সংবাদ পূর্বেই অবগত আছি। এখন চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হল। কিন্তু তোমার মধ্যে যা জাগ্রত তাহল যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা বিদ্বেষের সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে।

কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনায় রামচন্দ্রের বুক থর থর করে কাঁপল। মনে হল, সুতীক্ষ্ণ তার ভিতরকার সব ঘটনা জেনে ফেলেছে। রামের চোখে সত্যিকারের একটা আতঙ্ক ফুটে উঠল। আমতা আমতা করে বলল ঃ সন্তান জন্ম দেবার সময় মা যে প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করে তার মধ্যেও আনন্দ থাকে। বড় কিছু পেতে হলে যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আমরা যে বিশাল ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গঠনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, সেখানে দ্বন্দ্ব ও সংশয়, দ্বিধা অবশ্য থাকবে। সংঘাত হল জীবনের ধর্ম, অগ্রগতির চিহ্ন। মাটির সঙ্গে চাকার সংঘর্ষে চাকা এগোয়। যন্ত্রণা ছাড়া তেমনি জীবনের জড়ত্ব ঘোচে না। বন্ধনমুক্তির প্রেরণা জাগে না।

সুতীক্ষ্ণর মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ঃ বাঃ! ভারী ভালো লাগল তোমার কথাগুলো। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

রামচন্দ্রের বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এ সময়ে। সে বুঝতে পারছিল, সুতীক্ষ্ণ তাকে একটা কিছু বলতে চায়। এ হল তারই ভূমিকা। সেই চরম কথাটা কি তাও সে আন্দাজ করতে পারে। একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল তার। রাজনৈতিক নেতা হয়েও সে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সুতীক্ষ্ণ তীব্র রহস্যময় কটাক্ষে রামচন্দ্রকে বিদ্ধ করে বলল ঃ তোমার কাজের ধারাই আলাদা। তাই—

রাম কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে নিজের নখ, আঙুল দেখল। তারপর মুখ তুলে তার শ্রীময় মুখখানা ভরে একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল! বলল ঃ তাই আমাকে নিয়ে তর্কের ঝড় উঠছে। তেরো বছরের মধ্যে কেন রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিনি এই'ত? কথাটা বলেই রামচন্দ্র চমকাল। এ কি বলল সে? সুতীক্ষ্ণর প্রশ্নের আগেই সে কোন্ জাদুতে নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে গেল। অনুতাপ আর অনুশোচনায় তার বুক জ্বালা করতে লাগল।

রামের বাক্যতে কার্যের ইংগিত মিলল। আভ্যন্তরীণ বিরক্তি ও ক্ষোভেতে রামের মন যে অস্থির ও উত্তেজিত তা সুতীক্ষ্ণ অনুমান করতে পারে। ভিতরকার ঘটনা সে সবটা জানে না ঠিকই, কিন্তু তার কিছুটা হদিশ করতে পারল। দুর্গম অরণ্যে

কাজের অনুকুল পরিবেশ গড়ে তোলার অন্তরায় অনেক কিছু। তথাপি, তার কাজে কেউ কেউ সন্দেহ করছে। তাই, সতত ব্যর্থতাজনিত আত্মগ্লানিতে তার বুক পাষাণভার হয়ে আছে। সুতীক্ষ্ন বেশ বুঝতে পারছিল রাগ ও হতাশা বহুকাল ধরে রামের ভিতরে মাথা কুটে কুটে একটা বেরোবার পথ খুঁজছিল, আজ অকস্মাৎ তার সন্দেহই বিস্ফোরণ ঘটাল।

সুতীক্ষ্ম রামের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে স্তিমিত কণ্ঠে বলল : ইলাবৃতবর্ষের দেবতারা এসেছেন এই আশ্রমে। তোমার কাজের সমালোচনা করতে নয়। সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে।

সমাধানের পথ আমিও কি কম খুঁজেছি? বলে রামচন্দ্র থামল। দেবতা ও মানুষের পরিকল্পনা থেকে তার বনবাস যাত্রা সাধারণভাবে সুদীর্ঘ সময়। কিন্তু বিরাট শক্তিশালী রাজশক্তি উৎখাত করতে কত আয়োজনের দরকার। রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ তৈরী করতে সময়ের হিসাবে খুব একটা বৃহৎ অপচয় সে করেনি। বনবাসকে রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপায় করে তুলেছে।

রাম তার প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিল : দেববাহিনী কিংবা অযোধ্যার বিশাল বাহিনীকে রক্ষক করে দুর্গম গিরি গহন, অরণ্যের দেশ জনস্থান ও দাক্ষিণাপথের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ভরত চতুরঙ্গ বাহিনীকে তার রক্ষী-বাহিনী করতে চেয়েছিল। কিন্তু অকারণ রাজনৈতিক উত্তাপ ও উত্তেজনা বৃদ্ধির আশংকায় সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। মুষ্টিমেয় রক্ষীবাহিনী রাবণের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কাছে কিছু নয়। এ অবস্থায় তাদের থাকা না থাকা সমান। সংঘর্ষ বাঁধলে রাতারাতি সাহায্য বাড়ানো যাবে না। কিন্তু সর্বস্তরের লোকের অন্তরে অবিশ্বাস সন্দেহের বিষ ঢেলে দেয়া যাবে। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও রেষারেষি বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ পরিহার করে চলল সে।

বহিরাগত বলে লোকবলের অভাব এমনিই আছে। যুদ্ধে বাহুবল, অস্ত্রবল লোকবলের খুব দরকার। সুদূর ইলাবৃতবর্ষ কিংবা অযোধ্যা থেকে সৈন্য এনে এই যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। তাই, লোকবলের অভাব দূর করতে সে সাধারণ মানুষকে খুব কাছে টানল। তাদের বন্ধু ও আত্মীয় হল। তাদের অন্তরে রাবণের নেতৃত্বের প্রত্যয় না ভাঙা পর্যন্ত তার তৃপ্তি ছিল না। সংঘর্ষ সংগ্রাম অনিবার্য জেনেই জনস্থান ও দক্ষিণাপথের অভ্যন্তরেই খুব গোপনে সংগঠিত করতে লাগল এক সশস্ত্র বাহিনী। বাইরে থেকে তার উদ্দেশ্য বোঝার উপায় ছিল না।

আশ্রয় ও খাদ্যের অন্বেষণে সে বনে বনে পরিভ্রমণ করে কার্যতঃ মিত্র অন্বেষণ করতে লাগল। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার গুরুত্বকে দেখল, বহু খবর ও তথ্য সংগ্রহ করল। রাস্তাঘাটের সন্ধান নিল, স্থানের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হল। এই কার্যে তার দক্ষিণহস্ত ছিল মুনি ঋষিরা। একাধারে তারা মন্ত্রণাদাতা, অনুগত বান্ধব ও গুপ্ত সংবাদ সংগ্রাহক। পরিব্রাজক ঋষির মত বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে সে দেখেছে জনপদ, রাজ্য, রাজধানী ও তাদের রাজাকে। কাকে, কিভাবে মিত্র-

রূপে গ্রহণ করলে ভাল হয়, তার সব ব্যবস্থাই মুনি-ঋষিরা করে রাখত। তার পৌঁছানোর আগেই সেখানে খবর পৌঁছে যায়। নিষাদ রাজা গুহ, গৃধ্র অধিপতি জটায়ু, সম্পাতি, কিস্কিন্ধার সুগ্রীব প্রমুখের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব স্থাপনের এক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করছে ঋষিরা। তৈরী পরিবেশ তাদের মিলনকে দৃঢ় ও মজবুত করেছে।

হৃদয় জয়ের দিগ্বিজয় সফর সম্পন্ন করে সুতীক্ষ্ণর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে সে। রাজনৈতিক শক্তি ও সামর্থ কেন্দ্রীভূত করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। কেননা কোন সংঘর্ষে না গিয়ে বিনাযুদ্ধে কেবলমাত্র মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে রাজ-ক্ষমতা আদায় করে নেয়া তার কূটনীতির পক্ষে ছিল এক মস্ত সাফল্য। এই সাফল্য রাবণকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। তাই, বিরাধকে দিয়ে এক রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও দূরদর্শিতা যাচাই করতেই যেন মূর্তিমান পাপী ও দস্যুকে পাঠাল। কখনও কোন কারণে যে অস্ত্র ধরেনি, হিংসার পথ গ্রহণ করেনি, তাকে হিংসায় প্ররোচিত করে তার সুনাম নষ্ট করা ছিল রাবণের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ক্ষুরধারবুদ্ধি দিয়ে রামচন্দ্র বুঝেছিল রাবণ কি চায়? শত্রুকে তার নিজস্ব অস্ত্রে পরাভূত করার মত গৌরব আর কিছু নেই। বিরাধকে হত্যা করে রাম রাবণকে জানাল সে দুর্বল নয়। বনেতেও আর একা নয়। রাবণের আগ্রাসী রাজনীতি রুখতে তার গোপন কার্য-কলাপ মূল্যায়ন করতে তবে কি দেবতারা অপারগ হল?

রামচন্দ্র একটু স্থির দৃষ্টিতে সুতীক্ষ্ণর দিকে তাকিয়ে রইল। বিরক্তি ফুটে উঠল তার মুখে। স্তিমিত গলায় বলল: সমকক্ষ শত্রুর বিরোধিতা করার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সময়টুকু শুধু নিয়েছি। দেবতারা যাই ভাবুক, কালহরণের পেছনে এটাই ছিল একমাত্র কারণ।

সুতীক্ষ্ণ রামের সারল্যে মৃদু মৃদু হাসে। স্নিগ্ধ গলায় বলল: দেব-নরপতিরা অগ্নিহোত্র গৃহে তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। চল, আমরা সেখানে যাই।

রামচন্দ্র কক্ষে পা দিয়েই দেখতে পেল ঘর আলো করে বসে আছে দেব-নরপতিরা। রূপ না রূপের জ্যোতি! তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বুক ঠাণ্ডা হয়। মানুষ এমন শ্রীযুক্ত হয় দেবনরপতিদের চোখে না দেখলে প্রত্যয় হত না। তাদের অপাপবিদ্ধ মুখশ্রী দেখে তাদের চরিত্রের ঠিকানা পাওয়া কঠিন।

রামচন্দ্র কেমন হতভম্ভ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়েছিল তাদের দিকে। বাইরে জোনাকি পোকা উড়ছিল পরীর মত। রামচন্দ্র তেমন কিছু গম্ভীর করে ভাবতে পারছিল না। মাথাটা অস্থির, অশান্ত, এলোমেলো।

ব্রহ্মার মুখে হাসি লেগেছিল। হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানা এক অপরূপ ভঙ্গীতে নেড়ে বলল: বৎস রাম, তুমি ঈশ্বরের স্নেহধন্য। তোমাকে দেখব বলে দুর্গম পাহাড় জঙ্গল নদী ডিঙিয়ে এসেছি। তোমার দর্শন লাভ করে আমরা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হলাম।

আকস্মিক এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আপ্যায়ন পেয়ে রামচন্দ্র বারংবার শিহরিত

হল। উত্তেজনায় আর অজানিত এক পুলকানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে। কুটজ্ঞ ব্রহ্মা হঠাৎ তার এত প্রশস্তি করল কেন? এ কি প্রশংসার ছলে তার কোন নিন্দা? তীব্র আশংকায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষণিকের বিভ্রান্তি কেটে গেল কয়েক-মুহূর্তে। শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল তৃপ্তি সুখের ঝংকার।

ব্রহ্মার চোখের দিকে সম্মোহিতের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল: মহাত্মনের স্নেহ লাভ করে ধন্য হলাম। আচার্য বিশ্বামিত্র বলেন প্রশংসায় অহংকার জন্মে। আত্মশ্লাঘা হয়। স্তুতিতে আমি বিচলিত হই না। তবু সাবধান হওয়া ভাল। মহাত্মন আপনি আমাকে আদেশ করুন।

গভীর ভালবাসার আবেগে সুনিবিড় হয়ে উঠল ব্রহ্মার সুর্মা টানা ডাগর দুই চোখ। বুক উজার করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল: আচ্ছা রাম, শ্বাপদসংকুল বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়, ঋষিদের আশ্রমে আত্মগোপন করে, অর্ধাহারে কখনও বা অনাহারে দীর্ঘ তেরো বছর কাটিয়ে তুমি কি পেলে আর কি পেলে না তার হিসেব করেছ কখনও? প্রশ্নটা করে ইন্দ্র রামের দিকে সাপের চোখের মত একজোড়া কুটিল চোখে চেয়েছিল।

রামচন্দ্রের মুখ গম্ভীর। থমথমে। ইন্দ্রের জিজ্ঞাসার কি উত্তর করবে ভেবে স্থির করতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নম্রস্বরে বলল: আপনার পক্ষে প্রশ্নটা করা সোজা, কিন্তু আমার পক্ষে তার জবাবটা দেয়া খুবই কঠিন। বিচার করে দেখার মত সময় কোথায় পেলাম? আর নিজের সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা কারো পক্ষে সম্ভব হয় কি? নিজের কাজের কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ এর নির্ভুল বিচার যদি মানুষ করতে পারত তাহলে পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য হয়ে যেত। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তারক্তি, অশান্তি আর থাকত না।

ইন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করল না। প্রবল আত্মাভিমানে গর্জেও উঠল না। দিশাহারা চোখে রামের দিকে তাকিয়ে হাহাকারের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: আমার প্রশ্নটা মনস্তত্ত্বের কথা নয়, সত্য ও তথ্যের জবাব। তুমি কৌশলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছ!

রামচন্দ্রের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ইন্দ্রের চোখের উপর তার নীরব বিস্মিত চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করল—না। অমনি তার সুডোল মুখে একটা দীপ্তি ঝলকে উঠল। অসহ্য একটা তীব্র অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে বলল: সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়াকে কর্তব্যের অবহেলা বলে না। রাজনীতি অবশ্য আপনার চেয়ে কম বুঝি, কিন্তু এটুকু জানি, দেশ কাল পরিস্থিতির মধ্যে নেমে এসে রাজনৈতিক বিধি বিধান স্থির করতে হয়। রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে অনেক সৈন্য, অস্ত্র, রথ, অশ্ব, হস্তী, মানুষ দরকার। কিন্তু আমার মত নিঃসম্বল মানুষের পক্ষে সে সব সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। নিজের স্বার্থ সংগঠিত করার জন্যে ছত্রিশ জাতির মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে এক বিশাল বাহিনী সংগঠনের পরিকল্পনা আমার।

এই সব উপজাতিরা আমার অনুগত অনুচর। যে অঞ্চলে যখন যাই সে অঞ্চলের উপজাতি অনুচররা আমাকে অনুসরণ করে। আমার দুঃসময়ের বড় বন্ধু এরা।

দেব নরপতিদের কেউ কোন কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রামের দিকে। কেবল ব্রহ্মাই তার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসল। ওই হাসিটাই—তে বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রামচন্দ্রর। একটা বিষাক্ত সন্দেহ তার বুকের ভেতর পাক খেতে লাগল।

কথাবার্তার মধ্যে অকস্মাৎ যতি পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ব্রহ্মা মৃদুস্বরে বলল: বৎস রাম, আমাদের ভুল ধারণাগুলো ভেঙে দিয়ে ভাল করেছ। একটা পরিস্কার ছবি পাওয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাবনার বোঝাটা ঘাড় থেকে একেবারে নামল না। রাবণের আতঙ্ক কাটানোর চিন্তা-ভাবনা কি করলে?

অনেকক্ষণ চুপ করে রামচন্দ্র ভাবল। কিন্তু সব কথা খুলে বলার উৎসাহ বোধ করল না। ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে সে একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রহ্মার কৌতূহলিত দৃষ্টির উপর চোখ পেতে বলল: রাবণের জটিল কূট রাজনীতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাতের কোন ছিদ্র নেই। তার আচরণও পূর্বের মত আর নেই। সে এখন ভীষণ ধীর, স্থির এবং সংযত। উত্তেজনার বশে কোন কাজই করে না। রাজ্যেও সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে, সম্পদে, আনন্দে লঙ্কা অতুলনীয় দেশ। প্রতিটি প্রজার সুখ সমৃদ্ধিভরা নিশ্চিন্ত জীবন। নাগরিক জীবন-যাত্রার কোথাও ছেদ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, বাধা নেই। সবাই সুখী। সেইজন্যে লোকে বলে স্বর্ণ লঙ্কা। সত্যিই তাই! কেবল বিভীষণ যা একটু অখুশী। ভগিনী শূর্পণখার বুকেতেও আছে খানিকটা জ্বালা।

ব্রহ্মা কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল। তার কারণ একটাই। রামের কথার মধ্যে এমন কিছু ইংগিত ছিল যা বুঝতে ব্রহ্মার অসুবিধা হল না। নিজের শ্বাসে মৃদু কম্পন টের পেল। রামের সমস্ত চিন্তাধারা যেন দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে। সে ভেসে যাচ্ছে এক অমোঘ লক্ষ্যের দিকে। নিয়তির নির্দেশে। মস্তিষ্কের ভেতর প্রতিক্রিয়ার বদলে শুরু হয় বিচার বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা।

ইন্দ্রের অধরে কুটিল হাসি। আবেগ গাঢ় স্বরে বলল: ভাগ্যের কৃপা তোমার উপর। কালের স্নেহধন্য। তুমি রাজপুত্র। রাজরক্ত তোমার শিরায় শিরায়। রাজসম্মানে তোমার জন্মগত অধিকার যুদ্ধের। রাবণ তোমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে বলে তুমি যুদ্ধ করবে না? বীরের সম্মান পেতে হলে তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে তাকে ধ্বংস করতে হবে। মনে রেখ তোমার বীর খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী রাবণ। বীর তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাখে না।

বীর্যের গর্বে রামের পুরুষ প্রাণ জেগে উঠল। পাশব পৌরুষবল ধমণীতে টন টন করতে লাগল। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য হিংস্রতায় দপ্ করে জ্বলে নিভে গেল। রাম সম্মোহিত। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল: মহত্তের সন্ধানে যে জীবন মহান, বীর্যের আহ্বানে যে জীবন সার্থক, তার জন্যই সব মোহ, লোভ ত্যাগ করে এসেছি।

ইন্দ্র একটা বড় শ্বাস ফেলল। ভয় আর উদ্বেগটা বেরিয়ে গেল লম্বা শ্বাসের সঙ্গে। ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল ঃ নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তোমাকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি বল? প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ করা ছাড়া আর যা যা বল,— করব। একদিন এই বিশাল দেশের অধিপতি হবে তুমি। সেদিন আর বেশি দেরী নেই।

কেমন একটা আনন্দে, আবেগে তার বুক কাঁপল। দেয়ালে শরীরের ভর রেখে রামচন্দ্র কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। চোখ বুজতেই দেখতে পেল সীতার মুখ। তার বিস্রস্ত বেশবাস। ভীরু হরিণীর মত নিদারুণ ত্রাসে বিহ্বল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আর, ক্ষুধিত হায়নার মত বিরাধের জ্বলন্ত দুটি চোখ, বীভৎস হাসি ঝলসে উঠে—অবচেতনার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলল।

ব্রহ্মা বিহ্বল দৃষ্টিতে রামের দিকে তাকিয়ে রইল। এই প্রথম মনে হল, কালের প্রহরী, ইতিহাসের মহানায়ক যেন বড় বিপন্ন আর অসহায়।

দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশও ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের চতুর্দিক থেকে তার রব উঠল। গোদাবরীর বুক থেকে হু হু করে উত্তরের হাওয়া এল অদ্ভুত এক হাহাকারের শব্দ নিয়ে।

ব্রহ্মা সহসা এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল। এক আসন্ন সর্বনাশের পদধ্বনি শুনতে পেল। কিন্তু কখনো কোনো বিপদ, কোন জটিল সমস্যা জেনে শুনে হতাশার অন্ধকারে নির্বাসিত করে দিতে পারল না। মনের ভেতর ভয়ংকর ধূর্ত এক অভিসন্ধি বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল। মৃদু, শীতলকণ্ঠে বলল ঃ তোমাকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি বল?

রামের কোন কথা বলার আগে ইন্দ্র বলল ঃ প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া, আর যা বলবে, সব করব।

মনটা এমনিতে সিক্ত ও বিষণ্ণ ছিল। ইন্দ্রের আকস্মিক উক্তির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে রাম না হেসে পারল না।

ব্রহ্মা চমকাল না। ইন্দ্রের মনোভাবের কথা সে জানে। তার কথা বলার ধরণ ভাল লাগল না। বলল ঃ আসন্ন রাক্ষস যুদ্ধের জন্য দেবলোকে নির্মিত অস্ত্রের মজুত গোপন ভাণ্ডারের সন্ধান তোমাকে মহর্ষি অগস্ত্য দিতে পারবে। এই সব অতি শক্তিশালী অস্ত্র সহজেই তোমার প্রয়োজনীয় অভাব মেটাবে। এ-ছাড়া অস্ত্র বিশারদ অগস্ত্যর নিজের তৈরী ও আবিস্কৃত অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্রও তুমি পাবে। এইসব উৎকর্ষ যুদ্ধাস্ত্র তোমাকে রাক্ষসদের চেয়ে শক্তিশালী করবে।

ইন্দ্রের সুন্দর মুখখানা কেমন অমানবিক হয়ে গেল। বলল ঃ যেমন করে হোক রাবণকে বিনাশ করতে হবে।

॥ দশ ॥

প্রমোদভবনে খর যৌবনা রূপবতী দেশ-বিদেশের ললনাদের সঙ্গে উচ্ছৃংখল আর প্রমত্ত নিশিযাপন করে রাবণ। রমণীর দেহসম্ভোগের উত্তাল সুখে বিভোর হয়ে থাকে তার চিত্ত। পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যায় তার চেতনায়।

রাবণের ভয়ংকর মানসিক বিপর্যয় সারণকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল, রাবণের অধঃপতন তাকে অবাক করল। মনে প্রশ্ন জাগল, এই কি সেই রাবণ যে শ্বাপদসংকুল বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে আত্মগোপন করে ইন্দ্রর ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে একা লড়েছে,—কখনো দণ্ডকারণ্যের ঘন অরণ্যে, কখনো লঙ্কার জঙ্গলাকীর্ণ গিরি কন্দরে। সামান্য এক অবস্থা থেকে নিজের কৃতিত্বে ও গুণে সে জনগণ বন্দিত অধিনায়ক। তার ডাকে কাতারে কাতারে ছুটে এসেছে তরুণেরা। রাবণ যেখানে যায় সেখানেই উপজাতি এবং স্বজাতির শোষিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারী এবং বঞ্চিত খেতে না পাওয়া মানুষের দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নেতা মনে করে অনুসরণ করেছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কুবের বাহিনীর উপদ্রব, অর্থনৈতিক জোর, জুলুম, অত্যাচার, নিরীহ শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েছে, কখনো অস্ত্র ধরেছে। বিপন্ন কুবের অবশেষে বাধ্য হয়ে সিংহাসন ছেড়ে পালাল। রাবণ, তৎক্ষণাৎ, তার শূন্য স্থান পূর্ণ করল। মহা সমারোহে নিজের অভিষেক করল। জননী নিকষা তাকে রাক্ষস-বংশের রাজমুকুট পরিয়ে দিল। এই আভ্যন্তরীণ পালাবদলের সূত্রেই লঙ্কার ইতিহাসের পাতায় মহান সম্রাটের মত বিরাজ করতে লাগল রাবণ।* একটার পর একটা দেশ জয় করেছে, বিজিত রাজারা বীরের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করতে উপঢৌকন দিয়েছে সুন্দরী সুন্দরী রমণী। তাদের অনির্বচনীয় রূপ, সৌন্দর্য, শ্রী রাবণের সমগ্র চেতনাকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করেছে। নিজের ঘোর লাগা বিহ্বলতার ভেতর মগ্ন হয়ে গিয়ে বন্ধু ও মন্ত্রী সারণকে অভিভূত স্বরে ফিসফিস করে বলেছে: কী আশ্চর্য এই রমণীর সান্নিধ্য। সুরার নেশার চেয়েও ভয়ংকর। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সারা শরীর কেমন অচল হয়ে থাকে। আমি যে সুখের আকর্ষণ ভুলতে পারি না সারণ।

রাবণের চোখে মুখে বিভ্রান্ত বিহ্বলতা। কণ্ঠস্বর কি মিষ্টি, আর কি সুন্দর সেই কণ্ঠস্বর। সারণ জীবনে কখনো শোনেনি। তার কুটিল চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল। নিজের মনের ভিতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে অপলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: মহারাজ, নারী পুরুষের জীবনের এক অপার্থিব সম্পদ। স্বপ্ন দিয়ে গড়া তার শরীর। সঙ্গীতের মূর্ছনার মত এক অদ্ভুত মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে থাকে মনের ভেতর। কাটে না।

* মৎ লিখিত 'রাবণ বহে নিজ নাম" উপন্যাসে বিস্তৃত আখ্যান ও তথ্য পাওয়া যাবে।

রাবণ বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল : জানি। তুমি নারীর নগ্নতনুর সৌন্দর্য দেখেছ কখনও ? মোমের মত মসৃণ, কোমল ত্বকে নেশা মাখানো ; কিছুতে কাটে না। শরীরের আশ্চর্য যৌবনশ্রী, ডালিমের মত নিটোল স্তন, সুস্পষ্ট নিতম্বের হিল্লোল, দুই জঙ্ঘার মধ্যবর্তী ছায়াময় মরীচিকা সমগ্র স্নায়ুকে বিকল করে দেয়, বিশৃংখল করে দেয় সমস্ত চেতনা। কথা বলতে বলতে রাবণের দু'চোখ বুজে গেল এক সুখকর উল্লাসে। মনে হল, রমণীর দেহের স্বাদ যেন তাকে চিররহস্যময় এক অন্য লোকে নিয়ে গেল। নিশি পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন গলায় নিজেকে শুনিয়ে বলতে লাগল : ঐ দ্যাখ মঞ্জুঘোষা তার স্বচ্ছ নীল পরিধান একটানে খুলে ফেলল। তীক্ষ্ন বিদ্যুতের মত তার শুভ্র নগ্ন তনু যেন ঝলসে উঠল। প্রমোদ ভবনের সব আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল অবারিত সেই দেহের অনির্বচনীয় রূপের কাছে। মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে তৈরী যেন আমার মঞ্জুঘোষা। বর্ষার ঘন কালো মেঘের গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে নেচে নেচে আসছে। নৃত্যের ছন্দে হিল্লোলিত ওর দেহবল্লরী যেন উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গের মত দুলছে। আত্মনিবেদনের বিনম্র আকৃতি নিয়ে ও আমার কাছে আসছে। আমার অতীত-বর্তমানের সব স্মৃতি কর্ত্তব্যকে পিছনে ফেলে মুগ্ধ চকোরের মত লোক লোকান্ত পেরিয়ে আমিও চলেছি এক অজানা জগতে। কী আরাম ! কি সুখ ছড়িয়ে পড়ছে আমার সত্তায় !

রাবণের এই স্খলন পতন চোখে দেখতেও সারণের কষ্ট হল। রাবণের গৌরবোজ্জ্বল জীবনে এ এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। সুতীব্র নারীমাংস লোলুপতা তার রক্তের ভেতর হায়নার মত ক্ষুধিত হয়ে আছে। অথচ, একদিন রাবণের নিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ, সাহস, বীরত্বে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলেছিল, সে হবে রাক্ষস বংশের অন্যতম নরপতি ! ভারতবর্ষের ভেতর তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কোন তুলনা হবে না কোনদিন। ব্রহ্মার সে ভবিষ্যৎবাণী সত্য হল রাবণের জীবনে। প্রতিটি মানুষের মনে যে বিপুল মহিমা নিয়ে রাবণ বিরাজিত তার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা কখনো হীন পাপাচারের পথ ধরে পাপের পঙ্কে নামবে না, এই সুস্থ সংকল্পে প্রত্যয়বাণ ছিল রাবণের অন্তর। কিন্তু আর্য বিদ্বেষের স্রোতে একদিন সে সংকল্প ভেসে গেল। অদৃষ্টই তাকে প্রতারণা করল। আর্য রমণী বেদবতীর শ্বেতাঙ্গের গর্ব, অহংকার কৃষ্ণকায় রাবণের অনার্যত্বের অভিমানকে আঘাত করল। রাবণ সব সহ্য করতে পারে, পারে না কেবল শ্বেতাঙ্গের বর্ণবিদ্বেষ আর ঘৃণা সইতে। তীক্ষ্ন তীব্র যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতর সব সংযম শালীনতা প্রাচীর ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। রাবণের চোখে এক সর্বনাশের ইংগিত সেদিন প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল সারণ। সে কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় তার।

দেবলোক বিজয় করে ফিরছিল রাবণ। পথিমধ্যে স্নানরতা বেদবতীর সম্পূর্ণ অনাবৃত তনুর সৌন্দর্যে বিমোহিত রাবণের দেহের ভেতর সপ্তস্বর সুরের ঝংকার তাণ্ডব সুরু করল। রাবণ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল শ্বেতাঙ্গ রমণীর অপরূপ দেহ লাবণ্য। নগ্ন তনুর সৌন্দর্য তার দুর্বার আকর্ষণ তাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলছিল।

দেহের কোষে কোষে তরল আগুনের স্রোত গড়িয়ে পড়ছিল। অসহ্য অস্থিরতায় ছটফট করছিল পুরুষ দেহটা। বিমোহিত রাবণ কেমন যেন হয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতে উচ্চারণ করল ঃ রমণীর দেহ এত সুন্দর!

দেশ আর জাতির উন্নতি আর নিজের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে ভাবতে এই দিকটাই কখনো ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি। জীবনের একটা বড় দিককে সে উপেক্ষা করেছে। তাই কাঙালের মত দীন নয়নে শ্বেতাঙ্গ রমণী বেদবতীর নগ্ন দেহ শুধু দেখল না, তাকে অনুসরণও করল। চেতনার ভেতর মিলন পিয়াসী মানুষের রক্তে বর্ষার কল্লোল। অকস্মাৎ তার পথ রোধ করে দাঁড়াল! বলল ঃ আমি চাই তোমাকে।

বেদবতী চমকে উঠল। সর্বশরীরে তার শিহরণ জাগল। কোন পুরুষ এমন করে প্রথম দেখায় নিঃসংকোচে হৃদয়ের দাবি করেনি। অবশ্য সব নারীই জানে বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে দাবি করে, পাশব বলে সে তাকে ভোগ করে। একজন কৃষ্ণকায় পুরুষের এতবড় দাবির ঔদ্ধত্য বেদবতী সইতে পারল না। কিন্তু একা বলেই রাবণের কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

কিন্তু রাবণ অসংকোচে প্রেম নিবেদন করল। বলল ঃ আর্যা আমি চাই তোমার প্রেম। বল তুমি আমার হবে।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বেদবতী বলল ঃ দেহের নেশায় লোলুপ অনুগত পশু প্রেমের মূল্য জানবে কোথা থেকে? পাশব প্রবৃত্তিকে কখনও প্রেম বলে না। ছাড় পথ।

রাবণ দীপ্ত কণ্ঠে বলল ঃ কামুকতা কোন হীনবৃত্তি নয়। পঙ্কে পঙ্কজের জন্ম। তেমনি কামের ভূষণ প্রেম। তেমনি কামভাব থেকে অঙ্কুরিত হয় প্রেম। কামুকতা গর্বের বস্তু, পুরুষের লক্ষণ।

থুঃ! বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্পর্ধা কর না রাক্ষস। আমি বিষ্ণুর বাঞ্ছিতা।

নিদারুণ একটা অপমানের জ্বালায় রাবণ দপ্ করে জ্বলে উঠল। ভুরু কুঁচকে গেল। ব্যঙ্গে ঠোঁট বেঁকে গেল। বলল ঃ তুমি বেশ্যা! তাহলে ভোগে অবাধ অধিকার। বারাঙ্গনাকে কে কবে সম্ভ্রম দেখায়? সে বহু বাঞ্ছিতা।

নিমেষে বেদবতীর মোমের মত শরীরটাকে সে বুকের ভেতর নিয়ে নিস্পেষিত করতে লাগল। আগ্রাসী চুম্বনের মধ্যে ডুবে গিয়ে রাবণ যখন নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করল ঃ বীর শত্রু সংহার আর নারী সংগম করে তার বীর্যমোক্ষণ করে। যুদ্ধে শত্রুসেনা বধে যেমন অধর্ম হয় না, তেমনি শত্রু রমণীর ধর্মনাশও কোন অধর্ম নয়। শত্রুকে নিস্পেষিত করাই বীরের ধর্ম।

রাবণের প্রতিহিংসার ঝলকে বেদবতী ঝলকিয়ে উঠল। তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য কোন গ্লানিবোধ ছিল না। কেবল যা বিঁধে রইল তা তার কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের কাঁটা।

সেই সূত্রপাত। তারপর থেকে রাবণ আর নিজেকে সংযত করতে পারে না। শ্বেতাঙ্গ রমণী মাত্রেই তার কামনার জ্বালা। নারীমাংস লোলুপতা তার বুকের ভেতরে কামনার আগুণ জ্বালিয়ে রাখে। অসহ্য একটা জ্বালায় যন্ত্রণায় জ্বলে যায়

তার অন্তর। কিন্তু মনের ভেতর ধ্রুবতারার মত জ্বল জ্বল করে তন্বীর সুঠাম এক রূপরম্যা নারী। সে বেদবতী। যার হৃদয় মাধুর্য পেলে জীবন ধন্য হয়ে যেত, সে কেন ঘৃণা করে তাকে নরকে ঠেলে দিল। জীবনটা তার জন্যেই এমন এলোমেলো আর অস্থির।

দণ্ডকবনে রামচন্দ্রের পদার্পণ রাবণের মনের অস্থিরতাকে আরো তীব্র করল। রামচন্দ্র তার চোখে উদ্দেশ্যহীন কোন পরিব্রাজক নয়। মতলববাজ, দুরভিসন্ধি-পরায়ণ এক রাজনৈতিক নেতা। তার কূট কার্যকলাপকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার এক নিপুণ পরিকল্পনা করেই সে সীতা সহ বনে এসেছে। বনের'ত আর অভাব ছিল না- তবু বেছে বেছে সে দণ্ডকবনে এল কেন? রাম সীতাকে সঙ্গে নিল, কিন্তু লক্ষ্মণ পত্নী ঊর্মিলাকে সঙ্গী করল না কেন? সীতার অরণ্যবাসে যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে সীতা সহোদরা ঊর্মিলা কেন বাধা হবে? তার দোষ কি? মনের এই জিজ্ঞাসা থেকে রাত্রে স্বপ্নে বেদবতীকে দেখল। চুপি চুপি সে এসে দাঁড়াল তার শিয়রে। চমক লাগল রাবণের। ঘটনার মধ্যে একটা অভিনবত্বের আলোকপাত হয়। নিদ্রিত রাবণ স্বপ্নের ভেতর কৌতূহলিত চোখে দেখল বেদবতীর গভীর বিষণ্ন মূর্তি। কালো ডাগর চোখের দৃষ্টি ক্ষুব্ধ কুপিত, ঠোঁট ধনুকের মত বাঁকা আর টানটান, মুখে রক্তের আভা। আগুনের মত গণ গণ করছে। রাবণের মনে হল বেদবতী শুধু ক্রুদ্ধ না, একটা কষ্টে বিদ্ধ কাতর। রাবণের অবচেতনে সংশয়ের ছায়া, কিংবা একটা ভয়। বেদবতী ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাস। তীব্র ঘৃণায় নতুন প্রত্যয়ে শক্ত হয়। সবেগে ঘাড় ফিরিয়ে বলল ঃ শোনরে বর্বর রাক্ষস, অশুচি দেহের বিষজ্বালা জুড়োতে এ দেহ অগ্নিতে সমর্পণ করব। পৃথিবীতে ধর্ম সত্য বলে যদি কিছু থাকে তাহলে আমার নবজন্ম তোর মৃত্যুর কারণ হবে। তুই আমাকে বাঁচতে দিলি না, আমি'ও তোকে সুখে থাকতে দেব না। তোর বুকের ভেতর দুঃখের অনল জ্বালিয়ে তুলব। স্বপ্নের ভেতর রাবণ হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠল। বেদবতী হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। দাউ দাউ করে তার সারা অঙ্গে আগুণ জ্বলতে লাগল। আর সে প্রার্থনার ভঙ্গীতে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইল জ্বলন্ত শিখার ভেতর। মুখে কোন যন্ত্রণার বিকৃতি নেই! অনাবিল প্রশান্তিতে তাকে অপরূপ দেখতে লাগল।

ঘুমের ভেতর রাবণ চিৎকার করল। কিন্তু গলা থেকে তার কোন স্বর বেরোল না। আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য তার দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু পা দুটো তার এত ভারী যে এক পাও এগোতে পারল না। দেখতে দেখতে বেদবতী ভস্ম হয়ে গেল। ভস্মস্তূপ ভেদ করে উঠে এল এক রমণী। বেদবতীর মতই দেখতে। রাবণের চোখে মুখে এখন গভীর আগ্রহের ভাব। স্বস্তি ফিরে আসে তার মনে। কিন্তু সমস্ত চেতনা জুড়ে অপরাধবোধ বিষের মত ক্রিয়াশীল হল। নিজের প্রতি একটা ধিক্কারের বশে সে বেদবতীর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে। চোখের পলকে সে (সীতায়) রূপান্তরিত হয়। অমনি ঘুম ভেঙে গেল তার। স্বপ্নের ঘোর কাটতে অনেক সময় লাগল। দৃশ্যটা কিন্তু গেঁথে গেল রাবণের মনের ভেতর।

ভুলে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টায় সে তার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। এক উচ্ছৃংখল ব্যাভিচারী জীবনযাপন করতে লাগল। কিন্তু তারা কেউ বেদবতীর মত ধর্ষিতা রমণী নয়। সুখ ভোগের পর নিশি শেষের বাসি ফুলের মত আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়নি। প্রত্যেককে দিয়েছে বিবাহিতা রমণীর মর্যাদা। কিন্তু তারা রাজপ্রাসাদের মহিষী নয়, প্রমোদভবনের লীলা সঙ্গিনী। সেখানকারই শোভা হয়েই বিরাজ করে। কিন্তু তবু প্রমোদ সঙ্গিনীরা রাবণের মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না স্বপ্নের ঘটনাকে।

সারণ রাবণকে প্রবোধ দেবার জন্য বলল ঃ স্বপ্ন কখনও সত্য হয় ? মনের অভ্যন্তরে নানা জটিল প্রতিক্রিয়া স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়।

রাবণের চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা ফোটে। দৃষ্টি স্থির সারণের কৌতূহলী জিজ্ঞাসু চোখের দিকে। রাবণের স্বর গম্ভীর। চুপি চুপি উচ্চারণ করল ঃ সারণ, তুমি যা বলেছ, সত্য ! কিন্তু লোকে বলে মিথিলার জনক সীরধ্বজ হলকর্ষণ করতে করতে এক অপরূপা কন্যা লাভ করেছে।

আমিও শুনেছি।

সে কন্যা ভূগর্ভ থেকে উঠেছে।

তাও শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই, মহারাজের কানে তুলিনি।

রাবণ একটু থেমে চিন্তা করে বলল ঃ সারণ, এতবড় একটা ঘটনা শুনেও তুমি আমাকে একবার জানানো প্রযোজন মনে করলে না। আশ্চর্য তোমার কর্তব্যবোধ !

সারণ গম্ভীর হয়। স্থির চোখে রাবণের মুখের দিকে তাকাল, বলল ঃ এমন আজগুবি ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন দেখি না। স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলন ছাড়া কোন প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং লোকের অবাস্তব গল্প কেমন করে বিশ্বাস করব ?

রাবণ চিন্তিত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ পৃথিবীতে অনেক সময় এমন অদ্ভূত ঘটনা ঘটে যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

সারণ ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—মানি।

তাহ'লে গল্পটা মিথ্যে, কন্যাটির আবির্ভাব সত্য।

জনকরাজের একটি কন্যা, এই ঘটনার মধ্যে কোন অভিনবত্ব কিংবা চমৎকারিত্ব নেই।

তা বটে। প্রতিদিন পৃথিবীতে কত রাজার কত শিশু সন্তান হচ্ছে, কিন্তু তাদের কারোকে নিয়ে এরকম অদ্ভুত গল্প তৈরী হয়নি। কিন্তু এই কন্যাটি নিয়ে কেন এক অলৌকিক গল্প তৈরী হল। কি তার সার্থকতা ? সে ছাড়া বেদবতীর আত্মহত্যার গল্প কেউ জানে না।

মহারাজ, বাতাসেরও কান আছে। বেদবতী বিষ্ণু বাঞ্ছিতা। একদিন মনের গ্লানিতে আত্মাহুতি দিয়েছিল। বেদবতীর যন্ত্রণা, দুঃখ, চিত্তদাহ সংকল্প এবং মনের প্রার্থনাকে জনকের যোগসাজে সীতাকে নিয়ে তার গল্প তৈরী হল।

সারণ, মিথিলায় সীতার বীর্যশুল্ক সভায় আমিও প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলাম। জনকনন্দিনীর মুখের আদলে বেদবতীকে দেখলাম। কিন্তু সে মুখ সন্ধ্যাদীপশিখার মত নম্র, শান্ত, স্নিগ্ধ এবং জ্যোতির্ময়। আগুনের মত তার রূপ। মনে হল রূপ নয়, রূপের বহ্নি। ভীষণ ভয় পেলাম। চুপি চুপি সভা থেকে পালিয়ে এলাম। নিজেকে প্রবোধ দেবার মত আর কোন যুক্তি আমার থাকল না। আশ্চর্য লাগে রামচন্দ্র আমার দুর্বলতা প্রতিক্রিয়াকে কেমন করে টের পেল? না, আমার নিয়তি তাকে গহন অরণ্যে নিয়ে এল?

সারণ কথা খুঁজে পায় না। রাবণ নিজের মনে বলল: রামের অভিসন্ধি বুঝেও আমি নীরব। প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নিতে পারি না। ভয় সীতাকে। বেদবতী যে সীতা হয়ে জন্মেছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। রাম আমার মনের দুর্বলতা এবং ভয়ের রহস্য জেনেই সীতাকে আড়াল করে আমার ধ্বংসের আয়োজন করছে। আর আমি সব বুঝেও ক্লীবের মত দেখছি। সীতা যদি রামের সঙ্গে না থাকত তাহলে রামকে এই বন থেকে বিতাড়িত করতাম। তাকে হত্যা করতাম। শুধু সীতার অভিশাপের ভয়ে প্রেরণা পাই না। পাছে তার চোখের জল আমার সোনার লঙ্কাকে প্লাবিত করে, রসাতলে নিয়ে যায়—এই ভয়ে আমি তটস্থ। বলবার সময় রাবণ যেন সর্বনাশের আতঙ্কে শিউরে উঠল। চোখের চাহনিতে একটা ব্যাথা ফুটে উঠল।

মনের দুঃসহ অসহায় অবস্থা ভুলে থাকার এক আশ্চর্য ছলনা রাবণ নিজের সঙ্গে করতে লাগল। এক গৌরবোজ্জ্বল জীবন একটি গভীর কলঙ্কের অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করে দিল। মৌচাকে যেমন মৌমাছি লেপ্টে থাকে তেমনি সুদৃশ্য বিলাসবহুল প্রমোদ ভবনের প্রকোষ্ঠে সুন্দরী ললনাদের করোষ্ণ সান্নিধ্যে বিভোর হয়ে থাকে রাবণ। কোথা থেকে দিন কাটে, সন্ধ্যা হয়, রাত হয় আবার দিন হয় রাবণ তার কোন খোঁজ রাখে না। তাই সারণের আশ্চর্য লাগে, যে লোক দেশ ও জাতির সম্মান মর্যাদা গৌরবের জন্য বহু প্রলোভন জয় করেছে, বহুদেশ জয় করেছে সে নিজের ছোট্ট একটা মানসিক গ্লানি জয় করতে পারল না। নিজের কামনার কাছে এমনি করে আত্মসমর্পণ করে সে কি গৌরব ফিরে পাবে?

বাল্য থেকে রাবণ নীতি, ধর্ম, সত্য থেকে ভ্রষ্ট না হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করত। নিজেকে শুধু একজন আদর্শ শাসক, প্রজানুরঞ্জন নৃপতি করার স্বপ্ন ছিল তার। সে স্বপ্ন রাবণের ব্যর্থ হয়ে যায়নি। শ্রীহীন লঙ্কা ঐশ্বর্যে, সম্পদে, সমৃদ্ধিতে সে শ্রীযুক্ত করল। লোকের কাছে স্বর্ণলঙ্কা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হল। সেই কর্মযোগী, জিতেন্দ্রীয় পুরুষসিংহ রাবণ শুধু পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারের পাপকে চাপা দিতে আরও অনেক পাপ করে চলল। সে পাপ ও অন্যায় তার নিজের সঙ্গে।

প্রজারা অভাব অভিযোগ নিয়ে আসে রাজ দরবারে। প্রতীক্ষা করে। অবশেষে, ফিরে যায়, যে যার গৃহে। এসব দেখেশুনে সারণের মনে এক এক সময় প্রশ্ন জাগে,

কি তার ভবিষ্যৎ ? কি করলে রাবণ রক্ষা পায় ? পরিণামের কথা চিন্তা করতে গেলে সারণের সব গুলিয়ে যায়। লোকচোখে লালসার উম্মত্ত শিকার হয়ে রাবণ রসাতলের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। আর তার পিছনে এক দুর্যোগের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

সারণ অত্যন্ত ভয় পেয়ে একদিন বলল ঃ মহারাজ ! রমণীর দেহসুধা আস্বাদন'ত আপনার কাছে অজানা কিছু নয়। তবে, প্রতিদিন এই একরকম উম্মাদনা উত্তেজনা আপনার ভাল লাগে ? একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর মনে হয় না।

রাবণ নিবিষ্ট চোখে সারণের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। আচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ আমার জন্যে তুমি খুব ভাব—তাই না ?

কেন, আপনি অনুভব করতে পারেন না ? আজীবন আপনার পাশে পাশে কাজ করেছি, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

জানি।

বিচিত্র দৃষ্টিতে সারণ রাবণকে দেখল। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, তাহলে একটা কথা বলব ?

নিশ্চল বনস্পতির মত রাবণ দাঁড়িয়ে রইল। বলল ঃ বেশ, বল।

কী চেহারা হয়েছে আপনার ? দর্পণে নিজেকে দেখেছেন কখনও ?

আর কিছু বলবে ?

অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু এত নিস্পৃহ আর নিরাসক্ত হলে কেমন করে বলি ? কাকে বলব ? কে শুনবে ? বলেই বা কি লাভ ?

সারণের ভাবপ্রবণ মনের আকুলতা রাবণকে স্পর্শ করে। বলল ঃ বিরাধের খবর কিছু পেয়েছ ?

সারণ সংকুচিত হয়ে যায়। নির্ভুল গলায় বলল ঃ বিরাধ নিহত।

বিস্ময়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল রাবণের দুই চোখ। বলল ঃ বলছো কি ! তারপরেই কেমন যেন ভাবলেশহীন গম্ভীর থমথমে মুখে সারণের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি জানতাম বিরাধ মরবে। জানকীর রূপ না, রূপের বহ্নি। অশেষ তার বিস্ময়, অসীম তার আতঙ্ক। আমার অদৃষ্ট যেন তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে রণক্ষেত্রে।

তা হলে ভাবনা কিসের বীর ? হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন ? আপনি যদি যুদ্ধে না যান, তবে আমাকে যেতে আদেশ করুন। অদৃষ্টের সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে লড়ব ক্ষুদ্র গৃহকোণে নয়, উম্মুক্ত সমরক্ষেত্রে।

রুদ্ধ কন্ঠে রাবণ বলল ঃ বেশ, তোমাকে বাধা দেবার কি অধিকার আমার। যাও তুমি। আমার হয়ে তুমি রামের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং নেতৃত্ব দাও। তবে আমাকে যেতে বলো না।

রাজা, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? শত্রু যার সামনে থেকে চিরকাল মাথা নিচু করে ফিরে যায় আজ তার কি দুর্দশা ? শত্রুর ছায়া দেখেই সে ভয়ে অস্থির ? বীর চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সে সার্থক করতে চায়। ভয়াল আবর্ত্তের মধ্যেও অকুন্ঠ উৎসাহে যুদ্ধের তান্ডবে ঝাঁপ দিয়ে বীর তার কাম্য বস্তু জিতে নেয়। সীতাকে আপনার ভয় কিসে? তাকে লড়ে রামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আপনার ভাগ্য জয় করুন। হার জিত বীরের প্রশ্ন নয়। যুদ্ধের তান্ডবে সে মুখোমুখি হয় নিশ্চিত মৃত্যুর। তবু মৃত্যু উত্তরণের প্রত্যাশা করে সে। আপনারও আশা করতে দোষ কোথায়? রাবণের শত্রুর শাস্তি হোক।

রাবণের মগ্ন চৈতন্যের ভেতর কিসের একটা দ্রুত ভাঙা গড়া চলল। সহসা সে জেগে উঠল। উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ ঠিক বলেছ সারণ। আমিও তাই চাই। আমার নিজের তৈরী জাল আমি ছিঁড়ে ফেলে দেখব জীবন কি? শুধু আমি নই, প্রত্যেকটি রাক্ষসে তাই চায়! সারণ আমার ভয় ভেঙ্গেছে। এবার বীরের মত রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার আর কোন বাঁধা থাকল না। রামের শত্রুতার অবসান করব, সীতাকে জয় করে লঙ্কার অশোকবনে তাকে বন্দী করে রাখব। তারপর, রামকে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হব। আমার জীবনের হতাশার দিনগুলোকে বীর্য দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে চিরতরে মুছে দেব। রাবণ আবার বেঁচে উঠবে বীর্যে, দম্ভে, মহত্বে।

সারণ উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ চমৎকার। এই'ত বীরের মত কথা। একবার আলিঙ্গন দাও বন্ধু।

॥ এগারো ॥

মাসের পর মাস কাটল অগস্ত্যর আশ্রমে। অদ্ভুত আর আশ্চর্য সব অস্ত্রর এক মজুত ভান্ডার রাম অগস্ত্য মুনির কাছে পেল। এ ধরণের অস্ত্র সম্বন্ধে কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না। প্রতিটি অস্ত্র তার কাছে নতুন। আশ্চর্য তার শক্তি ও নিশানা। রাম ও লক্ষ্মণ নিজস্ব মেধাবলে খুব দ্রুত দক্ষতার সঙ্গে বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রতিরোধের সকল বিদ্যায় উত্তীর্ণ হল। পরিতুষ্ট অগস্ত্য রামচন্দ্রকে উপহার দিল তার নিজের বিজয় ধনু এবং অক্ষয় তূণ।

রামচন্দ্রর বিদায় গ্রহণের দিন এসে গেল। অগস্ত্য রামচন্দ্রকে অকস্মাৎ নিজের কুটীরে আহ্বান করল। তখন কাক ভোর। অন্ধকারের রেশ কাটেনি। কেমন একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা বয়ে গেছে তপোবন জুড়ে। ছাই ছাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন অগস্ত্যর কুটীরের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভেতরে ভেতরে একটা অশান্ত উত্তেজনা আর অজানিত এক উৎকণ্ঠায় আচ্ছন্ন হয়ে সে অগস্ত্যর কুটীরে প্রবেশ করল।

দারুনির্মিত সেই কক্ষের চারকোণে চারটি খরদ্যুতি প্রদীপ জ্বলছিল। সেই আলোয় ঝলমল করছিল কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় দেখল

অগস্ত্য অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার অপরূপ মুগ্ধতা। অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর রামচন্দ্রের কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। রামের বিভ্রান্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ এস। বড় প্রয়োজনে তোমাকে ডেকেছি।

আমায় কি করতে হবে বলুন। বিনম্র গলায় রামচন্দ্র বলল।

দণ্ডকারণ্যের সন্নিহিত গৃধ্ররাজ্য, দানব রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর দিয়ে লংকা নগরী থেকে আর্যাবর্ত পর্যন্ত একটি বাণিজ্য পথ চলে গেছে। এই পথে আর্যাবর্তের সঙ্গে দক্ষিণদেশের বন্ধু রাজ্যগুলির পণ্য সম্ভারের আদান প্রদান চলে। একদিন বিন্ধ্যাপর্বতের বাধা অতিক্রম করে উত্তর ও দক্ষিণের সেতু রচনা করতে এই পথ তৈরী করেছিলাম। আর্যাবর্তের সঙ্গে জনস্থানের চলাচলের পথ উন্মুক্ত করা ছিল আমার লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, উত্তর ও দক্ষিণে যাতায়াতের একমাত্র সড়ক হল এটি। সম্প্রতি রাবণ বিধবা ভগ্নী, দানব মহিষী শূর্পণখার সাহায্যে এই রাস্তাটি নিয়ন্ত্রণ করছে। সওদাগরদের পণ্য সামগ্রীর উপর চড়া শুল্ক ধার্য করছে। ফলে, বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

রামচন্দ্র সহসা প্রশ্ন করল ঃ কিন্তু এই বাণিজ্য পথে গৃধ্ররাজ জটায়ুরও অধিকার আছে। তবে, তিনি তাঁর অধিকার গ্রহণ করছেন না কেন?

বৎস রাম, এই গৃধ্ররা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ। বিবাদ-বিসম্বাদ এড়িয়ে চলে। সংঘর্ষ অপরিহার্য হলে যুদ্ধ করে। তাই, রাবণ ভগিণীর সঙ্গে প্রকাশ্য কোন বিরোধ জটায়ু চায় না। এতে বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সম্ভব। তাই কর্তৃত্বের লড়াইতে নামেনি। গৃধ্ররা ভীরু বা দুর্বল নয়। এরা সাহসী, পরিশ্রমী, কারিগরী শিক্ষায় ভীষণ উন্নত। যান্ত্রিক পক্ষ বিস্তার করে এরা অক্লেশে শূন্যে উড়তে পারে। অন্তরীক্ষ্য থেকে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখে। আকাশ যুদ্ধে এদের সমকক্ষ কেউ নেই। এরা বন্ধু হলে তোমার উপকার হবে।

জানি আচার্য। আমার মনেও সেই ইচ্ছা জেগেছিল। এখন দ্বিধাহীন হওয়া গেল।

হাঁ, গৃধ্রপতি সব বৃত্তান্ত অবগত আছেন। তিনি তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। আমার ধারণা, জটায়ুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হলে, ঐ নিয়ন্ত্রণ বন্ধ হবে। অন্যথায় শূর্পণখার সঙ্গে একটা অনিবার্য বিরোধ বাঁধতে পারে।

রামের অধরে স্নিগ্ধ হাসির আভাস। একটু অপ্রতিভভাবে বলল ঃ আপনি কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আচার্য?

অগস্ত্য সন্দেহের গলায় বলল ঃ আমার ভয় হচ্ছে। এই বিরোধ যে কোন মুহূর্তে একটা বিরাট সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে।

উদাস গলায় রাম জিগ্যেস করল ঃ এতে ভয় পাওয়ার কি আছে?

অগস্ত্য হঠাৎ একটু বিচলিত হয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলল ঃ আছে বৎস। পঞ্চবটী বন জায়গাটা ভাল নয়। দিনগুলো সেখানে তোমার নিরাপদে কাটবে না। কথাটা

শুনতে খারাপ, তবু যুক্তি সঙ্গত। কে সীতাকে অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখবে বল। সব পরিস্থিতিতে তো তাকে আর আগলানো যাবে না। তার চেয়ে বরং এমন জায়গায় তাকে লুকিয়ে রাখ, যাতে কেউ খুঁজে না পায়।

রাম নীরব।' তার কোন ভাবান্তর নেই। কিংবা চোখে মুখে কোন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠারও লক্ষণ প্রকাশ পেল না। পাবে কোথা থেকে? সারা জীবন রাজনীতি চর্চা করেছে। তাই, এ নিয়ে কোন উত্তেজনা বোধ করে না। কিংবা কোন অস্থির ভাবও জাগে না। রাজনীতিতে সবসময় ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে সে। হাসি মুখে সকলের কথা শোনে। কিন্তু নিজে কি করতে চায় ঘুণাক্ষরে জানতে দেয় না কাউকে। অন্তরের গভীরে অন্য এক সত্তা চতুর্দিকের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝে নেবার নিরুত্তেজক কাজে ব্যস্ত। এদের আদেশ নির্দেশ নীতি নির্ধারণে কতখানি সহায়ক তার হিসাব করে মনে মনে। এই রাজনৈতিক উত্তেজনার ভেতর রামচন্দ্র মানুষের চরিত্রের অনেক নগ্ন ও কুৎসিত দিক দেখতে পায়। তাদের আচরণে কত অসঙ্গতি চোখে পড়ে। এসব কিছুই তাকে আশ্চর্য কিংবা অস্থির করে না। অনাবিল আঁখি তারা বিস্ময় মুগ্ধ কৌতুকে স্নিগ্ধ হয়। অগস্ত্যর চোখে চোখ রেখে রামচন্দ্র নির্বিকার গলায় বলল: ওসবে ভয় করতে নেই কালচক্রের আকর্ষণ থেকে কারো মুক্তি নেই। সকলকেই কালের রথচক্রতলে পিষ্ট ও মথিত হতে হবে।

কুয়াশার মত অন্ধকারের ছায়া ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে চারদিক থেকে। রহস্যময় কুহেলিকার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল শিশু সূর্য। পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করে সে আলোর বন্যায় পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে তুলল। অরণ্যের পাতায় পাতায় লাগল খুশির দোলা। নীল আকাশ ঝলমল করে উঠল আলোয়। আলোর বন্যার প্রবাহিত ধারায় রাতের কলঙ্ক কালিমা যেন ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। জেগে উঠল অন্তরের ভেতর এক শুভ্রতার ঝিলিক।

প্রকৃতির রূপান্তরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকল রামচন্দ্র। মুগ্ধ অভিভূত স্বরে বলল: এখন যদি এই রাস্তা নিয়ে সংঘাত হয়, রক্তপাত হয়, তাহলে লংকার সুনাম নষ্ট হবে।

রামের কথায় অগস্ত্য অদ্ভুত হাসল। ধীর স্বরে বলল: রাস্তা হল গৌণ, বড় হল রাজনীতি। জনস্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বাঁধানোর জন্যে যারা তৈরী, যাদের নীতি হল সংঘাত বাড়ানো তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলবে কি উপায়ে?

রামচন্দ্র একটু বিব্রত হল। স্থির দৃষ্টিতে অগস্ত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নীরবতা কক্ষের নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করে তুলল। অগস্ত্য রামচন্দ্রের তন্মগত ভাব লক্ষ্য করে চুপ করে থাকল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রামচন্দ্রর বাহ্যিক কোন নড়াচড়ার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর বলল: স্থান কাল পরিস্থিতিতে যে কথা বলা শুধু সম্ভব, সেকথা এখন বলব কি উপায়ে? এখন বলা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, বিপদজনক।

অগস্ত্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অস্থিরতায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কয়েকবার। তারপর স্তিমিত গলায় বলল: তা বটে। কিন্তু উপায়?

রামচন্দ্রের অধরে স্নিগ্ধ হাসির আভাস। মৃদু স্বরে বলল ঃ নদীর স্রোতে ভেসে বেড়ানো শেওলার সাধ্য কি স্বাধীন ইচ্ছেয় চলে? তেমনি দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যা যুক্ত তাকে এখন আলাদা করে দেখি কেমন করে? ধৈর্য ধরে শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করতে হবে। সময়ের ফসল সময়েই ঘরে তোলা যায়।

প্রবল গর্বে, আনন্দে অহংকারে অগস্ত্যর বুক ফুলে উঠল। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে টের পেল শ্বাসের বাতাসটা কেঁপে গেল। অতি কষ্টে নিজের প্রবল আবেগ সামলে নিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ তোমার মত শিষ্য পেয়ে আমি গর্বিত। তাই তোমাকে নিয়ে আমার সর্বদা দুশ্চিন্তা।

পরম তৃপ্তিতে রামচন্দ্র দু'চোখের পাতা বুজল।

গন্ধরাজ জটায়ুর কাছে রামচন্দ্র জনস্থানের গোটা চিত্রটা জানতে পেল। আর্যাবর্ত থেকে লংকা পর্যন্ত পথ ঘাট, সব জটায়ুর নখদর্পণে। রাবণের কত সৈন্য-সামন্ত, রথ, অশ্ব, হস্তি, অস্ত্রশস্ত্র সব তার মুখস্থ। শুধু তাই নয়, লংকার চতুর্দিকে যেসব মানুষ ও জাতি বাস করে তারাও কত বিচিত্র এবং অদ্ভুত চরিত্রের। এদের অধিকাংশই চাষবাস করে না। অরণ্যে বসবাস করে। যুদ্ধ তাদের জীবন ও জীবিকা। যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তেজনা না থাকলে এরা ক্লান্তিবোধ করে। একদিন এদের সাহায্যে রাবণ কুবেরকে হঠিয়েছিল। রণনিপুণ যুদ্ধবাজ এই মানুষদের সাহায্যে রাবণ একটা যুদ্ধের আতংক সৃষ্টি করেছে। এই কাজে তার বড় সহযোগী হল মারীচ। শৃগালের মত ধূর্ত সে। নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত। বাঘের মত তার রক্তের তৃষ্ণা। আবার শশকের মত সে বনে জংগলে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তাদের রাজা রাবণ সে কালবৈশাখীর ঝড়। ঝড়ে যেমন কালবৈশাখীর চাল উড়ে যায়, বাসস্থান ভেঙে যায়, আঘাতে জখম হয়, নিরাশ্রয় হয়, বৃষ্টিতে ভিজে থর থর করে কাঁপে; রাবণের অভিযানও সেইরকম। কোথাও কিছু নয় হঠাৎ বিশাল বাহিনী নিয়ে সে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তছনছ করে দেয়। যুদ্ধে তার মত নির্দয় মানুষ হয় না।

রাবণের অভিযানের নাম শুনলে মানুষের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। লোকে ভাবে দেশ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? অরণ্য ভূমিতে রাক্ষস কোথায় নেই। রাক্ষস মানেই রাবণের অনুচর। শান্তি ভঙ্গের আশংকায় রাবণের বিরোধিতা করার সাহস নেই কারো। গোটা দাক্ষিণাত্যে রাবণের আধিপত্য। যুদ্ধের আর অত্যাচারের লীলাভূমি। নিজের অঞ্চলে যারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাদের শক্তি থাকলেও রাবণের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিপদ ডেকে আনে না। সড়কের বিবাদে জটায়ু তাই নিজেকে জড়ায় না।

রামচন্দ্র নীরবে শুনল সব। ভিতরটা তার চিন্ চিন্ করছিল। কেন হচ্ছিল বুঝল না। তবু মনে মনে অবিরাম এই প্রশ্নের জবাব খুঁজছিল সে। কেন? কেন?

রামচন্দ্রের দু'চোখ সহসা তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল, জটায়ুর কিছু একটা অস্বস্তির কারণ ঘটেছে। অস্বস্তির সঙ্গে একটা চাপা উদ্বেগও ছিল তার। ঘরের ভেতর পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে নিজের অগোচরে অস্ফুট উক্তি করছে।

কিন্তু আরো যে একজন নিঃশব্দে তাকে লক্ষ্য করছিল সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। হঠাৎ যেন জটায়ু মনস্থির করে ঘুরে দাঁড়াল রামচন্দ্রের দিকে। বলল: বন্ধুবর রামচন্দ্র সব কথা শুনেও তুমি নীরব কেন? পঞ্চবটী বন খুব ভাল জায়গা নয়। ওটা রাক্ষসদের স্বর্গরাজ্য। ঐ স্থানে বসবাস করা আদৌ নিরাপদ নয়।

রামচন্দ্রের স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। মৃদু স্বরে বলল: মহাত্মা জটায়ু আপনার উৎকণ্ঠায় আমি বিচলিত বোধ করছি। কিন্তু আমিত সহায়হীন সম্বলহীন বনবাসী পরিব্রাজক মাত্র। বনে আমি রাজ্য জয়ে আসিনি, পিতৃসত্য রক্ষা করতে এসেছি। পঞ্চবটীর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে চুম্বকের মত টানছে। পথের বিপদ বাধা চিন্তা করে কোন পরিব্রাজক যাত্রায় কি বিরত দেয়? দেয় না। আমিও থামব না।

বন্ধু তোমার জন্য ভাবি না। মা জানকীকে দেখা থেকে একটা ভয়ংকর বিপদের আশংকায় আমার মন তোলপাড় করছে। তুমি তাকে অন্য কোথাও রেখে যাও।

তা হয় না বন্ধু। তাতে রাক্ষসদের কাছে আমার দুর্বলতা ধরা পড়বে। তাদের বিক্রমে আমি শংকিত; এটাই জানবে লোকে। রাক্ষসেরা আমার ভীরুতা দেখে হাসবে। আর্যাবর্তের রাজারা আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কৌতুক করবে, রাবণ উপহাস করবে, মুনি ঋষিরা ধিক্কার দেবে, লক্ষ্মণ অভিসম্পাত দেবে। সকলের চোখে আমি ভীষণ ছোট হয়ে যাব। হীনমন্যতাবোধ কাঁটার মত বিঁধে থাকবে। জানকীকে নিয়েই এই অরণ্যভূমিতে আমার একটা বিশেষ মর্যাদা, সম্ভ্রম আর গৌরব-বোধ গড়ে উঠেছে। তাকে কেমন করে নষ্ট করব?

জটায়ু নির্বাক। বিস্ময়বোধে স্তিমিত হল তার দুই চোখের চাহনি। জটায়ু বিব্রত। দ্বিধায় পড়ল উত্তর দিতে। জটায়ুর ভেতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেল। মুখ চোখ তার থমথম করছিল। অথচ মনের কথাটা স্পষ্ট করে বলতে তার বাধ বাধ লাগছিল। কিছুক্ষণ রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল: জেনে শুনে বিপদ ডেকে আনবে বন্ধু।

রামচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসে। বলল: গৃধ্ররাজ তুমি নির্ভয়ে থাক। আমাদের কিছু হবে না। যদি কখনও হয় কিছু, তোমরা'ত আছ। ভয় কিসে?

জটায়ু চুপ করে থেকে সমর্থনসূচক মুখ নাড়াল। গভীর একটা বিষাদ অনুভব করল। খুব সংশয়পূর্ণ এবং বিষণ্ণ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রামচন্দ্রের দিকে।

তার মনে হল, রামচন্দ্রের সব ভাল, কিন্তু মনটা বড় নিষ্ঠুর, সংকল্প সাধনে বড় কঠোর, আর হৃদয়হীন। সেখানে কারো সঙ্গে কোন আপোস নেই তার।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শান্ত কণ্ঠে বলল ঃ তোমার সঙ্গে তর্ক চলে না। কিন্তু বিচারবোধও শেষ হয়ে যায় না। মনের সব কথা কি বোঝানো যায়? সব ভাব যে কথায় আসতে চায় না। কি করে বলি?

জটায়ু খুব করুণ দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সীতার মুখখানা যেন চারদিককার আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। জানকীর মুখের উপর আর এক মুখের ছায়া পড়ল। পম্পা হ্রদের শবর কন্যা সে। পানপাতার মত ভরাট আর নিটোল তার মুখশ্রী। সুদূর স্বপ্নের মত তার মস্ত মস্ত টানা দুটি চোখ। সীতার মতই সুন্দর আর অপার্থিব এক রমণী সে। শ্রাবণের ভরা নদীর মত ডগমগ করছে তার তাম্রাভ তনু। চেহারার ভেতর এমন একটা মিষ্টিভাব আছে যে, একবার তাকালে আঠার মত চোখ আটকে থাকে। ফেরাতে ইচ্ছে করে না। কী গভীর মায়া, কত ছলছলে আর করুণ। বাস্তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে এমন অদ্ভুত মিল থাকা সম্ভব চোখে না দেখলে প্রত্যয় হয় না। শবর কন্যা শবরীর সঙ্গে সীতার 'কোন প্রভেদ নেই। এক মায়ের পেটে যমজ বোন যেন তারা।

নিজের সে বিস্ময়ের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সম্মোহিতের মত আচ্ছন্ন গলায় বলল ঃ যা ছিল চোখের আড়ালে, যাকে চোখ মুখ বুজে ভুলে থাকা যেত, সেটা এমন রূঢ় বাস্তব হয়ে উঠল কেমন করে? আমার ভাবনায় সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আসলে আর নকলে একাকার হয়ে গেছে।

রামচন্দ্রকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাল। দ্বিধা করে বলল ঃ মিত্র জটায়ু, তোমার কথার রহস্য আমার বোধগম্য হল না।

হবে না। পম্পা হ্রদের কাছে ঋষ্যমূক পর্বতের উপর শবর কন্যা শবরীকে কখনও দেখেছ? শবরী জানকী, না জানকী শবরী এই বিভ্রম থেকে মুক্ত হতে পারছি না!

গৃধ্ররাজ, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মত অসংলগ্ন কথা তোমার মুখে শোভা পায় না!

জটায়ু একটু ফাঁকা আওয়াজ করে হাসল। বলল ঃ তা বটে। আপনার পক্ষে কথাটা বলা সোজা, কিন্তু আমার কাছে গোটা ব্যাপারটার রহস্য কিছুতে পরিস্কার হচ্ছে না, কেন, সেটাই ভাবছি।

রাম গম্ভীর হল। কিছুক্ষণ অবাক চোখে জটায়ুর দিকে চেয়ে রইল। চোখে তার সন্দেহের ছায়া পড়ল। বেশ বুঝতে পারছিল শবরীকে নিয়ে জড়িয়ে আছে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য। অকুণ্ঠচিত্তে যা প্রকাশ করতে জটায়ুর সংকোচ হচ্ছে। তাই, আভাসে ইঙ্গিতে সে বোঝাতে চাইল জানকী ও শবরীর আকৃতি ও গঠনের কোন প্রভেদ নেই। উভয়কে আলাদা করে চিনে নেয়া কঠিন। রামচন্দ্রের মনের অন্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল অন্য এক ভাবনা। মুখেতে তার হাসির নিঃশব্দ ঝরণা।

সব দিক চিন্তা করে রামচন্দ্র পাহাড় ঘেরা পঞ্চবটীতেই কুটীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত করল। এর ভৌগোলিক অবস্থান রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। লঙ্কার দূরত্ব এখান থেকে শুধু যে অল্প—তা নয়; একেবারে রাক্ষসদের ভেতরে বাস করতে পারবে। তারা কি চায়, কাকে চায়—এ সব জানা যেমন সহজ হবে, তেমনি দেখে নিতে পারবে রাবণের পক্ষে তার স্বজনদের সমর্থন কতখানি? বিবাদ বিভেদের এক আত্মঘাতী যুদ্ধের বীজ বপন করে নিজের স্বার্থকে নিরাপদ এবং রাবণের পরাভবকে সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা সে এখানে করার অবসর পাবে। রাবণের শাসনযন্ত্রের ভেতর যেসব দুর্নীতি, দুরাচার বাসা বেঁধেছে সেগুলো উস্কে দিয়ে কতখানি জয় আদায় করা যায় তারও হিসাব নিকাশ করতে পারবে। এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগও থাকবে।

লঙ্কার স্বর্ণসিংহাসনে রাবণ প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখার মত শৌর্যে, বীর্যে, সম্ভ্রমে, গৌরবে মর্যাদায় উজ্জ্বল। কিন্তু সিংহাসনের পাদদেশে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মত যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয়ে আছে তা নিয়ে রাবণের কোন চিন্তা নেই। সেই অন্ধকার তামসের গর্ভদেশে রাবণ ধ্বংসের বীজ বপন করতে এবং অঙ্কুরিত করতে তার পঞ্চবটীতে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল। পঞ্চবটীতে এক অভিনব রাজনৈতিক অধ্যায় সূচনা করার পরিকল্পনা তার। যাদের সাহায্য নিয়ে সে লঙ্কার রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই সূচনা করবে বলে মনে মনে স্থির করেছে তাদের সাহায্যে এবং সংস্পর্শলাভের জন্য পাহাড় ও নদী ঘেরা এই পঞ্চবটী একান্ত প্রয়োজন।

রাক্ষসের দৌরাত্ম্য আধিপত্য থেকে মুক্ত হবে ভারতবর্ষ। সে মুক্তি আসন্ন। মুক্তির চেহারা দেখে এখনই অনেকে আতঙ্কিত। এমন অনেক কিছু ঘটবে যা সহজ অবস্থায় কেউ চাইবে না। কিন্তু রাক্ষসশক্তির বিদায় ঘটানোর জন্য দেশমাতৃকার পদে দিতে হবে রক্তশতদলের পুজাঞ্জলি। বড় ত্যাগ বড় দুঃখ বরণ ছাড়া বড় জিনিস লাভ করা যায় না। তার নেতৃত্বে এবং উদ্যোগে একদিন আর্যাবর্তের গৌরবসূর্য উদিত হবে। আর্যাবর্তের ভাগ্য নির্ধারণ যখন বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে তার উপর ন্যস্ত তখন সবটুকু শুভবুদ্ধি দিয়ে সে তা করবে। এজন্য তাকে যদি কোন যন্ত্রণা কষ্ট পেতে হয় তবু করবে সে। এহল তার বহুবছরের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। শুধু ভয়ে আর আতংকে সে তা ব্যর্থ করে দিতে পারে না। পারবে কোথা থেকে? এক নতুন আদর্শ রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যে তার দুই চোখে।

পঞ্চবটী যাওয়ার আগে সে একা পম্পার তীরে শবর পল্লীতে যাওয়া মনস্থ করল। তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির মনোরম আশ্রম। সেখানে লক্ষ্মণ ও সীতাকে রেখে পম্পা হ্রদে যাত্রা করল। তার হঠাৎ গমনের কারণ কেউ জানল না। এমন কি প্রাণের লক্ষ্মণ পর্যন্ত নয়।

রাশি রাশি হরেক রঙের ফুল ফুটে আছে চৌদিকে। ফুলের দেশ পম্পা। এর পাহাড়ের বনে বনে ঘুরে বেড়াল রামচন্দ্র। কোথাও সেই স্বপ্নের বিচিত্র মেয়ের সন্ধান পেল না। কোথায় কোন সুন্দরী মেয়ে কোন খেয়ালে, কি কারণে জটায়ুর ভাল লেগেছে তা জানতে হলে'ত শবর পল্লীর সব মেয়েদের পিছনে গুপ্তচরের মত ঘুর ঘুর করতে হয়। বিদেশ বিভূঁইতে এসে সে কাজ করলে আর দেখতে হবে না। ধরা পড়লে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল রামচন্দ্রের। অস্ফুটস্বরে বলল ঃ হে ঈশ্বর রহস্যের যবনিকা উত্তোলন কর। দেখা দাও স্বপ্নের মেয়ের।

টুং টুং করে গরুর গলায় ঘণ্টা বাজছিল। আর সেই ক্ষীণ আওয়াজ মৃদু বাতাসে অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ করে রামচন্দ্র দূরের সবুজ পত্রপুঞ্জে ঢাকা শবরপল্লীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। দেখল দুটি গাড়ীর পিছনে যে মেয়েটি আসছে সে স্বপ্নের মেয়ের মত বিচিত্র আর রহস্যময়। গাভীদের সঙ্গে মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলেছে, মাথায় জলভরা গাগরী। মনে হচ্ছিল, বাতাসে ভেসে ভেসে যেন সে উঁচুনীচু জঙ্গল পথ ভেঙ্গে আসছে। রূপলাবণ্যে রমণীর সেই তনুখানি ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। রামচন্দ্র অবাক হয়ে দেখল মেয়েটি সীতার এক ছায়া। বিচিত্র আবেগে তার বুকের শিরা উপশিরাগুলো টনটন করতে লাগল।

রামচন্দ্রের সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। চোখে মুখে তার নিষ্পাপ সরলতা আর কেমন আরাত্রিক পবিত্রতা। অনির্বচনীয় যৌবনলাবণ্যমাধুরী নিয়ে যেন কোন সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে নেমে এসেছে সেই অপার্থিব নারী মূর্তি। তার শান্ত নির্বিকার বেদনাহীন দুই চোখের দৃষ্টি উৎসুক হয়ে রামের মধ্যে যেন কাকে খুঁজছে।

রামচন্দ্রের বিস্মিত মনের অভ্যন্তরে শুধু ভেসে ভেসে উঠছে সীতার মুখচ্ছবি। তার স্বপ্নাচ্ছন্ন কালো ডাগর দুই চোখ, নরম আর কমনীয় পানপাতার মত মুখ, গায়ের শুভ্র বর্ণ। শ্বেত পাথর কেটে কুঁদে কুঁদে তৈরী করা হয়েছিল তার মূর্ত্তি। বিজন আরণ্যক পরিবেশে স্বপ্নের মেয়ের অনুরূপ দেহশ্রীর স্বর্গীয় বিভূতি তাকে অবাক করে দিল। রামের নীল রঙের বড় বড় দুই চোখে তীব্র কৌতূহল জোনাকীর মত মিট মিট করছিল। অবাক বিস্ময়ে নিজেকে যেন প্রশ্ন করল, একি স্বপ্ন, না সত্য! মায়া, না বিভ্রান্তি! স্বপ্নের মেয়েকে সীতা বলে তার নিজেরও ভ্রম হতে পারত। কিন্তু বহিরঙ্গে সাদৃশ্য সব নয়। স্বপ্নের মেয়ের ভেতর খুঁজে পেতে হবে একটা মিষ্টি মেয়েকে। যার মনটা গভীর মমতা পরিপূর্ণ। যে হবে সীতার মতই শ্রীময়ী, লক্ষ্মীময়ী।

রামচন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল। নিজের অজান্তে মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হল তার মুখ। চকিতে মেয়েটিও সংজ্ঞা ফিরে পেল। রামের স্থির অনুসন্ধানী চোখের উপর চোখ রাখতে পারল না। মুখ নামিয়ে নিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মাথা নিচু করে পাহাড়ী পথের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল। আবার আড়চোখে রামকে দেখল। চোখের পলকে একটু অবাক জিজ্ঞাসু ঝিলিক খেলে যায়। তারপর সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

স্নিগ্ধ আর নমনীয় স্বরে রামচন্দ্র তার পিছনে ডাকল। কল্যাণী, তোমার কলসী থেকে একটু জল দেবে? আমি খুব তৃষ্ণার্ত।

রামের সস্নেহ অন্তরঙ্গ সম্বোধনে স্বপ্নের মেয়ে থমকে দাঁড়াল। থামতে গিয়ে শরীরটা টাল খেল। কিছুটা জল চলকে পড়ল মাটিতে। বুকটা আপনা থেকে থর থর করে কেঁপে উঠল। এমন মরমী গলায় কেউ কখনও ডাকেনি তাকে। হীন ঘরে জন্ম বলে, চিরকাল অনাদর, অবজ্ঞা, অবহেলা আর ঘেন্না পেয়ে এসেছে। রামচন্দ্রের ডাকে তাই মনটা ভিজে গেল। মাথা নুয়ে এল শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে এবং আবেগে। সুখানুভূতির আবেশে তার দু'চোখ শুধু বুজে গেল না, চোখের কোন ভরে গেল জলে। স্বপ্নের মেয়ের বুকের ভেতরটা কেমন বোবা হয়ে গেল। রামচন্দ্রের ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে পারল না। পাতলা ঠোঁট দুটো তার থর থর করে কাঁপতে লাগল। বিস্ফারিত দুইচোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটল।

মস্তিষ্কের অন্ধকারে আচমকা একটা পাপবোধ জাগল। সাপের দংশনের মত তার তীব্র জ্বালা অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল। করুণ অসহায় চোখে রামচন্দ্রের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পাপবোধের আড়ষ্টতায় সে বোবা। দাঁত টিপে অসহনীয় সহ্য করতে লাগল। সহসা তার কণ্ঠস্বর স্ফুরিত হল ভাঙা এবং অস্ফুট। স্নিগ্ধ গলায় বলল ঃ ভদ্রে, তুমি দেবতা কি মানুষ, জানি না। অন্ততঃ মানুষের এমন অদ্ভুত গায়ের রঙ হয় না। তোমার তনুশোভা অপূর্ব। অদৃষ্টপূর্ব। তোমার রূপ দেখে নয়ন জুড়োল। কথাশুনে হৃদয় ভরল। তোমার মহত্বে চমক লাগান বিস্ময়। আমাকে তুমি ধন্য করলে। কিন্তু কৃপা করুণা পাওয়ার যোগ্য কি আমি? সামান্য শবর রমণী।

আলোড়িত হয়ে উঠল রামের চেতনা। অপরিসীম বিস্ময়ে ললাট কুঁচকে গেল। চোখ বিস্ফারিত হয়। ফিস্ ফিস্ করে অস্ফুট স্বরে বলল ঃ তুমি শবরী?

শবরীর চোখের দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্য জাগল না। ঔৎসুক্যও প্রকাশ পেল না। দু'হাত দিয়ে মাথার উপরের জলপূর্ণ পাত্রটি ধরল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ হাঁগো, সামান্য শবর কন্যা আমি। পিতৃমাতৃহীনা এক অনাথিনী। অস্পৃশ্যা, অশুচি। তোমায় জলদানের শুচিতা আমার কোথায়? ওগো তাপস, ওগো মহৎ অপরাধ নিও না, আমাকে অপরাধী কর না। অস্থির যন্ত্রণায় সে কেঁদে ফেলল।

রামচন্দ্র ভারী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তার বুকের ভেতরটা, করুণায় উথাল পাথাল করতে লাগল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ শুচিস্মিতা অস্পৃশ্যা কিংবা অশুচি তুমি নও। তুমি বিধাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। অমৃতের পুত্রী। তোমার দেয়া জল ছাড়া আমার তৃষ্ণা দূর হবে না।

শবরীর সর্ব শরীর কণ্টকিত হল পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। কিন্তু প্রথা সংস্কার, বিশ্বাস যে তার মর্মমূলে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। তাকে উন্মূল করবে দিয়ে?

শবরীর মনে হতে লাগল তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা

কণ্টে টাটাচ্ছে। চোখেও ফুটে উঠেছিল একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ। যা তার পাপবোধের দ্বিধাকে তীব্র কণ্ট বিদ্ধ করছিল।

রামচন্দ্র শবরীর আয়ত কালো চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতরে ডুবে গিয়ে গাঢ় স্বরে ডাকল ঃ শবরী, তৃষ্ণার্তকে জল দান করলে ঈশ্বর সেবা হয়। আমি দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করছি, তুমি জল দাও।

শবরীর আবেগ গাঢ়তর হয়। যা মুগ্ধতা থেকে সঞ্চারিত হয়ে তার ভিতরের সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বাধার প্রাচীর ভেঙে দেয়। চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে তার রঙের ঔজ্জ্বল্য ঝলকিয়ে উঠে। বুকের স্পন্দন বাড়ে। বহুদূরে বেজে উঠা অতি স্তিমিত ঢাকের শব্দের মত বুকের ভেতর ধুক পুক্ ধুক পুক শব্দ হয় এবং সেই সঙ্গে একটা আবেগের ঢল যেন নেমে আসে কোন উচ্চচূড়া থেকে যা ভিতর থেকে উৎসারিত, দমনে অসহায় এবং দুরন্ত। নিমেষে শবরীর সর্বশক্তি সংহত করে মাথা থেকে জলপূর্ণ মাটির কলস নামাল। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রামচন্দ্রের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে অল্প অল্প করে জল ঢেলে দিতে লাগল। তার দুই চোখের দৃষ্টি রামচন্দ্রের উপর স্থির। এবং যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে উঠে। চিত্রিত প্রতিমার মত অপরূপ দেখায়।

জলপানে পরিতৃপ্ত রামচন্দ্র বড় শ্বাস ছেড়ে বলল ঃ সখী, এবার তোমার কথা বল। কোথায় তোমার ঘর ? কে তোমার পিতা, মাতা ?

রামের আচমকা সখী ডাকে শবরী চমকে উঠে। বিব্রত লজ্জায় তার শরীর কণ্টকিত হয়। তার গৌরবর্ণ মুখ রাঙা হয়। ভাল করে রামের দিকে তাকাতে পারে না। চাইতে গেলে চোখের পাতা কাঁপে, বুক দুর দুর করে। কথা বলতে গিয়ে কতবার ভীরু আবেগে ঠোঁট চেপে ধরেছে। রামচন্দ্র উদাস নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে। রামের বিস্ময়মুগ্ধতা শবরীর মুখে সঞ্চারিত হল। যেন ধ্যানের আচ্ছন্নতা থেকে সে বলল ঃ সব কথা না শুনে আমাকে সখী বলে ডাকলে কেন ? আমাকে তোমার মায়া পাশে বেঁধ না তাপস। রামচন্দ্রের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলল ঃ তুমি যাদু জান। একটু একটু করে আমাকে মন্ত্র মুগ্ধ করছ। এখন আমার বশে আমি নেই। অথচ তোমার কাছে আমার অনেক দোষ জমা হয়ে আছে—আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব কি দিয়ে ?

প্রিয়সখী তুমি'ত কোন দোষ করনি। পাপের প্রশ্নই বা উঠছে কেন ? প্রায়শ্চিত্ত করার মানে কি ? কখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় জান ?

ওসব শক্ত কথা আমি বুঝি না। তবে তোমার কাছে আমার অনেক পাপ জমে উঠেছে। তুমিই আমাকে অপরাধী করলে।

রামচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসে। ধীরে গম্ভীর গলায় বলল ঃ মানুষের যে অন্যায় বা দোষের ফলে শুভ্র মনুষ্যত্ববোধ পতিত হয় তাকে স্বস্থানে স্থাপনের ব্রতকেই প্রায়শ্চিত্ত বলে। তুমি'ত মনুষ্যত্ববিরোধী কোন কাজ কর নি। পিপাসিতকে জল দান ক... কি অধর্ম ? মানুষকে ভালবাসা কি পাপ ?

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল শবরীর চোখ। মুখে হাসি নেই তবে একটা স্মিতভাব আছে। শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মত কিছু টের পাচ্ছিল সে। আর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। তথাপি এই দ্বন্দ্বের ভেতর আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে তার অভ্যন্তর টৈটম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। আর আশ্চর্য একটা দৃঢ়তার প্রলেপে তার ভেতরটা শক্ত হচ্ছিল। কৃতজ্ঞতায় ভিজে গেল মন। চোখের কোণ জলে টলটল করে উঠল। পিপাসিতের মত মুগ্ধ দৃষ্টিতে রামের দিকে তাকিয়ে স্খলিত ভেজা গলায় বলল ঃ তোমার সব কথা বোঝার শক্তি নেই আমার। তর্ক করি, এমন জোরও পাই না মনে। আমার সংস্কার ভাঙছে, বিশ্বাস কাঁপছে। তুমি এমন করে আমাকে কাছে টানছ কেন? ওগো তাপস তোমার কথায় যাদু, চোখে মায়া। কিন্তু তুমিও জান না, আমি হীন পতিতের মেয়ে। আমার—বাদবাকী কথাগুলো তার আকুল কান্নার ভেতর তলিয়ে গেল।

রামচন্দ্র মুগ্ধ চোখে শবরীর দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েকমুহূর্ত কি চিন্তা করে বলল ঃ মানুষ কখনও পাপ নিয়ে জন্মায় না। বাইরে থেকে কোন কিছুই মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না। অবহেলায় যা বিকৃত হয়, প্রেমে তা ফিরে পায়। দস্যু রত্নাকরের ভেতর শুভ্র মনুষ্যত্বের যেদিন নবজন্ম হল সেদিন থেকে সে হল মানবতার পূজারী, কবি বাল্মিকী। সব দ্বিধা, সংশয়ের বাধা পেরিয়ে যখন তুমি আমার তৃষ্ণায় জল দিলে, তখন সমস্ত মনস্তাপ ধুয়ে মুছে তুমি পবিত্র হয়ে উঠেছ তোমার প্রেমে। তাই'ত তুমি আমার সখী হলে।

আমি পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি। পবিত্র হয়ে উঠেছি! তীব্র আনন্দ উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল শবরী। প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখখানা। আর মুহূর্তে বদলে গেল তার সেই অপরাধ মলিন স্তিমিত মূর্তি। মৃদু সমীরণ তার কানের কাছে মধুর রাগিণীর মত বাজতে লাগল—'তুমি পবিত্র' হয়ে উঠেছ তোমার প্রেমে। শবরীর কাছে পৃথিবীর রঙ বদলে গেল। তার সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বল স্বপ্ন। এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল তার মন। তন্দ্রাভিভূতের মত বলল ঃ তুমি তা-হলে আমার স্বপ্নের সেই রাজপুত্র রামচন্দ্র!

কেমন করে জানলে?

আমার অনুভূতি দিয়ে বুঝলাম। আর তোমার মিষ্ট বাক্যে চিনলাম। ঋষি মতঙ্গ বলেছিল, রামচন্দ্রই তোমাকে মুক্তি দেবে। তুমি আমার সেই প্রেমের ঠাকুর। তোমার প্রেমে আমার নবজন্ম হল।

দূর পাহাড়ের আড়াল থেকে রাখালের বাঁশীর সুর বেজে উঠল। নির্জন বনভূমি সহসা সচকিত হল বাঁশীর সুরে। সুরের মূর্ছনায় উন্মনা হয়ে গেল শবরী।

নীল আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে। দূর দিগন্ত অবসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে এল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন বনপথের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র মধুর কণ্ঠে বলল ঃ চল তোমাকে ঋষির আশ্রমে পেঁছে দিই।

পাশাপাশি হাঁটছিল তারা। উদার পবিত্র অনুভূতির একটা মধুর আবেশ ছড়িয়ে

ছিল শবরীর সমস্ত চেতনায়। আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন রামচন্দ্রের বিরাট মহত্ত্বের কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। রাখালিয়া বাঁশীর সুর বুকের গভীরে বেদনার করুণ মূর্ছনায় বাজতে লাগল শবরীর। মনের অনেক অনেক নীচে গহন-লোকে যে লজ্জা আর কলঙ্ক লুকোন আছে তার ইতিহাস কেউ টের পায় না। অথচ ভারী পাথরের মত ব্যথায় ভার হয়ে থাকে বুকের গভীরে। কিছুতে ভুলতে পারে না তার গল্প। আচ্ছন্ন চেতনার ভেতরে অস্পষ্ট কুয়াশার মত ফুটে উঠল তার ঋষি মতঙ্গের শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত ভারী মাংসল মুখখানা—আর শবরপল্লীর জীর্ণ পরিত্যক্ত কুটীর। নিজের অজান্তে মুক্তার মত দু-ফোঁটা অশ্রুর বিন্দু গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে।

অনেককাল আগের কথা।

শবরপল্লীর জীবন ভাল লাগেনি শবরীর। পাহাড়ের উপর ঋষিদের যে আশ্রম ছিল তার চোখ ছিল সেখানে। তাদের সঙ্গ লাভের আকাংখায় উন্মুখ হয়ে ছিল তার সমস্ত সত্তা। তার ইচ্ছে করত, ঋষিদের আশ্রমে যায়, বেদগান শোনে, তাদের যজ্ঞ ও পূজা দেখে। কিন্তু নিষেধের গণ্ডী ডিঙিয়ে মমতার বন্ধন ছিন্ন করে তার পাহাড়ে যাওয়া আর হয়নি। এদিকে চোখের অগোচরে দেহের নিঃশব্দ রূপান্তর চলছিল। নারীত্বের সব লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পেল শরীরে। কোথা থেকে লজ্জা এসে তাকে আত্মসচেতন নারী করে তুলল। কোষে কোষে নিদ্রিত নারীত্বের ঘুম ভাঙার গান। অকস্মাৎ একদিন টের পেল সে আর মেয়ে নয়, রমণী। তার বিয়ের কথাবার্তা যেদিন উঠল, সেদিন অনুভব করল তার সমস্ত সত্তার ভেতরে আর এক জ্যোতির্ময় সত্তার অস্তিত্ব। আর ঘরে মন বসল না। একদিন নিশুতি জ্যোৎস্না রাতে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল।

তখন সূর্যোদয়ের মুহূর্ত। আকাশে নানা রঙের হোলিখেলা। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জ। তন্ময় হয়ে মতঙ্গ মুনি সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখছিল। আর মনটা কেমন দীন হয়ে গেল। মাথাটা নুয়ে গেল আবেগে। দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে সূর্য প্রণাম করল। নিজের মনেই জিগ্যেস করল, অন্তরের এই বিগলিত ভাবকেই কি ভক্তি বলে?

নিঃশব্দে আশ্রমে প্রবেশ করেছিল শবরী। কুটীর অঙ্গনে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে জটাজুটধারী দীর্ঘদেহী এক তরুণ তাপস। স্নিগ্ধ আঁখি, প্রশস্ত মুখ, তপ্ত কাঞ্চনের মত দেহবর্ণ, গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়, হাতে কমণ্ডুল, গলায় রুদ্রাক্ষ। শবরী মুনির চরণতলে লুটিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করল। ঋষির তন্ময়তা ভঙ্গ হল। আচ্ছন্নতাভাব দূর হল। বিস্মিত মুনি সুধাস্নিগ্ধ স্বরে শুধাল: কে তুমি বালা? এখানে কেন এসেছ? অবনী পরে লুটায় কেন তোমার তনু?

পিতা, আমি কন্যা তোমার। তোমার শরণাগত। আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও। তোমাকে সেবার অধিকার দিয়ে চরিতার্থ কর। আমার সমস্ত প্রাণমন আশ্রমের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তুমি শুধু দয়া করে থাকতে দাও এখানে।

শবরীর দীন ব্যাকুল অনুনয় মতঙ্গ মুনির মন ছুঁয়ে গেল। তার হৃদয় ভাসিয়ে নামল করুণা। মধুর স্বরে প্রশ্ন করল ঃ তোমার পরিচয়।

জানি না। ঈশ্বরের নাম গোত্রহীন এক সেবিকা।

পিতা কে?

শবর দম্পতি পালিতা আমি।

মতঙ্গ মুনির দৃষ্টিতে বিস্ময়। আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে তার অন্তর টৈটুম্বর হয়ে যাচ্ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শবরীর দিকে তাকিয়ে তার সততা যেন পরিমাপ করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করল তার সমস্ত অভিব্যাক্তি। ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয়েছে তার আচরণে। মতঙ্গের বুকের ভেতর সহানুভূতির সমুদ্র যেন উথাল পাথাল করে উঠল। সহসা মনের গভীরে একটা অশুভ চিন্তা বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিল। এই রমণী রাবণের কোন মক্ষীরাণী নয়তো? কিংবা তাদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেইত? শবরীর নিষ্পাপ প্রশান্ত চাহনির দিকে তাকিয়ে কিছুতে তার দ্বিতীয়বার ও-কথা মনে এল না। তবু, মনের অন্ধকারে সরীসৃপের মত কিলবিল করতে লাগল অজস্র সংশয় দ্বিধা, সন্দেহ। এই রমণীকে জড়িয়ে কোন জটিল দুর্জ্ঞেয় সমস্যা আশ্রমে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে কিনা তার চিন্তা উদয় হল মনে। নিজের ভাবনার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে দূর দিগন্তের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যোদয় দেখতে লাগল।

পূবের আকাশে ভোরের রেখা জাগল। পাহাড়ের মাথার উপর মুঠো মুঠো লাল -রঙ ছিটিয়ে দিয়ে সূর্য উঠল। তপোবনের তাপস বালকেরা অনেক আগেই শয্যা ত্যাগ করে আলবালে জল সেচন করছে। দু'একজন শিক্ষার্থী কৌতূহলী হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল।

শবরী মতঙ্গের পায়ের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় ডাকল ঃ পিতা।

ডাক শুনে মতঙ্গ চমকে উঠল। এক অনির্বচনীয় সুখ আর তৃপ্তিতে পূর্ণ করে দিল তার মন। চেতনার ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। অসাড় হয়ে গেল তার সমস্ত চিন্তা। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে শবরীর দিকে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল ঃ শবরী তোমার কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এই তপোবনেই তুমি আশ্রম ভগিনী হয়ে থাকবে। তুমি হবে তাদের প্রেরণার উৎস। আর তোমার চেতনার ভেতর আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করছি। তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে নিবেদন করলাম।

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল শবরীর চিত্ত। মতঙ্গের শ্বেতপদ্মের পাঁপড়ির মত পা দুখানি জড়িয়ে ধরে সে শুধু তার ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করল না, চোখের জলে পা দুটো ভিজিয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দিল।

দূরে দাঁড়িয়ে শিষ্যরা দেখছিল। তাদের চোখে বিস্ময়।

দেখতে দেখতে শবরী আশ্রমের প্রাণ হয়ে উঠল। তার নিপুণ সেবা ও পরিচর্যায়

আশ্রমের রূপ বদলে গেল। শ্রী সৌন্দর্যে ভরপুর হল। কারো কাছে শবরী কিছুই চায় না। শুধু একটু সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। কিন্তু একদিন তার টান পড়ল আকস্মিকভাবে। সে হয়ে উঠল আশ্রম ভাইদের জীবনে এক মহা অনিয়ম।

একদিন মতঙ্গ মুনি তাকে কুটীরে ডাকল। বলল ঃ শবরী, প্রকৃতির নিয়মে ফুল ফোটে, ফল হয়। যৌবন ধর্মের নিয়মে তেমনি তরুণ তাপসেরা তোমাতে আসক্ত।

পিতা! চমকান বিস্ময়ে শবরী ডাকল।

তরুণ তাপসদের পাঠে মন নেই, যাগ যজ্ঞ ও পূজায় নিষ্ঠা নেই। সর্বকাজে তারা ভীষণ অমনোযোগী। তোমার যৌবনতপ্ত শরীর তাদের একমাত্র আলোচনার বস্তু। তাদের দেহে মনে পাপ প্রবেশ করেছে। অথচ, একদিন বহু প্রত্যাশা নিয়ে তোমাকে আশ্রমে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ তুমি—বাদবাকী কথাগুলো মতঙ্গের মুখে আটকে গেল।

থর থর করে কেঁপে উঠল শবরী। মাটির দেওয়ালে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টিতে মতঙ্গের দিকে তাকাল। দুঃখে অভিমানে তার বুকের ভেতর বৃশ্চিক দংশনের মত একটা মর্মান্তিক জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছিল। আর একটু একটু করে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। পাপের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে নিবিড় একটা প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে বলল ঃ যাদের ভাইর চোখে দেখি, ভাই বলে কাছে টানি, তারা এত নীচ, এত জঘন্য, ভাবতেও লজ্জা হয়। ঘৃণা হয়। অথচ, আমার দিক থেকেও কখনো এতটুকু দুর্বলতা কিংবা অসংযম প্রকাশ পায়নি। তবু তাদের মনের ভেতর কেন এই পাপ ঢুকল? শয়তান আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না। উদ্‌ভ্রান্ত আর শূন্য দৃষ্টিতে সে জানলার বাইরে যে, দূর দিগন্তে পাহাড় আছে সেদিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পর আর্তনাদ করে বলল ঃ পিতা, আমিত কোন অপরাধ করিনি, তবু আমাকে দোষী করছ কেন?

মতঙ্গ গম্ভীর গলায় বলল ঃ তবু, তুমিই কারণ, তুমিই পাপের উৎস তোমার জন্যেই এদের মনে পাপবোধ জেগেছে।

দুরু দুরু কাঁপছিল শবরীর বুক। কাঁপা গলায় মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল ঃ পিতা আমায় কি করতে হবে আদেশ করুন।

বৎস, আশ্রম পিতা আমি। কর্তব্যে মানুষকে কঠোর হতে হয়। আজ আমাকেও কঠিন নিষ্ঠুর হয়ে বলতে হবে, তোমার আর আশ্রমে থাকা হবে না। প্রকৃতির নিয়মে তুমি আশ্রমবাসীর জীবনে অভিশাপ, তাদের সাধনার বিঘ্ন। তোমার মুখ দেখলেও তাদের পাপ হয়।

ঘৃণার ধিক্কারে করুণ হল শবরীর চোখ। গভীর দুঃখে অভিমানে ভারি হয়ে উঠল তার মন। বুকের ভেতর যেন যন্ত্রণার সমুদ্র উথাল পাথাল করতে লাগল। অধীর চিত্তকে সংযত করে আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ পিতা, এত নিষ্ঠুর হলে কেমন করে? কঠিন কথাগুলো উচ্চারণ করতে তোমার কষ্ট হল না? জিহ্বা

ক্ষণেকের জন্যও স্তব্ধ হল না? মেয়ে বলে আমি এত অবহেলার পাত্র? পৃথিবীর সব পাপ, দোষ, অপরাধ তোমরা নির্বিচারে মেয়েদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সাধু হয়ে থাক। আর মেয়েরা তোমাদের অসংযমের দোষ, ত্রুটি, গ্লানি কলংকের বোঝা বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। তাদের সবচেয়ে বড় লজ্জা আর ভয়ের উপর দোষ চাপিয়ে এমন অসহায় করে দাও তোমরা যে তাঁদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না, নালিশ জানানোর ভাষা থাকে না; পিতা, তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ সৎভাবে চলবে, সত্যকথা বলবে। তোমার শিক্ষার অন্যথা করিনি কখনও। আজও অমর্যাদা করব না। তুমিই শিখিয়েছ পাপ মানুষের মনে। মনের বিকৃতি থেকে পাপবোধের সৃষ্টি। মানুষের কোন দুর্বল মুহূর্তে বিকৃতির যে বীজ অকস্মাৎ অঙ্কুরিত হয মনে, লোভে, মোহে, অসংযমের প্রশ্রয়ে লালিত হলে একদিন মহাবল দানবের মত সে শুভ বোধবুদ্ধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পিতা, তোমার শিক্ষার মর্যাদাহানি করিনি আমি। তবু, মারাত্মক মোহে তুমি চিরকালের সংস্কার, বিশ্বাস এবং ভুলধারণাকে অন্তরে স্থান দিয়ে আমাকেই দোষী আর অপরাধী করলে। আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর কলঙ্কের কালি লেপে দিলে। এ দুঃখ গ্লানি আমি মরে গেলেও ভুলতে পারব না। তুমিও বোঝ, আশ্রম বালকদের চিত্ত সংযমের শিক্ষা এতটুকু হয়নি। তাই তাদের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। অথচ একদিন আত্মসংযমের শিক্ষাকে সুস্থ ও সুন্দর করতে তুমি আমাকে তাদের মধ্যে টেনে আনলে। অন্যেরা না জানলেও আমি জানতাম। পিতা, নারী যদি চিত্ত চাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয় অসংযমের কারণ হয়, তবে চৌর্ষট্টি কামকলার ইন্দ্রিয় উদ্দীপক ভাস্কর মূর্তি মন্দির গাত্রে খোদাই করা হয় কেন? পূজার মন্দিরও তাতে অপবিত্র হয়ে যায় না। ঐ সব মূর্ত্তি দেখেও ভক্তের মনে কোন চাঞ্চল্য জাগে না কিসের জোরে? তোমার শিষ্যদের ভেতর অনুরূপ একটা আরাত্রিক ভাব তুমি জাগাতে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এখন আমার উপর সব দোষ চাপিয়ে দিলে কি দায়মুক্ত হওয়া যায়? তাতে কি সত্য চাপা পড়ে?

স্তব্ধ-বিস্ময়ে মতঙ্গ মুনি নির্বাক। চোখ দুটো কুঞ্চিত করে শবরীর মুখের দিকে স্থির অপলক তাকিয়ে রইল। মতঙ্গর চৈতন্যোদয় হল। বুকের ভেতর শবরীর কবতুরের মত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে বলল: আজ আমার যথার্থ সত্যদর্শন হল। সত্যের অপরূপ জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম। কি তার তেজ আর দীপ্তি।

পিতা! চমকানো বিষ্ময়ে ডাকল শবরী।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হল মতঙ্গের গোলগাল মাংসল মুখখানা। মর্মছেঁড়া যন্ত্রণায় তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। মুখখানা বিকৃত করে ঢোক গিলে বলল:

উপগুপ্ত কে?

আমার জীবনদাতা। একদিন সরোবরে পদ্ম আহরণ করতে গিয়ে ডুবে মরতে বসেছিলাম। উপগুপ্ত আমাকে বাঁচিয়েছিল।

তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক?

কৃতজ্ঞতার।

পাশে দাঁড়িয়েছিল শুদ্ধ সত্ত্ব। সরোষে বলল ঃ মিছে কথা। তার সঙ্গে তুমি ঘোর ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত। স্বয়ং দীর্ঘতমা তার প্রত্যক্ষদর্শী। তোমাকে সে অঙ্কশায়িনী অবস্থায় দেখেছে। স্বেচ্ছায় তুমি তাকে আলিঙ্গন করেছ। তুমি আশ্রমের নিষ্ঠাচার, পবিত্রতা নষ্ট করেছ।

উতথ্য প্রশ্ন করল ঃ নীরব কেন ? জবাব দাও ? কোথায় তোমার কাজে সততা আর সত্যতা।

নিজেকে আর সংযত করতে পারল না শবরী। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ককিয়ে কেঁদে উঠল। আকুল কান্নার ভেতর তলিয়ে গেল। দেয়ালের গায়ে মাথা ঘর্ষণ করতে করতে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল ঃ সব ষড়যন্ত্র। সব মিথ্যে। বুকফাটা হাহাকারের মত কথাগুলো শোনাল।

কেমন উদভ্রান্ত আর নিস্পলক দৃষ্টিতে শবরীর দিকে তাকিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে লাগল মতঙ্গ। ধীর পদক্ষেপে আচ্ছন্নের মত শবরীর কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল। ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হল। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের ন্যায় বিস্ময়স্থির দৃষ্টিতে শবরীর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ সকলকে নিয়ে আশ্রম। আমার ইচ্ছাটাই সব নয়। আশ্রমের নির্দ্দেশ তপোবনে তুমি থাকতে পারবে না। কথাগুলো বলতে মতঙ্গের বুক ফেটে গেল। কিছুতে চোখের জল সংবরণ করতে পারল না। তার আদেশে যে গভীর স্নেহ মিশে আছে শবরী তা অনুভব করতে পারল।

শবরী কথা বলল না। চোখ মুছল। তার আর কোন ক্ষোভ উত্তেজনাও ছিল না। ধীর পায়ে মৃদু মরাল গতিতে সে এল তার কুটীরে। জ্যোৎস্নাময়ী বিধুর বনভূমির বাতাস ও পরিবেশকে সে অভিমান দিয়ে ভরে তুলতে চাইল।

তারপর ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। কিছুদিনের মধ্যে মতঙ্গ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে দেহ রাখল। মৃত্যুকালে শবরীকে বলল ঃ তোমার উপর অনেক অবিচার করেছি। আমার উপর কোন অভিমান রেখ না। একদিন তোমার জন্যেই শ্রীরামচন্দ্রের পদার্পণ হবে এই আশ্রমে। তোমাকে তাঁর ভীষণ দরকার। সেদিন তাঁর সাহায্যে নিজেকে উৎসর্গ করলে তোমার স্বর্গলাভ হবে। মনে রেখ তাঁর হাতেই তোমার মুক্তি।

রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে মনের মধ্যে কথাটা উঁকি দিল কতবার। তবু একবারও সরমে সে জিগ্যেস করতে পারল না। রামচন্দ্র নিজের দরকারেই তার কাছে আসবে। তা হলে কি সে প্রয়োজন হয় নি এখনও তাঁর ?

গল্পে গল্পে তারা কুটীরে পৌঁছল। শবরীর শান্ত নিস্পন্দ বেদনার নদীর মত বিভ্রম রূপটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রামচন্দ্র বলল ঃ প্রিয়সখী তোমার মধুর সান্নিধ্যে ধন্য হলাম। তোমাকে যদি আমার কোন কাজে কখনও প্রয়োজন হয় অনুগ্রহ করবে'ত ?

শবরী কথা বলতে পারে না। বুকের ভেতরটা আপনা থেকে থর থর করে কেঁপে উঠল। গভীর একটা সুখের ভেতর ডুবে যেতে যেতে যেন চোখ বুজে একটা লম্বা

শ্বাস নিল। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে শবরী নিস্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল রামচন্দ্রের দিকে। তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। এমন করে একটি পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কিছুমাত্র সংকোচ কিংবা অস্বস্তি লাগছে না। বরং ভাল লাগছে। সুন্দর মুহূর্ত্তটাকে আরো কিছুক্ষণ মোহময় করে রাখতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ খিল খিল করে ভীষণ হাসতে লাগল। অনাবিল, সত্যিকারের খুশিতে ভরা সে হাসি হাসতে হাসতে বলল : অনুগ্রহ না করলে কি করবে?

এরকম একটা উত্তরের জন্যে রামচন্দ্র প্রস্তুত ছিল না। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে সে শবরীর মুখের দিকে তাকাল। হাসি হাসি মুখ করে বলল : প্রিয় সখির কাছে আমি এক কঠিন সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

শবরীর মুখে দুষ্টু হাসি, চোখে কৌতুক। কথার ছলনা। ভুরু টান টান করে বলল : ওরকম প্রত্যাশার কোন মানেই হয় না। ইচ্ছে করলেও সব পাওয়া যায় না। তার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়। কোন কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় কিছু?

রামচন্দ্র সহসা গম্ভীর হল। বেশ বুঝতে পারল, শবরী তার সঙ্গ ও সান্নিধ্য উপভোগের আনন্দে ও লোভে এমন মজা আর চটুল কথাবার্ত্তা বলে সময়টাকে দীর্ঘ করছে। রামচন্দ্র বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল : শবরী আমি সংগ্রাম পথের সংযম ব্রতে ব্রতী। আমার জীবন কাননে তুমি একটি ফুল। মাতৃপূজায় যেদিন নিবেদিত হবে সেদিন তোমার মুক্তি! সখী সময় হয়েছে। এবার বিদায় দাও।

কথাটা শুনে শবরী কেমন যেন হয়ে গেল। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল বাস্তবে। বুকের মধ্যে কিসের একটা তরঙ্গ যেন বয়ে গেল। দুই চোখ টলটল করে উঠল জলে। তীব্র হতাশায়, দুঃখে নারীসুলভ একট অভিমান ছাপিয়ে উঠল কণ্ঠে। বলল : তোমাকে'ত ধরে রাখেনি কেউ। তবে অজ্ঞাতে তোমাকে অবজ্ঞার আঘাত হেনে থাকি, তবে মার্জনা কর সখা।

মৃদু হাসিতে রামচন্দ্রের অধর রঞ্জিত হল। স্নিগ্ধ গলায় বলল : ব্যর্থ হবে না তোমার বাসনা। তোমার স্মৃতি আমার পথ চলার আলোকবর্ত্তিকা।

ধূলার উপর পায়ের ছাপ ফেলে রামচন্দ্র এগিয়ে চলল। শবরীর চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বল স্বপ্ন। মনে মনে বলল : তুমি কোন যাদুমন্ত্রে মনের সমস্ত ক্লেদ পঙ্কিলতা মুছে দিয়ে কি এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ করে দিলে আমার মন। ওগো হীন পতিতের বন্ধু তোমার কথাই তোমার বার্ণা। আমি দুঃখী মানুষের জীবনে তোমার বাণী পৌঁছে দেব। জনে জনে শুধাব : মানুষের ভিতর ঈশ্বর আছেন। কেউ কারো ছোট নয়। পৃথিবীতে পাপ নিয়ে কেউ জন্মায় না। ভগবানের রাজ্যে সবাই সমান।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

ফাঁদ পাতে পঞ্চবটী আর করে প্রবঞ্চনা

॥ বারো ॥

অজ্ঞাতবাসের তেরো বছর ছ'মাস পূর্ণ হল রামচন্দ্র'র। এতগুলো বছর একসঙ্গে এক জায়গায় কাটায়নি কোথাও। বিশাল দাক্ষিণারণ্যের বনে প্রান্তরে, গিরিকন্দরে যাযাবর জীবন যাপন করে গোদাবরী তীরে ঘনসন্নিবদ্ধ পঞ্চবটের সবুজ পত্রপুঞ্জে আচ্ছন্ন ছায়ায় সুনিবিড় উঁচু জমিতে পর্ণকুটীর করে বসতি করতে লাগল।

স্থায়ী ঘর পেয়ে সীতা খুশি। মনের মত ঘর দোর সাজানোর উপকরণ নেই। তবু চতুর্দিক পরিপাটি করে রেখেছে। তার হাতের সেবা পেয়ে আঙিনাখানি তক্ তক্, করছে। ছোট ছোট তরুগুলির সবুজ ডালে প্রাণের কি উন্মাদনা! মৃদু হাওয়াতেই তারা গদগদ হয়ে উঠে। আর কি বিপুল উৎসাহ পড়ে যায় শাখায় শাখায় ভাব জমানোর।

সবুজ সমুদ্রের মত পঞ্চবটীর অরণ্যকে ভীষণ ভাল লাগে সীতার।

চতুর্দিক ভারী নির্জন। নিরিবিলি। অথচ রোদে ঝলমল। গোদাবরীর জলে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব, সূর্যের গলন্ত সোনা এসে মিশেছে সে জলে। গাছপালার সুনিবিড় ছায়ায় হরিণ দল-বেঁধে নির্ভয়ে ঘোরে। ময়ূর নৃত্য করে। হাজার জাতের নাম না জানা পাখীরা ডালে ডালে অবিরাম কিচির-মিচির করে, পাখা ঝাপটায়। রাশি রাশি ফুলের মিষ্টি সুবাসে বাতাস আকুল হয়ে উঠে। ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে গাছের অবিরাম কথা হয় তখন।

আরো কত কি দেখে সে।

দূরে নীল উজ্জ্বল আকাশের নীচে দিগন্তজোড়া পাহাড়শ্রেণী বিশাল অজগরের মত চুপ করে শুয়ে রৌদ্র পোহাচ্ছে। মাঝে মাঝে সুউচ্চ গিরিশৃংগগুলি আকাশের দিকে মুখ তুলে স্পর্ধিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে মেঘের গতিপথ আগলে ধরেছে।

আবার এর মধ্যে কেমন একটা ভয় ধরানো নির্জন স্তব্ধতা। ঝির ঝির বাতাস যেন অশরীরীর মত চলাফেরা করে। গাছের পাতা নড়ে উঠলে সীতা চমকে উঠে। হরিণ কিংবা ময়ূর ছুটে পালাতে দেখলে ধুক ধুক্ করে ওঠে বুকের ভেতরে, নিবিড় গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অমনি ছুটে যায় তার দৃষ্টি। সন্দিগ্ধ, অনুসন্ধিৎসু চোখে অসহায়ভাবে তাকায়। রামচন্দ্রকে খোঁজে।

হতাশ চোখ দুটিতে ব্যথা ঘন হয়ে উঠে। বুকের ভেতর একাকীত্বের বেদনা রিণ্ রিণ্ করে বাজে। তবু পঞ্চবটী নানা রহস্য দিয়ে ঘেরা। মুগ্ধতা তার অবচেতন থেকে উঠে আসে অন্য আর এক মুগ্ধতার অভিব্যক্তি নিয়ে। জীবনে রামচন্দ্রকে পঞ্চবটীতে প্রথম অন্যভাবে পেল। সেকথা মনে হলে চোখ টান টান হয়ে যায়। প্রেমের কথাগুলো মনে করে আর নিজের মনে হাসে। অনুরাগের সুখানুভূতির আবেশ মৃগনাভির গন্ধ ছড়ায় চেতনার গভীরে। মুখের রঙ অমনি বদলে যায়।

রামচন্দ্রের দু'চোখ ভরা এত মোহের ছায়া কখনো তার চোখে পড়েনি। তার একটা হাত আশ্চর্য রকম অসহায়ভাবে তার হাতের উপর রাখা। পড়ে থাকা হাতের শিরায় শিরায় নদীর স্রোতের মত রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করছিল। মৌন ভাষায় সে কলধ্বনি সীতা তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে টের পাচ্ছিল। সীতা স্থির থাকতে পারল না। চোখে বিস্ময়, বুকে নির্ঝরের গান। ঠোঁটের ফাঁকে মদির হাসির অস্পষ্ট ফাঁক। অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল : কী দেখছো গো অমন করে?

রামচন্দ্র কেমন অনায়াসে বলল : তোমাকে।

প্রতিদিন'ত দেখছ।

আজ আমার অন্যরকম লাগছে।

কী রকম?

আজ তোমার মধ্যে রক্তমাংসের একটি মানবীকে দেখছি। তোমার নম্র শরীর, অনাঘ্রাত যৌবন, আমার ভেতরের নিদ্রিত পুরুষটার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

মুগ্ধ দুই চোখে সীতার বিস্ময়। ফিক্ করে দ্রুত একটু হেসে বলল : তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না।

রামচন্দ্রকে দিশাহারা দেখায়। চোখ সরাতে পারে না। রামের মুখ শক্ত হয়; কপালের রেখা গভীর হয়ে উঠে। নিঃশ্বাস পড়ে। সীতার চোখে চোখ রেখে হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণ বেদনা বাজল। বলল : তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না?

সীতা অল্প একটু মাথা নাড়ল। ঠোঁট কাঁপল। দুই চোখে যেন হাজার জিজ্ঞাসা নিয়ে সে উৎকর্ণ বোবা। রামচন্দ্রের রুদ্ধ স্বরে অপরিসীম বিস্ময় ঝলকিয়ে উঠল। বলল : তুমি কতো সুন্দর!

গভীর তৃপ্তি আর সুখের আনন্দে সীতার দুই চোখ বুজে যায়। মুখের কতগুলো রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এবং তার দু'চোখের কোণে জলের বিন্দু হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় টলটলিয়ে উঠল।

রমণীর যে আচরণ পুরুষকে মুগ্ধতার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়, আশা জাগায়, তৃষ্ণা জাগায় এ হল সেই মোহের সংকেত। আকর্ষণের নেশায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে সীতার মুখখানা তার তৃষ্ণার্ত্ত মুখের খুব কাছে তুলে ধরে। নিঃশ্বাসের সংঘাতে সঘন শব্দ হয়। রামের বুকের ভেতরটা যে শূণ্যতায় ছটফটিয়ে উঠেছে সীতা তার অনুভূতির ভেতর টের পাচ্ছিল। কিন্তু তখন এক পরম সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে দাবির আশ্বাসকে অপূর্ণ রেখে আত্মদানের আবেগে থর থর করে কাঁপছিল। আর রামচন্দ্র উচিত-অনুচিত প্রশ্নে বিব্রত, বিচলিত ও উদভ্রান্ত। কিন্তু সংশয় ও ভীরুতার মধ্যে রমণী সম্ভোগের তীব্রতা কমে না। বরং সংগম সুখের দুর্বার আকাংখায় আবিষ্ট হয় মন, যার অনিবার্য পরিণাম তাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলছিল।

রামচন্দ্রের চোখ সীতার চোখের উপর নিবিষ্ট। সীতার দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু একটু হাসে। সে হাসি বিষণ্ণ এবং সংগমে অবগাহনের ইংগিত। রামচন্দ্রের ভুরু

কুঁচকে গেল। সীতার হাসি চকিত যন্ত্রণার মত বিদ্ধ হয়। মুগ্ধতার আবেশের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে কথা তার আবেগে ধ্বনিত হয়। বলল : ভয় হয়। পাছে, ব্রত ভঙ্গ করি। একটু থেমে বলল : আমি কি করব ?

সীতা কোন কথা বলল না। স্থির চোখ দুটি অতি আয়ত হয়ে বেদনায় কেঁপে উঠল। ঠোঁটের রক্ত অতিমাত্র রক্তাভ দেখাল। রামের বুকে স্পন্দন বাড়ল। তৃষ্ণা জাগল। প্রাণের মূল থেকে উঠে আসা এক অবাধ্য আবেগের বশবর্ত্তী হয়ে সে সীতার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। অমনি বিদ্যুৎ শিহরণ লাগল শরীরে। আকণ্ঠ তৃষ্ণার চুমুকে সীতাকে নিঙড়ে নিতে লাগল। সীতার কোষে কোষে তরল আগুনের উদ্দাম স্রোত ছটফট করতে লাগল। রামচন্দ্রের আলিঙ্গনাবদ্ধ দু'বাহুর মধ্যে সে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করছিল। নিঃশ্বাসের সঘন শব্দ বাড়ছিল। আর শঙ্খ লাগা সাপের মত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরছিল। একেবারে অন্য একটা দেহের সঙ্গে লেপ্টে ধরছিল। এবং আবেগের একটা দুরন্ত মত্ততায় অসাধারণ সুখবোধ করছিল। শরীরের প্রতি কোষে কোষে যে এত উল্লাস আর যাতনা থাকতে পারে তা উভয়ের কারো জানা ছিল না। আর সেই মুহূর্ত্তে মনে হয়েছিল জীবনটাকে সে এতদিন ধরে শুধু অপব্যয় করেছে। আর নিজে ব্যর্থ হয়েছে।

একটা অস্পষ্ট শব্দে চুম্বন ছিন্ন করে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। রতিসুখের আনন্দানুভূতিতে তাদের অভ্যন্তর টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটু হাসি স্পর্শ করে তাদের অধরে। সে হাসি শরীরের মহত্তম প্রাপ্তি জনিত খুশিতে ভরা।

সীতার চোখে চোখ রামচন্দ্রর। শরীরের গভীরে আনন্দ ও উল্লাসের স্রোত তখনও অব্যাহত। তবু রহস্যের সবটুকু ভোগ করা গেল না। কিছু বাকি রয়ে গেল। রামচন্দ্র এই প্রথম অনুভব করল, শরীর ছাড়া প্রেমের কোন অস্তিত্ব নেই। শরীর বাহ্যরূপ। আর এই শরীরের মহত্তম প্রাপ্তিজনিত খুশি সুখে কত না স্বর্গীয় সুধা। অথচ এই ক্ষুধা কামাতুর দেহ নিয়ে কত না দুশ্চিন্তা ছিল তার। ছিল ব্রতভঙ্গ জনিত আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা। এখন সেই সংস্কারবোধ প্রবল হল মনে। তবু দেহের ক্ষণিক নৈকট্য তাকে অনেক জড়তামুক্ত করল। রমণীর দেহ সুখের উল্লাস শুধু নীচে নামায় না, উপরেও তোলে। সত্যিকারের প্রেম পথ দেখায়, প্রেরণা যোগায়, দেহে বল, মনে সাহস, কর্মে উদ্যম আনে। সীতার নম্র শান্ত মুখশ্রীর নিষ্পাপ সরস সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল রাম। বিহ্বল কণ্ঠে ডাকল : সীতা !

সীতার শরীর থরথরিয়ে কাঁপল। রামের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার বাহুর উপর মাথাটা চেপে ধরল। মুগ্ধস্বরে রাম বলল : অনেক দিনের একটা দ্বিধার অবসান হল।

সীতার বুকের ভেতর এক কোমল অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। তৃষিতের মত সীতা তার মুখ চোখ রামের দিকে তুলে ধরে প্রশ্ন করল : কিসের দ্বিধা বোধ ? সীতার চোখে স্বপ্নাচ্ছন্নতা।

রাম বড় বড় চোখে সীতার দিকে তাকিয়ে বলল : ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা তোমার আমার প্রেমের মধ্যে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছিল। বাস্তবিক কেমন একটা নেই নেই ভাবের রাজ্যে ছিলাম। তোমাকে দেখলে আমার ভয় হত। তবু যন্ত্রের মত একটা সম্পর্ক রক্ষা করে যেতাম। আজ ভয় ঘুচল। জীবনের ফাঁকি আর মনের ফাঁক দুটো একসঙ্গে দেখতে পেলাম। বুক হাহাকার করে উঠল।

সীতা হাসল না, চুপ করে রইল। তার বুকের ভেতর প্রবল আলোড়ন। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠল। কিছু না বলে মন্থর পায়ে চলতে লাগল। রামও তার পিছু পিছু গেল।

দুপুরের কড়া রোদে ঝলমল করছিল চারদিক। প্রকৃতিও নিঝুম, শান্ত, নির্জন। জীবকুলের স্তিমিত কোলাহল নেই কোথাও। ভাষাহীনতার প্রগাঢ় যন্ত্রণায় তারা বোবা ও গম্ভীর।

কয়েক পা এগোতেই রামচন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে ডাকল : সীতা কোথায় চলেছ?

রামের আহ্বানে সীতা চোখ ফেরাল। মায়াবী চোখে তাকাল। ঝিলিক দিয়ে হাসল। একটু বিভ্রমের মত। একটু মায়ায় মাখানো। প্রকৃতিতেও এরকম এক মায়া জড়ানো।

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিল। কখনও গায়ে গা ঠেকছিল। আর এক পুলক শিহরণে সীতা মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছিল। চারদিকে ঘন গাছপালা আর আগাছা। তার ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। মস্ত একটা বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সীতা কি খুঁজল। এদিকটা তার বেশি আসা হয় না। সামনে লাল মাটির রাস্তা। তারও পাশে গাছপালার ফাঁক দিয়ে গোদাবরী দেখা যাচ্ছিল। সেইদিকে গেল সীতা। গোদাবরীর পাড়ে এসে দাঁড়াল।

কেমন একটা অপরাধবোধ ফুটে উঠল রামচন্দ্রের চোখে মুখে। বোবা যন্ত্রণায় টনটন করে বুক। স্খলিত ভেজা স্বরে ডাকল : সীতা!

রামের ডাক সীতার অনুভূতির মধ্যে এক সুখ সুধার তরঙ্গ জাগল। তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে স্থির ও শক্ত থাকবার চেষ্টা করল। কোন উত্তর দিল না। রামচন্দ্র অস্বস্তি ও সংকোচ বোধ করতে লাগল। চোখে বিস্ময়ের বিভ্রান্তি। কণ্ঠস্বরে বিব্রত অসহায়তা। একটু থেমে বলল : আমার অসংযম তোমার খুব অদ্ভুত লেগেছে। তুমি আমার উপর রাগ ঘেন্না কিছু করনি তো? আমাকে তুমি বক, ভৎসনা কর, কিন্তু অবহেলা কর না। তোমার নীরব বিতৃষ্ণা আমাকে কাঁটার মত বিঁধছে। তুমি শুধু একবার বল, কিছু মনে করনি?

রামের প্রাণব্যাকুল জিজ্ঞাসায় সীতা দৃষ্টিতে অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি ফোটে। ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা নাড়ে।

নিকটে ঘাসে ঢাকা একটা সবুজ মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল : ওখানটায় বসবে চল।

রাম সীতার কথা শুনল। এবড়োখেবড়ো জমির উপর দুজন খুব কাছাকাছি বসল।

রামের গা ঘেঁষে রইল সীতা। মাথাটা তার কাঁধের উপর রাখল। আপনা থেকে বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। রুদ্ধ স্বরে কাঁপা গলায় বলল : ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি'ত তোমার বৌ। আজ তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছি। আমার মনের সে আনন্দ আর সুখকে ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। কি করে বোঝাই বল? কৈশোর থেকে স্বপ্ন দেখেছি স্বামীর পাশে পাশে থাকব, হাঁটব, আরো কত কি? কিন্তু তার কিছুই তোমার কাছে পাইনি বলে রাগে, অভিমানে, দুঃখে একা ঘরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কত কেঁদেছি। আজ আমার বাসনা পূরণ হল। স্বপ্ন হল সত্য। চরিতার্থতার এ সুখ আনন্দকে বোঝাই কেমন করে? এখন এ সুখ সইলে হয়।

সহসা মনুষ্য কণ্ঠের অস্পষ্ট সুরেলা শিস্ শোনা গেল। শব্দটা বহুদূর থেকে আসছিল, সীতা স্বপ্নের ভেতর কেঁপে উঠল। উৎকর্ণ অসহায় দৃষ্টিতে সে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে তাকাল। কেমন একটা ভয় ভয় ভাবে তার শরীর অবশ হল, তার গলা শুকিয়ে গেল। ক্রমেই শব্দ নিকটতর, স্পষ্ট এবং জোরাল হল।

পশ্চিম আকাশে একটু একটু করে হেলে পড়েছে সূর্য। চারদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতর অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে নামছে। চঞ্চল হয়ে উঠল সীতা। দু'চোখে অসহায় দৃষ্টি ফোটে। ভাবলেশহীন নির্বিকার প্রতিমার মত সে কুটীরের একটি খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ নিকটের ঝোপটা নড়ে উঠতে দেখল। চমকে উঠল সীতার চোখের দৃষ্টি। সে ভয় পেল। তার ভয়চকিত বিহ্বল চাহনিতে একটা প্রশ্ন ঘনিয়ে উঠল। কি হবে তার? কে রক্ষা করবে তাকে? তীব্র একটা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। তার বুকের ভেতরটা একট অসহায় কান্না উত্তাল হয়ে উঠল।

হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই এই বনে। কিন্তু নরখাদক আদিম উপজাতীদের উপদ্রব আছে। রাক্ষসেরও ভয় করছিল তার। ভয় যত নিজেকে নিয়ে তার চেয়ে বেশি দেহের শুচিতা নিয়ে। নারীর দেহটাই পুরুষের সাম্রাজ্য। অথচ সে সাম্রাজ্য রক্ষার সব দায়-দায়িত্ব নারীর। কর্তব্যের সামান্য অবহেলাও সইবে না পুরুষ। দোষ দুর্বলতার কোন ক্ষমা নেই। অথচ তার দেহের সবচেয়ে বড় শত্রু পুরুষ। দৈহিক বলে বর্বর পুরুষের কাছে সে ভীষণ অসহায়। দূরের শিস ধ্বনি থেমে গেছে। নিথর স্তব্ধতার ভেতর এক শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে ঝোপটার উপর চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিরাধের হাতে লাঞ্ছনার দৃশ্যটা চোখের উপর ভাসছিল। দাঁতে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া দেহটার ভারসাম্য যেন প্রাণপণ রক্ষা করতে লাগল।

অসময়ে এ উপদ্রব হল কেন? দস্যু, তস্কর অথবা নারীমাংস লোলুপ কামুক লম্পট পুরুষের জ্বলন্ত দু'চোখ ঝোপের ফাঁকে সহজে জ্বলতে দেখল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে একপা দু'পা করে কুটীরের বারান্দা থেকে নেমে এল। খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সে চোখ দুটো খুব সতর্কভাবে দূরে বহুদূরে দিগন্তরেখায় আঁকা

ম্লান অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে ভয় পাওয়া রমণীর মত কাঁপা গলায় মিথ্যে মিথ্যে করে চেঁচিয়ে বলল ঃ দেবর লক্ষ্মণ আমার মন বলছে আর্যপুত্র আসছে। ঐ উঁচু পাহাড় ঢিপির ওপর আমি তাকে ছায়ার মত দেখতে পাচ্ছি। দ্যাখ, বেশ বড় একটা শিকার তার কাঁধে।

আসন্ন সন্ধ্যায় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেই তীক্ষ্ণ স্বর বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে একটা ভয়ংকর আর্তনাদের মত গহন পঞ্চবটী বন ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত গেল! অমনি নিকটের ঝোপের ভেতর ভীষণভাবে নড়ে উঠল। ছুটে পালানোর মত পায়ের দুপদাপ কতকগুলো দ্রুত শব্দ হল।

কিছুক্ষণবাদে রাম লক্ষ্মণ একসঙ্গে শিকার করে ফিরল। অন্যদিনের মত সীতা তাদের দেখে এগিয়ে গেল না। তাদের হাত থেকে শিকার ধরল না। সীতার গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ টের পেল তার মনের অভিব্যক্তি। সীতার বুকের ভেতর যে ঘন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা শীঘ্রই ঝঞ্ঝায় পরিণত হবে। এই স্তব্ধতা'ত তারই সংকেত। তাই সে দ্রুত মাথা নীচু করে স্থানান্তরে গেল। নিজের মনেই হাসল।

রামচন্দ্রকে দেখা থেকে একটা দুরন্ত আক্রোশে ফুঁসছিল সীতা। তার বুকের ভেতরটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথা খুঁড়ছিল।

লক্ষ্মণ সরে যেতে রামচন্দ্র সীতার সামনে এল। তার ডাগর দুই চোখে কেমন মুগ্ধ তন্ময়তা। দু'চোখ অনুরাগে গভীর আর স্নিগ্ধ। সীতার মুখে কথা নেই। সাঁ সাঁ বাতাস গাছের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণার মত গোঙাতে লাগল। মৃদু ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকল ঃ সীতা! লক্ষ্মী আমার।

সীতার গণগণে অভিমান দপ করে জ্বলে উঠল। একটা কান্না তার বুক থেকে উঠে এসে গলায় আটকে রইল। খুব স্বাভাবিক কারণে রাম তাকে আদর করার জন্য বুকে টেনে নিল। অকস্মাৎ বদলে গেল সীতা। রামের দু'হাত থেকে নিজেকে সে ছাড়াতে চাইল। না পেরে, খামচে ধরল রামকে। জোরে জোরে তার মাথার উপর মাথা খুঁড়তে লাগল। উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ঃ আমাকে তুমি কি ভাব? আমার মন বলে কি কিছু নেই? আমি কি তোমার খেলার পুতুল? যা খুশি, তাই করবে? ঠিক করে বল, তুমি আমার কাছে কি চাও? আমাকে যে একটুও ভালবাস না, তা তোমার হাবভাব দেখেই টের পাই। তবু কাঙালের মত তোমাকেই চাই। পথের কাঁটা ভেবে আমাকে এভাবে একা রেখে যেও না। আমাকে তোমাদের সংগে নাও। কেন বোঝ না, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। অথচ তুমি আমার প্রতি কত উদাসীন আর নিস্পৃহ।

ক্লান্ত হয়ে রামের বুকে পড়ে পাগলের মত কাঁদতে লাগল। রামচন্দ্র সেই কান্নায় বাধা দিল না। অতলান্ত মনের গূঢ় কথাতো আর বলে বোঝানো যায় না। তাই রামচন্দ্র চুপ করে রইল।

॥ তেরো ॥

পঞ্চবটী বন থেকে বেরিয়ে মারীচ শূর্পণখার প্রাসাদে গেল। সেখানে পেঁছতে তার বেশ রাত হল। তবু তার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করছিল যমজ দু'ভাই খর ও দূষণের সঙ্গে শূর্পনখাও। মারীচ পেঁছলে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শূর্পনখা আপন মনে সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে বীণার তারে হাত বোলাচ্ছিল। আর প্রতিবারই তার আঙুলের কৌশলে এক অদ্ভুত সুরেলা ঝংকার কক্ষখানি গীতময় করে রেখেছিল। তারপর কখন যে নিজের অজান্তে সেই খেলা সুর হয়ে উঠল নিজেই জানে না। ঝংকারের মধ্যে কোন যাদু ছিল না। কিন্তু ধ্বনির মাধুর্য এক আশ্চর্য মোহ সঞ্চার করছিল। প্রত্যেকের অন্তর ছুঁয়েছিল তার ঝংকারে।

কক্ষে মারীচের চরণপাতের সঙ্গে সঙ্গে শূর্পণখার হাত থেমে গেল। আর আর্ত্ত-হাহাকারের মত বীণার তার বেজে থেমে গেল। কিন্তু রেশ তার রিণ রিণ করে বাজল অনেকক্ষণ। ঘরময় ছড়িয়ে ছিল তার আবেশ। তার ঘোর কাটতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল।

মুগ্ধ খরের দুই চোখে কেমন একটা বিহ্বলতা নেমেছিল। সুরের তান তারও মন ছুঁয়ে ছিল। আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজের মনে বলল: বিশ্বের সকল ধ্বনিই সঙ্গীত। সৃষ্টির আদিতে নিস্তরঙ্গ শব্দের মধ্যে প্রথম নাম ওম্। পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দের মত গম্ভীর সে ধ্বনি। তারপর মেঘগর্জনের বজ্রনাদে, ঝঞ্চার অট্টহাস্যে, বায়ুর শন্‌শন্ শব্দে, কোকিলের কুহুরবে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বৃক্ষপত্রের মর্মরে, ঝর্ণার কল্লোলে, সমুদ্রের নির্ঘোষেও এই ধ্বনি আছে। সবের মধ্যেই সঙ্গীত। যতক্ষণ সঙ্গীত ততক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারপরে মিলিয়ে যাওয়া রেশ বুকের ভেতর হারানোর হাহাকার জাগিয়ে তোলে।

খরের সারা মুখে এক বিষণ্ণ বেদনার ছায়া পড়েছে। শূর্পণখার দৃষ্টিও উদাস বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন।

মারীচ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। খরের কথা শেষ হলে, সে আস্তে আস্তে বলল: এমন করে থামলে কেন রাণী? না হয়, আরো কিছুক্ষণ চলত বাজনা। তাতে কি এমন ক্ষতি হত? কাজ'ত প্রতিদিন আছে। কিন্তু তার কাছে বিনোদন এবং উপভোগের সুখ সামান্য ব্যাপার। কিন্তু আমি এমন এক উৎপাত যে, তোমার সঙ্গীতের মজলিসটাই মাটি করে দিলাম। বেরসিকের মত কাজ কাজ করে মেতে থাকি। জীবনের সুখ আনন্দ যে কি নিজেও জানি না, অপরকেও পেতে দিতে চাই না। কিন্তু আমি'ত তাদের মত নই। তবে কেন এই সঙ্গীত সুধা থেকে বঞ্চিত হই? রাণী তুমি আবার শুরু কর।

মারীচের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং তীক্ষ্ন শ্লেষ মেশানো ভাষণে সকলে লজ্জায় রাঙা হল। খর ও দূষণ মাথা নীচু করে রইল। শূর্পণখার ভুরু কুঞ্চিত হল। দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে বলল ঃ মারীচ তুমি শুধু বীণা বাজনাটা দেখলে, আমাদের ব্যাকুল উৎকণ্ঠা চোখে দেখতে পেলে না। দেখবে কোথা থেকে ? তার জন্যে যে অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। তাই বুঝতে পারলে না আমাদের অশান্তি কোথায় ? যত সময় বয়ে যাচ্ছিল, আর ফিরতে দেরী হচ্ছিল ততই ভয়ে ভাবনায়, উৎকণ্ঠায় আমরা অস্থির, অশান্ত হয়ে পড়ছিলাম। মনের সেই অস্থির, অশান্ত অবস্থা ভুলে থাকতে আপন মনে বীণার তারে হাত বোলাচ্ছিলাম। সতীর শোকে উন্মাদ শিবের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, উন্মাদনা কখন যে তার চরণপাতে নটরাজের নৃত্যের ছন্দে ছন্দময় হল শিবও তা জানে না। তেমনি এক অশান্ত অস্থিরতা আমার বীণার তারে দাপিয়ে বেড়াল। কি করে বুঝব সে এমন করে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে ? তোমাকে দেখে আমার মন শান্ত হল। স্বস্তি পেল। বীণা থেমে গেল।

মারীচ কথা খুঁজে পেল না। অবাক বিস্ময়ে শূর্পণখার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করল। তার চেহারা ও দৃষ্টি কেমন যেন হঠাৎ বদলে গেল।

শূর্পণখা অপলক চোখে ত্রিশিরাকে দেখতে লাগল। শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল ঃ তুমি কি দেখলে, মারীচ ?

মারীচ শূর্পণখার দিকে চোখ তুলে তাকাল। অপরাধবোধের থেকে চোখেমুখে এখন একটা গভীর আগ্রহের ভাব ফুটল। শূর্পণখাকে নতুন চোখে দেখল। মনে হল, এসব কথা যেন নতুন শুনছে। কেমন একটা গৌরব আর খুশিবোধ জাগল তার মনে। কথা বলার সময় স্মিত হাসি ফুটল অধরে। বলল ঃ প্রায় গোদাবরীর তটে রামের তপোবনের মত আশ্রম। পঞ্চবট বৃক্ষের পত্রপুঞ্জের নিবিড় ছায়ায় তার কুটীর। কাছেই নারকেল, তাল গাছের সুদীর্ঘ সারি। তারই কোলে গোদাবরীর নীল তরঙ্গ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। নির্জন পরিবেষ্টনীর মধ্যে এমন মনোরম পরিচ্ছন্ন গৃহটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সীতার নিজের হাতে পরিপাটি করে সাজানো গোছানো একটি সুখের সংসার। স্থানটিও খুব নির্জন।

শূর্পণখার প্রত্যাশায় আচমকা যেন ব্যথা লাগল, দপ্‌দপ্ করে উঠল বুকের ভেতর। দ্বিধাভরা চোখে শরীরের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল ঃ রামচন্দ্রর গৃহিণীকে দেখলে ?

মারীচের অধরে কৌতুক হাসির আভাস ফুটল। বলল ঃ মনে হচ্ছিল তার স্বর্ণ-কান্তি যেন রৌদ্রতাপ ক্লিষ্ট একটি শ্যামলতা। রৌদ্রম্লান পাতার মত তার সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্লিষ্টতার চিহ্ন। তার দুই চোখে গোদাবরীর কৃষ্ণকান্তির লাবণ্য।

শূর্পণখা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করে বলল ঃ ছিঃ মারীচ ! সীতাকে দেখার জন্যে তুমি পঞ্চবটী যাওনি। শত্রুর কাজকর্ম দেখতে গেছ। কিন্তু কর্তব্য এবং শত্রুতা বিস্মৃত হয়ে এক অনুরাগী ভক্ত হয়ে ফিরেছ। আশ্চর্য তোমার নীতিজ্ঞান। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে জানতাম। কিন্তু এখন বুঝলাম তোমার মত নির্বোধ ভূ-ভারতে কম আছে।

বোধ হয় ভুলে গেছ রাম তোমার শত্রু। একদিন সে তোমার জননীকে, ভ্রাতাকে হত্যা করেছে! তার অপরাধ তুমি এত সহজে ভুলতে পারলে? তোমার কষ্ট হল না?

খরের মুখে কুটিল হাসি বর্তুল হল ক্রমে। শূর্পনখাকে সমর্থন করে বলল : রামের সাধুতা এমন উচ্চ বিন্দুতে আত্মগোপন করে আছে যে সাধু অসাধু ব্যক্তিও তার ছদ্মবেশ চিনতে পারে না। কণ্ঠস্বর শুনেও বুঝতে পারে না, কোনটা ছলনা আর মিথ্যা?

মারীচের চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের কঠিন অভিব্যক্তি। আশ্চর্য স্নিগ্ধ আর নমনীয় কণ্ঠস্বর। বলল : আমি এই কথার প্রতিবাদ করি। রামের অন্তরটি আপনি দেখতে পারেন নি। তাকে আমার যৌবন থেকে শত্রুর চোখে দেখে আসছি। বুকে এখন প্রতিহিংসার আগুন। তবু রামের কোন দোষ দেখি না। তার কাছে ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষি যেমন, অনার্য কৃষ্ণকায়ও তেমনি। মানুষের সম্মান, শ্রদ্ধা, প্রেম সহানুভূতি কৃষ্ণকায়রাই বেশি পেয়ে থাকে। রাক্ষস ছাড়া আর সব অনার্যই তার বন্ধু, ভাই। আর্যত্বের অহংকার থাকলে এই মহামিলন হত না। ছলনার দ্বারা এত বড় বিজয় হয় না কখনও। নিষাদ, কিরাত, গৃধ্র, যক্ষ, নাগ, বানর শক্তিতে বীর্যে সম্মানে রাক্ষসদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাদের মধ্যেও যথেষ্ট বীর ও কূটব্যক্তি আছেন। তবু নেতৃত্ব নিয়ে রামের সঙ্গে তাদের বিরোধ নেই। রাম বন্ধুত্বের অজুহাতে তাদের কারো রাজ্য গ্রাস করেনি, কিংবা নিজের আধিপত্যও চাপিয়ে দেয়নি। বিশাল ভারতবর্ষের হরেক রকম মানুষ, জাতি, গোত্রের মধ্যে বিভেদ, দ্বেষ, ঈর্ষা কলহ বিদ্বেষের উত্তেজনা দূর করে এক মহান মানবধর্মে দীক্ষিত করেছে। ঐক্যবদ্ধ মহান ভারতবর্ষের শক্ত মজবুত ভিতরের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের সৌভ্রাত্রবোধ, মৈত্রী সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

খর অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মারীচ তাকে কথা বলার কোন সুযোগ দিল না। মুগ্ধ আবেগে সে বলল : রামের দুচোখে করুণা, মনে প্রশান্তি, বুকে প্রেম। তার কোন লোভ নেই, বাসনা নেই। সে চায় মানুষের কল্যাণ, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। তার কথায়, কাজে, আচরণে সততা। কোন ছলনার দ্বারা নিজেকে সে আবৃত করেনি। সে মহামানব। মানুষের পরিত্রাতা! শত্রুর মনে সংশয় ভাঙানোর জন্যে সে স্বেচ্ছায় রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে একেবারে নিরস্ত্র, নিঃসম্বল হয়ে এসেছে। এমন কি মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। তবু অরণ্যে সে নির্ভয়। তার কোন শত্রু নেই, শত্রুতা করার ইচ্ছাও নেই। প্রেমে সে জয় করেছে, করুণায় বশীভূত করেছে। তাইত এক বিশাল ভারতবর্ষ তার নেতৃত্বে জেগে উঠেছে। আর্যাবর্তে রামচন্দ্র যা করতে পারেনি, দক্ষিণাবর্তের সরল, সহজ অনার্যরা রামের সেই স্বপ্ন সফল করেছে। প্রেম দিয়ে প্রেমের দরজা খুলে দিয়েছে মানুষের মনে। সব জাতি সব মানুষ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাদের নেতা মহামানবের সাগরতীরে

রাক্ষস ছাড়া আর সবাই উপস্থিত। শত্রুতা ভুলে আমরাই কেবল পারলাম না রামের পাশে দাঁড়াতে।

খরের অধর প্রান্তে এক বিচিত্র দুর্জ্ঞের হাসি ফুটল। বলল ঃ আশ্চর্য তোমার নীতিবোধ। নিজের অতীতকে ভুলে গেলে ?

অতীত ভুলিনি, ভুলব না।

তাহলে রামের প্রশস্তি কেন শত্রুর মুখে ? রক্তপাত রামের দুস্কৃতির সাক্ষ্য।

কিন্তু সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। তাকে দেখার ভুল করেছিলাম। আমার ভুল ভেঙেছে। এখন বেশ বুঝতে পারি তাড়কবন আর দণ্ডকবনের রামচন্দ্র এক নয়। তাদের ব্যবধান দেশ কাল পরিস্থিতিগত নয়, আরো অনেক কিছুর। সেদিন রামচন্দ্র ছিল সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। বিশ্বামিত্র তাকে প্ররোচিত করেছে। তার সরল ভক্তি বিশ্বাস ও আনুগত্যকে স্বার্থ সিদ্ধির কার্যে ব্যবহার করেছে ঋষি। অসহায় রাম গুরুর নির্দেশে মাতাকে ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। কিন্তু সে কাজে তার নিজের কোন দোষ ছিল না। এখন অনুভব করতে পারি রামের হাতে রাক্ষস ছাড়া আর কোন জাত, ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ মরেনি। রাক্ষসের মৃত্যুর জন্য দায়ী তারা নিজে। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, রাম তাদের কারোকে আগে আঘাত করেনি। নিজেকে রক্ষার জন্যে সে অস্ত্র ধরেছে। তাকে শত্রু মনে করতে তাই আমার কষ্ট হচ্ছে।

তুমি উদার !

বিদ্রূপ করে কি লাভ ? এতে আমার মত বদল হবে ভেবেছ ?

নির্বোধের মত কথা বল না। রাম কোনদিন শবর, চণ্ডাল, ব্যাধের সত্যকারে মিত্র হতে পারে না। তাদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি ঘৃণা না হয়, তাদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতা, দেহের কটুগন্ধে অবশ্যই এই ঘৃণা হয় তার। অনার্যর প্রতি আর্যদের বিদ্বেষ, ঘৃণা রক্তের সংস্কার। সেই আনন্দ যার স্বাদে, তাকে অভিনয় দিয়ে কতকাল ঢেকে রাখবে ?

এ রকম ধারণার পেছনে কোন যুক্তি নেই। তার নিজের বর্ণও সুনীল সাগরের মত নীল। কৃষ্ণাঙ্গদের সে ঘৃণার চোখে দেখবে কেন ? তার কৃষ্ণাঙ্গপ্রীতিতে কোন ভেজাল নেই।

যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো কষ্ট সাধ্য।

না, রাক্ষসদের উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, প্রবল জাত্যাভিমান, আত্মগরীমাবোধই মনুর বংশধরদের সঙ্গে বিরোধের কারণ। উভয়েই পরস্পরকে শত্রুর চোখে দেখে। কিন্তু রামের কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে রাক্ষস। আর্যদের চিরন্তন অনার্য বিদ্বেষের ইন্ধন দিয়ে রাক্ষসরা রামচন্দ্রের গতিরুদ্ধ করছে। আজও সরল মানুষের গোষ্ঠীপ্রীতি, আনুগত্য বিশ্বাসকে মূলধন করে জাতপাতের প্রশ্ন তুলে তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। শুধু কি তাই ? রাক্ষসদের মিথ্যে প্রচার, বিভেদের রাজনীতির উপর কার্যত আঘাত হেনেছে রামের অস্পৃশ্য প্রেম।

মারীচ ! খরের মুখ চোখ উত্তেজনায় রাঙা হল। চোয়ালের হাড় শক্ত হল।

ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ঃ তোমার এই নির্লজ্জ চাটুকারিতা আমার ধৈর্যহানি করছে। তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও।

মারীচ বিরস হেসে বলল ঃ আমারও তাই ইচ্ছা। রাজনীতি থেকে অবসর পেলে একটু নিশ্চিন্ত মনে ব্রহ্ম সাধনায় মন দিতে পারি।

মারীচের কথাগুলো শূর্পণখার অন্তরে নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল। মনের গভীরে এত তীব্র গভীরভাবে বেজেছিল যে সে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি। তারপর একসময় নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে গেল। চকিতবিদ্ধ একটা হতাশা, নৈরাশ্য তার আচ্ছন্নতার মধ্যে স্থায়ী হয়েছিল।

রাত্রি গভীর হল। বিছানায় শুয়ে শূর্পণখা সেইসব ঘটনার ছবি কল্পনায় যেন দেখতে পাচ্ছিল। সমস্ত ঘটনার মধ্যে রামচন্দ্রের এক কাল্পনিক মুখ দেখল। মুখে চোখে বিভোল যৌবনের বিভা। সুনীল সাগর যেন দেহের প্রতিটি উচ্ছল রেখায় উদ্ভাসিত। তার সুন্দর মুখ, কালো কেশের বিপুল জটাভার, দীঘল চোখের ঘন পল্লব যেন প্রেম রসে টইটুম্বুর। রামচন্দ্র নয় বিজয়ের উন্মাদনা, গৌরবের উদ্দীপনা। রামচন্দ্র মানে প্রেম, বিশ্বাস, সত্য। প্রেমই তার সাধনা, প্রেমই মহত্ব, আবার প্রেমই তার কলঙ্ক। প্রেমের সেই পরশমণি বুকে তুলে নিয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল দাক্ষিণাত্যের মানুষ। কিন্তু রাক্ষসরা কেবল সেই সৌভাগ্য সুখ থেকে বঞ্চিত কেন। যে মন নিয়ে দাক্ষিণাত্যের সকল মানুষ রামচন্দ্রকে দেখল, সেই মন, অনুরাগ রাক্ষসের কোথায় গেল?

ভাবতে ভাবতে কখন তার দু'চোখে ঘুম নেমে এসেছিল শূর্পণখা জানে না। বৈতালিকের সুমিষ্ট বাঁশীর সুরে ঘুম ভাঙলে দেখল চারিদিক সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। রাজপ্রাসাদের চত্বরে পুরোহিত এবং সেবাইতরা মিছিল করে মন্দিরে ভোগ এবং পূজার উপকরণ নিয়ে যাচ্ছে। প্রহরীরা বর্শা হাতে সারি সারি নিস্পন্দ ছবির মত দাঁড়িয়ে। বাদ্যকারেরা মন্দির প্রাঙ্গণে দুন্দুভি, সানাই, ঝাঁঝর বাজাচ্ছে। বিচিত্র সেই ঐকতানের সুমধুর মূর্ছনায় চারদিক কেমন একটা উৎসবের রূপ নিয়েছে।

তথাপি, শয্যা ছেড়ে উঠল না শূর্পণখা। কেমন একটা আলস্যে সে আচ্ছন্ন। অপলক দুই চোখে বিহ্বলতা। দৃষ্টি জানলায় স্থির। খোলা জানলা দিয়ে প্রাসাদ এবং মন্দির অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শূর্পণখা শুয়ে শুয়ে সব দেখতে পাচ্ছিল। বাইরের ঘটনাগুলো ছবির মত ভাসছিল। মনের ভেতর কোন রেখাপাত করছিল না। কিসের এক মুগ্ধ আলোর ছটায় যে চঞ্চলতা মনে জেগেছিল তা যেন ওর এই আচ্ছন্নতার ভেতর স্থায়ী হয়েছিল।

মারীচকে নিয়ে একটা অকারণ সন্দেহ তার মনে তীব্র হল। রাম রাজনীতি করতেই দাক্ষিণাত্যকে বেছে নিয়েছে এবং সেইভাবেই সে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সুচতুর কর্মপদ্ধতির ফলে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। রামচন্দ্র রাক্ষসদের সংগে যে বিরোধ কিংবা সংঘর্ষ চাইছে এটা বোঝার কোন উপায় রাখেনি। রাক্ষসরা তার শত্রু এবং বধযোগ্য এরকম কোন প্রত্যয় কিংবা সংশয় সৃষ্টির অবকাশ নেই। ফলে, এক দারুণ বিভ্রান্তি তাকে নিয়ে জমে উঠেছে। প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি

কিংবা রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের কোন মতলব তার সফরে প্রকাশ পায়নি। বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতার আদর্শ দক্ষিণাবর্তের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছে। ঐক্য ও সংহতিবোধে দৃঢ় ও মজবুত করেছে তাদের চিন্তা ও ভাবনা। শুধু হৃদয় জয় করে, প্রীতি মন্ত্রবলে রাম অনার্য রাজ্যগুলিকে বশীভূত করেছে। তার এই কৃতিত্বের কোন তুলনা হয় না। কিন্তু দক্ষিণাবর্তে রাক্ষসেরা তার এই প্রীতি থেকে বঞ্চিত কেন? রাক্ষসদের অপরাধ কি? বাধা কোথায়? প্রবল প্রতাপান্বিত, অমিতশক্তিধর বীরকুলোদ্ভব, নরোত্তম রাবণকে শুধু তার ভয়? তাকেই সে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে বসিয়ে কূটরাজনীতির জাল বুনে চলেছে। এ ব্যাপারে রামচন্দ্রের পরিকল্পনায় একটা নিজস্ব পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, অধ্যায়ন এবং বিচার আছে। তাই, লঙ্কাকে সে চারপাশ থেকে শত্রুরাজ্যগুলি দিয়ে ঘিরে ধরেছে।

সূর্যের তেজ প্রখর হল। শূর্পণখা শয্যা থেকে উঠল। একটা ক্লান্তিকর অস্বস্তি নিয়ে সে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াল। বুকের ভেতর কি যেন একটা আকুল করা যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। কুটিল জিজ্ঞাসা জাগল শূর্পণখার মনে।

মারীচের মত প্রজ্ঞাবান কূটরাজনীতিবিদকে রাম বিভ্রান্ত করল কোন মায়ায়? কি জাদু আছে রামের ব্যক্তিত্বে? সংস্পর্শে? প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ তার রক্তে টগবগ করছে। তবু মারীচ তার জননী ও ভ্রাতার হত্যাকারীকে বিস্মৃত হল কেন? ভুলল কেমন করে তার অপরাধ? তার এই হৃদয় পরিবর্তনের রহস্য কি?

মারীচের চোখে রামচন্দ্র মুক্তিদাতা। সকল মানুষের হৃদয়ের রাজা রামচন্দ্র। তার রাজ্য হল শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ ও আনুগত্য। রামের আদর্শের জন্য তারা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এই জন্য রামকে শক্তিশালী করছে দিন দিন। আর, সে শক্তির পরিধি যত বিস্তৃত ও ব্যাপক হচ্ছে ততই রাম রাবণের কাছে ভীতির পাত্র হয়ে উঠছে। অথচ, সে তার ভগিণী। বিশাল দণ্ডকবনের রাণী, তবু ভ্রাতার দুর্দিনে কিছুই করতে পারছে না। এখন মারীচের উপর তার আশা করাই বৃথা। বড় প্রত্যাশা নিয়ে রাবণ মারীচকে তার অন্যতম মন্ত্রণাদাতা করেছিল। কিন্তু মারীচ এখন বিভ্রান্ত। রামচন্দ্রের ভয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে তপস্বীর মত জপতপ আরাধনায় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছায় দিন গুণছে। মারীচের মত পরিবর্তন রাক্ষসদের বিভ্রান্তিকে কেবল বাড়িয়ে তুলবে। রাক্ষদের সংহতি ও ঐক্যের উপর একটা বড় আঘাত এসে লাগবে। তাতে সমূহ ক্ষতি হবে রাবণের এবং গোটা রাক্ষসজাতির। সংশয় ও সন্দেহের দোলা শূর্পণখার মনে একাগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে সাধারণভাবে উপলব্ধি করা ছিল কঠিন। রামচন্দ্রের পরিকল্পনায় তার একটা নিজস্ব পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন এবং বিচার ছিল।

সারা সকালটা শূর্পণখার খারাপ কাটল। কিছুতে সে নিজেকে ভাল লাগাতে পারছিল না। একটা অস্বস্তিকর নিরন্তর প্রবাহ অলক্ষ্যে তরলস্রোতের মত প্রবাহমান ছিল তার মনের ভেতর। দুকুল ছাপানো শরীর আর ভরা যৌবনের মধ্যে তখন যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল ছিল তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল।

বুকের ভেতর শূর্পণখার যেমন আতঙ্কিত সর্বনাশের ছায়া নেমে এল তেমনি চকিতবিদ্ধ কণ্ঠ ও আচ্ছন্নতার ভেতর নিবিড় প্রশান্তিতে আবিষ্ট রামের ঢলঢল মুখখানির আকর্ষণ গভীর আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। মনের গহনে অজস্র কথা ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে উথালি পাথালি করতে লাগল। কালো বড় বড় ডাগর দু'চোখে অনুরাগ মুগ্ধ তন্ময়তায় থম থম করতে লাগল।

জীবনের ও মনের গতিপ্রকৃতি কত বিপরীত আশ্চর্য ও রহস্যময় শূর্পণখা তার মর্ম এমনই অনিবার্যভাবে অনুভব করল যে অসহ্য আবেগে আর উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল তার শরীর। স্নায়ুতে স্নায়ুতে এমন বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল কেন? রক্তে তার এ কিসের হাহাকার? কার জন্যে এত অশান্ত হল চিত্ত? বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল, রামচন্দ্র জাদু জানে। তার প্রেমে শত্রু মিত্র, পাত্র-অপাত্র নেই। আক্রোশ বিদ্বেষ অভিমান নেই। তবু সে রাক্ষসের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব। সে তাদের ঘৃণা করে। শত্রুর চোখে দেখে।

মনের সঙ্গে বহু সংগ্রাম করল শূর্পনখা। যতবার নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল ততবার রামের শান্ত, সৌম্য মূর্তি ভেসে ভেসে উঠল মনের ভেতর। কিছুতে সে রামচন্দ্রের চিন্তা ভুলতে পারল না। কোন প্রবোধ মানল না চিত্ত। অভিসারের চুম্বক আকর্ষণে রাজপুরীর সারি সারি ঘর, বারান্দা পেরিয়ে, সে রাজপ্রাসাদের চত্বরে নেমে এল। পরিচারিকারা হন্তদন্ত হয়ে তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। শূর্পণখা ভ্রূক্ষেপ করল না। তাদের কৌতূহলী প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। নিশি পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন হয়ে সে যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। ত্রিশিরা তাকে দেখে ছুটে এল। খুব ঘন হয়ে দাঁড়াল। ত্রিশিরা প্রশ্ন করার আগে শূর্পণখা শুধাল: আমার রথ কোথায়? এখনি তেজস্বী অশ্ব জুড়ে দাও। আমি বেরোব।

ত্রিশিরা স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হল। একটু কুটিল চোখে শূর্পণখাকে দেখল। কী যেন বলি বলি করেও ত্রিশিরা সামলে নিল নিজেকে। তারপর গম্ভীর থমথমে মুখে নির্দেশ পালন করল।

শূর্পণখা নিজেই রথ চালিয়ে গেল। যথাসাধ্য দ্রুতবেগেই রথ চলছিল। রাঙা মাটির পথ ধরে রথ পঞ্চবটীর দিকে এগোতে লাগল।

না, আকস্মিক আবেগ নয়, উন্মত্ততা নয়। বহু অস্বস্তি, দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অনেক অতৃপ্ত কামনার জ্বালা, আর চিত্তের সীমাহীন দীনতা তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হতে হতে হয়ে গিয়েছিল এক বারুদের স্তূপ। শূর্পণখার চিত্ততলে অকস্মাৎ যেন তার বিস্ফোরণ ঘটল।

রথে যেতে যেতে শূর্পণখার ভিতরে প্রতিক্রিয়াটা শুরু হল। শরীরের ভিতরে একটা যন্ত্রণার মত কিছু টের পাচ্ছিল। এক চিরঘুমন্ত সত্তা হঠাৎ যেন পরশ পাথরের আকর্ষণে জেগে উঠল। বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর স্মৃতি এই মুহূর্তে তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগাল। রথের গতির সঙ্গে দৃশ্যগুলো চোখের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

ঘোড়ার খুরের মত বুকের ভেতর ধুকপুক করে বেজে যাচ্ছিল হৃৎস্পন্দন। আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে তার সমস্ত সত্তা হারিয়ে গেল এক বিস্মৃত অতীতের মধ্যে।

দশ বছর আগের কথা।

লাল টকটকে সূর্য পশ্চিম আকাশ রক্তে রাঙিয়ে দিয়ে অস্ত যাচ্ছে। অপরাধের নিষ্প্রভ আলোর কমনীয়তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে। কাননের আকাশে বাতাসে মিশে আছে ক্লান্ত বাতাসের শ্বাস। বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দূর দিগন্তে কালকেয়দের রাজ্যের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল শূর্পনখা। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার ভেতর অস্পষ্ট কুয়াশার মত ফুটে উঠল বিদ্যুৎজিহ্বর মুখ। তীব্র একটা উৎকণ্ঠায় তার বুক ভারী উঠেছিল। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে বলল ঃ দিবাকর, তুমি ওকে রক্ষা কর। কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করতে গিয়ে তীব্র একটা উৎকণ্ঠা যেন কণা কণা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দু'গাল বেয়ে।

রাবণ ভগিনীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপরেই অবাক হয়ে থমকে গেল। শূর্পণখা বাম হাতের উপর মাথা গুঁজে পড়েছিল। থেকে থেকে তার সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছিল। কিছুক্ষণ দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাকল ঃ শূর্পণখা।

অস্ফুট ডাক কানে আসতে শূর্পণখা বিষম চমকে উঠল। চকিতে উঠে দাঁড়াল। সামনের একগাদা চুল মুখে এসে পড়েছিল। সেগুলো সরানোর ফাঁকে মুখ আড়াল করে গলার স্বরে হাসি টেনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ ওমা তুমি! কখন এলে? কোথা থেকে আসছ? যুদ্ধ কি থেমে গেছে? খবর ভালত? কার জয় হল? তোমার ভগ্নীপতির খবর কি? কবে আসছে? কথাগুলো না থেমে বলল।

রাবণ বিব্রতবোধ করছিল। তবু মুখে স্বাভাবিক হাসি টেনে সস্নেহে বলল ঃ ব্যাপার কি? তোর আজ কি হয়েছে?

শূর্পণখার অস্বস্তির একশেষ। তাই, মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্য সে চর্তুগুণ হাসল জোরে। যেন তার কিছু একটা হাস্যকর গোপন লজ্জা ধরা পড়ে গেছে। বলল ঃ আচ্ছা চোখ তো তোমার। সব সময় আমার পিছে লাগ।

রাবণের প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তাই সে আবার জিগ্যেস করল, তুই কিন্তু কাঁদছিলি।

শূর্পণখা ফাঁপড়ে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল ঃ যখন বড্ড একা লাগে তখন আমার কেমন কান্না পায়।

রাবণ কথাটা বিশ্বাস করল না। কিন্তু এই জবাবটাকে তার ভাল লাগল। মানুষের মন কখনও কখনও তার বিপদকে আগে থেকে টের পায়। তখন, একটা অব্যক্ত বেদনায় মনের ভেতর রিণ রিণ করে কিছু ভাল লাগে না। এক নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে বড় বেশী যেন গুটিয়ে নেয় নিজেকে। শূর্পণখার মন কি তবে আগেভাগে তার ভবিতব্যের পরিণামকে জানিয়ে দিয়েছে? তার চোখের দৃষ্টি, আচরণ সব কিছুই অন্যরকম আজ। রাবণ তার লোকচরিত্র জ্ঞানের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল, তাকে চুপ করে থাকলে হবে না। এড়িয়েও যাওয়া চলবে

না। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তার। একটু একটু করে মনটাকে তৈরী করে, বুঝিয়ে তবে বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যু সংবাদ দিতে হবে। আবার সান্ত্বনাও দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে যে এই কঠিন কাজটা সম্পন্ন করবে, সে নিজেও ভেবে পেল না। অবশেষে ভগিনীকে ভর্ৎসনা করে বলল : দানব গৃহিণীর চোখে জল মানায় না। রাজমহিষীর এত অল্পে ভেঙে পড়লে হয় ? রাজার অবর্তমানে তাকেই রাজ্য চালাতে হবে। সিংহাসনের দায়-দায়িত্ব তখন'ত তোর কাঁধেই চাপবে। তাই বলি, মনকে দুর্বল করতে নেই।

শূর্পণখার বুকের ভেতরটা ত্রাসে চমকে উঠেছিল। মুখের রঙ বদলে গেল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বুকের ভেতর একটা কষ্ট বীণার তার ছিঁড়ে যাওয়ার মত রিণ্ রিণ করে বাজতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে।

ভ্রাতার তিরস্কার বড় নির্মম। কান্নার সান্ত্বনা না হয়ে যন্ত্রণা হয়ে উঠল। নিজের অস্তিত্বটাই তখন তার কাছে বোঝার মত ভার লাগছিল। অস্বস্তি কষ্টের মিলিত অনুভূতির আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে তার বেশ সময় লাগল। তবু মন থেকে সব কিছু ঠেলে দিয়ে সেই মুহূর্তে সহজ হয়ে উঠতে চেষ্টা করল। থমথমে গলায় বলল : তোমাদের চোখে যা সাংঘাতিক লজ্জার ব্যাপার, আমাদের কাছে সেটাই স্বাভাবিক। বলতে পার, মেয়েদের একেবারে নিজের জগৎ। মায়া, মোহ, আকর্ষণ মেয়েরাই তৈরী করে। বিন্দু বিন্দু শিশির যেমন ঘাসের বুকে মনোহর মায়া রচনা করে, তেমনি পুরুষের কঠিন প্রাণে, প্রেমের মন্দাকিনী সৃষ্টি করতে অশ্রু বর্ষণ করে।

রাবণ নীরব। তার কাণের দু'পাশ জ্বালা করছিল। মাথার মধ্যে যেন এক যন্ত্রণা দপ্‌দপ্ করছিল। কি করবে সে ? তার কি করার আছে ? মুখ থেকে রক্ত-কণাগুলো যেন সব উঠে গেছে। নিস্পন্দ চোখে শূর্পণখার দিকে তাকিয়ে রইল। কি দেখছে জানে না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অস্ফুট স্বরে বলল : ভগিনী তোর কাছে আমার অপরাধের পাহাড় জমেছে। কি করে বোঝাই তোকে ? বলতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

শূর্পণখার বুকের ভেতরটা ত্রাসে শুকিয়ে গেল। ভ্রাতার কথা বলার ভঙ্গী দেখে সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কি অমঙ্গলের ছায়া যে তাকে গ্রাস করতে আসছে তা সে নিজেও ভাল করে বুঝতে পারল না। নিস্পলক চোখে রাবণের দিকে তাকিয়েছিল। কি দেখছিল জানে না। অস্ফুট কণ্ঠে বলল : তোমার কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি ওর সম্বন্ধে কিছু জান ? বল দাদা, আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। ওর যদি কোন অমঙ্গল হয় তা হলে আমি বাঁচব না।

ভগিণীর ব্যাকুলতা রাবণের মন ছুঁয়ে গেল। কেমন যেন হয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার উৎকণ্ঠা, ভয় দূর করার জন্যে, এবং মনের ভার হাল্কা করার উদ্দেশ্যে যেন কথাগুলো বলল : পাগল নাকি ?

তা-হলে তোমার মুখ মলিন কেন ? হঠাৎ কেন অত উতলা হয়ে পড়লে ?

রাবণ ফাঁপড়ে পড়ল। কানে যেন কথাটা খচ্ করে বিঁধে গেল। শূর্পণখার

মনের গতি অন্যদিকে ফেরানোর জন্যে খুব জোরে হাসল। শুকনো, প্রাণহীন হাসি রাবণের নিজের কানেই হাহাকারের মত বাজল। বলল ঃ দূর, উতলা হব কেন?

কেন হবে না? আচমকা যেন গর্জন করে উঠল শূর্পণখা। তোমার সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা, আর ক্ষমতার প্রতি মোহ না থাকলে কখনও ভয় পেতাম না। কিন্তু তুমি ক্ষমতার জন্য, নিজের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য সব করতে পার। আত্মীয়তার কোন মূল্যই তোমার কাছে নেই।

আমার উপর এত নির্দয় হতে তোর কষ্ট হচ্ছে না? তোর সামান্য একটু করুণা পেলে যে হৃদয় ধন্য হয়ে যেত তার প্রতি অকারণ নিষ্ঠুর হতে তোর কষ্ট হল না?

সে কথা তোমাকে বোঝাই কেমন করে? তুমিও জান, বিয়ের পর সব মেয়ের আর এক সত্তা তৈরী হয়। আমারও হয়েছে। আমার স্বামী তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি তাকে শত্রুর চোখে দ্যাখ। তার ভাল চাও না। তাই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না।

ফাঁদে পড়া পাখীর মত রাবণের অবস্থা। তার ভীত বিহ্বল দুই চোখের উপর শূপর্ণখা জ্বালা ভরা দুই চোখ রাখল। বলল ঃ এবার তোমার ভয়ের জায়গাটা আমি দেখতে পেয়েছি।

রাবণের পরিচ্ছেদ দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে আচমকা টান দিয়ে ছিঁড়ল, প্রবল-ভাবে ঝাকুনি দিয়ে বলল ঃ তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করে আমাকে দয়া দেখাতে এসেছ। তোমার সব শয়তানি আমি জানি। ওকে তুমি কখনও বিশ্বাস করনি। কান্না কান্না গলায় উচ্চারণ করল।

রাবণ আঁতকে উঠল। ভগিণীর ব্যাকুল অভিযোগের ভেতর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল-না। বিশ্বাস কর, আমি তাকে যুদ্ধে হত্যা করতে চাইনি। তবু ভ্রমক্রমে আমার তীরই তাকে বিদ্ধ করেছে। আমি শুধু নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকলাম।

শূর্পণখার পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল। দুই চোখে অশ্রু ঢল নামল না, বিদ্যুতের মত জ্বলে নিভে গেল। বলল ঃ মিছে কথা। তারপরেই বিগলিত অশ্রুর ধারায় ভেসে গেল তার কণ্ঠস্বর। কান্না জড়ানো গলায় বলল ঃ তুমি নিজের হাতে হত্যা করেছ তাকে? একটু কষ্ট হল না? স্নেহের ভগিণী শূর্পণখার কথা তোমার মনে পড়েনি? উঃ কি ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি! এখন বুঝতে পারছি, তাকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধটা তোমার ছল। চিরদিন তুমি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছ, শত্রুর চোখে দেখেছ। তাই কৌশলে পথের কাঁটা সরানোর জন্যে যুদ্ধ করেছ।

রাবণ শিউরে উঠল। নিস্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। শূর্পণখা রাবণকে দুই হাতে আকড়ে ধরে তার বুকের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল আর হতভম্ব রাবণ ভগিণীর একরাশ এলো চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করতে লাগল।

শূর্পণখার শরীরের ভেতর একটা যন্ত্রণার মত কি যেন ছড়িয়ে পড়ছিল। বেশ বুঝতে পারছিল, ঘুমের ভেতর থেকে কে যেন জেগে উঠেছে তার চৈতন্যের ভেতর।

বুকের জ্বালা আর অক্ষম রাগ এক গভীর বেদনায় হাতের মুঠোয় নিশপিস্ করতে লাগল। নিজের অজান্তে সে ঘোড়ার পিঠের উপর শপাশপ্ চাবুক চালাতে লাগল। বেচারা ঘোড়া মার খেয়ে চিঁহি-হি করে ডাক ছাড়ল। চারদিকে ঢেউ তুলে শূর্পণখার রথ বায়ু বেগে সাঁ সাঁ করে ছুটল।

শূর্পণখার শ্বাস ক্রমশঃ প্রলংকর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল। ভিতরে এক তীব্র জ্বালা সে টের পেল। সে অনেক কিছুই টের পেল। দাঁতে দাঁত পিষে নিজের মনে বলল ঃ রামচন্দ্র তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। তুমি রাক্ষসের শত্রু কিন্তু দানবের সঙ্গে তোমার কোন বিরোধ নেই। আমি দানব মহিষী শূর্পণখা। নির্দোষ, স্বামী হত্যার অপরাধীকে আমি ভুলিনি। ভুলব কেমন করে? এক তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তার হৃদয় মথিত হতে লাগল।

মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোয় বনভূমি ঝলমল করছে। যেতে যেতে দেখল, সূর্যের আলোয় আঁকা তরুণ দেবদারুর মত দীর্ঘ আর বলিষ্ঠ এক যুবক পাহাড় টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। দুরু দুরু কেঁপে উঠল শূর্পণখার বুক। কাজল টানা কালো ডানার দুটি চোখ আগ্রহে প্রদীপের মত জ্বলতে লাগল। টিলার উপর ঐ যুবক কি রামচন্দ্র? সেই আশ্চর্য সুন্দর মুখশ্রী দেখে শূর্পণখার দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল। রামের দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সত্যিই টলটল করছে অপার মমতার সাগর। শূর্পণখা রথ থামিয়ে গাছের আড়াল থেকে রামকে দেখতে লাগল। উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল তার মাথার ভেতর। আর মনে হতে লাগল রামচন্দ্র অদ্ভুত, ভীষণ আশ্চর্য, আর ভয়ংকর সুন্দর! শূর্পণখা হতভম্ব।

খানিক পরে চমক ভাঙল তার। রামচন্দ্র সত্যিই তার সামনে দাঁড়িয়ে। এ যে হতে পারে তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সবটাই স্বপ্ন তার।

স্বপ্নেই হোক, আর যাই হোক সে শুনল এক অনির্বচনীয় মধুর কণ্ঠস্বর। সুন্দরী, এই বিজন বনে কোথায় চলেছ তুমি? পথের কোন ভ্রম ঘটেনি ত তোমার? তুমি কে? তোমার পরিচয়ই-বা কি? আমি সামান্য তাপস মাত্র।

শূর্পণখা জবাব দিতে পারল না। সর্বাঙ্গ তার থর থর করে কাঁপছিল। মুগ্ধ দুটি চোখে রামচন্দ্রকে দেখছিল। চিন্তাশক্তি কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। ঠিক যে কি হচ্ছে অনুমান করতে পারল না। তবে, কিছু যে ঘটল তা অনুভব করতে পারল। রামকে দেখে অনেক অনুভূতি জাগল, যা আগে কখনও মনের কোণে আসেনি। শূর্পণখা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের দুর্বলতার গতি প্রতিরোধ করল। তারপর মাথা নিচু করে প্রশ্ন করল, মহাত্মন, আপনার পরিচয় অবগত হওয়ার বাসনা প্রবল হয়েছে মনে। অনুগ্রহ করে কৌতুহল চরিতার্থ করে ধন্য করুন।

রামের অধরে স্নিগ্ধ হাসির লাবণ্য, কণ্ঠে মাধুর্য। বলল ঃ সুচিস্মিতা আমি একজন ফলাহারী তাপস মাত্র। এর অধিক কোন পরিচয় আমার থাকার কথা নয়। ওই ঘন সবুজ পত্রপুঞ্জের নিবিড় ছায়ায় আমার কুটীর।

শূর্পণখা কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর রথ থেকে ধীর পায়ে নেমে এল। রামচন্দ্রের সামনে দাঁড়াল। অপলক স্থির চোখে সুনিবিড় ছায়া নামল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল ঃ তুমি রামচন্দ্র! সমুদ্রের বারি রাশির মত নীল তোমার গায়ের রঙ। সারা অঙ্গে ভস্ম লেপেও পারেনি ভিতরের রঙ ঢাকা দিতে। এই রঙ, ঐ ভুবন ভোলা চোখ আর কণ্ঠের ঐ মধুমাখা স্বর রামচন্দ্র ছাড়া আর কোন পুরুষের হয় না। রমণীর চোখকে ফাঁকি দেয়া এতই সহজ?

রামচন্দ্র চুপ করে রইল। চোখের তারায় নিঃশব্দ ঘুরছে তার নীরব প্রশ্ন ঃ এই রমণী কে? কোন উদ্দেশ্যে, কি প্রয়োজনে এই নির্জন অরণ্যে একা এসেছে? কোন মোহ সৃষ্টি করে এমন করে আকর্ষণ করছে তাকে? কোঁচকানো চোখের কোণা দিয়ে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিল। পরক্ষণেই মুখে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে বলল ঃ তুমি সত্যি বলেছ। কিন্তু বিধুমুখী তোমার কোন পরিচয় ত দিলে না।

শূর্পণখা একটু দিশেহারা বোধ করে চুপ করে থাকল। তারপর, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ সামান্যা রমণী আমি। পরিচয় দেবার মত কিছু নেই আমার। নিঃশব্দ একটা যন্ত্রণামথিত কষ্ট তার কথার সুরে মর্মরিত হল। তার বিষণ্ণ রেশটুকু রামচন্দ্র ছুঁয়ে গেল।

তা কেন হবে?

শূর্পণখা একথার জবাব দিল না। পিপুল গাছের ছায়ার দিকে চেয়ে রইল। কায়া ও ছায়ার মত একসঙ্গে মিশে আছে রাবণের সঙ্গে তার পরিচয়। রাবণের নাম শুনে রামচন্দ্রর হৃদয় যদি বিরূপ হয়, তার সম্পর্কে নিরুৎসাহ বোধ করে তাই সে সাবধান ও সতর্ক হল। একজন কঠোর বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল ব্যক্তির মত সে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল ঃ এক অনাথিনী আমি। রামচন্দ্রের মনের মধ্যে মমতা, সমবেদনা ও অনুরাগের বীজ বপন করতে চাইল শূর্পনখা।

শূর্পণখার আত্মপ্রকাশের বাধ বাধ ভাব রামচন্দ্রকে সতর্ক ও সাবধান করে রাখল। তার কোন কথা রামের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু তার কথার ভেতর ধরা পড়ল বঞ্চিতা নারীর বিপন্ন অসহায়তা।

শূর্পণখা রামের মন বুঝার জন্যে সময় নিচ্ছিল। নিজের আঙুলগুলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

কিছুক্ষণ পর রামচন্দ্র নিজে থেকে বলল ঃ সুলক্ষণা আত্মপরিচয় দিতে যদি সরমে লাগে তাহলে থাক সে রহস্য তিমিরে। ব্যক্তি নিজেই তার নিজের পরিচয়।

শূর্পণখার বুক কেঁপে উঠল। রামের সান্নিধ্য লাভের একটা সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় বলল। না, ঠিক তা নয়। আমি দানবকুল বধূ শূর্পণখা।

তুমি রাবণ ভগিনী?

শূর্পণখার সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। মুখ সাদা হয়ে গেল।

ডাক ভুলে যাওয়া পাখির মত তার অবস্থা। চোখে বোবা শূন্যতা। কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল অপরূপ পুরুষটির দিকে। এখনো এই পুরুষটির প্রায় সবটাই তার জানার বাইরে। তবু মনে হল, এই অপলক আশ্চর্য মানুষটাই তার সাধ পূরণ করতে পারবে। ক্ষণিক একটু দ্বিধা আর জড়তা কাটিয়ে শূর্পণখা গম্ভীর থমথমে গলায় বলল ঃ আর কেউ না জানুক, আমি জানি সে আমার কেউ না। আমার শত্রু। আমার জীবনের বড় অভিশাপ।

বিস্ময়টাকে চাপা দিতে রামচন্দ্র মৃদু রহস্যময় হাসল। হাসলে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে তার মুখে। কী গভীর মায়া আর মমতা সে হাসিতে মাখানো। বলল ঃ তাও নয়। হঠাৎ মাথায় ভুত চাপে না মাঝে মাঝে? সেই রকমই।

শূর্পণখা চমকে উঠল রামের কথায়। বুকের মধ্যে তার ঝড়ো বাতাসের দোলা। রামচন্দ্রের কাছে জীবনের একটা গোপন দিক প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে কেমন লজ্জাবোধ করল। আত্মগ্লানিতে তার বুকের ভেতর জ্বালা করছিল। বজ্রাহতের মত অবাক চোখে রামের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা কান্না তার বুক ঠেলে উঠে এল। দু'হাতে মুখ ঢাকল। ফোঁপাতে লাগল।

রামচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা একটু ভেবে নিল। তাকে বাধা দিল না। কাঁদতে দিল। রামচন্দ্রের সব সময় উৎকণ্ঠা, ভয় অজানাকে ঘিরে। সে তো জানে না, শূর্পণখা কি বলবে তাকে? তাই শক্ত হয়ে রইল। তীক্ষ্ন চোখে শূর্পণখার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ মানুষের নীচতা, হীনতা দেখলে আমার ভীষণ ঘৃণা হয়। কোন নোংরামি আমি সইতে পারি না। পৃথিবীতে তোমার ভ্রাতার মত মানুষের কোন প্রয়োজন নেই, এরা শুধু জীবনের শান্তি নষ্ট করে। সংকট, সমস্যা বাড়ায়। তবু, এরা জন্মায় কেন বলতে পার?

শূর্পণখা কি জবাব দেবে? ভ্রাতা ভাল কি খারাপ সে বিচার করে দেখেনি কখনো। বড় ভাই সে। কোলে পিঠে করে তাদের মানুষ করেছে আদরে; সোহাগে, শাসনে। সুতরাং, তার বিচার শূর্পণখা করতে পারেনি। তাই কথাটা তার কানে লাগল। কিন্তু ভাই হওয়া সত্ত্বেও কিছু বলারও নেই তার। থাকবে কোথা থেকে? তার বৈধব্যের জন্য রাবণ দায়ী। প্রতিপক্ষ ভেবে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করার সংকল্পে সে জেনেশুনে বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করেছে। তার স্বপ্ন, সাধ, সুখ ;—রাবণের ভুলে হোক, ইচ্ছেয় হোক ধূলিসাৎ হয়েছে। ভগিনীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য থেকে তার কাছে বড় হল সাম্রাজ্য। তাই, রাবণের স্নেহে তার সন্দেহ। তাকে তার জীবনে বিপজ্জনক মনে হল। এ কথাগুলো আগে মনে হয়নি এখন মনে হল। রামের কথার ভেতর যে গভীরতর কিছু ইঙ্গিত ছিল তা বুঝল শূর্পণখা। আর, প্রশ্ন করল না। তবে, নিজের ভাই রাবণ সম্পর্কে এতকাল যে নির্বিকারত্ব ছিল তার, সেটা কাটল। মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ তোমার কথার জবাব আমার জানা নেই রাঘব। এরা জন্মায় বলে'ত তোমাদের মত মানব পরিত্রাতাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। নইলে তোমাদের চিনতাম কেমন করে?

মানুষের মন রহস্যময়। শূর্পণখাকে দেখে রামের অনুভূতিশীল মনের মধ্যে একটা সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হল। হঠাৎ, শূর্পণখার কথায় তার অনুমান সত্য হল। রাবণ ভগিণীর উত্তরে রামচন্দ্র গম্ভীর হয়ে যেতে পারত। কিংবা কথাগুলো জবাব না নিয়ে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার কিছু হল না। সামান্য শব্দ করে হেসে বলল ঃ তুমি খুব চতুর মেয়ে। বুদ্ধিও রাখ।

শূর্পণখা এক বড় শ্বাস ফেলল। ভয়টা বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। এক মুখ হাসিতে খুশির বন্যা বয়ে গেল। হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। বলল ঃ বিদায়।

রাম বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল তার যাত্রাপথের দিকে। সবটাই কেমন আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। মনের মধ্যে অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ কাজ করে যাচ্ছিল।

॥ চোদ্দ ॥

গৃহে ফিরে শূর্পনখা এক অভূতপূর্ব শিহরণ বোধ করল। মুগ্ধতার সমুদ্র তার হৃদয়দেশকে প্লাবিত করে গেল। আর এক সুখকর উল্লাসের ভেতর তার সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিজের মনে প্রশ্ন করল—এই কি প্রেম? নইলে একজন শত্রুকে দেখে এরকম অনাবিল শান্তি সুখের শিহরণ জাগবে কেন বুকে? শূর্পনখা প্রতিমুহূর্ত্ত অনুভব করছিল রামচন্দ্র যেন অকস্মাৎ তার মরা নদীতে স্রোত এনে দিল। চলার ছন্দ জাগল, সুর ফুটল। চাঞ্চল্য জাগল দেহের প্রতি কোষে কোষে। চোখের তারায় ফুটে উঠল রামচন্দ্রের ছবি। আর কানের পর্দ্দায় রিন রিন করে বাজতে লাগল তার মধুর কন্ঠস্বর।

কৃষ্ণপক্ষর চাঁদ তখনও ওঠেনি। মিশমিশে অন্ধকারে চুমকির মত জ্বলছে জোনাকি। বাস্তব হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কুয়াশা মাখা অন্ধকারে। কেবল আর্ত্তনাদের মত ঝিল্লীরব কঠিন অবোধ অন্ধকারের ভেতর গুমরোতে থাকে। অনুরূপ এক তীব্র যন্ত্রণাময় আর্ত্তি শূর্পনখার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের গভীরে শব্দ করে বেজে যাচ্ছিল।

মা। সহসা পুত্র শম্ভুর আহ্বানে ভেঙে গেল তার চিন্তার তন্ময়তা।

সবিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ রুষ্ট হল শূর্পনখা। রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করল। সে কি তুমি ঘুমুতে যাওনি এখনো?

শম্ভু নির্বিকার ভাবে জবাব দিল ঃ ঘুম আসছে না। বাবার কথা মনে পড়েছে। মনটা ভার হয়ে আছে। আর ভীষণ একা লাগছে। তুমি আমার কাছে একটু শোবে চল।

শম্ভুর ব্যাকুলতা শূর্পনখার জননী হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু সে মুখ নত করে মৌন রইল। অনেকক্ষণ কাটল। তবু কোন উত্তরের লক্ষণ দেখা গেল না। উন্মনা

দৃষ্টিতে শূর্পনখা তাকিয়ে রইল দূর দিগন্তে মিশে যাওয়া সবুজ বনানীর সমান্তরাল এক ঘন ছায়ার দিকে।

পরের দিন ঠিক সময় ঠিক জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছিল শূর্পনখা। অনেকক্ষণ ধরে রামের প্রতীক্ষা করল। তারপর হতাশ হয়ে একসময় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল। তখন সহসা চকিত বিস্ময়ে দেখতে পেল রামচন্দ্র বৃক্ষ শাখার ডালে·ডালে সন্ধানী চোখ রেখে মৃদু মন্দ পায়ে চলেছে।

শূর্পনখা নিঃশব্দে শ্বেতবর্ণ অশ্ববাহিত সুবর্ণ রথ চালনা করে রামচন্দ্রের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। মুখে তার প্রফুল্লিত হাসি। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল রামচন্দ্র। সভয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করল রথোপরি রাণীর মত বসে আছে শূর্পনখা। সর্বাঙ্গ তার স্বর্ণালংকারে ভূষিত। অধরে টেপা হাসি। তন্দ্রা জড়ানো দুই চোখে বিভোল বিহ্বলতা। রামচন্দ্রের দৃষ্টি লুব্ধ ও আকৃষ্ট করতেই যেন চুমকী বসানো কাঁচুলিতে সুডৌল স্তন দুটি আবৃত করেছে। কিন্তু উপরের অনেকটা অংশ উন্মুক্ত। যেখানে স্তনের উপরিভাগের কোমল নরম ত্বকের বেশ কিছুটা দৃষ্টি পড়ে। ছোট কপাল শূর্পনখার, কিন্তু চমৎকার। থোকায় থোকায় নেমে আসা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম। পা পর্যন্ত নেমেছে। শূর্পনখার অনুভূতি মাখানো সাজসজ্জা যেন এক অপরূপ মুগ্ধতা সৃষ্টি করল।

অবাক চোখে রামচন্দ্র তার আপাদমস্তক দেখল। রক্তমাংসের দেহের আড়ালে লুকোন তপ্ত কামনার বহ্নি সাজসজ্জায় যেন বাসনার শিখা হয়ে জ্বলতে লাগল।

রামচন্দ্রর মুগ্ধ দুই চোখের উপর চোখ রেখে শূর্পনখা রথ থেকে নামল। দুই চোখের চাহনিতে তন্দ্রা জড়ানো, অধরে কামিনা ঝরানো হাসির তরঙ্গ। ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করল ঃ অমন করে দেখছ কি ?

রামচন্দ্রের অধর ঈষৎ উন্মুক্ত হল। স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বলল ঃ তোমাকে !

অদ্ভুত তাই না ?

ভীষণ সুন্দর।

শূর্পনখা রামচন্দ্রের ঘন হয়ে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টিতে বিমগ্ন কামনার আকুতি দীন হৃদয়ে মধুর গলায় বলল ঃ প্রিয় আমার, তোমাকে দেখা থেকে মন হয়েছে উতলা।

ভালবাসার পৃথিবী বিশাল। পাত্র-অপাত্র, জাত-ধর্ম নেই সেখানে।

ঠিক বলেছ প্রিয়তম। যুগ যুগ ধরে মানুষের সঙ্গে রাক্ষসের বিরোধ। কিন্তু হৃদয়দানের ক্ষেত্রে এই বিরোধ কখনও তাদের মিলনের বাধা হয়নি।

নর-নারীর প্রণয় এক বিচিত্র মায়া। ঈশ্বরের এক অদ্ভুত যাদু।

প্রিয়তম, রমণীর প্রণয় পুরুষের জীবনকে শোভিত করে।

আবার বিষময় করে তোলে। বলল, রামচন্দ্র।

প্রিয় আমার ; ও কথা বলে, তুমি পালাতে চেয়ো না। চেয়ো না আমার প্রেমের কাছ থেকে সরে যেতে। আমি চাই তোমাকে।

রামচন্দ্র কথা খুঁজে পায় না। শূর্পনখার মায়াবী চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার ভিতরকার প্রেম টের পায়। সে প্রেম দুর্জয়, বাসনায় কামনায় নির্ভীক, বলিষ্ঠ এবং উগ্র। এ প্রেম দুর্বার, বাধা মানে না, নিষেধ জানে না থামার। কোন নারী পুরুষের কাছে এমন অসংকোচে তার প্রেম দাবি করেনি। শূর্পনখার প্রেম তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে। শুধু প্রেমে প্রলোভিত করে তার কাছ থেকে এক বিরাট রাজনৈতিক জয় আদায় করা তার কাছে কিছু কঠিন নয়। কিন্তু এই ধরনের রাজনীতির নোংরা যে কি ভীষণ রামচন্দ্র তা আন্দাজ করতে পারে। কখনও এধরনের রাজনীতি সে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু গভীর হতাশা থেকে এই ধরনের রাজনীতির সমর্থনে তার মন যুক্তি খুঁজতে লাগল। রাজনীতিতে বিবেক বস্তুটি অচল। জয় একমাত্র সত্য। রাবণের মত শত্রুকে ভয়ংকর বিষের বিষক্ষয় নীতি প্রয়োগ করে একমাত্র কব্জা করা যায়। শূর্পনখার প্রেম নিবেদন যদি তাকে সেই অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দেয় তবে কেন সে তা গ্রহণ করবে না? রাবণের নিয়তি শূর্পণখার রূপ ধরে যদি ধরা দেয় তার কি করার আছে? সে নিজেও নিয়তির চালিত যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তার ইচ্ছায় কোন মূল্যই নেই। কালের রথচক্রতলে তাকে নিষ্পেষিত হতে হবেই।

শূর্পণখা রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করল। তাকে একটু গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখাল। তার চোখের দৃষ্টি উদাস, শূন্য। সেই চোখের ভাষা কি অনুভব করতে পারে না। অথচ যে আবেগটা রামচন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিল তা ভিতরে ভিতরে তার বাঁধ কেটে দিচ্ছিল। তরঙ্গায়িত অনুভূতিতে যেন ঢেউ জাগল। প্রবল ঢেউয়ের ঝাপ্টা তার মস্তিষ্ক আঘাত করল, তার হৃদয়কে মথিত করল এবং বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ম যন্ত্রণায় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বিভ্রান্ত অবাক চোখে রামের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: প্রিয়তম তোমার মৌনতার আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। তুমি কথা বলছ না কেন? তোমার দ্বিধা কিসে, বাধা কোথায়? আমি অনার্য, রাবণ ভগিনী শূর্পনখা বলে তুমি কি ঘৃণা করছ আমায়?

রাম শশব্যস্ত হয়ে বলল: সুন্দরী নিজেকে ছোট চোখে দেখে ছোট কর না মন। নিজের সম্পর্কে হীন ধারণা করা সহজ কিন্তু মহৎ কিছু বিশ্বাস করা কিংবা চিন্তা করা আরো কঠিন। আমি কোন মানুষকে ছোট করে দেখি না। ঘৃণা আমার ধর্ম নয়। সতত মানুষের মঙ্গল কামনা করি। আর তুমি'ত আমার দুরন্ত বিস্ময়।

গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রামের দিকে বিলোল কটাক্ষে তাকিয়ে বলল: প্রিয় তোমার কৌতূহল আমায় মুগ্ধ করল। ভাবছ, এ রাজেন্দ্রাণীকে কোথায় রাখবে? কি করবে তাকে নিয়ে?

সুন্দরী তুমি ঠিক বলেছ। আমি বনবাসী এক তাপস। আমার কী আছে, যা তোমাকে দিতে পারি?

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ল। শূর্পণখার মুখে। চোখের কোণ ঝকমক করে উঠল আলোয়। হাসিতে টোল খেল মুখ। অস্ফুট গলায় বলল: কি দেবে আমাকে? যে চোখে তুমি আমাকে দেখেছ সেই চোখ দাও আমাকে।

কিন্তু জীবনের প্রথম দিনের কামনা বাসনা, মন, অনুরাগ সব যে আমি বৈদেহীকে দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে বসে আছি। আর কি আমার আছে যা দিয়ে তোমার প্রেমের অভিষেক করব।

শূর্পণখা চমকাল না। একটুও ভয় পেল না। অবাকও হল না। অকুণ্ঠচিত্তে বলল: বৈদেহী তোমার একমাত্র পত্নী নয়। আরো অনেক স্ত্রী আছে তোমার। তারা চায় তোমাকে। আমি তোমার বহুস্ত্রীর মত তোমার মন প্রাণ আত্মাকে চাই। আমি তোমাকে প্রেম দেব। যৌবন দেব, ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য দেব।

রামের অধর মৃদু হাসিতে রঞ্জিত হল। বলল: সুন্দরী চাওয়া নিতান্ত সহজ, চাওয়ার পেছনে একটা চিন্তা ভাবনা থাকা চাই। লোকে বলে আমার স্ত্রী শত শত। কিন্তু তারা কে? কেন তাদের বিবাহ করেছি? এসব কখনও জানতে চেয়েছে তারা? বহু নারীর আসঙ্গ লোভের কামনায় তাদের বিবাহ করিনি। বয়সের দোষে, লোভের বশে, মোহের তাড়নায়, লম্পটের প্রতারণায় অথবা দুর্বৃত্তের বর্বরতায় যে সব রমণীর সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, জীবনের গৌরব গেছে, অবাঞ্ছিত জীবনের অপমান, অসম্মান নিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে বেঁচে আছে তাদের প্রতি আমাদেব প্রত্যেকের সামাজিক ও মানবিক যে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে তার আদর্শে মানুষকে প্রত্যয়বান করতে চেয়েছি। মানুষের একটু দরদ, সহানুভূতি বিবেচনা আর উদারতায় যাদের জীবন ধন্য হয়ে যেত তাদের প্রতি অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ করে তাদের জীবনকে বিষময় করে দেব কেন? এই বোধ অনুভূতি জাগাতে ত আমি পতিত রমণীকুলকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছি। অযোধ্যার পাষাণ প্রাসাদ মূর্ছিত হয়ে আছে তাদের ভাষাহারা স্পন্দনহারা প্রেম। কবে তাদের কাছে যাব—কবে আমার প্রেমের যাদুর ছোঁয়ায় তাদের মূর্ছা ভাঙবে তার প্রতীক্ষায় তাদের দিন কাটে। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে।

শূর্পণখার বুকের ভেতর থর থর করে কাঁপল। গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনের উদ্বেগ চাপা রাখা অসম্ভব হল। সরোবরের মত শান্ত দুই চোখ রামচন্দ্রের চোখে রাখল শূর্পণখা। সেই চোখের দৃষ্টি প্রেমের নির্ঝরিনী হয়ে রামচন্দ্রের মনকে প্লাবিত করল। গাঢ় স্বরে বলল: তুমি আকাংখার ধন। আমি চাই তোমাকে। প্রিয়তম যা পেতে তুমি এসেছ দণ্ডকবণে, তা আমি দেব দু'হাত ভরে। আমাকে নেবে না তুমি?

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত রামচন্দ্র বলল: নেব বৈকি, তুমি আমার বিজয় অভিযানের দীপবর্তিকা, তোমায় নেব না?

বিগলিত প্রসন্নতায় গদ গদ হল শূর্পণখার কণ্ঠস্বর। বলল: তা-হলে তুমি আমার হলে। আমাকে তোমার হৃদয়ের ভালবাসা দিও, বিনিময়ে আমি উজার করে দেব তোমাকে আমার আতপ্ত যৌবন, আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য সব।

রামচন্দ্রের অধরে টেপা হাসি। সেই হাসিতে রঙীন হল শূর্পনখার মুখ। পুরুষের যে আচরণ নারীকে মুগ্ধতার ওপারে, প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়, আশা জাগায় তৃষ্ণা জাগিয়ে দেয় আকণ্ঠ, রামচন্দ্র তা পূর্ণ করল, শূর্পনখার দাবির আশ্বাসকে অপূর্ণ রেখে। কিন্তু আবেগ দমিত থাকে না, দৃষ্টির সংগমে নিজেকে পরমসুখে স্নাত করার প্রবল তৃষ্ণা শূর্পণখার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণের সংগমে অবগাহনের তৃষ্ণা জাগে শরীরে। বলল ঃ প্রিয়তম, আমার অন্তরের ইচ্ছা কি দুর্বোধ্য থেকে যাবে? তন্দ্রা জড়ানো দু'চোখে প্রেমের নির্ঝরিণী। রামচন্দ্রের গা ঘেঁষে সে দাঁড়াল। বলল ঃ প্রিয় আমার, প্রেম দেব তোমাকে। কিন্তু কি দিয়ে বোঝাব প্রেম, যদি দেহ রহে নিরুত্তর!

শশব্যস্ত হয়ে রামচন্দ্র বলল ঃ না সুন্দরী, নরনারীর প্রেম এক দুর্লভ রত্ন। তাকে পাশব পৌরুষবলের বিনিময়ে পাওয়া যায় না, শক্তি দিয়ে জয় করা যায় না। সে আকাংখার চাঁদ। তাকে পাওয়া কি অমনি অমনি? সাধনায়, সিদ্ধ না হলে তাকে অর্জন করব কেমন করে? রাজ্য না হলে রাজা হওয়া যায়? প্রেম যদি পেতে চাও, প্রেমিক হও আগে।

শূর্পণখার চোখে মুখে হতাশার ভাব ফুটল। রামচন্দ্রের কথা শোনার ধৈর্য ছিল না তার। রামের কথা শেষ হওয়ার আগে বলল ঃ মুখে যাই বল, সীতাকে তুমি ভয় পাচ্ছ। মেয়েটার কি আছে? সে কুরূপা। আমার অধিক সুন্দরী'ত নয়ই। ঐ বিশ্রী মেয়েমানুষটা তোমার পাশে বেমানান। তার চেয়ে বরং আমাকেই বেশি মানায় তোমার সঙ্গে। রোগা-প্যাঙা ঐ তামাটে রঙের মেয়েটার শরীরে ক'গাছি হাড় ছাড়া আর কি আছে? ওকে বৌ বলে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা করে না? ও তোমাকে বশীকরণের মন্ত্র করেছে। কিন্তু ওসব বিদ্যে আমিও জানি। তুমি ভেব না, পথের কাঁটা ঠিক সরিয়ে দেব।

রামচন্দ্র সীতার জন্যে অদ্ভুত এক বেদনাবোধ করল মনে। নরম গভীর গলায় বলল ঃ তোমার শান্তি আমার স্বস্তি এক নয় সুন্দরী। মিথ্যে এমন জিনিস যার মধ্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেবার বিষ আছে। মিথ্যেকে আরো মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে হয়। অথচ, এসব কিছু না করে আমরা পরস্পরের বন্ধু হতে পারি।

দৃষ্টির অগোচরে লক্ষ্মণ একটু একটু করে বদলে গেল। কারো নজরে পড়েনি তার পরিবর্তন। বোধ হয় লক্ষ্মণও টের পায়নি। ইদানীং তার পরিবর্তন চোখে পড়ার মত ঘটনা। লক্ষ্মণের হাসিখুশি সদা প্রফুল্ল ভাবটি গহণ অরণ্যে কবে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার সুন্দর মুখখানা আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের মত হতাশায় দুঃখে বিষণ্ন।

পঞ্চবটীতে বাসা করা থেকে সে একটু আড়ালে আবডালে থাকে। একাই যেন বেশি ভাল লাগে। একক নিঃসঙ্গ জীবনের গভীরে নির্বাসিত করে লক্ষ্মণ আপনাকে খোঁজে। কিসের দুঃখ তাকে যেন চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বনে। গোদাবরীর নির্জন তীরে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে। আর বুকের ভেতরটা বিষাদে টৈটুম্বর হয়ে যায়।

নদী তার প্রিয়। যখন কিছু ভাল লাগে না, শূন্যতার বিষাদে ভরে যায় মন তখন এই নদীতীরে এসে বসে। শান্ত নির্জন প্রকৃতির মৌনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে ভাল লাগে তার। বদ্ধ নিঃশ্বাসের কষ্ট ঝির ঝিরে বাতাসের মত তার বুকে ঢেউ তোলে। নদী নিশ্চুপ, কোন শব্দ নেই, তথাপি নদীর বুকে চকিত শিহরণের মৃদু তরঙ্গ খেলে যায়।

লক্ষ্মণে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আবর্তিত হয়। মন ভারী হয়ে যায়। একটা কষ্ট কষ্ট ভাব দুই চোখের পাতায় নিবিড় হয়ে উঠে। ভিতরে ভিতরে কিসের যন্ত্রণায় যেন পুড়তে থাকে। ঊর্মিলার জন্য একটা কষ্ট গভীরভাবে তার মনে বাজল। একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথার সঙ্গেই সে প্রকৃতি দেখে। বিশ্বলোকে কেউ নিঃসঙ্গ নয়। সকলের সঙ্গী আছে। এই যে নদী চলেছ অবিরাম নৃত্যে গানে তাকে মুখর করছে তরঙ্গ। বিহগের সঙ্গে বিহগীর মুখর কুজনে হর্ষময় হয়ে আছে বনভূমি। ঊর্ধ্ব আকাশে বলাকার যে দল উড়ে যাচ্ছে তারাও নিঃসঙ্গ নয়। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেও একা থাকতে চাইলে না। একা তার ভাল লাগল না। কোন কিছুতেই আনন্দ-রূপ প্রকাশ পায় না বলে ব্রহ্ম নিজেকে দুই করল। ঐতরেয় উপনিষদ বলছে ব্রহ্মার সবচেয়ে প্রকট যে রূপ তা আনন্দরূপ। রসো বৈ সঃ। তিনি রসিক, রসপ্রিয় রসলোভী। রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। রস অনুভব করে তিনি আনন্দ পান। আর সে রস একা অনুভব করা যায় না। তার জন্য চাই আরও একজন। মহাজ্ঞানী রামচন্দ্র সেই তত্ত্ব অবগত আছে বলে সহধর্মিণী সীতাকে বন-যাত্রার সঙ্গিণী করেছে। এ না'হলে জীবন রসের ধারা বইবে কি করে? নিরানন্দে যে কোন বড় কাজ হয় না এই গভীর সত্যের রহস্য তার জানা ছিল না। তাই নির্বোধের মত ঊর্মিলাকে তার বনযাত্রার সঙ্গিণী থেকে নিবৃত্ত করেছে। সেকথা মনে হলে অনুশোচনা হয়। নিজেকে তার সবচেয়ে দোষী আর অপরাধী মনে হয়। ব্যথিত মনের ভেতর একটা কান্না গুমরে গুমরে উঠে। আর তখন মনের ভেতর ভেসে উঠে প্রিয় বিরহ কাতর ঊর্মিলার শান্ত করুণ গভীর চোখ দুটো। কিছুতে যে দৃষ্টি ভোলা যায় না।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্মণ ঊর্মিলাকে দর্শন দিতে এল। ঊর্মিলা জলভরা চোখ দুটো তুলে স্নিগ্ধস্বরে বলল: প্রিয়তম, কোন অপরাধে আমাকে তুমি একা ফেলে যাচ্ছ? ভগিনী সীতা স্বামীর সঙ্গে বনে যেতে যদি পারে, তা-হলে আমি পারব না কেন? আমার যেতে বাধা কোথায়? তুমি আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ না কেন? আমাকে সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তোমার কি লাভ?

লক্ষ্মণের চোখে মুখে একটা অসহায়ভাব ফুটে উঠল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কষ্টের ভেতরও স্মিত হাসি ফুটল অধরে। বলল ঃ আমারও কি কম ইচ্ছে হয়? কিন্তু জেষ্ঠের আদেশ—

ঊর্মিলার কণ্ঠে বিস্ময় ঃ স্ত্রী যাবে স্বামীর সঙ্গে তাতেও আপত্তি তাঁর? আমার অদৃষ্টই মন্দ! এই পুরীতে আমাকে একা থাকতে হবে। দুঃখে বিরহে কত নিঃসঙ্গ কাটবে আমার দিনগুলো ভাবত?

নির্জন অরণ্যে আমারও ভীষণ একা, শূন্য মনে হবে।

প্রিয়তম, মানুষ জন্মেছে মিলিত হবার জন্য, সরে দাঁড়ানোর জন্য নয়। দুয়ের ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব, প্রীতি না পেলে জীবনধারা বইবে কেমন করে? প্রিয়তম তোমাকে না পেলে আমার জীবন হবে ব্যর্থ, নিরানন্দ।

লক্ষ্মণ কথা বলতে পারেনি। তীব্র ব্যথায় বুকের ভেতরটা তার টনটন্ করছিল। দু'চোখের পাতা তার ভিজে গিয়েছিল। ঊর্মিলা লক্ষ্মণের বুকে মাথা রেখে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার নরম চুলে ভরা মাথায় মুখ ঘষতে ঘষতে অস্ফুট স্বরে বলল ঃ তোমার কথাগুলো এত মিষ্টি আর মায়া মাখানো যে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। সব যুক্তি হার মেনে যাচ্ছে।

সহসা ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত ঊর্মিলা লক্ষ্মণের বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। জ্বালাভরা দু'চোখে লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। গলার স্বর কেমন কান্নায় জড়িয়ে গেল। বলল ঃ মিথ্যে, মিথে-সব ষড়যন্ত্র। অগ্রজ কখনও বলেনি ঊর্মিলা যাবে না, যেতে পারে না। আর যদি বলেও থাকে তুমি কেন নীরবে মেনে নিলে সে প্রস্তাব? কেন? কেন বললে না, নারী যেমন পুরুষের মনে কামনা জাগিয়ে দেয়, তেমনি দেবত্বও জাগাতে পারে। সে শক্তিরূপিণী কল্যাণময়ী।

তীব্র আবেগে আর উত্তেজনায় ঊর্মিলা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে লক্ষ্মণ মুঠো করে মাথার চুল ধরে নিজেই ঝাঁকাতে লাগল। আর মনে মনে বলল ঃ ঊর্মিলা, আমি ভীষণ নির্বোধ। কি দারুণ মোহে একটা মরীচিকার পিছনে ছুটেছি। আজ শুধু মনে হচ্ছে আমি ভীষণ রিক্ত, আর নিঃস্ব। জীবন যৌবন সব মিথ্যে হয়ে গেল।

খস খস করে শুকনো পাতায় কার পায়ের শব্দ হল। লক্ষ্মণের স্বপ্ন ভেঙে গেল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সচকিত হয়ে উঠল। পিছনে ফিরতেই সে দেখতে পেল রামচন্দ্রকে। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। রামচন্দ্র যে তাকে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে এটুকু মুখে না বললেও অগ্রজের চোখ মুখ দেখে তা টের পেল। ব্যাকুল স্বরে রামচন্দ্র জিগ্যেস করল ঃ তোমার কি হয়েছে ভাই, তুমি এখানে কেন?

লক্ষ্মণ একটু থমকে যায়। তার সমস্ত চেতনা তখন ঊর্মিলাতে আচ্ছন্ন। বুকের ভেতর মর্মরিত হয়ে উঠল বেদনার সুর। তীব্র আবেগে হৃদয় মথিত হতে লাগল। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দূরের বনভূমির দিকে

তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় ডাকল ঃ ভাইয়া ! ঘনপক্ষ ভুরুজোড়ায় আয়ত দুটো চোখ বেদনায় সুনিবিড় হল। কথা বলার আগেই বুকের ভেতর তার হু হু করে উঠল। কয়েকবার ঢোক গিলে বলল ঃ ভাইয়া, মাঝে মাঝে বড় একা আর নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে।

তোমাকে দেখলেই তা বোঝা যায়। পঞ্চবটীতে আসা থেকে তুমি একেবারে বদলে গেছ।

কোনদিন'ত সে কথা বলনি।

সরমে বলতে পারিনি। তোমার নীড়মুখী মন ভগিনী ঊর্মিলার কথা ভেবে আকুল হয়ে আছে।

ভাইয়া ! চমকানো বিস্ময়ে ডাকল লক্ষ্মণ।

স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে কতবার ঊর্মিলা, ঊর্মিলা কারে কাতরাতে শুনেছি।

জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে গেল, তাহলে থাকল কি ?

দুঃখী দুর্গত মানুষদের স্বার্থে সংগ্রাম করে তুমি আনন্দ পাওনা ? সংগ্রামই জীবন।

ভাইয়া, সরল মনে, নিষ্ঠার সঙ্গে চিরদিন তোমার আদেশ পালন করেছি। অন্তরের স্তরে স্তরে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে ; সে তোমার। অকস্মাৎ সে ছবি অস্পষ্ট হল কেন ? সহসা বেদনাময় স্মৃতির দীর্ঘছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় লক্ষ্মণের চেতনা। হৃদয় গহনের অন্ধকারে কেঁদে উঠে তার জীবনের মৌন প্রেম। বিস্মৃত হয় স্থান কাল পাত্র। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে তন্দ্রাভিভূতের মত আচ্ছন্ন স্বরে বলল ঃ ঊর্মিলার অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি স্বপনে জাগরণে কেন মনে পড়ে ? কত চেষ্টা করি ভুলে থাকব বলে, তবু পারি না। দীনা রমণীর মত তার শুধু একটা ভিক্ষা ছিল আমাকে দয়া করে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। আমি তোমাদের নির্দ্দেশে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত। তোমাদের সেবা করতে একান্ত আগ্রহী।—উঃ ! কী তীব্র যন্ত্রণায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। কার কাছে ব্যক্ত করব আমার যাতনা ? কে শুনবে আমার অক্ষম পৌরুষের আত্মগ্লানি ? ন্যায়ধর্মের নামে আমি তাকে প্রতারণা করেছি।

লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল রামচন্দ্র। তার চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবিম্ব। এতদিন লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে দেখেনি বলে মনে মনে বেদনাবোধ করল। কার্যতঃ তার জন্যেই লক্ষ্মণ নিঃশেষ করেছে তার জীবনের যৌবনের যত আবেগ। শীতল হয়ে গেছে তার অনুরাগের উত্তাপ। তার কোটরগত আঁখি যুগলে পড়েছে ক্লান্ত জীবনের ছায়া। দেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ব্রহ্মচর্যে অর্জিত তেজোময় কান্তি। লক্ষ্মণের কষ্ট দুঃখ দেখে তার হৃদয় আকুল হল। অথচ এরকম একটা কিছু হতে পারে আশংকা করেই সে কখনও সীতার সঙ্গে সহবাস করেনি। কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে সীতার নিবিড় সাহচর্য মেলামেশা লক্ষ্মণের হৃদয় নিভৃতে নানাবিধ অনুভূতির এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সে বুঝতে

পারেনি। লক্ষ্মণের জন্য সহানুভূতিতে মন কেঁদে উঠল। ক্লান্ত কণ্ঠে ডাকল ঃ লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সহসা তার স্বপ্নের মধ্যে চমকে উঠল। মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে লজ্জায় আরক্ত হল তার মুখ। রামচন্দ্রের নয়নে সবিস্ময় জিজ্ঞাসা। বলল ঃ অজ্ঞাতবাসের সন্ধিলগ্নে মিথ্যা অভিমানে কেন তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলছ? বিরহ ক্লেশে অবশ হয়ে যায় দেহ মন। ঊর্মিলা স্নেহময়ী কল্যাণী। তোমার ভিতরের অগ্নিকে শান্ত করতে সে ছিল সলিল। কিন্তু ঊর্মিলার প্রকৃতি কঠোর নয়। দাবির নামে কাঁদতে শুধু জানে, জানে এলিয়ে পড়তে পায়। বনের কষ্ট স্বীকারের মনোবল, সাহস তার ছিল না বলেই জোর করে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারেনি। নিজের অধিকারও ঊর্মিলা বুঝে নিতে পারে না। অরণ্যের জীবন আরামের নয়, এখানে আবেদন নিবেদনের কোন স্থান নেই। জোর করে অধিকার যে নিতে পারে সে কেবল টিঁকে থাকে। তুমি বৈদেহী আমার সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে, বনের কষ্ট বরণের ভয় তুচ্ছ করে বনবাসের সঙ্গী হলে, কিন্তু ঊর্মিলা নিষেধ বাধা পেরিয়ে অধিকার ও মনোবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল না। তার ব্যর্থতার জন্যে সে তোমার সঙ্গী হতে পারল না। সেজন্য তোমার কষ্ট হতে পারে কিন্তু আত্মানুশোচনা থাকবে কেন? জানি সেও অযোধ্যার রাজপুরীতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তার হৃদয়মন্দিরে যে প্রদীপটি অনির্বাণ হয়ে জ্বলছে সে তুমি। তার সমব্যথী হতে গিয়ে নিজেকে অপরাধী কর না।

দুরু দুরু করে উঠল লক্ষ্মণের বুক। কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের হাসিমাখা অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। নদীর ঢেউর মত রামচন্দ্র তার জীবনটাকে সুখ আর সমৃদ্ধির ধারায় যেন অভিষিক্ত করে দিল। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল লক্ষ্মণের অন্তর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কথা বলতে পারল না। ক্ষণকাল আগের সব ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, অনুশোচনা থেকে মুক্ত চিত্ত একটা নিবিড় প্রশান্তিতে আবিষ্ট করল তার সমস্ত চেতনা।

সারাদিন পথেব ক্লান্তি নিয়ে ওরা দু'জনে এসে বসল গাছের ছায়ায়। ওরা দু'জন হল রামচন্দ্র আর সীতা। ওরা দেখছিল গম, বজরার সবুজ ক্ষেত। গম ক্ষেতের উত্তোলিত ডগায় সবুজ গমের সারি সারি দানা। পলাশ, মহুয়ার ডালে লেগেছে রঙের দোল। পশ্চিমের আকাশেও লেগেছে গোলাপ রাঙা রঙের ছিটে। মেঠো পথ দিয়ে রাখালী মেয়ে একপাল গরু নিয়ে বাড়ী ফিরছে। তার তেলহীন রুক্ষ কেশ লাল। সারা গায়ে লাল মাটির ধুলো জমে লালাভা। মেয়েটির পিছনে পিছনে আসছে দুটি উলংগ বালক। তাদের কৃষ্ণবর্ণ দেহের কালো কালো লম্বা ছায়া পড়েছে পথে। আস্তে আস্তে আকাশের রঙ বদলাতে থাকে।

সীতা আর রামচন্দ্র পাশাপাশি বসে দেখছিল অপরাহ্নের প্রকৃতির দৃশ্য। আকাশের লাল রং পড়েছে সীতার মুখে। তার গৌরাঙ্গ তনুতে, পথের ধুলো মাখা মুখে ও রুক্ষ চুলে। রামের জটা, মুখ, শরীরেও লালাভ। তথাপি তার নিরীহ মুখ, নিরীহ ভঙ্গি, নিরীহ চাউনি, ছাড়িয়ে মাথার দিকে তাকালেই যেন যৌবন ও ব্যক্তিত্বের ছাপটুকু চোখে পড়ে। এই ধুলো বালি, রুক্ষতা আর তার সবুজ শাদ্বল রঙ মিশে অপরূপ দেখতে লাগল। সীতা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রামচন্দ্রকে নতুন রূপে দেখতে লাগল। কেমন একটা নেশা ধরে গেল।

হঠাৎ সীতা তরতর করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেল নিচে। একেবারেই পাহাড়ী ঝর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল। বিশাল পাথরের বুকের উপর পড়ে জলস্রোত যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বাঁধা পেয়ে জলস্রোত যেন ফোঁস ফোঁস করে গর্জন করে। আর তুষার কণার মত বিন্দু বিন্দু জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে অনেকদূরে।

সীতা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গাছপালা বেশি নেই। জলস্রোতও খুব উত্তাল নয়। তবে স্রোতের টান আছে। আর জলের ভেতর পাকিয়ে উঠা স্রোত যেন ডুবতে ডুবতে যাচ্ছিল। সীতার সারা অঙ্গে তার হিল্লোল জাগল। নিচু হয়ে সে জল স্পর্শ করল। ততক্ষণ রামচন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সীতাকে জলে হাত দিতে দেখে বলল: জলে হাত দিও না, উল্টে পড়ে যাবে।

সীতার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ঝলকে উঠল। দু'চোখে তার দুষ্টুমি। দু'হাত দিয়ে রামচন্দ্রের দিকে জল ছুঁড়তে লাগল। রামচন্দ্রের সারা গা ভিজে গেল। আর রামচন্দ্র দু'হাত আড়াল করে যেন প্রাণপণে জলের ছিটে রুখতে লাগল। এবং নানাভাবে সীতাকে মানা করল, শাসাল। কিন্তু সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই রইল, একটুও নড়ল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জলের ছিটে খেতে লাগল। পরে, নিজে থেকেই সে সীতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জল ছিটানোর খেলায় যোগ দিল। এক হাঁটু জলে নেমে সীতার শাড়ী ভিজিয়ে দিল। হঠাৎ খেলায় ইস্তফা দিয়ে খিল খিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল। রাম আঁজলা করে জল নিয়ে তার পিছু ছুটল।

দৌড়তে গিয়ে সীতার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ঝর্ণার ঢেউর মত উত্তাল হয়ে উঠল। রামচন্দ্র কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত অন্ধ উন্মত্তবেগে সীতার পেছনে পেছনে দৌড়ল। সারা শরীরের ভেতর তার আগুনের জ্বালা দপদপ করতে লাগল। দুরন্ত দর্পিত আগুনের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে তেমনি রামচন্দ্রও সীতার পিছু পিছু গাছগুলি ঘিরে ঘিরে পাক খেতে লাগল। সীতা হাঁফাতে হাঁফাতে রামচন্দ্রকে ধরা দিল। তখন তার দেহ টলছে। পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। সে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রামচন্দ্রকে সবলে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল। মুখ ঘষল। লালায় সিক্ত হল বক্ষদেশ। রামচন্দ্রের বুকের ভেতর প্রচণ্ড তাপে কি যেন গলে গলে পড়ে। শরীরটা একটু একটু করে নুয়ে পড়ে। ভেঙে পড়ে। তবু আকাংখানুযায়ী প্রচণ্ড মত্ততায় ফেটে পড়তে পারে না। শরীরের ধর্মে সীতার মুখের খুব কাছাকাছি তার মাথাটা নেমে আসে। সীতার দেহের একটা ঘর্মাক্ত কটু গন্ধে ক্রমেই অচেতন

হতে থাকে। সীতার নিঃশ্বাস বায়ুর সীমানায় মুখ নেমে এসে থেমে যায়। ঈষৎ চোখ সরাতেই সীতার বিস্রস্ত শাড়ির বাইরে উজ্জ্বল উদ্ধত যুগল প্রতিমার মত বক্ষ রামের রক্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিভ্রান্তির মধ্যে একটা অন্তহীন বিস্ময়ে রামচন্দ্র আরণ্যক পরিবেশে এই অপরূপ মানবীরূপ দেখতে থাকে। আর ভিতরে ভিতরে পুড়তে থাকে। তবু, মত্ততায় ফেটে পড়ল না তার আবেগ।

হঠাৎ ওরা সচকিত হল। বহুদূরে থেকে। ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দ ভেসে এল। তারপরে ঘোড়ার খুরের শব্দ, রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ। রাস্তার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, সাদা ঘোড়ায় টানা রথে করে মন্দগতিতে চলেছে শূর্পনখা। চড়াই, উতরাই টেনে টেনে উঠেছে রথ। পঞ্চবটীর দিক থেকে সে আসছিল। ঠিক যেন যুদ্ধ ফেরতা, পরাজিত সৈনিকের মত ক্লান্তভাবে রথ চালাচ্ছিল। অনেক দূরে সারি সারি গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল শূর্পনখাকে। দুই পাহাড়ের খাঁজের ভাঁজে বসে তারা দু'জন রুদ্ধশ্বাসে দেখল একটু একটু করে চড়াই উতরাইর আড়ালে শূর্পনখার রথ হারিয়ে যাচ্ছে।

রামের শুকনো ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল। বনের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া রথের দিকেই চোখ রেখে বলল : শূর্পনখা—রাবণের ভগ্নী।

সীতার ঠোঁটের হাসি বঙ্কিম হল। কৌতুকে ভুরু কুঁচকে গেল। রামের মুখ থেকে চোখ না ফিরিয়ে, দৃষ্টি না ঘুরিয়ে বলল : ডুবে ডুবে মহাশয়ের জল খাওয়া হয় তাহলে ?

দু'জনেই চোখাচোখি করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু বেলা শেষের আকাশের মতই বিষণ্ণ এবং গম্ভীর হয়ে উঠল দু'জনে।

শান্ত বড় বড় চোখে নিরীহ দৃষ্টিতে সীতা রামের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল : শূর্পনখা সত্যিই সুন্দরী। বয়সের কোন ছাপ লাগেনি ওর শরীরে। তারপরেই ছুরির ফলার মত বেঁকে যায় তার ঠোঁটের কোণ। বলল : তোমার প্রেমে পড়েছে। তাই না ?

রামচন্দ্রের মুখ একটু লাল হয়ে গেল। রক্তিম হওয়ার মত রক্ত ও লজ্জাটুকু এখনও তার আছে দেখে সীতা অবাক হল। তাকে লজ্জা দেয়া কিংবা বিদ্রূপ করার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু তাতে রামের বুকের ভেতর ধক্ করে উঠেছিল। সীতার দিকে না তাকিয়ে সে ঘাড় কাৎ করে বলল : বেচারা, এই বিশাল জনস্থানে নিতান্তই একা। অত্যন্ত অসহায়।

সীতার বুকের ভেতরটা কিছু একটা ফোটার মত ব্যথা করছিল। রামচন্দ্রর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তার ভীরু মনের দুর্বলতাকে যদি দেখে ফেলে তাই সে একটু বেশি জোরেই হেসে প্রগলভ হবার চেষ্টা করল। বলল : তাই বুঝি ?

রামচন্দ্র হাসল। শান্ত গম্ভীর মাপা হাসি। সীতার বুকের ভিতরে ব্যথা তার শীর্ণ হাসিতে ঝলকে উঠেছিল। সীতা যেন একমুহূর্ত্ত দূরের আকাশ, পাহাড়ের মত ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অন্য মানুষ হয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে একটা লজ্জা

রামচন্দ্রকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। আর, মনে হচ্ছিল, সীতা তাকে যেন অপরাধীর চোখে দেখছে। তার নীরব শান্ত দুই চোখের চাহনিতে অজস্র তিরস্কার আর ধিক্কার যেন ঝরে পড়ছে। সীতার নারীসুলভ অভিমান অসহায়তা তার বুকে ছলছলিয়ে টলটলিয়ে একটা অস্থির বেগে বইছিল। তার কষ্টের সান্ত্বনা দিতে সে নিজের কাজের একজন বড় সমালোচক হয়ে উঠল। বলল ঃ সে আমার কাছে অপরিহার্য। এই জনস্থানে তাকে আমার দরকার। তারও প্রয়োজন আমাকে। তাকে সেতু করে আমার কুল থেকে তার কুলে পৌঁছতে চেষ্টা করছি।

সীতা কেমন একটু শঙ্কিত হয়ে হাসল। বুকের ভেতরটা তার টাটাতে লাগল। চুপি চুপি স্বরে উচ্চারণ করল ঃ তোমার বিবেককে প্রয়োজনের কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চাইছ। কিন্তু আত্মা মানবে কেন? তার চেয়েও বড় কথা জীবনের চারপাশে একটা শক্ত বেড়া দিয়ে নিজেকে আগলাচ্ছ। একসঙ্গে জীবন কাটিয়ে এলাম। কিন্তু একদিনের জন্যেও তোমাকে সম্পূর্ণ করে পায়নি। একটা সংস্কারবশে তুমি আমার সঙ্গে জীবন কাটালে কিন্তু আমার সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর সবচেয়ে বড় সম্পর্ক গড়ে উঠল না, কেন? তোমারও এই আত্মবঞ্চনায় বুক টাটায়। এখন তুমিও বোধ হয় টের পাচ্ছ। নিজেকে উপবাস রেখে কোন ধর্ম হয় না। বলতে বলতে সীতার দু'চোখ ছলছল করে উঠল।

রামচন্দ্র একটুও অবাক হল না। বেশ মনোযোগ দিয়ে সীতার অভিযোগ শুনল। শান্ত দুই চোখে নিবিড় বিহ্বলতা। নির্বিকার চিত্তে বলল ঃ শূর্পনখার সঙ্গে আমার হৃদয় দেয়া নেয়ার কিছু নেই। আমার মেলামেশার বারোআনা রাজনীতি। রাবণের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করব বলে প্রেমের সোপান বেয়ে তাকে আরো কাছে টানার এক খেলা করছি। প্রেমের রামধনুর রঙে মন তার যত রাঙিয়ে উঠছে ততই আমার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রাজনীতি সার্থকতা লাভ করছে।

সীতা বলার মত কথা খুঁজে পেল না। সরল চোখের অগাধ বিস্ময় নিয়ে রামের মুখে কি যেন খুঁজল। রামচন্দ্রের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে সে দাঁড়াল। শরবিদ্ধ হরিণের মত একটা কাতরতা ফুটল তার দুই আঁখি তারায়। বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ আগুন নিয়ে খেলা ভাল নয়।

রামচন্দ্রের স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। বলল ঃ আগুন জ্বালানোর যে শক্তি বিধাতা দিয়েছে, তাকে ব্যবহার না করলে শক্তির অপচয় হয়। রাজনীতির গর্ভদেশে সব সময় উত্তাপ সঞ্চিত থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে তা চোখে পড়ে না। রাজনীতির বাইরে লড়াইটা সবাই দেখতে পায়। কিন্তু এই লড়াই ছাড়াও রাজনীতির অভ্যন্তরে সংঘাত, সংকট পাকিয়ে উঠে তা আরো ভয়ংকর। সেখানে উচ্চাশার সংঘর্ষ, লোভের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা নিয়ে ভাইতে ভাইতে রেষারেষি। বিদ্বেষবশতঃ হিংসার ছুরিতে গোপনে শান দিচ্ছে তারা। যেন তেন প্রকারে একদিন তারা অন্যের সাহায্যে রাজনৈতিক সংকট পাকিয়ে শত্রুকে জব্দ করবেই। এ হল রাজনীতির ধর্ম। রাবণের ঘর শত্রু বিভীষণ, শূর্পনখা সেই কাজই করছে। নিজেদের স্বার্থে তারা আমাকে ইন্ধন করছে। পরগাছার মত আমি তাদের শুধু অবলম্বন করে আছি।

সীতার মুখে বিমর্ষতার ছায়াপাতে ঘটল। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্নিগ্ধ ও স্মিত মুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। সে হাসি শ্লেষ ও বিদ্রুপ মাখানো। ক্ষুব্ধ গলায় বলল ঃ রাবণকে নিয়ে তোমার এ দুশ্চিন্তার অর্থ বুঝি না। কিসে তার অমঙ্গল, ধ্বংস হয় তার কথা ভাবে সর্বক্ষণ। কিন্তু তোমাকে নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। তোমার কোন ক্ষতিও সে করেনি। তোমার সঙ্গে বিবাদেও প্রবৃত্ত হয়নি। তবু তার ভাল চাওনা তুমি। তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধানোর মতলবে তুমি বনবাসে এসেছ কিনা জানিনা। কিন্তু সেই কাজেই লিপ্ত থেকেছ। বনবাসের চোদ্দটা বছর রাবণকে নির্মূল করার পরিকল্পনায় কাটল। এখন বুঝতে পারছি বনবাসের শুরুতে তোমার দক্ষিণারণ্য পরিভ্রমনের তাৎপর্য। বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে তুমি সরজমিন করেছ, রাবণের শত্রু কে? আর কে নয়? কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে তোমার রাজনৈতিক লাভালাভ হবে তার নির্ভুল অঙ্ক কষেছ মনে মনে। রাবণকে নির্বান্ধব করে, রাবণ বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন সম্পন্ন করে তুমি অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান করেছ। অনেক সময়, ধৈর্য, সংযম নিয়ে তার অগোচরে একটু একটু করে জাল পেতেছ, সে তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণও বোধ করি জানে না। অকস্মাৎ আমি তোমাকে নতুন চোখে আবিষ্কার করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পঞ্চবটীতে বসে তুমি রাবণের উপর প্রথম আঘাত হানতে চাও।

রামচন্দ্র চমকে উঠল। গভীর এক দৃষ্টিতে সীতার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থম হয়ে রইল। তারপর বিচিত্রভঙ্গী করে হেসে উঠল। পরিহাস করে বলল ঃ রাজনীতিতে তোমার মেধার পরিচয় পেয়ে অবাক হলাম। তোমাকে আমার রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা করে নেব। তোমার জানা উচিত, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। সাধুকে রক্ষা করা, এবং দুর্জনকে নির্মূল করা হল আমার জীবন ব্রত।

তাপসের বেশে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করলে লোকে তোমাকে শঠ, প্রতারক বলবে। ঋষিরাও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয়, কিন্তু ক্ষাত্রযুদ্ধে কখনও অস্ত্র ধরেন না।

সীতার জবাব শুনে রামচন্দ্র যে খুব খুশি আর নিশ্চিন্ত হল তা নয়। স্তিমিত চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

শূর্পণখার সঙ্গে রামচন্দ্রের গভীর মেলামেশাকে লক্ষ্মণ ভাল চোখে দেখল না। মনে তার যাই থাকুক এতে হৃদয়ের পবিত্রতা কলুষিত হচ্ছে। সীতার চোখে মুখেও একটা ভয়চকিত আতংকের ভাব লক্ষ্য করেছে সে। ইদানীং বৈদেহীকে খুব একা, নিঃস্ব এবং অসহায় লাগে। ভাল করে রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা পর্যন্ত হয় না। তবু তার আচরণ এত সংযত যে বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না তার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তার ভেতরটা পুড়ে পুড়ে নুয়ে পড়ছিল লক্ষ্মণ তা টের পায়। সীতার

জন্য লক্ষ্মণের ভীষণ কষ্ট হয়। ভাই-র কাণ্ড দেখে লজ্জায় এবং ক্রোধে রাঙা হয়ে উঠে। রামের ব্যবহারে সে ক্ষুব্ধ। ভাবলে শরীর দিয়ে রাগের হল্কা বেরোয়। চোখে জল আসে। পরিতাপের দহণে জর্জরিত হয় অন্তরাত্মা। নিজের মনেই ভাবে এতদিন পুণ্যের গৌরবে রাম যা অর্জন করেছিল মোহের তাড়নায় তাকে হারাতে বসল।

অথচ এই রামচন্দ্রের শপথ ছিল রাক্ষস আর অসুরের সঙ্গে কোন সমঝোতা করবে না। ভারতবর্ষের মাটি থেকে আর্য বিদ্বেষের চিহ্ন মুছে ফেলে নিজেকে ন্যায় ও ধর্মের জন্য উৎসর্গ করবে। সুন্দরী শূর্পণখা সব গণ্ডগোল করে দিল। রামচন্দ্রের মনোভাব এখন কিরকম কে বলতে পারে? স্বর্গ থেকে আহরিত পুরুষের সবকিছু শ্রেষ্ঠত্ব রামচন্দ্র রমণীর রমণীয় সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ সান্নিধ্য, আর কামনা ঝরানো হাসির কাছে কি করে উজাড় করে দিল ভাবতে খুব অবাক লাগছিল লক্ষ্মণের। শূর্পণখার রক্ত মাংসের দেহকে মূলধন করে রাবণ যে রামচন্দ্রকে বিভ্রান্ত করছে না, কে বলতে পারে?

শূর্পণখার চোখের আকর্ষণ কি মোহময় এক লহমার জন্য চোখ রেখে সে নিজেই বুঝেছিল, এ রমণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে পাপ। তার খেলার আনন্দে সে পুরুষকে আকর্ষণ করে। তাকে ভুলে থাকার মত কোন পুরুষ নেই। হৃদয় তার ঝঞ্ঝার মত প্রমত্ত বিদ্যুতের মত চমকানো বিস্ময়ে সুন্দর। তার তন্দ্রা জড়ানো দুই চোখের সুনিবিড় চাহনির যাদু এখনও ভুলতে পারেনি সে। সে কথা মনে হলে বুকের মধ্যে চিন্ চিন্ করে। সেই অদ্ভূত দুটি চোখ প্রথমে বিষণ্ণ, অবসন্ন, শ্রান্ত লাগলেও মুহূর্তে তা কামনার শিখায় জ্বল জ্বল করে উঠেছিল। এখানেই শেষ নয়। ক্ষণে ক্ষণে তার দীপ্তি বদলে যেতে চাইল সমুদ্র জলের রঙের মত। শূর্পণখার মনোভাব বুঝতে পারার জন্য প্রয়োজন তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করা। রামচন্দ্র মোহাচ্ছন্ন। সে বিচারবোধ তার লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু শূর্পণখার রূপ, সৌন্দর্য, মাধুর্য তার পুরুষ চিত্তকে যত মুগ্ধ করুক না কেন, প্রাণের মধ্যে তাকে ঘৃণা করে চলছিল। তার নিজের আচরণে অবহেলা ফুটে উঠেছিল। কারণ দেবীর মত সীতার পবিত্র প্রেম ও স্নিগ্ধ রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার স্পর্ধা তার। রাক্ষুসী রামকে প্রেমের ছলনায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নরকে। তার হাতে নির্ভর করছে রামচন্দ্রের জীবন পরিণাম। শূর্পণখার রাক্ষুসী প্রেমের ফাঁস থেকে রামকে কি করলে মুক্ত করা যায় তার নানা কথা ভাবল সে। কিন্তু কোনটাই গ্রহণযোগ্য হল না।

আর সেই রাতেই ঘটল এক অদ্ভুত, অভাবনীয় ব্যাপার। রামচন্দ্র নিজে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলল: লক্ষ্মণ, রাবণ ভগিনী শূর্পনখা সুন্দর স্বাস্থ্যবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজী পুরুষ পছন্দ করে। তোমাকে তার খুব মনে ধরেছে। তোমাকে আজ সে ভালভাবেই লক্ষ্য করেছে। আর আমাকে প্রশ্ন করেছে—তুমি কে? আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? কোথায় থাক তুমি? তার কোন খোঁজ রাখ কিনা? তুমি স্ত্রীকে সঙ্গে নাওনি কেন? তোমাকে নিয়ে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। তোমার

অবহেলা, ঘৃণা প্রত্যাখ্যান, সংযম দেখে তার হৃদয়ে ভালবাসার আগুন জ্বলে উঠেছে। সে তোমার ভেতর খুঁজেছে তার এক শ্রেষ্ঠ প্রেমিককে, মহৎ মানুষকে।

লক্ষ্মণের দু চোখে গভীর বিস্ময়। রামচন্দ্রকে এ ধরণের কথা কখনও তাকে বলেনি কোনদিন। ছোট বড় বহুকালের প্রাচীর ভেঙে রাম যেন তাকেও মুক্ত করল। অনেক কথায় তার বুক তোলপাড় করে কিন্তু সংকোচে পারে না বলতে। এখন সে ব্যবধান ঘুচল। লজ্জায় আর রাঙা হল না মুখ। খুশি খুশি মন নিয়ে শূর্পণখার কথা শুনল। শুনতে খারাপ লাগছিল না। বুকটা একটু কেমন করছিল। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোন মানে হয় না। তবু সাময়িক একটা বিভ্রান্তিতে তার চিত্ত বিগলিত হয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা কেটে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল ঃ ডানা মেলা রাজহংস কুমীরকে উপহাস করে। কিন্তু সে ঘুণাক্ষরে জানতে পারে না, জলের তলায় লুকোন তার নিশ্চিত মরণ।

রামচন্দ্র বিস্ময়ে গম্ভীর হল। লক্ষ্মণের তীক্ষ্ন দুই চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ তা বটে। ও আমাদের শত্রুপক্ষের মেয়ে। ওকে বিশ্বাস করা যায় না। যে কোন সময় একটা ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। ওকে এড়িয়ে চলাই উচিত। কিন্তু ওর একার বুকের আগুনে লঙ্কা পুড়ে ছারখার হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নিজের প্রয়োজনে সে আমাদের চায় একান্ত নিজের করে। তার এই আকাংখার ইন্ধন দেব আমরা।

লক্ষ্মণের গণগনে অভিমান ফুঁসে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপল সে। কয়েকবার ঢোক গিলল। ভীষণ লজ্জা করছিল। ক্ষণিক দ্বিধা আর জড়তা কাটিয়ে বলল ঃ তোমার বিভ্রান্তির ঘোর এখনও কাটেনি। স্বচ্ছ চোখে তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ না। তোমাকে সে যাদু করেছে। নিজের ভাল মন্দ বোধের শক্তিটুকু হারিয়ে বসেছ।

রামচন্দ্র মৃদু একটু হাসল। তারপর হাসি গোপন করতে মুখ নামিয়ে নিল। মাথা নেড়ে বলল ঃ বাস্তব বড় জটিল। মানুষের জীবন রহস্যময়। তুমি জীবনকে দেখ, কিন্তু অনুভব কর না। জেনে রাখ, মেয়েরা তখন বিশ্বস্ত, যখন ভালবাসে। আর ভালবাসায় বিশ্বাসহীন হলে হৃদয় ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। শূর্পণখার ক্ষেত্রে দুটোই সমান সত্য।

লক্ষ্মণ একটু অবাক হল। দুশ্চিন্তার গলায় বলল ঃ রাক্ষুসীর সর্বগ্রাসী প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। সুরুতে যা অতি সামান্য, শেষে তা হয়ে উঠে বিরাট। আশার এলাকা প্লাবিত করে সকল আকাংখাকে ধ্বংসের প্রলয়ে চূর্ণ করে।

রামচন্দ্র হঠাৎ একটু গম্ভীর ও ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু তার নিরীহ চোখ দেখে কার সাধ্য বলে সে ওই পরিকল্পনার জনক। শূর্পণখার প্রেম তার নিজের দিক থেকে থেকে লক্ষ্মণের অনুকূলে নিয়ে যেতেই এই চেষ্টা। রামচন্দ্র আবেগপ্রবণ নয়। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে সে তার কর্মনীতি ও আচরণ পরিবর্তন করে।

রামচন্দ্রের অধরে অনির্বচনীয় হাসি। ভারী সুন্দর দেখাল তাকে। লক্ষ্মণকে খুব স্থির চোখে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বলল ঃ লক্ষ্মণ, তোমার উপর নির্ভর করছে

মনুর বংশধর আর আর্যাবর্তের ভাগ্য। তুমি তাকে প্রেমিকা হিসাবে প্রাণে যদি না চাও, বন্ধু হিসেবে নাও। তুমি জান কিনা, জানি না, পৃথিবীর কোন রাজপুত্র কখনও স্বাধীন নয়, রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের জীবন। সেই রাজনীতির হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়। আমি তুমি সেই রাজনীতির জন্যেই আজ নির্বাসিত। নির্বাসনের শেষে মর্যাদা ও গৌরবের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে হলে রাবণ বধের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের করতে হবে। ভরতের হাত থেকে শাসনভার পেতে হলে রাবণের মত পুরুষসিংহকে জয় করা এবং ধ্বংস করা একান্ত প্রয়োজন। শূর্পণখা একাজে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। সে তার স্বামীহত্যার প্রতিশোধ চায়। রাবণের গ্রাস থেকে স্বামীর রাজ্য উদ্ধার করা আর এক সংকল্প তার। প্রজাদের ঔপনিবেশিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার আকুল আকাংখা নিয়ে সে আমার কাছে এসেছে। শূর্পণখার দাক্ষিণ্যে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণকেও আমরা পাব। তার মত ক্ষমতালোভী স্বার্থপর মানুষের সাহায্য ও পরামর্শ পেলে রাবণের মনের অভ্যন্তরে তীব্র সংঘাতের এক বীজ বপন করা সহজ হবে। ভয়ংকর স্বার্থের বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে রাবণের গোটা প্রশাসনের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিমূল নাড়া খাবে। রাবণ বিপন্ন বোধ করবে। শুধু সেইজন্যেই শূর্পণখাকে একটু প্রেমের উত্তাপ দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে সেও কৃতার্থ হবে, আমরাও লাভবান হব। সে বেচারার বীর্যবান ও রূপবান পুরুষের বন্ধুত্ব পছন্দ। এই অরণ্যভূমিতে তুমিও একান্ত নিঃসঙ্গ। তোমার মনের অবস্থাও ভাল নয়। শূর্পণখার মত রূপসী বান্ধবী পেলে তোমারও ভাল লাগবে।

চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মণ। বেশ কিছুক্ষণ থম হয়ে থাকার পর বলল ঃ রাক্ষুসীর মারাত্মক প্রভাব থেকে তবু তুমি মুক্ত হতে পারলে না।

রামচন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে প্রতিবাদ করল। বলল ঃ না লক্ষ্মণ, সে আমার পাশার ছক্কা। এই মুহূর্তে তাকে হারালে খেলাটা নষ্ট হয়ে যাবে। লক্ষ্মণ রাজনীতিতে কোন ভাবাবেগের স্থান নেই।

ভাইয়া, কার সঙ্গে তুমি ছলনা করছ? তোমার শপথ কার্যত ভঙ্গ হতে চলেছে। কারণ তুমি শূর্পণখাকে ভালবাস।

এ মিথ্যে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে প্রশ্রয় দিল না। ক্রোধ ও বিরক্তিতে সে স্থান ত্যাগ করল।

লক্ষ্মণ একটু হতাশ হল। রামচন্দ্রর স্বীকারোক্তি অবিশ্বাস করার মত জো পায় না মনে। তাকে মিথ্যেবাদী বলতে বাধে লক্ষ্মণের। কারণ সে জানে, রামচন্দ্র সর্বদাই ঠিক কথা বলে। তবে, কোন কথাই স্পষ্ট এবং সহজ করে নয় বলেই বিভ্রান্তি উদ্রেক করে।

হেমন্তের সকালে নতুন একটা আনন্দ আবিষ্কার করল লক্ষ্মণ। তার চিরপ্রিয় নদীর ধারে গিয়ে বসল। শান্ত নদী, নীল আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়—এই অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে কোমল সূর্যের আলো নদীর বুকে রুপোর পাতের মত ঝলমল

করতে লাগল। উদাস, শূন্যে দৃষ্টিতে লক্ষ্মণ গোদাবরীর বহমানতার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মুগ্ধ বিভোর লক্ষ্মণ বোবা বিস্ময়ে শান্ত সুন্দর জায়গাটির চারিদিকে চেয়ে তার মনের বিষণ্ণতার রেশটুকু খুঁজতে লাগল। নদীর মাঝে বরাবর একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আছে। কিন্তু জলের মৃদুমন্দ শব্দ, গাংচিলের ডাক নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ করছিল বারবার। লক্ষ্মণ নদীর ধারে বসে প্রকৃতির সেই বোবা ভাষা অনুভব করতে লাগল।

নদীর বুকে মিষ্টি বাতাসের হিল্লোল, জলের সঙ্গে অবিশ্রাম কথা, বৃক্ষশাখায় ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীকে প্রেম নিবেদনে মগ্ন, ঝর্ণার পথে চলার অফুরন্ত গান লক্ষ্মণের সমস্ত অনুভূতিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। শান্ত ভাবলেশহীন মনের ভেতর কিসের চাঞ্চল্য মুহূর্মুহূর্ তাকে চমৎকৃত করছিল।

লক্ষ্মণের স্থির দুই চোখে নদীর ঢেউ দেখছিল। দু' হাঁটুর উপর থুতনির ভর রেখে সকৌতুকে গোদাবরীর বহমানতার দিকে চেয়ে রইল। অকস্মাৎ নদীর জলে অস্পষ্ট এক নারীর ছায়ামূর্তি দেখে লক্ষ্মণ তার অন্যমনস্কতার মধ্যে চমকে উঠল। তার পেছন ফিরে দেখার আগেই ছায়ামূর্তি তার পাশে বসল। আগন্তুকার স্থূল স্পর্শে নদীর ঢেউয়ের মত থর থর করে কেঁপে উঠল তার বুকের ভেতর। তার পানপাতার মত মুখ চোখ দুটি বড় মাদকতাময়। একবার তাকালে আঠার মত লেগে থাকে। ফেরাতে ইচ্ছে করে না। হাসি হাসি মুখে সে তাকিয়েছিল লক্ষ্মণের দিকে। হাসলে তার দুপাশে টোল পড়ে। আর তখন মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে।

শূর্পণখাকে দেখে লক্ষ্মণ ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ তার মধ্যে কোন জ্ঞান ছিল না। তারপর কাঁপতে কাঁপতে জরাগ্রস্ত রুগীর গলায় বলল: না, না, আমি না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে শূর্পণখার ভীষণ হাসি পেল। রাগও হল। কিন্তু সে রাগ লক্ষ্মণের উপর প্রকাশ করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা একটু ভেবে নিল। তারপর খুব জোরে উচ্চহাস্য করে বলল: তুমি কেমন ধরনের পুরুষমানুষগো, মেয়েমানুষ দেখে ভয় পাও? অচেনা পুরুষ দেখলে মেয়েমানুষ বরং ভয়ে লজ্জায় একটু জড়সড় হয়। কিন্তু পুরুষমানুষের লাজলজ্জা বলে কিছু নেই। থাকবে কেন? তাদের'ত আর চরিত্র খোয়া যাবে না, গায়ে কলংকও লাগবে না।

লক্ষ্মণ বেশ বুঝতে পারছিল শূর্পণখা একটা অঘটন কিছু করে ছাড়বে। তার মাথা ঠিক নেই, নির্জন বনে, এরকম একা অচেনা পুরুষের হাত ধরে নির্ভয়ে কথা বলার পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে, রাক্ষসীর তা বিবেচনা করার সাধ্য নেই। পরক্ষণেই মনে হল, সে হয়'ত ভাল করেই জানে লক্ষ্মণ নারীমুখী নয়। সে বিপজ্জনকও নয়। তাকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। তাই এত নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে তার হাত ধরে আছে। কিন্তু লক্ষ্মণ এমন সম্মোহনে বন্দী যে, তার মুঠো থেকে

নিজের হাত মুক্ত করবে সে শক্তি যেন তার নেই। শূর্পণখা লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল। সকৌতুকে বলল ঃ তুমি বড় বোকা।

লক্ষ্মণ অসহায়ের মত মাথা নেড়ে স্বীকার করল। শূর্পণখার মুখে চোখে একটা চাপা আনন্দ ডগমগ করছিল। চোখের দৃষ্টিতে একটু চকচকে কৌতুকের ভাব। হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ নির্বোধ আর নিরীহ পুরুষগুলোকে মেয়েরা ভীষণ পছন্দ করে। কেন জান? এদের ভেড়া বানানোর খুব সুবিধা হয়।

শূর্পণখার বিদ্রূপ তাকে ছুঁচের মত বিদ্ধ করল। কিন্তু জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না লক্ষ্মণ। কথাটা শুনে তার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। বুকের ভেতরটা অপমানের জ্বালায় জ্বলতে লাগল। লক্ষ্মণ একপলক শূর্পণখার দিকে তাকিয়ে রাগে তূণে হাত দিল। তারপর আবার হাত নামিয়ে নিল। লক্ষ্মণ খুব ধীর স্বরে বলল ঃ আমি ভিন্নতর এক কাজে ব্যস্ত। অকারণ কেউ আমাকে উত্যক্ত করলে তার হাত পা কেটে টুকরো টুকরো করি। তুমিও সাবধান। পথ ছাড়।

শূর্পণখা মায়াবী চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব লক্ষ্মণকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে বলল ঃ তোমার আর দোষ কি বল? মেয়ে মানুষের সংশ্রবে না থাকলে মন সুধা স্নিগ্ধ হয় না। নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত বলে হৃদয়টা তোমার শুকিয়ে গেছে। মরুভূমির মত রুক্ষ, খটখটে, এক ফোঁটা আর্দ্র-ভাব নেই কোথাও। শুধুই দাহ, আর সুতীব্র জ্বালা। তাই এমন বেরসিক।

তুমি চুপ করবে?

পারছি কৈ প্রিয়তম। তোমার মরাগাঙ্গে প্রেমের মন্দাকিনী ধারা যে আমাকেই বহাতে হবে। নারীর প্রেম, ভালবাসা তুমি ভুলে গেছ। তাই বা বলি কেন? এসবের মর্ম তুমি কতটুকু বোঝ? ঊর্মিলা তোমার বধূ ছিল, কিন্তু কখনও তার হৃৎস্পন্দন তোমার হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মেলাতে চাওনি। কোনদিন দয়িতার অশ্রুসজল কামনার চোখ তোমার চোখে পড়েনি। কোনদিন অন্যের হৃদয় রহস্যে নিজেকে হারাতে চাওনি। জানতে চাওনি ভালবাসা কিভাবে একাকীত্ব দূর করে দেয়? আজ আমি তোমার সব বাঁধ কেটে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাব। প্রিয়তম জীবনে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে বেঁচে থাকার কি জ্বালা, আমি জানি। তাই, যতদিন বাঁচি, ততদিন নিজেকে প্রেমে ভরিয়ে রাখব। আকণ্ঠ ডুবে থাকব ভোগে। জীবনটা নিঃশেষ হওয়ার জন্যে নয়। প্রিয়তম, কাছে এস। ধর আমার হাত। বল, ভালবাসি-ভালবাসি।

কথার ভেতর শূর্পনখা খুব ধীরে ধীরে নিজের শরীরটাকে এগিয়ে আনে। দু' হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে। লক্ষ্মণের ভয় চকিত দৃষ্টির সামনে মেলে ধরে তার প্রশান্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন দুই চোখ। তার অধরে মৃদু হাসির ঝলক। শূর্পণখা তার অন্তরে সুবাসিত অলংকার ভূষিত সুন্দর তনুখানি লক্ষ্মণের তনুতে মেশাল। তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। লক্ষ্মণ সম্মোহিত, বিভ্রান্ত। কেমন একটা নেশাচ্ছন্ন ভাব তার। শূর্পণখার নিঃশ্বাসে লক্ষ্মণের চুল খেলা করছিল। নিবিড় একটা সুখের মধ্যে একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগল তারা।

শূর্পণখার চোখ বোজা। গলিত অশ্রু গাল বেয়ে নেমে আসে। কিন্তু স্বরে কান্না নেই। তার ঠোঁট উন্মুক্ত। লক্ষ্মণের মুখের উপর নেমে আসে ঠোঁট। লক্ষ্মণের শরীরে আতঙ্কের শিহরণ লাগে, অতি ভয়ংকর শঙ্কিত প্রশ্ন জাগে। এক অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হয় নিজের অবস্থাকে। শূর্পণখার চুল লক্ষ্মণের মুখে পড়লে দুরন্ত আত্মধিক্কারের সমুদ্র উথলে উঠল। ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিল। শূর্পণখার গরম লালা লাগল লক্ষ্মণের মুখে। দুরন্ত একটা ঘৃণায় শরীর পাক দিয়ে মুচড়ে উঠল। সমস্ত শক্তি সংহত করে সে অসহায়ভাবে তূণ থেকে তীর নিয়ে শূর্পণখার মুখে আঘাত করল।

আকস্মিক আঘাতের বেদনায় শূর্পণখা লক্ষ্মণের কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কণ্ঠ দিয়ে যন্ত্রণাকাতর একটা তীক্ষ্ম আর্ত্তধ্বনি বেরোল উফ্। তারপর দু'হাতে চোখ মুখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ল। আর আকুল কান্নায় ছটফট করতে লাগল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে টকটকে লাল রক্ত গড়াতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে লক্ষ্মণ যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল। বিস্ময়ে, ভয়ে, আতংকে তার দু'চোখ বিস্ফারিত হল। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ এ কি ? এত রক্ত ! এ রক্ত এল কোথা থেকে ? নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। তখনও হাতের মুঠোয় ধরা ছিল ধারাল তীক্ষ্ম তীর। এ তীর সে কখন তূণ থেকে তুলল ? কি করে তার হাতে এল—চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। বিস্ময় থেকে ভয়, ভয় থেকে আতঙ্ক তার মনকে গ্রাস করল। হতবুদ্ধির মত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বানাহত হরিণের মত ছুটতে লাগল। পড়ে রইল তার তীর, ধনু আর তূণ।

কুটীরের উঠোনে বসে রামচন্দ্র কাটারি দিয়ে কাঠ কাটছিল। আর সীতা নিকটে বসে তা দেখছিল। কাঠের দিকে নজর রেখে রামচন্দ্র বলল ঃ বৈদেহী দিন দিন তুমি কেমন বদলে যাচ্ছে। কি হয়েছে তোমার ? এত গম্ভীর কেন ? আগে'ত কখনও এমন ছিলে না ? চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখখানি থমথম করছে। কেমন একটা উদাস করা গাম্ভীর্য, তোমাকে যেন কোন সুদূর লোকের মানুষ করে তুলেছে। আজকাল কথা পর্যন্ত বল না কেন ? আমার উপর রাগ করেছ ?

সীতা দুই হাঁটুর উপর থুতনি দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বসেছিল। আর ডান হাত দিয়ে সমানে মাটির উপর হিজিবিজি দাগ কেটে চলেছিল। রাম তাকে নীরব দেখে বলল ঃ মেয়ে মানুষ বড় অভিমানী। সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে বৃহৎ করে দেখা গভীর করে অনুভব করা তাদের প্রকৃতিগত প্রবণতা। অত্যন্ত সাধারণ জিনিসকেও বড় অসাধারণ করে তোলে। তোমরা মেয়েরা ভীষণ আবেগপ্রবণ। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেয়ে আবেগ দিয়ে বিচার কর বেশি। তার ফলে, নিজেরাও কষ্ট পাও। অন্যদেরও কষ্ট দাও।

সীতা হাঁটুর উপর মাথা রেখে বলল ঃ সমাজ মেয়েদের কি দিয়েছে ? পুরুষের অনুগ্রহ, অনুকম্পা নিয়ে তাদের জীবন। এটুকু পাওয়াও পুরুষের দয়ার উপর নির্ভর করে। তার দাবি, অধিকার বলে কিছু নেই। পুরুষের মর্জির উপর থাকতে হয় তাদের। পুরুষের অবিচার, অনাচারের বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না। কার কাছে নালিশ করব, আর কে-বা শুনবে ? তাই নিজের এই ঘেন্নায় মেয়েজন্মের উপর তার অসহায় অভিমান।

সহানুভূতিতে রামচন্দ্রের মন আর্দ্র হল। সীতার পাশে গিয়ে সে বসল। মুখ তার সীতার মাথার খুব কাছে নেমে এল। তার চুলের উপর হাত রাখল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধাল ঃ বৈদেহী, তোমার অভিমান কার উপর ?

স্বামী সব মেয়ের মত আমারও মনে হারানোর ভয় আছে। ভয় থেকে আতঙ্ক জন্মে। তুমি আমার সেই আতংক।

আতঙ্ক বলছ কেন ? তুমি'ত ভাল করেই জান রাক্ষস আমার শত্রু। রাক্ষসের সঙ্গে কোন হৃদয়ের সম্পর্ক গড়তে আসিনি অরণ্যে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্রও চিন্তা করি না। শূর্পণখার সঙ্গে আমার মেলামেশা কখনও অনুরাগের নয়, স্বার্থের। গোটা ব্যাপারটাই একটা বিরাট অভিনয়। আমার এই সোনার প্রতিমা ফেলে তাকে ভালবাসতে যাব কোন দুঃখে ?

আমার সঙ্গে যে সে অভিনয় করছ না—কে বলতে পারে ?

সীতা ! চমকানো বিস্ময়ে বলল রাম।

স্বামী সত্য মিথ্যা তুমি জান। ধর্ম সাক্ষী থাক, প্রতারণা কর না।

বৈদেহী, তোমাকে কখনও মিছে কথা বলতে পারি ?

জোরে শ্বাস পড়ল সীতার। মুখ তুলল। রামের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল, তেজী ঘোড়ার মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে লক্ষ্মণ। তাকে এভাবে আসতে দেখে সীতা উদ্বিগ্ন হল। তার দিকে অপলক তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল ঃ স্বামী দেবরের কি হয়েছে ? ছুটছে কেন ? তার তীর, ধনু, তূণ কোথায় ?

রাম ও সীতা অবাক হয়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে তার কাছে দাঁড়াল। লক্ষ্মণ দুই চোখ বিস্ফারিত করে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। শরীর কাঁপছিল।

রাম স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতি ও জটিল অনুক্ত প্রশ্ন পাক খেতে লাগল। সীতার মুখে উদ্বেগ ফুটল। লক্ষ্মণের মুখ চোখ ভাল করে নিরীক্ষণ করে বলল ঃ তোমার মুখ শুকনো, শরীর কাঁপছে, কি ব্যাপার ? তুমি'ত ভয় জান না দেবর ? তোমার অস্ত্র হরণ করল কে ?

লক্ষ্মণ কথা বলতে পারল না। মুখখানা নিমেষে কালো হয়ে গেল। অসহায় দৃষ্টিতে রামের মুখ পানে চাইল। এবার রাম তার কাছে গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল ঃ লক্ষ্মণ কি হয়েছে ভাই ? তোমাকে এমন বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত হতে দেখিনি কখনও ? কোন বনচর তোমায় একা পেয়ে কি লাঞ্ছিত করেছে ?

লক্ষ্মণ বার কয়েক ঢোক গিলে উচ্চারণ করল ঃ শূর্পণখার।

সবিস্ময়ে রাম প্রশ্ন করল ঃ শূর্পণখা ! কি করেছে তোমার ?

দ্বিধায় লজ্জায় লক্ষ্মণের কণ্ঠস্বর নির্গত হল না। রামচন্দ্রের বারংবার ব্যাকুল জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলল ঃ ভাইয়া, সব কথা বলতে পারব না। তার অশালীন আচরণ থেকে ছাড়া পেতে গিয়ে নিজের অজান্তে তীক্ষ্ন ধারাল তীরের ফলায় তার নাসিকা কেটে ফেলেছি। বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছা করে করিনি। নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। রাক্ষসীর বিকট চিৎকার আর তর্জন গর্জনে আমার ঘোর কেটে গেল। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম। তখন শুধু তোমাকেই আমার একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয় মনে হল। গভীর ব্যথায় থম থম করতে লাগল লক্ষ্মণের মুখ।

রাম নিরুত্তর। লক্ষ্মণ অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। দুঃখের সঙ্গে বলল ঃ আমি বোধ হয় একটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুললাম।

রাম তৎক্ষণাৎ উত্তর করল। বলল ঃ মোটেই নয়। তুমি বরং আমাকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করলে যেদিকটা আমি এতকাল অস্বীকার করেছি।

ভাইয়া ! অপরাধীর মত সংকুচিত স্বরে উচ্চারণ করল লক্ষ্মণ।

অপলক স্থির চোখে লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র চিন্তিত স্বরে বলল ঃ লক্ষ্মণ তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। যুদ্ধ এখন অনিবার্য। এখন মনস্তাপের সময় নয় ভাই। প্রতিপক্ষকে এমনভাবে আঘাত করার কথা ভাব যাতে সে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

স্নিগ্ধ হয়ে উঠল লক্ষ্মণের চোখের দৃষ্টি। শঙ্কিতস্বরে প্রশ্ন করল ঃ কিন্তু—

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন কিন্তু নয়। যুদ্ধ করার শক্তি সামর্থ্য আমাদের আছে কি নেই তা নিয়ে কোন ভাববার সময় নেই। সময় অনুকুল কি প্রতিকূল তা জানার দরকার নেই। শূর্পণখার লাঞ্ছনার শোধ নিতে খর দূষণ কোন ত্রুটি করবে না। তাদের পৌঁছানোর আগে তুমি কালক্ষয় না করে যুদ্ধের জন্য সংকেত পাঠাও বন্ধু অনার্য রাজ্যগুলির কাছে। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে এটুকু জেনে রাখ আমাদের ভবিষ্যৎ এই যুদ্ধের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

রাম আর দাঁড়ালো না সেখানে। লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। কোথাও না থেমে দৌড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কুটীর থেকে অনেক উঁচুতে পৌঁছিয়ে লুকোন অস্ত্রগুলো একে একে বার করল। অগস্ত্য প্রদত্ত স্বয়ংক্রিয় বিজয় ধনুর যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম অনেকখানি জায়গা জুড়ে রইল।

দানব সেনাপতি ত্রিশিরা কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ লক্ষ্মণকে বন্দী করতে এসে আর ফিরল না। তখন পাঁচ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে খর তৃতীয় দিবসে পঞ্চবটী রওনা হল। গোদাবরীর তীর ধরে খরের চতুরঙ্গ বাহিনী অগ্রসর হতে লাগল।

পঞ্চবটীর কাছাকাছি এসে খর রামচন্দ্রের প্রতিরোধের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। নজরদার বাহিনী উঁচু গাছে উঠে কোথায় কিভাবে রামচন্দ্র সৈন্য স্থাপন করেছে তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। দু'একজন সাধারণ মানুষকে পাহাড়ের এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কিন্তু তারা কে, কিজন্য সেখানে দাঁড়িয়ে তা বুঝতে পারল না। তাই খর পঞ্চবটীতে প্রবেশ নিরাপদ বোধ করল না।

আক্রমণ শুরুর আগে শত্রুর গতিবিধি ভাল করে বুঝে নেয়ার জন্যে সেখানে ছাউনী করা স্থির করল। পঞ্চবটী ফাঁকা। রামচন্দ্রও হয়ত পঞ্চবটী ছেড়ে কোথাও আত্মগোপন করেছে। কিন্তু ত্রিশিরা কোথায়? তাকে নিয়েই ভাবনা। কারণ তার ও দূষণের সঙ্গে ত্রিশিরার সম্ভাব নেই। পঞ্চবটীর গোলক ধাঁধায় তাকে বিপাকে ফেলার সম্ভাবনা খর উড়িয়ে দিল না। রামচন্দ্রের সঙ্গে তার আঁতাত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। ক্ষমতার জন্যে সে সব করতে পারে। তাই পলায়নের রাস্তা খোলা রেখেই সৈন্য শিবির নির্মাণের নির্দেশ দিল। সাংকেতিক শিঙাধ্বনি করে প্রত্যেক সৈন্যকে তা জানিয়ে দিল।

কিন্তু শিঙা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অন্ধকার করে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ হতে লাগল তাদের উপর। তীরের পেছনে অগণন তীর। কিছু বোঝার আগেই সৈন্যবাহিনীর একটা বিরাট অংশ তীর বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। চারদিকে পৈশাচিক চিৎকার, শোরগোল পড়ে গেল। দিশেহারা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে শুরু করল চারিদিকে। কিন্তু তীরগুলো তাদের পিছন পিছন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে যেন তাড়া করল। খর দিশেহারা হয়ে পড়ল। যে দিক থেকে তীর নিক্ষেপ হচ্ছিল আক্রমণ এড়াতে সেই দিকেই ছুটে গেল। সুশিক্ষিত পাহাড়ী অশ্বের পিঠে চড়ে সে পালাতে লাগল। সমস্ত শরীর তার ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

হঠৎ কাঁধের ডানদিকে একটা তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করল। পোষাক ভিজে গেল রক্তে। তবু খরের ভ্রূক্ষেপ নেই। মরিয়া হয়ে সে তখন আত্মরক্ষার জন্যে ছুটছে। হঠাৎ সামনে পড়ল শত্রুব্যূহ। চোখ তুলে দেখল ব্যূহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে রামচন্দ্র। তৎক্ষনাৎ সে দিশাহারা হয়ে অন্যদিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। ঘোড়ার গতি পরিবর্ত্তনের সময় লক্ষ্য করল একটা তীর উদ্যত হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে। সে তাড়াতাড়ি করে ঘোড়ার একদিকে হেলতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল ঘোড়ার নীচে। খরকে লক্ষ্য করে রাম তার বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা বক্ষস্থল বিদ্ধ করল।

শূর্পনখার প্রাসাদে খবর পৌছল: ত্রিশিরা, খর এবং তাদের সৈন্যবাহিনী রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। খরের মৃত্যু দূষণের মন আচ্ছন্ন করে রাখে ভয় মেশানো ভাবনায়। এক এক সময় নিজেকে বোঝাত, এসব অকারণ মিথ্যে ভাবনা। কে এই রামচন্দ্র যে তাকে ভয় করতে হবে? সে রাবণ ভ্রাতা। রাক্ষস বংশের রক্ত তার ধমনীতে। ভয় কাকে বলে, রাক্ষসরা জানে না। মৃত্যুকে তারা তুচ্ছ করে। যুদ্ধে জয় পরাজয়, পতন, মৃত্যু আছে জেনেও কোন বীর যুদ্ধে মরতে ভয় পায়? তবু আবার কিছুক্ষণ পরে মনে ভয় ধরে যায়। মনে পড়তো

রামচন্দ্র একা। একটা ধনুকে এতবড় বিশাল বাহিনী কেমন করে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করল? দূষণের মনে সন্দেহ হয়। সবটাই গল্প আর আজগুবি লাগে। রামচন্দ্রের মুখোমুখি হয়ে সে নিজেই একবার পরখ করতে চায় রাম কতবড় বীর? আর কত শক্তি সে ধরে? মন থেকে সব আশঙ্কা, ভয়, দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল। যুদ্ধের জন্য মন উৎফুল্ল হল।

সূর্যোদয়ের দুই দণ্ডের মধ্যে দূষণ কয়েক হাজার সৈন্যর এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হল। নিঃশব্দে ফৌজ এগোতে লাগল। ধুলো উড়ছে চারদিকে, কারো মুখে কোন কথা নেই। সবারই মুখে দৃঢ়তার ভাব, সবারই দৃষ্টি শান্ত।

পঞ্চবটীর কাছাকাছি এসে দূষণ সৈন্য ব্যূহবন্ধ করে চতুর্দিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করল। দূষণ নিজে গ্রহণ করেছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পাহাড়ের সুউচ্চ ত্রিশূল চূড়া থেকে রামচন্দ্রের আক্রমণ করছিল। তার সম্মুখ ভাগের আঘাতকে অব্যাহত রাখার সুযোগ দিয়ে সে ডান, বাম ও পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করল। সম্মুখভাগের কিছু সৈন্যকে তীরের নিশানায় বাইরে দাঁড় করাল, এদের কাজ হল অগ্রবর্তী বাহিনীকে পর্বতের পাদদেশের দিকে এগোনোর সুযোগ করে দেয়া। রামচন্দ্র যখন অগ্রবর্তী বাহিনী রুখতে ব্যস্ত থাকবে ইত্যবসরে তারা ডান বাম ও পিছন দিক থেকে আক্রমণকে তীব্র করে তুলবে। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে রামচন্দ্রকে অসহায় করে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে মধ্যাহ্নে যুদ্ধের সূচনা করল।

অবিরাম যুদ্ধ চলল সারাদিন ধরে। কিন্তু রামচন্দ্রের দিক থেকে চক্রাকারে যে ভাবে তীর বর্ষণ হতে লাগল তাতে যুদ্ধ চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়ল। রামচন্দ্রকে জয়ের আশা ত্যাগ করল দূষণ। চারিদিক ছড়িয়ে আছে মানুষের এবং ঘোড়ার মৃতদেহ। আর আহত সৈনিকেরা যন্ত্রণায় তৃষ্ণায় আর্তনাদ করছে দুঃসহ কষ্টে। রক্তে ধুলোয় মিশে গিয়ে গোটা জায়গাটা কাদা হয়ে গেছে। বেশীক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

দিনের শেষ হয়ে এসেছে। যুদ্ধের ফলাফলও নিশ্চিত হয়ে গেছে। সৈন্যেরা হেরে গিয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। দূষণের সারা শরীর তীরে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। শরীরের উত্থানশক্তি গেছে। নিজের হাতে তীর ছুঁড়বে সে শক্তিও আর নেই। তূনও খালি। যন্ত্রণায় সারা অঙ্গ টাটাচ্ছে। রক্ত ঝরছে। চোখের কোণে জল টসটস করছে। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে জিহ্বা যেন ক্রমাগত ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। চাহনিতে নেমেছে মরণের ছায়া। এখনও জ্ঞান লুপ্ত হয়নি দূষণের। মনে মনে সে চিন্তা করে, জীবন পণ করে সে রুখেছে রামচন্দ্রকে। প্রাণ নিয়ে খরের মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করেনি। বীরের শ্রেষ্ঠ শয্যা রণক্ষেত্র। সেখানেই সে শান্তিতে মরেছে। এর চেয়ে গৌরব আর কি আছে?

॥ পনের ॥

শূর্পণখার নিজের উপর ধিক্কার জন্মাল। ঘৃণা হল। প্রচণ্ড রাগও হল। অনুতাপে অনুশোচনায় জ্বলতে লাগল বুকের ভেতর। রামের ভালবাসার নেশায় এক জঘন্য পাপ করেছে সে। জনস্থানের সর্বনাশ করেছে, রাবণের ভয়ংকর ক্ষতি করেছে, শেষ করেছে নিজেকেও। তার এ অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। মৃত্যুই একমাত্র তার শাস্তি। কিন্তু মৃত্যু মানে'ত জীবনের সমাপ্তি। জীবন ফুরলে 'ত কিছু করার থাকে না। বেঁচে থাকলে অন্ততঃ সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে। নাবালক পুত্র শম্ভুর কথা মনে হল। আর যার নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতায় জনস্থানের এই সর্বনাশ হল তার কাজের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তার মরেও সুখ নেই। রামচন্দ্র জীবিত থাকা অবধি শেষ হবে না অনুতাপের যন্ত্রণা। বেঁচে থাকলে অন্ততঃ রামের উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে। খর ও দূষণকে উত্তেজিত করে যুদ্ধে পাঠানোর শোক ভুলতে পারবে। তাই, সব অভিমান ত্যাগ করে সে রাবণের সামনে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভার ভার গলায় শূর্পণখা বলল: তোমার ভাল করতে গিয়ে দুশমন লক্ষ্মণ আমার কি দশা করেছে দ্যাখ।

শূর্পণখার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রাবণ নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল: ভগিনী তোমার উন্নত নাসিকা এমন ক্ষত করল কি করে?

শূর্পণখা জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। রাবণের প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সে? সব কথা'ত আর খুলে বলা যায় না। বলা সম্ভবও নয়। তাই, শূর্পণখা একটু দ্বিধায় পড়ল। কেমন করে কথা বললে সব কুল রক্ষা পায় তার কথা ভেবে আকুল হল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস শূর্পণখার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে গোপনে মিলিয়ে গেল। নিদারুণ একটা গ্লানিতে আচ্ছন্ন তার মন। মনে হল, তার রূপ যৌবনের অপমান, নারীত্বের অপমান করেছে লক্ষ্মণ। এর প্রতিশোধ নেবার শেষ চেষ্টা করতেই যেন যন্ত্রণায় দপ করে জ্বলে উঠল। ক্লান্ত আর হতাশ গলায় বলল: জনস্থানের পঞ্চবটীতে রাম-লক্ষ্মণের কুটীর নির্মাণকে আমি ভাল চোখে দেখিনি। তাদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ন নজর রেখেও তাদের মনের অভিপ্রায় কিংবা গোপন কার্যকলাপের কিছুই আঁচ করতে পারিনি। কিন্তু সে রাক্ষসের শত্রু। তাদের ক্ষতি করতেই এই বনে এসেছে। তার বৈরীতার উৎস কোথায়? রাক্ষস নরোত্তম মহান রাবণের সঙ্গে তার কোন বিরোধ, বিদ্বেষ নেই, তবু কার প্ররোচনায় কিসের স্বার্থে সে একটি পরিকল্পিত উপায়ে তাকে শত্রু করে তুলেছে? সমগ্র দক্ষিণারণ্যে রাক্ষস ছাড়া আর সকলে তার বন্ধু। তার পক্ষপাতিত্ব বুঝতেই

খর ও দূষণ,— এই পর্যন্ত বলে শূর্পণখা একটু ঢোক গিলল। মৃত দুই ভ্রাতার নাম এতবড় একটা মিথ্যা উচ্চারণ করতে গিয়ে সে ক্ষণেকের জন্য দ্বিধায় পড়ল। পরক্ষণেই মনে হল, কথাটার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোন সুযোগ রাবণ কোনদিন পাবে না। অথচ, এই কথাগুলো তাকে রাবণের চোখে নিষ্পাপ করে রাখবে, সে তার প্রিয়. হয়ে উঠবে। তাই রমণীসুলভ লাজে একটু বিব্রত হওয়ার ভান করে, মাথা নীচু করল। ধীরে ধীরে বলল ঃ মানে, খর ও দূষণ আমাকে রামের কাছে পাঠাল। রূপের চটকে তাকে বিভ্রান্ত করে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের কাজে আমাকে প্ররোচিত করল। তারা আমাকে বোঝাল, মহান সম্রাট এবং দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য যদি এই পার্থিব শরীরটা কাজে লাগে তাহলে সে হবে শ্রেষ্ঠ দেশসেবা। আমিও জানি, রমণীয় বুদ্ধি আর যশ, সৌন্দর্য কি এক চমৎকার বস্তু, যা যে কোন রাজাকে সংযমীকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে সক্ষম, আর সক্ষম ন্যায় ও নীতির পথ ত্যাগ করতে। একটু একটু করে আমি জয়ী হতে লাগলাম। রামচন্দ্র আমার অনুরাগী বান্ধব হয়ে উঠল। জানতে পারলাম, সীতার উপর রামের হৃদয়ে দুর্বলতা কী ভীষণ! জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনি সীতা ছাড়া রামচন্দ্র অচল।

শূর্পণখা হঠাৎ থামল। তার তীব্র আবেগে তার চোখ দুটো বুজে এল। আর তার বুকের ভেতর রামের মধু নিসৃত কণ্ঠস্বর মন্ত্রের মত নিঃশব্দে গুঞ্জরিত হতে লাগল। সুন্দরী, রমণীর প্রেমে আমার বিরাট জীবন স্রোতের অংশ। স্রোত যেমন বাধা থাকে না, ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেমন এগিয়ে চলে তেমনি আমার রক্তধারা অনন্ত প্রবাহে এক থেকে বহুমুখী।

রামের বাক্যে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল শূর্পণখা। তার কালো বড় বড় দুটো চোখে তীব্র কৌতূহল। জোনাকির মত মিট মিট করছিল সেইসময়। আশ্চর্য একটা কমনীয়তা ফুটে উঠেছিল তার মুখে। বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল ঃ কিভাবে জানব, তুমি আমাকে ভালবাস? সীতা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাকেই তোমার ভালবাসা স্বাভাবিক।

না, সীতাকে নয়, তোমাকেই আমি ভালবাসি শূর্পণখা। শুধু তোমাকেই।

সত্যি বলছ? আমাকে সত্যি ভালবাসতে পার তুমি? পার একনিষ্ঠ হতে? আমার শক্তি ক্ষমতার জন্য নয়, অথবা আমার সৌভাগ্যের তারকার জন্যেও নয়; শুধু আমার জন্যে।

পারি, সুন্দরী।

আঃ, তা যদি পার এই মুহূর্তে তোমাকে আমার হৃদয়ের অধিশ্বর করে শুধু বসাবো না, আমি তোমাকে সমগ্র দুনিয়ার সম্রাট করে দেব। রাবণের রাজমুকুট পরিচয়ে দেব তোমার শিরে।

তোমার বাণী আমার কানে মধুবর্ষণ করছে। এ বাণী আমার আরও প্রিয়তর হয়ে উঠবে তোমার একান্ত সাহচর্যে।

মনে হচ্ছে স্বর্গের আশীর্বাদ নেমেছে মর্তে। প্রিয়তম তুমি জান না, কি শূন্য-

গর্ভ একাকীত্বে ভরা আমার জীবন। তোমার প্রেমে যেন আজ আমার সকল শূন্যতা দূর হল। আঃ, আমাকে তোমার দু বাহুর মাঝখানে একটু টেনে নাও। আমরা ভালবাসার শপথ নেব, যে শপথ সারা জীবনেও ভঙ্গ হবে না। রামচন্দ্র আমি শুধু তোমার। চিরদিনের জন্যে তোমার দাসী।

কথাগুলো মনে হতে একটা অদ্ভুত তিক্ততায় ভরে উঠল শূর্পণখার অন্তর। আশ্চর্য লাগল রামচন্দ্র কেমন করে তার শপথ বিস্মৃত হল? আর নির্বোধের মত তাকে ভালবেসে, বিশ্বাস করে সে রাবণের কত ক্ষতিই না করেছে। কি করলে রাবণ ফাঁদে পড়ে তার সব কটি পথই রামের কাছে ফাঁস করে বসেছে। তার নিজের এই বিশ্বাসঘাতকতার কোন তুলনা হয় না। একদিন ইতিহাস তার নিজের নিয়মে এই ভুলের শোধ নেবে। শূর্পণখা আর চিন্তা করতে পারে না। তীব্র যন্ত্রণার আঘাতে তার হৃদয় মথিত হয়ে নেমে এল অশ্রু।

রাবণ শূর্পণখাকে কাঁদতে দেখে বিচলিত হল। বলল ঃ কেঁদো না ভগিনী।

রাবণের সহানুভূতি পেয়ে শূর্পণখার কান্না আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে ফুঁপিয়ে উঠল। রাবণ সিংহাসন থেকে নেমে এসে ভগিনীর পাশে দাঁড়াল। শূর্পণখা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল ঃ তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না। আমার একবার যদি অনুমতি নিতে, তাহলে তোমার এমন অবস্থায় পড়তে হত না।

দাদা! শূর্পণখা চমকান বিস্ময়ে ডাকল। তারপর নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করে বলল ঃ জীবন ছাড়া'ত আমি সব হারিয়েছি। আমার আর কি আছে বল? বিশ্বাস করে স্বামী যা রেখে গেল তাও রক্ষে করতে পারলাম না।

ভগিনী, হতাশ হয়ো না। দুঃখেরও কিছু নেই। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আশা থাকে। আবার ততক্ষণ থাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ।

শূর্পণখা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ক্লান্ত স্বরে উচ্চারণ করল ঃ হ্যাঁ, প্রতিশোধ। কিন্তু কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তীরের মত বিদ্ধ করল তাকে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল ঃ হ্যাঁ, বহু দুঃখের মূল্যে কথাটার অর্থ জেনেছি। তাই প্রতিশোধ নেবার কোন বাসনা আমার নেই। তোমার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ আমার জন্য কর না। তুমি নিঃসন্দেহ বড় যোদ্ধা এবং বীর। কিন্তু রামচন্দ্র যেন দেববলে বলীয়ান। কি দারুণ তার অস্ত্রবল। চোখে দেখলেও প্রত্যয় যায় না। খর দূষণের মৃত্যু থেকে বুঝেছি সে এক অসাধারণ আশ্চর্য যোদ্ধা। আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে যে একা যুদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে না যাওয়াই ভাল। ও তোমার আমার নিয়তি। রাহুর মত বিরাট মুখ ব্যাদান করে গ্রাস করতে আসছে আমাদের। ওকে এড়িয়ে চল।

রাবণের অধরে কৌতুক হাসি। মৃদু মাথা নেড়ে বলল ঃ ভগিনী, অনেককাল ধরে তাকে এড়িয়ে চলেছি। আর বোধহয় সম্ভব হবে না। এবার সে সরাসরি আমার মর্যাদাকে আঘাত করল। তোমাকে লাঞ্ছিত করে কার্যতঃ সে আমাকেই অপমান করল।

আমার শক্তিকে ব্যঙ্গ করল। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে করল পরিহাস। তার প্রতি আমার সীমাহীন ঔদাসীন্যের ঘুম ভাঙাতেই সে এত নির্দয় নিষ্ঠুর হল তোমার প্রতি। তোমার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে সে শুধু রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের নয়া ইতিহাস রচনা করল না, দাক্ষিণাত্যের মাটির উপর তার অধিকার ও প্রভুত্বের থাবা গেড়ে বসল। আমার বুকের মধ্যে ভীরু আতংকের বীজ বপন করতে তোমাকেই সে টোপ হিসাবে ব্যবহার করল। আমার প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধ কৌশল মাপার এ এক আশ্চর্য চাল তার। এগোতেও যেমন পারছি না, তেমনি পিছু হটতেও পারি না। আমার উভয় সংকট।

শূর্পণখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কৃতকর্মের অনুশোচনায় দু' চোখের পাতা ব্যথায় সুনিবিড় হয়ে উঠল। রাবণ অস্থিরভাবে দ্রুত পদক্ষেপে পদচারণা করছিল। তার মুখে এক দুঃসহ নিরুপায় অসহায়তার যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

ক্ষণকাল নীরবতার পরে অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতর মগ্ন হয়ে শূর্পণখা ডাকল : দাদা। এরকম ক্ষেত্রে স্নায়ু সংকট সৃষ্টি করে শত্রুকে নতুন সংকটে ফেলা যায়। রামের মনের অভ্যন্তরে সংঘাতের বীজ রোপন করতে তুমি সীতাকে অপহরণ কর।

রাবণ সহসা চমকে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেল। চমকানো উল্লাসে ডাকল : শূর্পণখা।

দাদা! সীতার জন্যে রাম এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস পেয়েছে। তাকে রামের জীবন থেকে যে কোন উপায়ে সরিয়ে দিলে তার জীবন নানা দুর্ভাগ্যে বিষময় হয়ে উঠবে। সীতার দুঃসহ বিরহে রামের মন ভেঙে যাবে। দুঃখে, আত্মগ্লানিতে হয়ত আত্মহত্যা করবে।

রাবণ কোন কথা বলল না। প্রস্তর নির্মিত শয়ন কক্ষের দেয়ালগাত্রে শ্বেতশুভ্র হস্তীদন্তের উপর স্বর্ণসূত্রে মণ্ডিত অপরূপ কারুশয্যার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেমন তপস্বীর মত আত্মসমাহিত মুখ। ক্ষণকাল পর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর মগ্ন হয়ে বলল : চমৎকার সমাধান। তোমার দূরদর্শিতা এবং তীক্ষ্ন বুদ্ধি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি আমাকে একটা বিরাট দুর্ভাবনা থেকে উদ্ধার করলে।

প্রত্যূষে সীতা ধড়ফড় করে উঠে বসল শয্যায়। আতঙ্কিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রামের দিকে। অবোধ দৃষ্টি।

রাম অকাতরে ঘুমোচ্ছিল।

সীতা খুব চিন্তিতভাবে দু'হাত জড়ো করে তাতে থুতনী রেখে কিছুক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে রইল রামের মুখের দিকে। তারপর গায়ের উপর আস্তে আস্তে তার হাত-

খানা রাখল। রাম চমকে চোখ মেলল। অবাক চোখে দেখল সীতার দুই চোখের কোণে জল টলটল করছে। মুখে বিষণ্ণ বেদনা থমথম করছে। তবু হাসি হাসি মুখে রাম মৃদু স্বরে বলল ঃ সকালে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু দিন যাবে ভাল।

সীতা কথা বলল না। নড়ল না। যেমন বসেছিল সেইভাবে রইল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছল। তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। রাম আশ্চর্য হল। সীতার পিছু পিছু সেও বাইরে এল।

আঙিনায় পিপুল গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে বসল। তার ভুরু কুঞ্চিত শীর্ণ শান্ত মুখে যথাযথ উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য। জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামের বুকের ভেতরটা কেমন অকারণে হু হু করে উঠল। একটা বড় শ্বাস পড়ল। রামের ভয়টা যেন বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। বলল ঃ তোমার কি হয়েছে বৈদেহী? তুমি অসুস্থ কি?

সীতা কথা বলতে পারল না। আবেগে চোখের দুর্বল পাতা অতিকষ্টে তুলে ধরল রামের দু'চোখের উপর। গলাটা তার বড্ড শুকনো লাগল। উদাস গলায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ প্রত্যুষে ঘুম ভাঙার ঠিক আগে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। আচ্ছা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়? সীতার মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

রাম কেমন একটা অভিভুত আচ্ছন্নতায় বলল ঃ স্বপ্ন! কি স্বপ্ন দেখেছ?

স্বপ্নের স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ সে এক অদ্ভুত আর বিচিত্র স্বপ্ন। ভাবলে, আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

স্বপ্নে কি দেখলে, বল।

স্বপ্নে দেখলাম, সুন্দর একটা উদ্যান। সেখানে অদ্ভুত আর বিকট দর্শনের সব মানুষ আমাকে ঘিরে রয়েছে। আমার হাত পা শৃংখলাবদ্ধ। লঙ্কেশ্বর রাবণ সেখানে আসতে অন্যেরা সব অদৃশ্য হয়ে গেল। রাবণ আমার দিকে তাকিয়ে হা-হা করে অট্টহাস্য করতে লাগল। তার খিল ধরা হাসির শব্দে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। ভীষণ ভয় করছিল। রাবণ খেলার ছলেই আমার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল। চুলের মুঠি ধরে মাটির উপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। আমি খুব চিৎকার করে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল।

রাম কোন কথা বলল না। কেমন পাংশু হয়ে গেল তার মুখাবয়ব।

রামের নির্বিকার, নিরুত্তাপ মুখাবয়ব দেখে সীতা ব্যাকুলস্বরে প্রশ্ন করল ঃ স্বামী, তুমি নীরব কেন? বল, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়?

রাম কেমন আচ্ছন্নের মত সীতার কাছে ঘন হয়ে বসল। নিস্প্রাণ প্রস্তর মূর্তির মত অপলক স্থির দৃষ্টিতে সীতার দিকে তাকিয়ে রইল।

রামচন্দ্রের মনে সীতা হরণের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে তা প্রবল হ'ল। খর ও দূষণের মৃত্যুর পর অনেকদিন হয়ে গেল। তবু রাবণের দিক থেকে কোন সাড়া ছিল না। কিংবা তার কোন প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেল না। তার স্তব্ধতা রামের মনে ঝড়ের আশংকাকে কেবল প্রবল করছিল। কিন্তু তার আকৃতি প্রকৃতি কি হতে পারে

বা হওয়া সম্ভব রাম আঁচ করতে পারছিল না। তবে সীতার উপর যে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ হতে পারে এরকম একটা ধারণা তার মনে উঁকি দিচ্ছিল। সীতার স্বপ্ন বৃত্তান্ত অকস্মাৎ তাকে বাস্তব সচেতন করে তুলল। নিজের আবেগকে সংযত করে আস্তে আস্তে অস্পষ্ট গলায় বলল ঃ প্রত্যূষের এই স্বপ্ন তোমার নিজের মনের ভয়, আতংক দুর্ভাবনার প্রতিক্রিয়া। ও কিছু নয়।

রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে সীতা ভীত স্বরে বলল ঃ স্বামী তোমার কণ্ঠস্বর কাঁপল কেন? তুমি আমাকে সত্যগোপন করছ। তোমার নিজের ভয় শঙ্কা কিন্তু তোমার চোখের চাহনিতে থমথম করছে।

রামচন্দ্রের অধর স্নিগ্ধ হাসিতে রঞ্জিত হল। এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সীতার দিকে। তারপর গম্ভীর ভরা গলায় বলল ঃ মানুষের মন অনেক সময় দূরে ভবিষ্যতের কোন বিপদ আঁচ করতে পারে। এই স্বপ্ন তেমনি ভয়ানক কোন আসন্ন দুর্ঘটনায় অশুভ সংকেত হতে পারে।

সীতার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হল। বুকে হৃৎস্পন্দনের শব্দ দ্রুত হল। ভয়চকিত আর্তস্বরে প্রশ্ন করল ঃ তা হলে?

কি জবাব দেবে রামচন্দ্র? এ প্রশ্ন তার নিজেরও। অনেকদিন ধরে ভেবেছে সীতাকে পঞ্চবটীতে রাখা আর নিরাপদ নয়। তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে তাকে সরিয়ে দিলে তার নিজের মর্যাদাহানি হবে। রাবণের গৌরব বৃদ্ধি পাবে। সে যে রাবণের শক্তিকে ভয় করে, ভয় পায় এই সত্যই লোকে জানবে। একজন বীর যোদ্ধার কাছে পলায়নের মত লজ্জা অগৌরব ছাড়া আর কিছু নেই। সীতা তার রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাসের জীবনে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা। রাবণ ভগিনীর লাঞ্ছনার শোধ সীতাকে নিগ্রহ করেই নেবে। কেননা এই মুহূর্তে কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সে যাবে না। কারণ যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়। কিন্তু সে এক জন রাজ্যচ্যুত বনবাসী। যাযাবরের মত বনে বনে বেড়ায়। সুতরাং রাবণ কখনও তার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে না। যুদ্ধ হওয়া মানে তাকে রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরব ও মর্যাদা দেয়া। তাই, খর ও দূষণের মৃত্যুকে প্রতিশোধের আঘাত হানতে কোন রণভেরী বাজল না।

রাবণের নীরবতা রামের মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। প্রতি মুহূর্ত্তে নতুন নতুন বিপদের আশংকায় সে বিমর্ষ। অতর্কিত আক্রমণের শঙ্কা তাকে সর্বদা তটস্থ করে রাখে। বনভূমিতে সে আর পূর্বের মত স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে আর চলাফেরা করতে পারে না। সর্বদা একটা ভয় নিয়ে থাকতে হয়। প্রতিদিন এক যন্ত্রণাময় দুর্বলতা আর ব্যথার অনুভূতির ভেতর তার কাটে। বন্ধু রাজ্যের সশস্ত্র সৈনিকের অতন্দ্র প্রহরার ভেতর নিশ্চিন্তে আছে। তবু উৎকণ্ঠা মুক্ত হতে পারে না। অষ্টপ্রহর সীতার ভাবনায় শঙ্কিত। এতসব কথা তার মনের ভেতর উদ্ভাসিত হয়েই মিলিয়ে গেল।

সীতাকে পঞ্চবটী থেকে অপসারিত করার কথা তার মনে হয়েছিল। কিন্তু সে মনে ব্যথা পাবে ভেবেই কথাটা বলতে পারছিল না। সীতা তার বিচ্ছেদ বেদনা সইতে অক্ষম। তাই অপসারণের কথাটা বলতে তার কেবলই বিলম্ব হচ্ছিল। সীতার স্বপ্ন সেই অবাঞ্ছিত অপ্রিয় কথা বলার যেন এক অপ্রত্যাশিত পরিবেশ সৃষ্টি করল। রামচন্দ্র বার কয়েক ঢোক গিলে বিভ্রান্ত স্বরে বলল ঃ তা-হলে, এই পঞ্চবটীর কুটীরে তুমি আর থেক না। অন্য কোথাও তোমাকে রেখে আসি।

এই কথাটুকু সীতার কাছে সামান্য নয়। এ ধরণের কথা রামচন্দ্রের এই প্রথম নয়, আগেও শুনেছে। বহুবার, নানা প্রসঙ্গে। গায়ে মাখেনি। কিন্তু এইবার মাখল। বড় লজ্জা আর ঘেন্না হল নিজের উপর। রামচন্দ্র হয়ত সত্যি তাকে ভালবাসে না। কিংবা তার আকর্ষণ বোধ করে না। তাই রামচন্দ্র সবসময় অজুহাত খোঁজে কি করলে তাকে এড়ানো যায়। কথা বলার সময় সীতার ভুরু কুঁচকে গেল। ভ্রূকুটি করে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ঃ আমাকে নির্বাসনে পাঠাতে পারলেই তুমি বাঁচ। আমি'ত তোমার পথের কাঁটা। আপদ গেলে বাঁচ এমন একটা ভাব। প্রেম বলে যদি কিছু থাকত তোমার অন্তঃকরণে তা হলে এমন কথা বলতে বুক ফাটত। কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর। দরদ, ভালবাসা, মমতা কিচ্ছু নেই তোমার বুকে। মরুভুমির মত আমার জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছ।

আমি! রামচন্দ্র বিস্মিত ও ব্যথিত স্বরে উচ্চারণ করল।

তুমি নওতো আবার কে?

রামচন্দ্র বিব্রত মুখে বলল ঃ তোমার দুঃখ কষ্টের কথা ভেবেই বলি, কি করবো বল।

কী বুদ্ধি! আমায় তাড়ালে তোমার সুখ খুব বাড়বে বুঝি?

কোন সুখে তোমাকে রেখেছি?

তোমার কাছে কি আমি সুখ চেয়েছি?

রামচন্দ্র আমতা আমতা করে বলল ঃ মানে, তুমি নরকযন্ত্রণার যে স্বপ্ন দেখেছ তা সত্য হওয়ার আগে আমি অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় তোমাকে সরিয়ে ফেলতে চাই। রাক্ষসের হাতে তোমার লাঞ্ছনা দেখার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

আতঙ্কে সীতার মুখ সহসা সাদা হয়ে গেল। সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। রামের খুব ঘন হয়ে বলল ঃ স্বামী, আমার ভীষণ ভয় করছে।

রামচন্দ্র বিবর্ণ মুখে শুকনো গলায় বলল ঃ নিজেকে তুমি দুর্বল কর না।

সীতা হতাশভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল ঃ তুমি ঠিক বুঝবে না। কখনও'ত ভালোবাসনি!

রাম এবার হাসল। বড় অদ্ভুত রহস্যময় সে হাসি। বলল ঃ ভোগ করার সুখ আর ভালবাসার আনন্দ কখনও এক জিনিস নয়। একটিতে নবনব দুঃখ ভোগের যন্ত্রণা, আর অন্যটিতে অবারিত করার উল্লাস। প্রকৃত ভালবাসা কখনও আঁকড়ে ধরে না। আগলেও রাখে না। যে ভালোবাসায় ত্যাগ নেই, সে ভালবাসা কখনও মহত্তম

আত্মদানে সুন্দর হয়ে উঠে না। দিল যদি ত্যাগ করতে না পারে, লোকের ভাল করবে কি করে?

সীতা কি বলবে ভেবে পায় না। হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল। বলল ঃ আমি সামান্য সাধারণ মানুষ। বড় ভাব, বড় কথা মাথায় আসে না। তোমার অভাব বিশাল মরুর মত আমাকে দগ্ধ করবে নিরন্তর।

রাম মৃদু গলায় বলল ঃ বিচ্ছেদ বেদনায় মর্মান্তিক দুঃখ আমার অন্তঃকরণেও জ্বলবে অহরহ। তবু জানব বৈদেহী আমার নিরাপদ। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতি আমার বুকের ভেতর জোনাকির মত টিম টিম করে জ্বলবে।

রামের এই স্তুতিটুকু সীতার মনঃপুত হল না। বুকটা একটু কেমন করছিল। একটু ভেবে গম্ভীর গলায় বলল ঃ এই আপদ বিদেয় করলে তোমার রাজনৈতিক মর্যাদার কি অবস্থা হবে ভেবেছ? রাবণের কাছে তোমার মর্যাদার দীপ্তি, গৌরব কেমন করে রক্ষা পাবে? আমাকে বিদায় দেয়া মানে তোমার নৈতিক পরাজয়কে বড় করে তোলা।

না, তা হবে কেন? রাবণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার এক নকল সীতার দরকার। পম্পা নগরের শবর কন্যার কথা তোমার মনে আছে? স্বভাবে, আচরণে, গাত্রবর্ণে, উচ্চতায় তোমার ও তার সামঞ্জস্য এবং মিল এত বেশি যে তোমার বিকল্পরূপে সে থাকবে এই কুটীরে। আর তুমি থাকবে বাল্মীকির আশ্রমে। একমাত্র এই স্থান পরিবর্তন দ্বারা দুকুল রাখা সম্ভব।

সীতা একটু চমকে উঠল। আচমকা একটা অনুভূতি হল তা। চকিতে রামচন্দ্রের দিকে ফিরে তাকাল। দু'চোখে ভ্রূকুটি। তাকাতে গিয়ে একটা জোরে শ্বাস পড়ল। বলল ঃ- এরকম একটা অসামাজিক সম্পর্ক তার সঙ্গে শুরু করলে তোমার সম্মান কি খুব বাড়বে?

রামচন্দ্র ব্যথিত হয়ে বলল ঃ কথাটা ঠিক নয় বৈদেহী। রাজনীতির স্বার্থে, তোমার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য একজনের আত্মোৎসর্গকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। এই ঘটনার শুধু সাক্ষী হয়ে থাকবে তুমি আমি আর মুনিবর বাল্মীকি।

সীতা যে খুব খুশি আর নিশ্চিন্ত হল তা নয়। স্তিমিত চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। রামচন্দ্রের কৈফিয়ৎটা তার কাছে খুব প্রত্যাশিত নয়। তারপর খুব নিরুৎসুক গলায় বলল ঃ ও আচ্ছা।

এক, দুই, তিন করে দিনগুলো যেতে লাগল। রাবণ মনস্থির করতে পারল না। শূর্পণখা ভীষণ অধীর হল। প্রতিহিংসার বিষ নিয়ে সে জ্বলতে লাগল। রাবণের সামনে দাঁড়াতে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে মিলিয়ে গেল। একটা অসহায় কান্নার আবেগে আর দারুণ অপমানের যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে বলল ঃ

দাদা, তোমার এই নিস্পৃহ নির্বিকারত্বের কোন তুলনা হয় না। শত্রু তোমার ঔদাসীন্যের সুযোগ নিচ্ছে। তারা তোমাকে ভীরু কাপুরুষ ভাবছে। তোমার ভয় কিসে ?

ভয় ! রাবণ চমকে উঠল। ভয় কাকে ? কোথায় ভয় ? নিজের মনের ভেতর ভয়ের রহস্য সন্ধান করতে বেদবতীর স্মৃতি, স্বপ্ন তার চোখের তারায় ভেসে উঠল। বেদবতী যদি সীতাও হয় তাতেই বা তার ভয় আতংক কি আছে ? আসলে এ তার বার্ধক্যজনিত অবসাদ। বয়সের কারণে জীবন দীপের শিখা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাই ভাঁটির টান লেগেছে ইচ্ছায় ও উদ্যমে। যুদ্ধে উন্মাদনা, নারী হরণ, রক্তারক্তি, সংঘর্ষের ভেতরে কোন উত্তেজনা খুঁজে পায় না। বয়সই তাকে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত করেছে। এর সঙ্গে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা তার আকস্মিক মনে হওয়ায় ভীষণ স্বস্তি পেল। বুকের ভেতরটা বহুদিন পর সুখের উল্লাসে থর থর করে কেঁপে উঠল।

রাবণকে নীরব দেখে শূপর্ণখা নিজেকে ভীষণ অসহায় আর বিপন্ন মনে করল। অথচ বহু আশা ছিল তার মনে। মাথার ভেতরটা খুব ভার ভার বোধ হল। আর কেমন জ্বর জ্বর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার চেতনা। দুঃসহ অপমানবোধ বিষাক্ত একটা পোকার মত তার মাথার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল। প্রতিহিংসায় জ্বলতে লাগল দুই চোখ। বললঃ দাদা, তুমি কি ক্লীব হলে শেষে ? আমার উপর শত্রুর বর্বর আক্রমণ দেখেও কি নীরব থাকবে তুমি ? পঁচাত্তরটি বসন্ত ঋতু তুমি কাটিয়েছ। তবু যথেষ্ট শক্ত, মজবুত, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সুঠাম তনু তোমার। বার্ধক্যে ন্যুব্জ হওনি, কেশে পাক ধরেনি, দেহের মাংস লোল হয় নি। বয়সের ছাপ পড়েনি মুখে। এখনও তোমার সমকক্ষ বীর যোদ্ধা নেই ভূ-ভারতে। অযুত হস্তীর বল তোমার দেহে। তবু কেন ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে মহাবল দানবের মত জেগে উঠছ না ?

রাবণের সমস্ত সত্তা প্রবলভাবে নাড়া খেল। সহসা একটা দুঃস্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠল। মহৎ বিশাল অনুভূতির ভেতর আবিষ্ট হয়ে গিয়ে বললঃ ভগিনী তুমি নিশ্চিন্ত থাক রামচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা ও মর্যাদাবোধ ক্ষেপিয়ে তুলতে আমি সীতাকে অপহরণ করব। কিন্তু এই জটিল ও কঠিন কাজটি কিভাবে সম্পন্ন করব তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছি।

আর কতদিন ধৈর্য ধরব ?

যতদিন না রামচন্দ্রের পাহারা শিথিল হয়, ততদিন ধৈর্য ধরে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।

দাদা, তুমিও ভয় পাও রামচন্দ্রকে ?

ভগিনী, তুমি যাকে ভয় বলে ভাবছ, আমি তাকে কৌশল বলে মনে করছি। রক্তাক্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়াকে ভয় পাওয়া বলে না।

কিন্তু সংঘাত বাঁধাতে একদিন তোমার জুড়ি ছিল না।

যারা রাজনীতির বাইরের সংঘাতকে বড় করে দেখে তাদের সঙ্গে খোলা মাঠে, সবার দৃষ্টির সামনে যুদ্ধের জয়পরাজয় মীমাংসা করেছি। কিন্তু রামচন্দ্র এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র সৃষ্টি করল। বাইরে থেকে এর লড়াই চোখে পড়ে না। লোকচক্ষুর আড়ালেও যে রাজনীতির গোপন সংঘাত বাঁধানো যায় তার এক পরিবেশ সৃষ্টি করল রামচন্দ্র। নিভন্ত আগ্নেয়গিরির মত তার গর্ভদেশে জ্বলে। সেখানে ক্ষমতা উচ্চাশা লোভ নিয়ে রেষারেষি ভাইয়ে ভাইয়ে, সহকর্মীতে সহকর্মীতে। ভগিণী তুমি সব খোঁজ রাখ না। স্বর্ণলঙ্কা গড়ার অভিনব উদ্যোগে যারা আমার পাশে ছিল, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, হাতে হাত মিলিয়েছিল, তারা কিন্তু আর আগের মত নেই। তাই, কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভাবতে হয় অনেক।

শূর্পণখার আলোড়িত হয়ে উঠল চেতনা। অবাক হয়ে ভাবল, এতবড় একটা মানুষ, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যার নাম, যাকে সবাই ভয় করে, সমীহ করে, এমন যার তীব্র ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড শক্তি, অসীম দুঃসাহস, অনন্ত আত্মবিশ্বাস সেও রামচন্দ্রর শক্তি এবং অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অনেক অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে শূর্পণখা রাবণের দীর্ঘ পুরুষালী চেহারা, তার ধারাল গম্ভীর মুখ আর তীক্ষ্ন দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল ঃ কেন বল এসব কথা ? তীব্র একটা জ্বালায় বুকের ভেতরটা তার চিন চিন করে জ্বলতে লাগল। সেই অসহ্য যন্ত্রণা আর বিষাক্ত ঘৃণা, বিদ্বেষ বুকেতে চেপে শান্ত অথচ ভারী গলায় বলল ঃ তোমার হাতে স্বামীর যদি মৃত্যু না হত তাহলে এমন অসহায় হয়ে থাকতে হত না। অথচ, তোমার সম্মান, গৌরব, মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আমি সর্বস্বান্ত আর পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আমার মত নিঃস্ব ও হতভাগ্য কে হয় ? কান্নায় তার ঠোঁটের পাতা দুটো কাঁপছিল।

রাবণ কোন কথা বলল না। একটা অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখের উপর। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে শান্ত মৃদু গলায় বলল ঃ কাকে পাঠালে কার্যোদ্ধার হয় সেকথা ভেবেছ কি ?

শূর্পণখা কি বলবে ভেবে স্থির করতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল। নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল।

নিথর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সহসা পুরুষালি কণ্ঠস্বর দ্বারদেশে শোনা গেল। বলল ঃ মহান সম্রাটের অনুমতি হলে ভিতরে ঢুকতে পারি।

শূর্পণখার বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। আলোড়িত হয়ে উঠল সমস্ত চেতনা। মনে মনে বলল ঃ এও কি সম্ভব ? বিধাতা তার মনের কথা টের পেয়ে যেন মারীচকে পাঠিয়ে দিল তার কাছে। রাবণের জবাব দেবার আগেই সে বলল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এস।

মারীচের কক্ষের ভেতর পা রাখতে বুকের ভেতর দুলে উঠল। এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তার গলাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মারীচ কিছু বলার আগেই শূর্পণখা বলল ঃ মারীচের চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আমার চোখে পড়ছে না। তার সম্বন্ধে নতুন কিছু বলারও নেই। তোমরা কথা বল। আমি যাচ্ছি।

প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মারীচ। রাবণকে প্রশ্ন করার সাহস হল না তার। রাবণ স্তব্ধ গম্ভীর। তার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে ঘেমে উঠল।

রাবণ কি একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মারীচের দু'চোখে গভীর বিস্ময়।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। অজানিত একটা দুর্ভাবনায় মারীচের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। সাহস সঞ্চয় করে নীরবতা ভঙ্গ করল। অস্ফুট স্বরে বলল ঃ রাজন, অধীনকে স্মরণ করে কৃতার্থ করলেন। এখন কি করতে হবে অনুগ্রহ করে আদেশ করুন।

রাবণের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। সুনিবিড় দৃষ্টি মেলে মারীচেব দিকে তাকাল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ এস আমার সঙ্গে।

মারীচ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাবণকে অনুসরণ করল। তীব্র একটা উৎকণ্ঠায় বুকটা একটু কেমন করছিল। রাবণের পিছন পিছন দ্বাররুদ্ধ মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করল। তার আয়ত চোখ দুটোয় বিবর্ণ বিষণ্ণতা। মারীচের বার বার মনে হচ্ছিল এবার একটা কিছু ঘটবে। রাবণের অনেক দুষ্কর্মের সাক্ষী সে। নিজের স্বার্থে সে বিবিধ ইন্ধন যুগিয়েছে রাবণকে। শত্রুকে বিব্রত রাখার বহু কু-মন্ত্রণা দিয়েছে। আর এসব ব্যাপারে তার বুদ্ধি ও চিন্তা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। কিন্তু ইদানীং তার সব কাজেই কেমন একটা ক্লান্তি। রাজনীতিতে নিরুৎসাহ। রামচন্দ্রকে নিরস্ত করার সব উদ্যোগ, চক্রান্ত, আক্রমণ তার ব্যর্থ হয়েছে। এখন তার বিশ্বাস রামচন্দ্র মানুষের কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট সে। রাক্ষসের সাধ্য নেই তার ক্ষতি করে।

মারীচ নিরুত্তর হয়ে বসেছিল রাবণের সম্মুখে। রাবণের দুই চোখ জ্বল জ্বল করছিল। নিজের ভাবনার ভেতর মগ্ন হয়ে গম্ভীর স্বরে ডাকল ঃ মারীচ! সে ডাকে মারীচের বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। মুহূর্তে তার মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। রাবণ তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে মৃদু হাসল। বলল ঃ মারীচ শুনতে পাই, অনুতাপে ও অনুশোচনায় তোমার দিন কাটছে।

মারীচের উজ্জ্বল মুখে একটা ছায়া খেলে গেল। বলল ঃ রাজন, সংবাদদাতা সত্যের অপলাপ করেছে। রামচন্দ্র এক আশ্চর্য অদ্ভুত মানুষ। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, কৌশলকে আমি শ্রদ্ধা করে। তাই বোধ হয়, কেমন একটা ভয় লাগে তাকে। অথচ তাকে হত্যা করার জন্য কত ষড়যন্ত্র, কত চক্রান্ত করলাম, সব উদ্যোগ নিস্ফল হল। আমি পরাভূত। তাই নতুন করে সংগ্রামে উৎসাহ পাই না।

ছিঃ, হতাশায় ভুগছ তুমি। মৃত্যুর আতঙ্কে কাঁপছ। একজন অনুগত দীন সেবকের মত শত্রুর অনুগ্রহ করুণা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার এ এক চমৎকার ফন্দী তোমার। কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে আমি বাঁচতে দেব না।

মহান সম্রাট। আপনার ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ অত্যন্ত নির্মম। আপনি আমাকে আঘাত করুন, প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ করুন। আপনার এই নিষ্ঠুর অভিযোগের ভার আমি সইতে পারছি না।

মারীচ, তুমি আমার স্নেহের পাত্র। রামচন্দ্র তোমার হৃদয় পরিবর্তনের সংবাদ পেয়ে তোমাকে খুঁজছে। তাই কঠিন বাক্যে তোমাকে ভর্ৎসনা করতে হল। তবু তোমাকে জানাচ্ছি, শাস্তি ও পুরস্কার দানের অধিকারী তোমার অদৃষ্ট। তোমার ভাগ্যই তোমার কার্যের কঠিন বিচারক।

মহান রাজা! আমি নীতিভ্রষ্ট নই। আমার হৃদয়ের অন্তস্থলটা যদি দেখতে পেতেন, পারতেন যদি কি যন্ত্রণায় আমি জর্জরিত হচ্ছি তা পাঠ করতে,—তা হলে এই অভিযোগ থাকত না আপনার।

মারীচ, আমার অভিযোগ তোমাকে বিব্রত করবে না, যদি বিনা প্রতিবাদে তুমি আদেশ পালন কর।

রাজা!

লক্ষ্মণের ঘৃণ্য বর্বরতার কোন তুলনা হয় না, রামচন্দ্রের নীরব সম্মতি ছাড়া এমন জঘন্য বর্বর কাজ লক্ষ্মণ করতে পারত না। ভগিনী শূর্পণখাকে নিগ্রহ করা মানে আমাকে অপমান করা। একটা প্রত্যক্ষ বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কিন্তু একজন সামান্য বনচারীকে আমার রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে পারি না। অথচ প্রত্যক্ষ বিরোধের যে রাজনৈতিক চাল সে দিয়েছে তা এড়াতে গেলে রাঘবের নির্দেশিত পথে এক হীন জঘন্য আচরণ আমাকেও করতে হয়। প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে অপহরণ করলে রামচন্দ্রের অন্তরে যে দারুণ হতাশা, শূন্যতা সৃষ্টি হবে তা তার ভয়ংকর মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠবে। শোকে দুঃখে কাতর হয়ে রামচন্দ্র যুদ্ধে নিরুৎসাহ হবে। শুধু কি তাই? প্রিয়তমা পত্নীকে লাভ করার জন্যে যে কোন রাজনৈতিক সর্তে সে রাজী হবে।

আপনার অনুমান সত্য নাও হতে পারে। রামচন্দ্রর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি সম্পর্কে যতখানি জানি, তাতে এটুকু বুঝি মানুষটি মোটেই আবেগপ্রবণ নয়। যুক্তি ও বুদ্ধি নিয়ে চলে। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র রুগ্ন, অসুস্থ, মুমূর্ষু পিতার কাতর অনুনয়েও একটি রাত অযোধ্যায় কাটায়নি। এমনকি অযোধ্যা ত্যাগ করতেও কোন হৃদয়াবেগের দ্বারা চিত্ত উতলা কিংবা অস্থির হয়নি। কর্তব্যে, সংকল্পে সে শুধু দৃঢ় নয়, নির্মম, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনও বটে। রাজনৈতিক খেলায় দুর্বল হৃদয়াবেগকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না রামচন্দ্র।

হুঁ! পরিকল্পনা, লক্ষ্য ব্যর্থ হলেও নিজের কাজের জন্য ছোট হবার কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না আমাদেরও। কারণ এ হল নীতিতে নীতিতে লড়াই। নারী নির্যাতনের শোধ নারীর অপমান দিয়েই শোধ করব।

মারীচ চুপ করে রইল। তার নিরুত্তর, নির্বিকার মুখাবয়ব রাবণকে অসহিষ্ণু করল। প্রস্তাবটা যে মারীচ মেনে নেয়নি মুখচোখের অভিব্যক্তিতে তার সে আপত্তি

ফুটে বেরোল। মারীচের সঙ্গে রামের কোন গোপন সম্পর্ক আছে কি নেই রাবণ সে প্রশ্নেও গেল না। রামের প্রতি তার মনে যে প্রবল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মেছে তা কোন গভীর চক্রান্তে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই রাবণ তাকে নির্মূল করার এক সুন্দর কৌশল করল। মারীচের মৌনতায় হঠাৎ তীব্র ক্রোধে আর আক্রোশে জ্বলে উঠল সে। কঠিন স্বরে বলল ঃ শোন মারীচ, তোমার মত চতুর আর কৌশলী মানুষের সাহায্য আমার দরকার। সীতা অপহরণের কাজে তুমিই সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি।

রাজা! বিস্ময়ে চমকে উঠল মারীচ।

রামের পত্নী সীতাকে হরণ করব আমি। তুমি আমায় শুধু সাহায্য করবে।

মহারাজ, আপনি এ সংকল্প ত্যাগ করুন। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল মারীচ।

রাবণের অধরে মৃদু হাসির আভাস। গম্ভীর গলায় বলল ঃ রাজাকে প্রশ্ন করা চলে না। রাজাদেশ মানাই বিধি। কখন কি করতে হবে ঠিক সময় জানতে পারবে। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।

রামচন্দ্র শবরীকে নিয়ে পঞ্চবটীতে প্রত্যাবর্তন করল। সীতার ভূমিকা নিল শবরী। রামচন্দ্র তাকে অনেকখানি প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু তার নারীসুলভ লজ্জা, দ্বিধা, ভীরুতা, সংস্কার নিয়ে শবরী কতখানি সীতা হতে পারবে এই সংশয় রামচন্দ্রের মনেও ছিল।

এমনিতে লক্ষ্মণ কিছু টের পায়নি। রামও কিছু বলেনি। আসল নকলের তফাৎ বুঝতে লক্ষ্মণ কি করে সেটাই লক্ষ্য করা ছিল তার উদ্দেশ্য। লক্ষ্মণের সামনে শবরীর আচরণে, চলা ফেরায়, কথাবার্তায় এমন একটা জড়তা, দ্বিধা আর আড়ষ্টভাব ছিল যে তাতেই সে লক্ষ্মণের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু রামের কাছে লক্ষ্মণ কিছু ভাঙল না। যেটুকু বোঝার সে বুঝে নিল। রামও দেখল লক্ষ্মণ শবরীরূপী সীতার কাছে সহজ হয়ে উঠতে পারছে না। সংকোচ, দ্বিধা, লজ্জা শবরীর সঙ্গে তার একটা দূরত্ব রচনা করেছে। অথচ সীতার সঙ্গে লক্ষ্মণের এরকম দূর দূর ভাব কোনদিন ছিল না। ব্যাপারটা যখন লক্ষ্মণ নিজে থেকেই বুঝে ফেলেছে তখন তার কাছে সব ঘটনা খুলে বলা রামচন্দ্র সমীচিন বোধ করল। অতীতে কৈকেয়ীর কাছে সিংহাসনে অভিষেকের কথা গোপন করে যে ভুল করেছিল, সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই রামচন্দ্র বলল ঃ লক্ষ্মণ, তোমাকে বলতে আমার কোন বাধা ছিল না। তবু বিশেষ উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে গোপন করেছিলাম। কিন্তু এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কুটীরে তুমি যে রমণীকে দেখছ সে সীতা নয়, শবরী।

শবরীকে নিয়ে যে রাজনৈতিক খেলা সূচনা করছি তার ফাঁকি অন্যের চোখে ধরা পড়ে কিনা যাচাই করতে আমি তোমায় কিছু জানায়নি।

লক্ষ্মণ গম্ভীর মুখে রামের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল: তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আসল নকল একাকার হয়ে গেছে। আচরণের মধ্যে বৈদেহীর সঙ্গে তার তফাৎ লক্ষ্য করেছি। সংশয়ে, দ্বিধায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছি। তবু নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। আজ দ্বন্দ্ব ঘুচল। কিন্তু ভাইয়া, আগুন নিয়ে তোমার এই বিপজ্জনক খেলায় আমি কোন উৎসাহ পাই না, বরং একটা দারুণ ভয়ে উদ্বেগে আমার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একজন পরনারীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে আসা আমার চোখে অপরাধ। তোমার কাছেও প্রত্যাশা করি না।

রামচন্দ্রর অধর মৃদু হাসিতে রঞ্জিত হল। শান্ত ও সংযত হয়ে বলল রাজনীতির খেলায় রমণীর অভিমান আর ন্যায়বুদ্ধি দিয়ে জয়লাভ অসম্ভব। আমি নিজের পথে চলতে কখনও ভয় পাই না। আমার কোন কাজের অর্থ যদি বুঝতে না পার, আমার উপর বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা কর। একদিন দেখতে পাবে তোমার প্রত্যাশার কোন অমর্যাদা হয়নি।

পাহাড়ের মাথার উপর বিরাট লাল সূর্য উঠল। আকাশ জুড়ে লাল মেঘের সমুদ্র। গোদাবরীর স্বচ্ছ জলে পড়েছে তার ছায়া। মনে হচ্ছে রক্তের নদী। রাঙা তাজা রক্তে যেন লাল হয়ে উঠেছে গোদাবরীর জলধারা। রামচন্দ্রর সমস্ত চেতনা নিবিষ্ট হয়ে যায়। তন্ময় হয়ে প্রকৃতির রূপ দেখছিল। শবরী রামের খুব কাছে বসেছিল। রামচন্দ্রের উষ্ণ শ্বাস তার গায়ে লাগছিল। হঠাৎ কি খেয়ালে শবরী রামের খোলা জটা চূড়া করে বেঁধে দিতে গেল। রাম মাথা সরিয়ে নিল। তার হাত ধরে বাধা দিল। শবরী নাছোড়বান্দা। চূড়া বাঁধার সে যত চেষ্টা করে রাম তত মাথা সরিয়ে নেয়। এটাই তাদের দু'জনের তখন খেলা হয়ে গেল। শবরী রামকে কাতাকুতু দিল। রাম হাসতে হাসতে শবরীকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু শবরীকে কিছুতে নিবৃত্ত করতে পারল না। শবরী একটা দুরন্ত মজা পেল। অকারণ হাসির উচ্ছ্বাসে তার সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। স্রোতের মত কলকল করছিল তার হাসির শব্দ।

শবরীর হাসি অদ্ভুত সুন্দর। একেবারে শিশুর মত সরল সহজ হাসি। তার কণ্ঠের মধ্যে একটা আন্তরিকতা মাখানো নম্রভাব আছে। তার নেশায় রামচন্দ্র মজেছিল।

সোনালী মায়া রোদ পড়েছে দূরের মাঠে সবুজ ঘাসে। হঠাৎ সেইদিকে দৃষ্টি

পড়ল শবরীরূপী সীতার। দেখল, একটা বড় সোনার হরিণ নিজের মত চড়ে চড়ে ঘাস খাচ্ছে। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট হরিণ আছে। `কিন্তু বড় হরিণটি দলের মধ্যে স্বতন্ত্র। রোদ লেগে সোনার পাতের মত ঝকমক করছে তার সারা অঙ্গে। শবরী খেলা ফেলে সোনার হরিণ দেখতে লাগল। আশ্চর্য ! ভীষণ আশ্চর্য। এমন সুন্দর অদ্ভুত হরিণ সে কখনও দেখেনি। হরিণটা পেতে তার ভীষণ লোভ হল।

মুগ্ধ চোখে সে কয়েক মুহূর্ত্ত রামচন্দ্রের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। একটা তীব্র লোভ ধীরে ধীরে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে দুর্বার বাসনায় সঞ্চারিত হল। তার আর তর সইল না। কখনও যা করেনি, হঠাৎ তাই করে বসল। রামচন্দ্রের গায়ের উপরে তার যৌবনপুষ্ট দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বলল: আর্যপুত্র, দ্যাখ সুন্দর হরিণ! সোনার চাদর দিয়ে যেন মোড়া। রোদের আলোয় ওর তেল চকচকে শরীরের উপর ঝলক দিচ্ছে। কী অপূর্ব লাগছে। ছোট্ট হরিণ দলটার মধ্যে ওর জুড়ি নেই। ওটাকে আমায় ধরে দাও। লক্ষ্মী আমায় ধরে দাও।

রামচন্দ্রের সারা শরীর শির শির করে উঠল। কেমন বিহ্বল আর নিশ্চল হয়ে সে তাকিয়ে রইল শবরীর দিকে। কিন্তু শবরীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার চোখ তখন ঐ সোনার হরিণের দিকে। দুই চোখের দৃষ্টিতে লোভ চকচক করছে। তীব্র আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে এল শবরীর কণ্ঠস্বর। রামের কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, আমি কিছু চাইনি কখনও। ঐ হরিণটা আমি ভিক্ষা করছি। তুমি ওটা আমায় ধরে দাও। হরিণটা আমি চাই—ই—চাই।

বিপুল এক সুখের আবেশে আচ্ছন্ন চেতনার এক অপরূপ ইন্দ্রজালের মত বিচরণ করছে ভোজনরত সোনার হরিণ। রাম নিবিষ্ট হয়ে দেখছিল। সোনার হরিণ নিজের মত ঘাস খায়, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে সন্ত্রস্ত চোখে দেখে নেয় চারপাশ।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল।

সহসা রামচন্দ্রের উজ্জ্বল চোখের নীলরঙের তারা দুটো যেন ঝিক করে হেসে উঠল। বলল: শুচিস্মিতা ওটা মায়া হরিণ। কোন গৃহস্থের পালিত। হয়ত ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে। ওর গায়ে সোনার পাতের তৈরী বাহারী সাজ। জীবন্ত সোনার হরিণ বিভ্রম জমানোর জন্যেই কোন ধনী লোকের বিলাসিতা। এত বোঝ এটুকু বোঝ না, হরিণ কখনও সোনার হয়? না হতে পারে?

সোনার হরিণের উপর শবরীর দৃষ্টি স্থির সম্মোহিতের মত উচ্চারণ করল: কত লোকের কত প্রার্থনা করে। আমি না হয় ঐ সামান্য মায়া হরিণ চাইলাম। ওকে তুমি ধর।

রামের চোখে কৌতুক, মুখে হাসি। মায়াবন বিহারিনী হরিণী কেন তারে ধরিবারে কর পণ অকারণ?

দুরন্ত একটা অভিমানে শবরীর চোখে জল এল। গলা ভারী হল। নিজের মনেই বলল: চিরদিন যা চেয়েছি, দেরীতে হলেও তা পেয়েছি। একদিন স্বপ্ন

ছিল তোমার মত পুরুষের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হব। বিধাতা আমার সে ইচ্ছাও অপূর্ণ রাখেনি। আজও থাকবে না। ব্যাধের ঘরে মেয়ে আমি। বনের পশু কেমন করে বন্দী করতে হয় তাও আমি জানি।

কথা শেষ করে শবরী উঠে দাঁড়াল। আঁট করে শাড়ী পরল, কোমড়ে আঁচল জড়াল। তার বড় দুটো চোখ, খাড়া নাকে দক্ষিণ দেশীয় মানুষের সহজাত নির্ভীক প্রত্যয় আর দৃঢ়তা ফুটে বেরোল। শবরীর কাণ্ড দেখে রামচন্দ্র বেশ একটু বিব্রত বোধ করল। মুখ তার ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। বলল ঃ তুমি কোথায় যাবে? বনে বিপদ ওৎ পেতে আছে। ওই হরিণ বিপদের সংকেত। নারীর সহজাত স্বর্ণতৃষ্ণাকে প্রলুব্ধ করার কোন ফাঁদ। অভিনব অদ্ভুত, আশ্চর্য বস্তুর প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণকে লুব্ধ করার কোন চক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমি দেখব এর শেষ কোথায়? তুমি কুটীরে অপেক্ষা কর। লক্ষ্মণ তোমাকে দেখবে।

রাম তীর, ধনু তূণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণকে ডেকে বলল ঃ লক্ষ্মণ ঐ স্বর্ণ মৃগ সীতার মনোহরণ করেছে। ওটি পাওয়ার জন্য তার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছে। কুবেরের চৈত্ররথ বনেও এমন প্রাণী নেই। ওকে জীবন্ত ধরে আনার আদেশ। এই কুটীর শোভা করে থাকবে অন্যের মনে বিস্ময় জাগাবে। আমি এখনি মৃগ নিয়ে ফিরব। ফিরে না আসা পর্যন্ত কুটীর ছেড়ে কোথাও যাবে না।

চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, হরিণের দৃষ্টি এড়িয়ে রাম এগোতে লাগল। শুকনো পাতার খস্ খস্ শব্দে সচকিত হয়ে হরিণের দল দৌড়তে লাগল। অনেকদূর পর্যন্ত তাদের পিছে ধাওয়া করল। গভীর বনের কাছাকাছি হতে রামচন্দ্র আড়পথে একেবারে সোনার হরিণের মুখোমুখি হল। অমনি কে যেন বনের মধ্যে লুকিয়ে হরিণ দলটিকে অন্যদিকে হটিয়ে দিল।

অকস্মাৎ রামের স্বর নকল করে বিপন্ন মানুষের কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা চেয়ে চিৎকার করে ডাকল ঃ ভাই লক্ষ্মণ—অ-অ, রক্ষা কর-অ-অ। রক্ষা কর-অ-অ।

বনভূমির নিথর স্তব্ধতা কেঁপে উঠল। প্রতিধ্বনি হতে হতে বাতাসে সে ধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

রামচন্দ্র বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল। যে আশংকা সে মনে মনে করল, তাই হল শেষ পর্যন্ত। শত্রুর ছলনায় বিভ্রান্ত হয়েছে বুঝতে তার কষ্ট হল না। আক্রান্ত হওয়ার আগেই সে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে। তৎক্ষণাৎ অরণ্য কাঁপিয়ে আর্ত্তনাদ উঠল ঃ হা লক্ষ্মণ, হা লক্ষ্মণ। একটা করুণ আর্ত্তনাদ আর মৃত্যু যন্ত্রণার গোঙানিতে মুহূর্ত্তে চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল রাম।

সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়েছিল। এইবার ধীর পায়ে বেরিয়ে এল। এল মৃত্যুপথ যাত্রী আহত মানুষটির সামনে। তার দুটো চোখ বিস্ময়ে

আশ্চর্য হয়ে গেল। যন্ত্রণায় আহত ব্যক্তির সুন্দর মুখখানা কেমন বীভৎস আর অমানবিক হয়ে উঠল। অবাক স্বরে প্রশ্ন করল ঃ মারীচ তুমি ? তুমি কেন এই বনে ?

যন্ত্রণাকাতর আঁখি মেলে স্থির অপলক চোখে রামচন্দ্রর দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল ঃ বিশ্বাস কর শ্রীরাম, নিজের ইচ্ছেয় তোমাকে ঠকায়নি। রাবণের আদেশে বাধ্য হয়েছি। তাই-বা বলি কেন, অতলান্ত মনে সুপ্ত কোন প্রতিশোধের বাসনা নিয়েই হয়ত এই কাজ করেছি। আজ আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। অথচ, একটু আগেও স্বপ্নে ভাবিনি, তোমার মত বিচক্ষণ কুট কৌশলী মানুষ সোনার পাতে মোড়া হরিণ দেখে প্রলুব্ধ হবে ? জীবন্ত হরিণ কখনও সোনার হয় ? কিন্তু নারীর সহজাত স্বর্ণ তৃষ্ণা, এক বিচিত্র বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণের কথা মনে রেখেই এইরকম একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছি। আমি জানি সীতা তোমার জীবন। প্রিয়তমা স্ত্রীর মন রক্ষা করতে তুমি আমার ফাঁদে পা দেবে। আরো জানতাম, তোমার হাত থেকে আমারও রেহাই নেই। আমার সেই কর্মফল ভোগ করছি। চিরদিন তোমার শত্রুতা করেছি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তোমার শত্রু থেকে গেলাম। কিন্তু মনে বড় সাধ ছিল তোমাকে বন্ধু করে পাওয়ার। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে একবার বন্ধু বলে ডাক রামচন্দ্র। বল, বন্ধু আমার !

রামচন্দ্র কেমন অভিভূত আচ্ছন্নতায় উচ্চারণ করল ঃ বন্ধু আমার।

মারীচ তৃপ্তিতে আরামে চোখ বুজল। কিন্তু তার শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। মুখখানা দুমড়ে মুচড়ে গেল। নিজের কষ্টে তার ঠোঁট বেঁকে গেল। তবু, থেমে থেমে কষ্ট করে উচ্চারণ করল ঃ বন্ধু, তুমি শীঘ্র পঞ্চবটী যাও। সেখানে তোমার বৈদেহী—মারীচের কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেল।

হু-হু বাতাসের সওয়ার হয়ে পঞ্চবটীর কুটীরে এসে পৌঁছল দূরাগত ক্ষীণ আর্ত্তস্বর—ভাই লক্ষ্মণ, রক্ষা কর। প্রাণ যায়। কুটীর প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিতে দিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শবরী। শবরীরূপী সীতা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সেই বিপন্ন আর্ত্তস্বর। একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার শুনল। এর কিছুক্ষণ পরেই শুনল করুণ আর্ত্তনাদ। উৎকণ্ঠায় শবরীর কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। একটা দারুণ উত্তেজনা আর উদ্বেগ ধীরে ধীরে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে আগুনের স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হল। তার জেদের জন্যেই রামচন্দ্র শত্রুর ফাঁদে পা দিয়েছে। বিপন্ন অসহায়ের মত সে এখন লক্ষ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু লক্ষ্মণের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। অগ্রজের জন্যে তার কোন চিন্তা ভাবনা আছে বলে মনে হল না শবরীর। তবে কি লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুপস্থিতির সুযোগ খুঁজছে। এই বিজন আরণ্যক পরিবেশে তার বুকে কি কোন কামনার আগুন জ্বলে উঠল ? তার যৌবনপুষ্ট নরম দেহটার উপরেই কি তার লোভ ? তাকে একা পেয়ে কি লক্ষ্মণ—পরের কথাগুলো মনে করতে তার কষ্ট হল, ঘৃণা হল। নিদারুণ আতংকে, উত্তেজনায় তার দেহমন বিবশ হয়ে গেল। মুখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। আর তার

স্নায়ুতে স্নায়ু তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল লেলিহান অগ্নির ঝড়। এই নির্জন কুটীরে তার মনে হল লক্ষ্মণের দীর্ঘ দেহ যেন ঢেউর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গ্রাস করার ফাঁক খুঁজছে।

তবু যথাসম্ভব নিরাবেগ চিত্তে নিজেকে শান্ত ও সংযত রেখে সে বলল: দেবর, শুনতে পাচ্ছ শ্রীরামের আকুল কণ্ঠস্বর। কত বিপন্ন, অসহায় হয়ে সে তোমাকে ডাকছে। তোমার সাহায্য চাইছে। আর তুমি তার ডাক শুনেও নীরব কেন? অসহায় অগ্রজের বিপদ জেনেও তুমি তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছ না কেন? ভ্রাতার জন্যে তোমার মন কি বিচলিত হচ্ছে না? তোমার অন্তরের মধ্যে ঐ করুণ আর্ত্তনাদ কি এতটুকু করুণা সঞ্চার করছে না?

শবরীর উদ্বিগ্ন অসহায়তা লক্ষ্মণের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। কিন্তু মনের ভেতর তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। প্রগাঢ় প্রত্যয়ে হৃদয় টৈটুম্বুর। শ্রীরামের বিপন্ন, অসহায় অবস্থা তার কল্পনায় আসে না। তাই শবরীরূপী সীতার উৎকর্ণ উৎকণ্ঠার কি জবাব দিলে ভাল হয় ভেবে পেল না। মাথা হেঁট করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত গলায় বলল: দেবী, অগ্রজ অজেয় ধনুর্ধর। বিপুল শক্তির অধিকারী। মল্লযুদ্ধেও সে পারদর্শী। কারো সাধ্য নেই তার গতিরোধ করে। তার বিক্রম সর্বজন বিদিত। সারা ভারতবর্ষের লোক তাকে চেনে। কারো সাহস নেই শ্রীরামকে একা পেয়ে আক্রমণ করে। তুমি শান্ত হও। নিশ্চিন্তে থাক। অগ্রজের কোন বিপদ হয়নি। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ভাল আছে। তার কিছু হলে আমি বুকের ভেতর টের পেতাম। ঐ আর্ত্তস্বর কখন শ্রীরামের নয়। কোন দুষ্ট, দুরভি-সন্ধিপরায়ণ লোক সম্ভবত শ্রীরামের কণ্ঠস্বর নকল করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

—না, না, তার জন্যে আমার মন ভীষণ উতলা হয়েছে। হৃদয় কোন যুক্তি মানছে না। তুমি তাড়াতাড়ি তার অনুসন্ধানে যাও।

দেবী, তুমি ব্যাকুল হয়ো না। কোন অবস্থায় এই কুটীর ছেড়ে যাওয়ার হুকুম নেই আমার। আমি তার অনুগত সেবক, এবং দাস মাত্র। তার নির্দেশ অমান্য করার পরামর্শ দিও না আমায়।

দেবর, তোমার কথা আমার ভাল লাগছে না। ঐ শোন আবার কাতর আর্ত্তনাদ। হা লক্ষ্মণ, হা লক্ষ্মণ করে কে যেন কাতরাচ্ছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার যুক্তি বুদ্ধি, সব হারিয়ে যাচ্ছে। দেরী হলে আর হয়ত অগ্রজকে জীবিত দেখবে না, তাকে বাঁচানোর আর কোন পথ থাকবে না। যাও ভাই—

তবু পারি না দেবী অগ্রজের নির্দেশ লংঘন করতে। আদেশ মেনে চলাই আমার কাজ। জ্যেষ্ঠের কঠোর নির্দেশই হল, কোন অবস্থায় কুটীরে তোমাকে একা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে কোথাও যাওয়া চলবে না।

দেবর, এ কুটীরে আমি বেশ একা থাকতে পারব। আমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি নির্ভয়ে তার অনুসন্ধানে যাও। আমার জন্য কোন ভয় নেই।

দেবী, অনুরোধ বৃথা।

শবরীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। লক্ষ্মণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখতে পেত সহসা তার মুখের রঙ বদলে গেছে। মুখে চোখে শবরীর অভিব্যক্তির রূপান্তর ঘটেছে। তাল তাল কাদার মত ঘৃণার ধিক্কার জমল মনে। নিদারুণ একটা হীনমন্যতায় যন্ত্রণায় তার দু'চোখ জলে টলটল করতে লাগল। সমস্ত সত্তার ভেতর বিদ্রোহ আগুনের ফুলকির মত জ্বলতে লাগল। সহসা ক্রোধে সে সংযম হারাল। তার সমস্ত চেতনার ভেতর এক দুরন্ত অসহায় অভিমান যেন ক্রোধে গর্জে উঠল। বলল ঃ আমার মনে হচ্ছে রামের মহা বিপদ তোমার কাম্য, তাই এমন কথা বলছ।

দেবী! চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল লক্ষ্মণ।

তুমি লোভী, পাপাত্মা। এই নির্জন আরণ্য পরিবেশে তুমি চাও আমার এই লোভনীয় নারী দেহকে। তার লোভে এই স্থান ছেড়ে যেতে চাইছ না। কিন্তু তোমার সে ইচ্ছা সফল হওয়ার আগে আমি গোদাবরীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করব।

লক্ষ্মণ বিস্ময়ে স্তব্ধ, বাক্‌রহিত। যন্ত্রণায় বুকটা তার মুচড়ে উঠল। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। এত বড় লজ্জায় কলংক, অপমান তাকে কেউ করেনি কখনও। তার নিষ্কলংক শুভ্র চরিত্রের উপর এই মলিন দাগটি আর কোনদিন মুছবে না। ধিক্কারে, অনুশোচনায় জ্বলতে লাগল তার বুক। শবরীর প্রত্যেকটি কথা তার মর্মে বিঁধল। প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ধাক্কায় তার সকল সহিষ্ণুতা এবং সংযম ভেঙে পড়ল। বৈদেহীর মত মহৎ বিশাল অন্তঃকরণ কোথায় পাবে এই বনবালা? তার উপর অকারণ রাগ করাও বৃথা। তবু মন প্রবোধ মানল না। নিজের অজানিত দুঃখ বেদনায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। ধীরে ধীরে কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করল ঃ তুমি বৈদেহী হলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে না। দেবীর মত সম্ভ্রম করি তোমাকে। কোনদিন ভুলেও তোমার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। তবু এমন ঘৃণ্য সন্দেহ করতে তোমার শিক্ষা সংস্কারে বাঁধল না? বাঁধবে কোথা থেকে? নীচ কূলে তোমার জন্ম। তোমার কাছে প্রত্যাশা করাই বৃথা। ধিক্ তোমাকে। ধিক্ তোমার ধর্মবোধকে। তোমার সর্বনাশ আসন্ন। তাই তোমার নিয়তি তোমাকে এমন বিবেকহীন ধর্মজ্ঞানশূন্য করল। আমি কি করব? ঈশ্বর সাক্ষী, আকাশ, সূর্য আর বনভূমি সাক্ষী—আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় কিংবা বিভ্রমবশতঃ এই কুটীরে একা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাচ্ছি না। তোমার মর্মবিদারী বাক্য নিষ্ঠুর সন্দেহ এবং আশংকা আমাকে বাধ্য করল জ্যেষ্ঠের আদেশ লংঘন করতে। এর জন্যে তুমিই দায়ী। তবু কামনা করি, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন। ভুলেও সশস্ত্র রক্ষীর পাহারার সীমানার বাইরে কখনও যেও না।

লক্ষ্মণের কথাগুলো যেন অন্তঃস্থলের এক বেদনাময় উৎস থেকে একটা একটা করে নির্গত হল। শবরী নির্বাক। পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তার জবাব দেবার মত কোন কথাই ছিল না। বিষণ্নতায় তার সমস্ত মনটি আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

লক্ষ্মণ চলে যাওয়ার পরেই শবরী ভীষণ শূন্য বোধ করল। নিদারুণ ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। বাইরেও কাঁপুনি প্রসারিত হল। সে অনুভব করতে পারল

তার পা কাঁপছে। ভীষণ অসহায় লাগছে। তার যেন কোন সহায় নেই, অবলম্বন নেই, ভীষণ একা। পঞ্চবটী মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধ, প্রাণহীন। এক আসন্ন বিপদের ভবিতব্যতা তার কল্পনায় এক বিচিত্র কালো ছায়া ফেলল। সেই কালো ছায়া যেন নৈঃশব্দের মূর্ত্তি ধরে প্রেতের মত তার সামনে দাঁড়াল।

খানিকবাদেই চমক ভাঙল তার। শবরী হতভম্ব। শ্বেত বস্ত্র, শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত এক বিশালদেহী ঋষি এসে দাঁড়াল তার কুটীর অঙ্গনে। অদ্ভুত মুগ্ধতা নিয়ে সে শবরীরূপী সীতার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল, ঋষি যেন কোন একটা বড় দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। ওর চোখে মুখে যেন কিছু বলার অভিব্যক্তি।

শবরীর দুই চোখের দৃষ্টি উৎকণ্ঠায় তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। নিজের বিসদৃশ আচরণের জন্য সে মর্মাহত। অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। এরকম একটা বিশ্রী ঘটনার জন্যে তৈরী ছিল না মোটেই। ভারী বিশ্রী লাগছিল। লক্ষ্মণের জন্যে তার মনের অস্বস্তি আরো বাড়তে লাগল। অস্বস্তির সঙ্গে একটা চাপা উদ্বেগও ছিল। তার ভেতরের প্রতিক্রিয়া তার প্রতি মুহূর্ত্তের অভিব্যক্তির রূপান্তর বাইরে অপেক্ষামান একজন ঋষি নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় যে মুখব্যাদান করে আছে শবরী এখনও জানে না। নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে সে ঋষির সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। ঋষির ছদ্মবেশে রাবণও চেয়ে থাকল। নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময়। চেয়েই আছে দু'জনে। কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটে গেল। ঋষিরূপী রাবণের মনে হল এমনিই কেটে যাবে বুঝি।

বৈদেহী এদিকে এস। সর্বাঙ্গে আচমকা একটা তড়িত প্রবাহ বয়ে গেল বুঝি শবরীর। সম্মোহিতের মত আদেশ পালন করতে সে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ঋষির মুখ দেখার চেষ্টা করল। দু'চোখের সমস্ত জোর দিয়ে শবরী দেখতে চেষ্টা করল তাকে।

মৃদু হাসি খেলা করতে লাগল ঋষিরূপী রাবণের মুখে। কি যেন ভাবছে শবরী। দু'চোখের নীরব চাহনি মেলে ছদ্মবেশী রাক্ষসের মায়াবী চোখের দিকে চেয়ে সে উৎকর্ণ, বোবা। মনে তার উতরোল ঝড়। নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা নেই। মুখে নীরব বেদনার ছায়া ফুটে উঠল। রাবণ তার অবস্থা বুঝে বলল: বৈদেহী, তোমার মনের অবস্থা আমি অবগত আছি। যার জন্যে তুমি ভেবে অস্থির হচ্ছ সেই রামচন্দ্রর কথা মুখে বলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তোমার উৎকণ্ঠা দূর করার জন্যে বলছি, লঙ্কেশ্বর রাবণের তীরে মুমূর্ষু সে। লক্ষ্মণ আমার তপোবনে তার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। তুমি অরক্ষিত জেনেই আমি এসেছি তোমাকে পাহারা দিতে।

শবরীর বুক ঠেলে উঠল নীরব কান্না। কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল: ঋষিবর আর্যপুত্রকে দেখার জন্য আমার মন ভীষণ চঞ্চল হয়েছে। আর একটা মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।

ঋষিবেশী রাবণ শবরীরূপী সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে কপটতা করে বলল: তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে? লক্ষ্মণ আছে—

ঋষিবর নিষ্ঠুর হয়ো না। সে আমার সব। আমি তার সেবা করব, শুশ্রূষা করব। আমাকে একটি মুহূর্ত না দেখলে আর্যপুত্র বাঁচবে না। আমি তার প্রাণ, সে আমার জীবন।

কথাগুলো একেবারে শবরীর বুকের ভেতর থেকে উঠে এল। ঐ উৎকণ্ঠার মধ্যে নিজেও কম অবাক হল না। নিজেকে আজ নতুন করে দেখতে পায় শবরী। মাত্র কটা মাস। এর মধ্যে সত্যিই সে রামের পত্নী হয়ে উঠেছে। এ শুধু অভিনয়ে হয় না। জীবনের একটি পরম স্পর্শের স্বাদে তা মধুময়। পাখি গান গায় নিজের আনন্দে। কারো যে ভাল লাগে সে খবর পাখি জানে না। শবরী নিজের আনন্দের পথে চলতে চলতে হঠাৎ নদীর মত বাঁক নিয়েছে। বর্ষার জলে তার শূন্য বুক কবে কখন ভরে উঠেছে জানে না। জানে না কবে কোন মনে সে রামের সত্যিকারের সীতা হয়ে উঠেছে। সারা মনে তার একটা নতুন সত্তার আবির্ভাব হয়েছে। রাবণের সাধ্য কি শবরীকে চেনে?

ওর ভাষাহীন কণ্ঠের নীরব কান্নায় শিউরে উঠেছিল রাবণ। মনে মনে খুশিও হল। সীতা আজ সর্বকিছুর জন্যে তৈরী। কিন্তু তার সরল বিশ্বাস, গভীর প্রেমে রাবণের মনকে ছুঁয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য বিচলিত বোধ করল। শূর্পণখার বিকৃত মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠতে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল রাবণের পুরু ঠোঁট দুটোতে। স্বস্তিতে একটা নিঃশ্বাস পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ তা-হলে আমার সঙ্গে এস।

রাবণ জানে রামের সশস্ত্র প্রহরীরা সব সময় পাহারা দিচ্ছে। একমাত্র মুনি-ঋষি ছাড়া আর কারো প্রবেশের অনুমতি নেই পঞ্চবটী বনে। ঋষির ছদ্মবেশে খুব সহজেই সে পঞ্চবটীতে ঢুকতে পারল। কিন্তু সশস্ত্র রক্ষীর চোখ ফাঁকি দিয়ে পঞ্চবটী থেকে সীতাকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হওয়া ছিল কঠিন। তাই যেদিকে রক্ষীর সংখ্যা নগণ্য সেই পথেই সীতারূপী শবরীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বেশ খানিকদূর আসার পর শবরী দেখল একটা সুসজ্জিত সুন্দর রথ।

নির্জন বন। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রথ। শবরী থমকে দাঁড়াল। তার বিশ্বাস হঠাৎ ঘা খেল। নিশিপাওয়া মানুষের মত একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর এতটা পথ অতিক্রম করে এল। একবারও সন্দেহ হয়নি ঋষিকে। ভুলেও মনে পড়েনি লক্ষ্মণের সতর্কবাণী। ভয়ে শবরীর বুকের ভেতর থর থর করে কাঁপল। তার সমস্ত শরীর ভার ভার বোধ হল। ইন্দ্রিয়, স্নায়ু সব যেন অবশ হয়ে এল। পিছনে তাকাল শবরী। পঞ্চবটী অনেক দূরে একটা বিন্দুর মত। রক্ষীদের পাহারার সীমানা পেরিয়ে অনেকটা বনের ভেতর এসে পড়েছে। ভয়ে তার চাহনিটা কেমন বিচিত্র হয়ে উঠল। তবু একটা তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল তার মুখাবয়বে।

নিস্তব্ধ বনভূমি কাঁপিয়ে ঋষিরূপী রাবণ বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করল ঃ রথে ওঠ। আমি ঋষি নই, মহাপ্রতাপশালী রাবণ। লোকে আমাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে।

রাবণ কঠিন হাতে তার কোমল হাতখানা চেপে ধরল। নিজেকে মুক্ত করার

চেষ্টা করল শবরী। কিন্তু নিষ্ফল হল সেই চেষ্টা। ভাষাহীন অসহায় কান্নায় তার বুক ভিজে গেল।

বেদনা জড়ানো অপমানের চরম দুঃসহ গ্লানি আর অমানুষিক পৈশাচিক একটা আতঙ্কের ছায়া হঠাৎ তার বুকে দুর্জয় প্রতিরোধের এক শক্ত প্রাচীর গড়ে তুলল। ঘৃণা, ধিক্কারের দুর্বিষহ জ্বালায় জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। কণ্ঠস্বরে তার তীব্রতা ঝলকে উঠল। বলল ঃ বীর্যবান পুরুষ হয়ে অবলা নারীর উপর বিক্রম দেখাতে লজ্জা করল না? এই বীরত্বের তুমি আস্ফালন কর? ধিক, ধিক তোমার পৌরুষকে। তস্করের মত হীন উপায়ে বীর্যবান পুরুষের ভর্তাকে যে হরণ করে তার মত কাপুরুষ এই বিশ্বচরাচরে কে আছে?

একটানে রাবণ তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলল। ঋষির শান্ত সৌম্য মুখখানা কেমন বীভৎস আর অমানবিক হয়ে উঠল। ভয়ংকর আক্রোশে তার চোখদুটো জ্বলছিল। মুখখানা আগুনের মত গণগণ করছিল। ক্রোধ যথাসম্ভব সংযত করে ধীরে ধীরে বলল ঃ শোন সুন্দরী, তুমি বৃথাই বাক্য ব্যয় করছ। তোমার শত ভর্ৎসনাতেও আমার হৃদয়ে কণামাত্র করুণা জাগবে না। তার চেয়ে বরং সন্ধি কর। তুমি আমার প্রধানা মহিষী হও। তোমাকে দেখা থেকে আমার নিজ পত্নীদের উপর আর অনুরাগ নেই। আমি তোমাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করব।

শবরী চমকে উঠল। মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। ভীষণ ভয় করতে লাগল তার। নিজেকে বড় বিপন্ন আর অসহায় বোধ হতে লাগল। কে তাকে দস্যু তস্কর রাবণের হাত থেকে রক্ষা করবে? রামচন্দ্র? তার সঙ্গে সম্পর্ক কি? কতটুকু-বা দরদ তার আছে? দরদ থাকলে সীতার বিকল্প কখনো চিন্তা করত না তাকে। সীতার নিরাপত্তা তার কাছে জরুরী এবং প্রয়োজন। আর তার বিপদ সম্বন্ধে সে নিরুদ্বেগ। তার সহায় বলতে কেউ নেই। ভীষণ অভিমান হল রামচন্দ্রের উপর। শবরীর মনে হল, রামচন্দ্র যেন তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়েছে। সীতা গেলে যে ব্যথা তার বুকে বাজে সেই অনুভূতি কিন্তু তার জন্যে রামচন্দ্রের নেই। এরকম প্রত্যাশা করাও তার পক্ষে অন্যায়। তাই নিজের চিন্তায় সে ভীষণ একা নিঃসঙ্গ। বড় অসহায় লাগল নিজেকে। তার দুঃখের কোন সান্ত্বনা নেই, কষ্টের উপশম নেই। সহায় হওয়ার জন্যেও নেই কেউ। তার সমস্ত চেতনা আলোড়িত হয়ে উঠল। সহায়-হীনা নারীর মত ব্যাকুল স্বরে কেঁদে বলল ঃ বিশ্বাস কর, তুমি যা ভাবছ— আমি তা নই। আমি রামের কেউ না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

শবরীর আবেদনে রাবণ কৌতুকবোধ করল। মৃদু মৃদু হাস্যে বলল ঃ তুমি তবে কে?

শবরী প্রমাদ গণল। এই প্রশ্নের কি জবাব সে দেবে? রামচন্দ্রের কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বারংবার তার শপথের কথা মনে পড়ল। শবরী নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রভুর জীবন নিরাপদ রাখা তোমার কর্তব্য। কোনদিন সেকথা ভুলে যেও না। সত্যভ্রষ্ট হওয়ার আশংকায় তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কিন্তু

সে নিজেকে রক্ষা করবে কোন অস্ত্রে? বড় বড় আর ঘন কালো ডাগর দুটো চোখের দৃষ্টি কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল। ভয়ে ভাবনায় আতঙ্কে অস্থির হয়ে দীন প্রার্থীর মত বলল: বিশ্বাস কর, আমি সীতা নই। শবরী। পম্পানগরের শবরের ঘরের মেয়ে। রামের দাসীগিরি করতে পঞ্চবটীতে এসেছি।

কথাটা শুনে বুকটা দুলে উঠল রাবণের। চোখে অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়ের ছায়া নিবিড় হল। অপলক দুই চক্ষুর দৃষ্টি স্থির। বিদ্যুত-চমকের মত তার মনের অন্ধকারে ঝলসে উঠে মিলিয়ে গেল বেদবতীর মুখখানা। অভিভূত আচ্ছন্নতার অতলে নিমগ্ন হয়ে বলল ঃ ' রামচন্দ্র তোমার কেউ নয়। একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ। কিন্তু সুন্দরী তোমার ঐ চোখ, মুখ, নাক, কান কখনও মিথ্যে বলে না। একজনের সঙ্গে অন্য এক জনের এত গভীর মিল হয় কখনও।

বিশ্বাস কর আমি সীতা নই। কি করে তোমাকে বোঝাব? কান্নায় আভাসে থমথম করতে লাগল শবরীর মুখখানা।

রাবণ মৃদু মৃদু হাসে আর নিজের বিশ্বাসে অবিচল থেকে বলে ঃ বোঝানো যাবে না সুন্দরী! রামচন্দ্রের জন্যে তোমার মনের যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখছি, তার কোনো নকল হয় না। একমাত্র অতি প্রিয়জনের পক্ষেই তা সম্ভব।

তীব্র একটা অসহায়তাবোধে শবরী পীড়িত হতে লাগল। চোখ দুটো জলে ভরে এল। কান্নায় ভার ভার গলায় বলল ঃ বিশ্বাস কর আমি সীতা নই। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও।

রাবণের বুকটা খুশিতে দুলে উঠল, কিন্তু সহজ গলায় বলল ঃ তোমার কথা বিশ্বাস করার মত মতিভ্রম আমার হয়নি। বিপদে পড়লে সব মেয়ে ওরকম মিথ্যে কথা বলে। পরিত্রাণ খোঁজে। তুমিও ব্যতিক্রম নও। তোমাকে ছেড়ে দেবার কোন প্রশ্ন উঠে না। রামের দাসীগিরি করেছ এতকাল, এবার না হয় রাবণের দাসীগিরি করলে। তুমি হলে আমার চোখে আর্যাবর্তের রাজনৈতিক মর্যাদা আর দম্ভের প্রতীক চিহ্ন। তোমাকে আটকে রেখে রামচন্দ্রকে পোষ মানাব। তোমার নেশায় নেশায় তাকে একদিন আসতে হবে এখানে।

শবরীর চোখে মুখে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটে উঠল। হতাশ গলায় বিব্রত বিস্ময়ে বলল ঃ না, না! ভুল। আমার জন্যে কোনদিন সে আসবে না। আমি তার কেউ নই।

হো-হো করে হেসে উঠল রাবণ। তার অট্টহাসির শব্দ প্রগাঢ় স্তব্ধতার বুক চিরে বয়ে গেল লহরে লহরে। হাসতে হাসতে বলল ঃ তুমিও বেশ কথা জান। রাজনীতি কুটনীতিও ভাল বোঝ। কি বললে আমি বিভ্রান্ত হতে পারি সে বুদ্ধিও তুমি ধর।

দুঃসহ অসহায়তা শবরীর বুকের ভেতর মাথা খুঁড়তে লাগল। অস্বস্তিতে জ্বলে যায় তার মাথার ভেতর। একটা ঘৃণা স্নায়ুতে স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে গেল। মুখখানায় কঠোরতা ফুটে উঠল। গলার স্বর উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল।

বলল ঃ বীর্যের গর্বে যে পুরুষ নারীকে প্রার্থনা করে তার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেয় নারী। আর যে, পাশব বলে অধিকার করতে চায় তাকে করে সে ঘৃণা। আমি তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি। শোনরে কপটচারী বর্বর রাক্ষস, পাশব বলে দেহ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রেম মেলে না।

ক্রোধে রাবণ দপ করে জ্বলে উঠল। অপমানের সূঁচ বিঁধতে লাগল তার মাথার ভেতর। দুরন্ত আক্রোশে রাবণ শবরীর মুখ টিপে ধরল। জোর করে কবতুরের মত তার নরম দেহটাকে কোল পাঁজা করে রথে তুলল। চোখের নিমেষে রথ মাঠি ছেড়ে শূন্যে উঠল।

শবরী উম্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নিরুপায়ভাবে চিৎকার করে রোদন করতে লাগল। কোথায় আছ রঘুবীর? মহাবাহু লক্ষ্মণ? রাক্ষস আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মূর্খ নারী আমি। না বুঝে খল দস্যু রাক্ষসের খপ্পরে পড়েছি। দ্বিজ জ্ঞানে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছি। অধর্মচারী, কপট রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। ওগো আকাশ, বাতাস, নদী, বৃক্ষস্থ পাখীগণ তোমরা মহাবাহু রামের কাছে আমার হরণের বার্তা পেঁছে দাও। ওগো বায়ু, শ্রীরামকে বায়ুবেগে এনে আমাকে উদ্ধার কর।

পুষ্পকরথ শূন্যপথে উড়ে চলল।

গৃধ্রদেশ।

গৃধ্রপতি জটায়ু পদব্রজে বাসভবনে ফিরছিল। সহসা দুটি অলংকার আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল। বেশ অবাক এবং আশ্চর্য হয়ে অলংকার দুটি কুড়োল। এরকমভাবে আকাশ থেকে রমণীর অলঙ্কার পতনের ঘটনা শুধু অভিনব নয় বিস্ময়কর। অলংকারটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে বারবার দেখল। অলংকারের উত্তর দেশীয় শিল্প-কর্মের ছাপ সুস্পষ্ট। সহসা তার অযোধ্যাপতি শ্রীরাম পত্নী প্রিয়দর্শিনী সীতার কথা মনে পড়ল। অমনি আশংকায় বুকের ভেতরটা দুর দুর করে উঠল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। নীল আকাশ রোদে ঝলমল করছে, সাদা সাদা তুলোয় পেঁজা মেঘ এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। জটায়ুর সন্ধানী দৃষ্টি অচিরেই সাদা মেঘের ফাঁকে একটি চলন্ত আকাশ যান বিন্দুর মত দেখতে পেল। দক্ষিণারণ্যে রাবণ ছাড়া আর কারো বিমান নেই। তবে কি রাবণ তস্করের মত সীতাকে অপহরণ করে ঐ বিমানে পলায়ন করছে? অসহায় জানকী.

কি তার অলংকারকে অপহরণের চিহ্ন ও সংকেত করে তুলেছে? বর্বরের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে অলংকারগুলো যেন তার হয়ে নীরব প্রার্থনা করছে।

জটায়ুর মাথার ভেতর সহসা আগুনের ঝড় বয়ে গেল। কানের পিঠ দুটো গরম হয়ে উঠল। পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠল। দেরী না করে জটায়ু নিজেকে অস্ত্র সজ্জিত করে যান্ত্রিক ডানা মেলে বিহঙ্গের মত উড়ে গেল। রাবণের পিছু ধাওয়া করল। রাবণের পুষ্পকের বিমানের চেয়েও জটায়ুর যান্ত্রিকের গতি ক্ষিপ্র। খুব অল্প সময়ে সে রাবণের বিমানের কাছাকাছি হল। রোরুদ্যমান সীতাকে দেখতে পেল রথে। তীব্র ক্রোধে আর উত্তেজনায় তার দেহটা থর থর করে কেঁপে উঠল। রাবণকে লক্ষ্য করে সে হুঙ্কার ছাড়ল—শোনরে বর্বর রাক্ষস, আমি রামচন্দ্র সখা গৃধ্রপতি জটায়ু। বাঁচতে যদি চাস, তাহলে সীতাকে এখনি ফিরিয়ে দে।

রাবণ ঘাড় ঘোরাতে দেখল জটায়ু ডানা মেলে তার মাথার উপর পাখ খাচ্ছে। প্রচণ্ড যান্ত্রিক আওয়াজে জটায়ু কথা শুনতে পেল না, রাবণকে লক্ষ্য করে জটায়ু তীর ছুঁড়ল। রাবণ তৎক্ষণাৎ তার ধনু ও শর তুলে নিল। মুহূর্তে একটা বিরাট যুদ্ধ বেঁধে গেল। জটায়ু ক্ষিপ্র আক্রমণে রাবণ দিশেহারা হয়ে পড়ল। দেহের বহুস্থান দিয়ে তার রক্ত ঝরতে লাগল। রাবণ মরিয়া হয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। মুষলের প্রচণ্ড আঘাতে সে জটায়ুর যান্ত্রিক ডানার একটা ভেঙ্গে দিল। শূন্যে জটায়ু তার সব নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। প্রবল আর্তনাদ করে জটায়ু ভূপাতিত হল। তার রক্তাক্ত দেহ একটা মাংস পিণ্ডের মত পাহাড়ের ঢালু বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে বিঁধে গিয়ে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল। প্রাণটা তখনও পর্যন্ত ধুক্-পুক ধুক্-পুক্ করছিল।

রাম-লক্ষ্মণ কুটীরে প্রত্যাবর্তন করে দেখল কুটীর শূন্য। সীতারূপী শবরীর চিহ্নমাত্র নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেল না কোথাও। উন্মাদের মত রামচন্দ্র সীতা সীতা করে ডাকতে লাগল। নিথর স্তব্ধ বনভূমি যেন প্রতিধ্বনি করে বলল ঃ নাই, নাই।

লক্ষ্মণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হতে লাগল। একটা এলোমেলো বিশৃংখল চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করল। সব কেমন যেন ফাঁকা লাগল। চিত্তলোক অন্ধকার। বিচারবুদ্ধি অপরিচ্ছন্ন। বুকে একটা কিসের নিরন্তর আঘাত, যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। মনে হল, তার কাছে সব অর্থহীন। কতক্ষণ যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেও জানে না। অকস্মাৎ যন্ত্রণাকাতর একটা আর্তনাদ তার কানে এসে ঢুকে তাকে সচেতন এবং ঈষৎ চকিত করে তুলল। তাতেই তার সম্বিৎ ফিরল।

রামচন্দ্র ফুঁপিয়ে কাঁদছিল নীরবে। মধ্যে মধ্যে মৃদু কাতর একটা শব্দ বেরোচ্ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। রুদ্ধ যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। রামচন্দ্রের কান্না দেখে লক্ষ্মণ নিজের কষ্টের মধ্যে অনুতাপে জ্বলছিল। অপরাধবোধে সংকোচে সে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত।

রামচন্দ্র দুঃখে শোকে কাতর হয়ে লতার মত পড়ে আছে কুটীরের মেঝেয়। দেখলে কষ্ট হয়। বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠে।

প্রথম উত্তেজিত মুহূর্তের তরঙ্গগুলো শান্ত হয়ে এল ক্রমে। নিস্তরঙ্গতার গভীর থেকে একটা বিস্ময় তার চোখে চকচক করে উঠল। শবরী'ত সীতা নয়। তবু রামচন্দ্র তার জন্য এত শোকার্ত, দুঃখকাতর কেন? তার অপহরণের জন্য দুঃখ, মানবিক কর্তব্য, দায়িত্ব, সহানুভূতি নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু রামের এই মনোবেদনা দুঃখ-কষ্টর যেন কোন তুলনা হয় না। রামের জীবনে একটি ব্যতিক্রম অধ্যায়। প্রিয়জনকে ত্যাগ করার জন্যে সে কখনো এরূপ মনোবেদনায় কাতর হয়নি। পিতার মৃত্যু, অযোধ্যার জনগণের অশ্রুজল কিছুই তার মর্মবিদীর্ণ করেনি। রামচন্দ্র স্বভাবেও কখনো আবেগপ্রবণ নয়। তাহলে কোথা হতে এত কান্না এল তার? এই কান্নার রহস্য কোথায়? রামচন্দ্রের কোন কাজই উদ্দেশ্যহীন নয়। কার্যকারণ সূত্রে বাধা তার প্রতিটি কাজ। লক্ষ্মণের সাধ্য নেই তাকে অনুধাবন করে। নীরবতায় শুধু ক্লান্ত হয় সে। মৃদুস্বরে ডাকল ঃ ভাইয়া এমন চুপ করে থেক না। কথা বল। আমার কর্তব্যহীনতার দণ্ড দাও। তোমার কষ্ট আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

রামচন্দ্র আরক্ত চোখ মেলে বিভ্রান্তের মত তাকাল। আস্তে আস্তে সে মাটি থেকে উঠল। চাহনিতে কেমন একটা অবসন্নতার ঘোর ঘোর ভাব। মুখে ক্লান্তি ও কষ্টের ছাপ। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস নামল। থমথমে গলায় বলল ঃ লক্ষ্মণ তোমার অনুশোচনার কোন কারণ নেই। আমাদের অদৃষ্টে তাকে হারালাম। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লক্ষ্মণ বলল ঃ ভাইয়া, তোমাকে এমন শোকার্ত দেখিনি কখনও।

লক্ষ্মণ এই পঞ্চবটীতে কোন দিন শত্রুর ভয় করিনি। কিন্তু আর নিরাপদ নই আমরা। মনে হচ্ছে গুপ্তচর ছায়ার মত আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসাবধানে আমাদের আচরণ অন্যের চোখে সন্দেহজনক হয়ে উঠুক কিংবা প্রকাশ হয়ে পড়ুক এমন আচরণ কখনও করা উচিত নয়। শবরী আমাদের কেউ নয়, তবু তার জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রামচন্দ্রের চোখ ছলছল করে উঠল। বলল ঃ যে কোন উপায়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সৈন্যবল আমাদের কোথায়?

জটাজুটধারী গেরুয়া বসন পরিহিত কয়জন ঋষিকে রামচন্দ্র কুটীরে আসতে দেখল। তাদের কেউ চেনা নয় তার। ঋষির ছদ্মবেশধারী স্বাস্থ্যবান লোকগুলো আদৌ ঋষি নয়। এরা রাবণের প্রেরিত গুপ্তঘাতক অথবা চর। রামচন্দ্র এক মুহূর্ত ভাবল। তারপরেই তাদের না দেখার ভাণ করে বুকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করল। গভীর দীর্ঘায়িত এক শ্বাস পড়ল। কণ্ঠস্বর বদলে গেল সহসা। শোকাচ্ছন্ন স্বরে বলল ঃ লক্ষ্মণ যাওয়ার সময় সীতা খুব ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আমি বেশ অনুভব করতে

পারছি কত অসহায়ভাবে সে তোমার আর আমার নাম ধরে ডেকেছিল। কত মিনতি করেছিল।—রামের শ্বাস দীর্ঘায়িত হল। গলার স্বর স্খলিত ও ভেজা।—লক্ষ্মণ, সীতা হয়ত এখনও মূর্ছিত আছে ? কি জানি কখন মূর্ছা ভাঙবে তার ? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তার স্তম্ভিত চেতনা ফিরল। হয়'ত দুপুরের আহার হয়নি এখনও।

রামচন্দ্র নিশি পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্নভাবে কুটীর থেকে বের হয়ে এল। লক্ষ্মণও তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করল। রামচন্দ্র উম্মাদের মত আচরণ করতে লাগল ঃ লক্ষ্মণ আমার সোনার সীতা গেছে ঐ শিশুগাছের কোল ঘেঁষে। দুরাচারী রাক্ষস ওরই ছায়ায় আত্মগোপন করে তাকে নিয়ে গেছে নিঃশব্দে। ওই যে চঞ্চল শাখা গুলি মাথা দুলিয়ে বলছে এই পথে, হাঁ এই পথে গিয়েছে সীতা।

রামচন্দ্র উম্মাদের মত ছুটে গেল শিশুগাছের দিকে। লক্ষ্মণ, ঐ দ্যাখ সীতার পায়ে চলার দাগ ঘন হয়ে উঠেছে তৃণের বুকে। এখনও অমলিন তাজা হয়ে আছে মাটির বুকে। রামচন্দ্র হায় হায় করে দক্ষিণ দিকে ছুটল। ওই দিকেই সম্ভবত সীতাকে নিয়ে গেছে। ওই পথে গেলে আমি লঙ্কায় পেঁছিব।

আগন্তুক ঋষিরা রামচন্দ্রের পিছনে পিছনে দৌড়চ্ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রের সঙ্গে তাদের ব্যবধান এত বেড়ে গেল যে চিৎকার করে বলল ঃ রামচন্দ্র যেও না, যেও না ওদিকে। নিষিদ্ধ দেশ অনেকদূর। তুমি দুর্বল। তুমি শোকে কাতর। পথে চলার শক্তি তোমার নেই। তোমাকে আমরা শুশ্রূষা করব। আচার্য অগস্ত্য তোমাকে পঞ্চবটীর কুটীরে অবস্থান করতে বলেছেন। তোমাকে রক্ষার জন্য তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন।

রামচন্দ্র সহসা পথের মধ্যে থমকে দাঁড়াল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সচেতন হয়ে উঠল। তার দুই চোখে বিহ্বলতা। রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। দেহের শিরায়, মাথায় স্নায়ুর মধ্যে কি যেন উষ্ণতা, কিছু যেন, সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করার মত তীব্র একটা কিছু বয়ে যাচ্ছিল।

ঋষিরা পিছন থেকে আবার ডাবল ঃ আমরা আচার্য অগস্ত্যর সেবক। তোমার সেবায় আমরা এসেছি। শোকে বিভ্রান্ত হওয়া তোমার শোভা পায় না।

রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর গাঢ় হল। স্খলিত গলায় বলল ঃ মহাত্মা ? সীতা চাই। কোথা গেলে সীতা পাব ? এক মুহূর্তে রামচন্দ্র কেঁদে আকুল হয়ে পড়ল। স্বল্প উচ্চ কণ্ঠে ডাকল ঃ সীতা ! সীতা ! তোমাকে হারিয়ে রাজা জনক'কে আমি কি বলব ? ওগো মন্দাকিনী নদী তুমি কি জান কোথায় অপহৃতা হয়েছে জানকী ?

এবার চোখে পড়ল রাস্তা। নারিকেলের সারির ছায়া, মধ্যে একটা ফাঁল তাকে দেখিয়ে দিল গাছের শিকড়ে বেঁধে ত্রিশঙ্কুর মত কে যেন ঝুলছে। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে রাম সে দৃশ্য দেখেই দ্রুতপদে সেদিকে ছুটে গেল। বিস্ময়ে চমকাল। একি ! জটায়ু ? ছিন্ন লতার মত গাছের তলায় ক্লান্ত হয়ে ঝুলছে। সারা দেহের রক্ত মুখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। চোখ বোজা। মুখ ঠোঁট শুকনো। যন্ত্রণায় গোটা মুখখানা বিকৃত।

নিস্তেজ শরীরে প্রাণ আছে বলে বোধ হয় না। রামচন্দ্র এদৃশ্য দেখে চোখ বুজল। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। দুই হাত প্রসারিত করে তাকে কোলে তুলে নিল। লক্ষ্মণ তার পিঠ থেকে বাঁকাচোরা যান্ত্রিক ডানাটা খুলে ফেলল। সমান জমির উপর আস্তে আস্তে রাম তাকে শুইয়ে দিল। যন্ত্রণাজর্জর আর্ত্তস্বর বেরোল তার গলা দিয়ে—আঃ।

রামচন্দ্র একটু নত হয়ে ডাকল ঃ বন্ধু জটায়ু।

লক্ষ্মণ তার শিয়রে বসে মাথাটা তুলে নিল কোলে। রাম তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিল। চোখের নিচের পাতা টেনে দেখল। মণিবন্ধটি হাতে নিয়ে নাড়ী দেখল। খুব ক্ষীণ গতি। রামচন্দ্র কি ভেবে বন থেকে খুঁজে শিকড় ওষুধ তুলে এনে তার মুখে পুরে দিল। কিছুক্ষণ পর জটায়ুর আরামের শ্বাস পড়ল। আঃ।

রামচন্দ্র ভাবল একে নিয়ে কি করবে? এখান থেকে গৃধ্রদেশ অনেকটা দূরে। জটায়ু আচ্ছন্নের মত চোখ মেলল। মাথাটা একবার উঁচু করে তোলার চেষ্টা করল। সকরুণ চোখে রামচন্দ্র তার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ বন্ধু আর ভয় নেই। তুমি এখন আরামে একটু বিশ্রাম নাও। কথা বল না।

যন্ত্রণাকাতর অধরে একটু করে মলিন হাসি ফুটল। চোখ মেলে চাইলও একবার। তারপর ফিস ফিস করে অস্পষ্ট গলায় বলল ঃ বন্ধু, অপহরণকারী দস্যুর হাত থেকে জানকীকে উদ্ধার করতে পারলাম না।

তৃষ্ণার জলপানের জন্য হাঁ করল। একবার নয় কয়েকবার। আবার চোখ মেলে বিভ্রান্তের মত জটায়ু বলল ঃ বড় জ্বালা বন্ধু। বড় দাহ। একটু জল। কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে টেনে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বলল। বন্ধু অপরাধ নিও না। জানকীকে রক্ষা করতে পারলাম না। রাবণ তাকে রসাতলের দিকে নিয়ে গেছে। ভয়ংকর সমুদ্র পরিবেষ্টিত সে স্থান। জটায়ু শ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুত এবং কষ্টকর হল। গলা দিয়ে একটা ঘর্ঘর শব্দ বেরোল। অবসন্ন ও শ্রান্ত দেখাচ্ছিল জটায়ুকে। নিস্তেজ হয়ে এল তার শরীর। ধীরে ধীরে চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল।

রামচন্দ্র চোখ বুজল। কয়েক ফোঁটা জল তার চোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে পড়ল।

লক্ষ্মণ তার কাঁধ ধরে একটু আকর্ষণ করে বলল ঃ ওঠ। আমাদের থামলে'ত হবে না।

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

দিনাবসানের বেদীতলে

॥ ষোল ॥

মন্দোদরীর সঙ্গে গল্প করছিল রাবণ। মন্দোদরী চমৎকার গল্প বলতে পারে। কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর আবেগে উঠানামা করে। এই অনবদ্যভঙ্গী গল্পকে জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষবৎ করে তোলে। ব্যস্ততা না থাকলে মন্দোদরীর সঙ্গে গল্প করে। কখনও বা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করে।

মন্দোদরীর নিজস্ব গুপ্তচর আছে। তাদের কাছে পাওয়া সংবাদসূত্র সে রাবণকে শোনাচ্ছিল।

সীতা সীতা, করে চিৎকার করতে করতে রামচন্দ্র পঞ্চবটীর কুটীর থেকে বেরিয়ে এল। রামচন্দ্র কোথাও দাঁড়াল না। পাগলের মত দৌড়তে লাগল। কণ্ঠে তার আর্ত্ত কান্না। অদূরবর্ত্তী বিশাল নদীবক্ষে সমুদ্রের বিশাল জোয়ার উঠেছে। তরঙ্গাঘাতের শব্দের সঙ্গে কল্লোল ধ্বনি উঠেছে। রামচন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্যে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। তারপর একবার পিছন দিকে তাকাল পঞ্চবটীর কুটীরের দিকে। বনভূমিতে? কই? সীতা কোথায়? বুকের ভেতরটা তার হু-হু করে উঠল। সারা বনভূমি সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। শূন্য পথ। আকাশের দিকে তাকাল। সেদিকেও তাই। অনেক দূরে গ্রামের কুটীর দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটা কুকুর অসহায়ের মত কাঁদছে। কিন্তু সীতা কই? দক্ষিণ দিকের উঁচু মাটির পথ ধরে ছুটল রামচন্দ্র। কিছুদূরে গিয়ে সে পথ নিম্নভূমিতে মিশেছে। তার পরে ঝাউ, শাল, শিশু, অর্জুনের সারি। আকাশের সূর্য মধ্য গগনে। গাছগুলির ছায়া তাদের পায়ের তলায় জমেছে ঘন হয়ে। মধ্যে মধ্যে পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো সূর্যের আলো রশ্মিভল্লের মত ছায়াকে বিদ্ধ করছে। বায়ু তাড়নায় গাছের শাখা প্রশাখাগুলি ভিতরের একটা অস্থিরতায় কিছুতে স্থির হতে পারছে না। ওই চঞ্চল দোলায়মান ছায়ার ভেতর দিয়ে রামচন্দ্র চলেছে। সামনে তার বিশাল নদী। রামচন্দ্র এসে দাঁড়াল সেখানে। জোয়ারের স্রোত যেন ফুঁসছে। আঘাতের পর আঘাত করছে তটভূমিতে। একটা বৃহৎ তরঙ্গ আছড়ে পড়ে তার পা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। রামচন্দ্র আর দাঁড়াল না। কান্নায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল। সীতা! সীতা! টুকরো ছায়া ও আলোর ফুটকির মধ্যে রামচন্দ্রের রহস্য মূর্ত্তি দেখা গেল। চিৎকার করে বললে—সীতা যেও না, তুমি দুর্বল, তুমি যুবতী। একা বনের পথে এভাবে চলা তোমার নিরাপদ নয়। তুমি দাঁড়াও? কিন্তু কই? ক্লান্ত হয়ে সে নিজেই বসে পড়ল একটি গাছের ছায়ায়।

রাবণ মুগ্ধ হয়ে শুনল। রামচন্দ্র কেমন করে কেঁদে মানুষের হৃদয় জয় করল তার এক নাটকীয় গল্প। গল্পই বটে। রামচন্দ্রের মত রাজনৈতিক নেতা একজন সাধারণ মানুষের মত পত্নী শোকে উন্মাদ হতে পারে রাবণ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে মন্দোদরীর গল্পের ভেতর প্রশ্ন করল ঃ মহিষী এসব করে রামচন্দ্রর কি লাভ হল ? তার কোন গৌরব বেড়েছে কি ? বরং তার দুর্বল ব্যক্তিত্বই লোকচক্ষে প্রকট হয়েছে।

মন্দোদরী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে বলল ঃ তোমার গৌরব যে রামের বিলাপের দরুণ নষ্ট হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনিন্দিত এই লঙ্কা রাজ্য তুমি এখন প্রজাকুলের নিন্দা ও সমালোচনার পাত্র এ খোঁজ রাখ কি ?

তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম রাণী। এসব খবর আমার কানে কোনদিন পৌঁছয় না। এর মধ্যে নিন্দার কি আছে ? রমণী ত বীরভোগ্যা। পুরুষ বীর্য বলে নারী হরণ করে পাশব বলে তাকে ধর্ষণ করে। অনাদি অন্তকাল ধরে তা চলে আসছে। এ ত নতুন কিছু নয়। সীতা হরণের ঘটনা নিয়ে রাম একটু বাড়াবাড়ি করছে।

তবু ননদিনী শূর্পণখার প্ররোচনায় উত্তেজনায় পড়ে এই বয়সে কাজটা করে তুমি ভাল করনি।

মহিষী লোভ লালসার বশে তাকে অপহরণ করিনি। রাম শূর্পণখার মর্যাদাহানি করেছে। লক্ষ্মণ একজন বীর পুরুষ হয়ে যে ধরনের নারী নির্যাতন করেছে তার কোন নজির নেই। আমি লাঞ্ছিতা ভগিণীর অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে সীতাকে অপহরণ করেছি। এতে অন্যায়ের কিছু নেই।

মন্দোদরীর অধরে বিচিত্র হাসি ঝলকে উঠল। হাসলে মন্দোদরীর গালে এই বয়সেও টোল পড়ে। তখন ভীষণ সুন্দর লাগে দেখতে। রাবণ তার অনির্বচনীয় সুন্দর সেই মুখখানির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রাবণের চোখে চোখ রেখে বলল ঃ স্বামী, রাজনীতিতে তুমি এখনও রামের কাছে শিশু। লক্ষ্মণের জঘন্য নারী নির্যাতনের নিন্দার কোন ভাষা নেই। কোন বর্বর মানুষও নারীকে অমন করে অঙ্গ বিকৃত করে দেয় না। লক্ষ্মণের জঘন্য নারী নির্যাতনের কাহিনী শুনলে সভ্য মানুষও স্তম্ভিত হয়ে যেত। কিন্তু লোকচোক্ষে তাকে ঘৃণার পাত্র করে তোলার কোন ব্যবস্থাই তুমি করলে না। একটা চমৎকার সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করলে। অথচ, শূর্পণখাকে সামনে রেখে কত সহজে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে দক্ষিণদেশের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা যেত। রামের আর্য-অনার্যর ঘৃণা ও বিদ্বেষের এক আদর্শ নজির হতে পারত শূর্পণখার অঙ্গ বিকৃতিকরণের ঘটনা। তাহলে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার কোন প্রয়োজন হত না। রামের রাজনৈতিক মতলব যাই হোক তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের উপর একটা বড় ধাক্কা লাগত। তার পক্ষে এই দন্ডকারণ্যে বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। কিন্তু তুমি তাকে একজন রাজ্যচ্যুত বনবাসী যাযাবর বলে চিরদিন উপেক্ষার আবিল চোখে দেখেছ। তাকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করনি। তোমার সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে আজ।

রাক্ষস বংশের সম্ভ্রম মর্যাদার কথা ভেবেই আমি শূর্পণখাকে নোংরা রাজনীতির ঘোলা আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনিনি। তাতে আমার সম্ভ্রম বাড়ত না, শূর্পণখাও

অত্যন্ত ছোট হয়ে যেত। কান্নাকাটি করে লোকের অনুগ্রহ ভিক্ষার মত লজ্জা আর কিছু নেই। আমি মরে গেলেও সম্ভ্রম খোয়াতে রাজি নই।

স্বামী, রাজনীতিতে ঐসব ঠুনকো সম্মানবোধের কোন মূল্য নেই। রামচন্দ্রকেই দ্যাখ, নিজের স্ত্রীকে জনতার সরণীতে এনে সে তোমার চরিত্র হনন করেছে। তোমার যা কিছু খ্যাতি, গৌরব, সুনাম তার উপর কলংক লেপন করেছে। লোকচক্ষে রাবণ বর্বর, হীন, বিবেকহীন রাক্ষস। রামচন্দ্রের বিলাপের এত বড় সাফল্যকে তুচ্ছ করে দেখ না, স্বামী। এখনও চোখ বুজে থেক না। মনে রেখ, তোমার চোখে যা কান্না রামের কাছে তা লক্ষ্যে পেঁছিনোর কৌশল। প্রচারের ভাষা কখনও একরকম হয় না। ঘটনা বিশেষে এক একরকম হয়ে থাকে। মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তুলতে, তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে তার হৃদয় মথিত করতে যে ভাব ও ভাষা সর্বাপেক্ষা উপযোগী রামচন্দ্র তার নিপুণ প্রয়োগ করে এক বিরাট নৈতিক জয় আদায় করে নিয়েছে। তোমার নীতির ব্যর্থতাই তোমাকে এক সংকীর্ণ গণ্ডীতে আটকে রেখেছে। তুমি এগোতে পারছ না, পিছোতেও পারছ না। তুমি উভয় সংকটে ভুগছ।

রাবণ কথা বলতে পারল না। প্রশ্ন করার মত কোন কথা খুঁজে পেল না। শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় বনস্থলী রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মন্দোদরীর মতই রহস্যময়। মায়ামন্ত্রবলে সে যেন রামের অভিপ্রায়, উদ্দেশ্যের গভীরে অবগাহন করে তার কান্না ও যন্ত্রণার সব রহস্য অবগত হয়েছে। তার ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি, পরিস্থিতি ও আচরণ পর্যালোচনার অসীম ক্ষমতা রাবণকে আশ্চর্যান্বিত করল।

কেমন যেন হয়ে গেল রাবণ। বহু দূরে থেকে চিন্তার বাণী আহরণ করে আনল সে। এক আশ্চর্য মুগ্ধতা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠস্বরে। বলল ঃ জান মন্দোদরী, মাঝে মাঝে নিজেকে জিগ্যেস করি রামচন্দ্র কে? কি জন্যে তার জন্ম? কেন সে এ সব করছে আমার বিরুদ্ধে? এসব করে তার কি লাভ? সে আর আমি তো এক নই। তবু আমার বিরুদ্ধে তার লড়াই। কেন?

লুব্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দোদরী বলল ঃ তোমার অনুমান মিথ্যে নয়।

তাহলে বল, আমার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে তার কি লাভ? সাধারণ মানুষের রাজনীতিতে স্থান কোথায়? কোথায় তাদের অস্তিত্ব? তারা কে? চাষী, মজুর, শ্রমিকের মত ছাপোষা মানুষ। তারা রাজনীতির কি জানে? রামচন্দ্র পারবে তাদের নিয়ে আমার শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। রামচন্দ্রকে তারা কতটা সহানুভূতি দেখাল, আর দেখাল না, তার হিসাবের অঙ্ক করে আমি কি করব?

স্বামী এ আলোচনার শেষ নেই। তা-ছাড়া আমি নারী, ওসব ভাল করে বুঝিও না। তুমি সীতাকে ফিরিয়ে দাও। লঙ্কার শান্তি আসুক। আমাদের উদ্বেগ দুশ্চিন্তার অবসান হোক।

মহিষী এখন তা আর হয় না। সীতাকে ফিরিয়ে দেবার সব রাস্তা বন্ধ। এর

সঙ্গে আমার মর্যাদার প্রশ্ন যুক্ত। সীতারও গৌরব তাতে কমবে বৈ বাড়বে না। রামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতারও অবসান হবে না। আসল প্রশ্ন ত শূর্পণখা কিংবা সীতা নয়। এরা উপলক্ষ্য। বিরোধ ও বিদ্বেষের মাধ্যম। দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। ভারতবর্ষের আধিপত্যে কে থাকবে তার নিষ্পত্তির সংগ্রাম। সুপ্রাচীনকাল থেকে আর্য-অনার্য বিরোধের যে ধারাটি চলে আসছে এ ত তারই পুনরাবৃত্তি।

স্বামী ও প্রসঙ্গ থাক। চল, আমরা একটু চাঁদের আলোয় গিয়ে বসি। এত সুন্দর চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল।

॥ সতেরো ॥

পঞ্চবটী ত্যাগ করে এসেও রামচন্দ্র স্বস্তি পেল না। সীতারূপী শবরীর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় সব সময় মন থাকে আচ্ছন্ন। কেবলই একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল বুকে। শবরীর উপর রাবণ কেমন ধরনের আচরণ করবে তা নিয়ে রামের উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার শেষ নেই। ঘৃণায়, আক্রোশে, ক্রোধে, হিংসায় রাবণ তাকে নিয়ে কি করবে কে জানে? রাম খুব উতলা বোধ করল। রামের ভয় শবরীর উপর দৈহিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার অথবা, তীব্র কোন কামার্ত তাগিদে তার সম্ভ্রম যদি লাঞ্ছিত হয় তা-হলে শবরী ঘেন্নায় জীবন ত্যাগ করবে। এবং এই আশংকাতেই তার সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। রাবণ যে তাকে কোনদিন হত্যা করবে না রামচন্দ্র তা জানে। কারণ, হত্যা করা মানে সব কিছুর ইতি হওয়া। মীমাংসার পথ বন্ধ হওয়া। রাজনৈতিক দর কষাকষি করতেই রাবণ তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে শবরীর কাছে জানতে পারে সে আসল সীতা নয়, সীতার বিকল্প, তা-হলে যে কি করবে রাবণ, সে কথা অনুমান করতেও ভয় হয় তার। ভয়ংকর ক্রোধে রাক্ষসপুরীর নির্জন অন্ধকার কক্ষে হয়ত তাকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করবে। সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা শবরী করবে না কোনদিন। আর সে চির-অপরাধী হয়ে থাকবে তার চোখে। রাগ, অপমান আর অযোগ্যতার একটা যন্ত্রণা রামকে বড় বেশি করে আন্দোলিত করে ফেলল। লক্ষ্মণের চোখে মুখেও রামচন্দ্র একটা আতঙ্ক আর দিশাহারা ভাব লক্ষ্য করল।

রামচন্দ্রের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কয়েক পলক চোখ বন্ধ করে শবরীর মুখটা দেখতে পেল কল্পনায়। রাক্ষসপুরীর অন্ধকার কারা কক্ষে বন্দিনী শবরী যেন কেঁদে কেঁদে বলছে ও-গো প্রেমের ঠাকুর তোমার এ কি নিষ্ঠুর খেলা আমার সঙ্গে! বেশ'ত ছিলাম। জনক নন্দিনীর নারী ধর্ম বাঁচাতে তুমি আমাকে আহুতি দিলে। কেন? আমার কেউ নেই, কিছু নেই বলে? তোমার জন্য যা আমার একান্ত নিজের তাও দস্যু রাবণ কেড়ে নিল। কি নিয়ে থাকব আমি? বিশ্বাস, ধর্ম গেলে আর কি থাকল মানুষের? আমার মত হতভাগিনী স্ত্রীলোক পৃথিবীতে বড় কম জন্মে।

অকস্মাৎ একটা হুংকার আর অট্টহাস্য শুনে রামচন্দ্র চমকে উঠল। লক্ষ্মণ চোখের নিমেষে খড়্গ হাতে উঠে দাঁড়াল। বিকটকায় বিশাল দেহী এক রাক্ষস তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উম্মাদের মত হো-হো করে হাসতে লাগল। হাসি থামলে গর্বোদ্ধত গলায় বলল ঃ আমি কবন্ধ। এই গহণ বনের অধিপতি। লংকেশ্বর রাবণের আমি অনুরাগী। তোমরা কে, কেন এসেছ তাও জানি। তোমরা'ত মস্ত বীর। কিন্তু শিশুর মত কাঁদ কেন? কান্না জিনিষটা'ত চিরকাল শিশু আর নারীর দাবি আদায়ের অস্ত্র। তোমরাও অবশেষে সেই পথ ধরলে? ছিঃ, পুরুষের লজ্জা তোমরা। একটা মেয়েমানুষের জন্যে তোমাদের এত কান্নার কি আছে?

কবন্ধের ব্যঙ্গ বিদ্রুপে তীক্ষ্ন বাক্যবাণে জর্জরিত হল লক্ষ্মণের অন্তরাত্মা। ক্রোধে দগ্ধ হল তার সর্বাঙ্গ। চতুষ্পার্শ্বের বায়ু তরঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ চিৎকার করে বলল ঃ চুপ কর বর্ব্বর। তোমার স্পর্ধা দেখছিলাম। আমরা রাক্ষস নই, মনুর পুত্র। মানুষ, রাক্ষসের মত দস্যু নয়। তারা নারী হরণ করে না। নারীকে তারা সম্মান দেয়। নারী তাদের লালসার খাদ্য নয়, আকাংখার অমৃত। প্রতিহিংসার প্রতীক নয়, আনন্দ স্বরূপিণী।

জিভে চুক্ চুক্ করে শব্দ করল কবন্ধ। উজ্জ্বল চোখের কৃষ্ণতারা দুটো যেন ঝিক্ করে হেসে উঠল। বলল ঃ তাও-তো বটে। অবলা নারীকে তুমি আদর করে নাক কাট, তার অঙ্গ বিকৃতি কর। কদিন আগেও আনন্দস্বরূপিণী অয়োমুখীকে সোহাগ করতে গিয়ে তার স্তন দুটিকে কেটে ফেলেছ। তোমার প্রেম নিবেদনের এই রীতি, নারীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশের এই ভাষা বর্ব্বর রাক্ষসেও জানে না।

পাংশু হয়ে গেল লক্ষ্মণের মুখাবয়ব। অপমানের ছায়া ফুটে উঠল সুনিবিড় চাহনিতে। লজ্জায় সে অধোবদন হল। লক্ষ্মণের ভাবান্তর লক্ষ্য করে কবন্ধ রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। স্থির অপলক নেত্রে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ আচ্ছা, জনগণ-মন-অধিনায়ক তুমি বল, নারী হরণের কাজ আর লক্ষ্মণের নারীর অঙ্গ বিকৃতিকরণের মধ্যে কোনটা বেশি বর্ব্বরতা? রাবণ সীতাকে দস্যুর মত হরণ করে নিয়ে গেছে, কিন্তু তার কোন অসম্মান বা অমর্যাদা করেনি। অপরপক্ষে, লক্ষ্মণ যা করল তা কোন সভ্যতা গর্বিত মানুষ করে না। তোমরা নারীর কোন সম্মান তাদের দাও নি।

কবন্ধের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, শ্লেষ মেশানো কূট বাক্যে রামচন্দ্র স্বস্তিবোধ করল না। দেবার মত কোন জবাব খুঁজে পেল না। তার অভিযোগ ছিল স্পষ্ট, ঋজু এবং বলিষ্ঠ। তাদের কার্যের এক নিষ্ঠুর সমালোচক। কবন্ধের কথাগুলো সাধারণ মানুষের বিবেক ও বুদ্ধিকে প্রবলভাবে নাড়া দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে, বিভেদের ক্ষেত্র তৈরী হবে তার মনে। এতকালের শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মানের আসন তাতে টলে উঠবে। বন্ধু আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে। সহযোগিতার পথ বন্ধ হবে। সুতরাং কবন্ধ বেঁচে থাকলে তার সমূহ ক্ষতি হবে। জেনে-শুনে কবন্ধের মত শত্রুকে সে বাঁচতে দিতে পারে না। কবন্ধের নিয়তিই তার কাছে টেনে এনেছে। এসব কথা

দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় তার মনে হয়েছে। তবু রামচন্দ্র বিচলিত হল না। নিজেকে শান্ত সংযত রেখে ধীরে ধীরে তার অভিযোগের উত্তর দিল : সত্যি? লক্ষ্মণ যাদের অস্ত্রাঘাত করেছে তারা রমণীর রূপ, যৌবন, শরীর দেখিয়ে প্রতারণা করতে চেয়েছিল। লক্ষ্মণকে বিভ্রান্ত করে জব্দ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কপট প্রণয় নিবেদনের লক্ষ্য শত্রুতা। আত্মরক্ষার জন্যে শত্রুকে আঘাত করা শাস্ত্রবিরোধী নয়। আর শত্রুর কোন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। তার পরিচয় একটাই—সে শত্রু। শত্রুকে নির্মূল করাই যুদ্ধনীতি।

কবন্ধের মুখে হাসি। চোখে কৌতুক। বলল : রাবণও সীতা হরণ করে কোন অন্যায় করেনি। সীতাও শত্রুতার প্রতীক। কৌশলে শত্রুকে বিপাকে ফেলে, জব্দ করা যুদ্ধ নীতি।

ভুল বলছ তুমি রাক্ষস। রামচন্দ্র শান্ত গলায় বলল : সীতা গৃহবধূ। অন্তঃপুরবাসিনী। রাবণের সঙ্গে আমাদের কারো কোন শত্রুতা নেই। আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীও নই। তার কোন অনিষ্ট চেষ্টাও করিনি। তবু, রাবণ ইচ্ছে করেই বাইরে বাইরে হামলা চাপিয়ে আমার শান্তি সুখ নষ্ট করছে। কিন্তু আমি তার কোন ক্ষতি করিনি। কিংবা তার সংগে কোন বিরোধও সৃষ্টি করিনি। তবু রাবণ সীতাকে হরণ করল। নিরপেক্ষ নির্বান্ধব, সহায়হীন, আশ্রয়হীন, এক বনবাসীর উপর তার মত শক্তিমান রাজার এই হামলা চালানোকে বীরোচিত কর্ম বলে না। এতে তার গৌরব নষ্ট হয়েছে।

আচ্ছা রামচন্দ্র তোমার কোন কাজটা নিরপেক্ষ? তুমি অরণ্যের ঘুম ভাঙিয়াছ। রাবণের অগোচরে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আনুগত্যকে তোমার অনুকূলে এনেছ। তুমি যুদ্ধ করনি। কিন্তু তার উত্তেজনা সঞ্চার করেছ। এটা কি রাবণের শত্রুতা নয়? একে কি রাবণ বিরোধী কার্যকলাপ বলব না? তোমার মত সামান্য নগন্য বনবাসীর সঙ্গে রাবণ যুদ্ধে উৎসাহ পায় না বলেই তুমি গোপনে গোপনে তার শত্রুতা করেছ। রাবণের সীতা হরণ অনুরূপ শত্রুতামূলক আচরণ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

হাঁ, আমিও বিস্মিত হচ্ছি, তোমার স্পর্ধা দেখে। কথায় ও আচরণে তুমি আমার শত্রুতা করছ। তোমার সঙ্গে আমিও শত্রুর মত আচরণ করব। অস্ত্র তুলে নাও বাক্যবাগীশ। যতক্ষণ না আমাদের একজনের মৃত্যু হচ্ছে ততক্ষণ যুদ্ধ করব আমরা।

আমি নিরস্ত্র। যুদ্ধ করব বলে আসিনি।

তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি না মায়াবী রাক্ষস। বীর করবে মুখোমুখি লড়াই। হয় জয়, না হয় পরাজয়।

উত্তেজনা প্রকাশের অনেক সময় পাবে রাঘব। আমার মুণ্ডপাত করে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। মানুষের মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছে তাকে ঠেকাবে কোন অস্ত্রে? একমাত্র বন্ধুর আছে সমালোচনার অধিকার। সমালোচনা, নিন্দা নয়।

সঠিক পথে চলার মন্ত্রণা। লক্ষ্মণের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ আজ তোমাকে নির্বান্ধব করেছে, এ খোঁজ রাখ কি? অয়োমুখীর দোষ, ত্রুটি, অপরাধ যাই হোক, লক্ষ্মণের নিষ্ঠুরতার কোন পরিমাপ হয় না। তার স্তন, নাসিকা ছেদন করে তার নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমন বিকৃত করার এই নারকীয় কর্মকে কেউ ক্ষমার চোখে দেখবে না। কোন কৈফিয়তও নয়। অরণ্যের মানুষের ঘুম ভেঙেছে। একদিন তুমি তাদের অধিকার সচেতন করেছ। তাদের পরিচ্ছন্ন চেতনা যখন তোমার বর্বরতার কৈফিয়ৎ চাইবে, কি জবাব দেবে? আমি তাদের হয়ে তোমাকে সতর্ক, সচেতন করতে এসেছি।

রামচন্দ্র নির্বাক বিস্ময়ে কবন্ধের দিকে চেয়ে রইল। কবন্ধের মত এরকম অন্তরঙ্গ সৎ পরামর্শ কেউ কখনো দেয়নি তাকে। নিজেও সে এরকম কোন প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেনি। কবন্ধর কথায় যথেষ্ট যুক্তি ও সত্য ছিল। মনে হল, কবন্ধ তাকে আর এক নিরপরাধীকে হত্যা করা থেকে বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় দীন হয়ে গেল। বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল, কবন্ধ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে তার কাছে এসেছে। পরক্ষণেই একটা হীন সন্দেহে তার বুকের ভেতর পাক খেল। মায়াবী রাক্ষসের মোহবন্ধ করার কোন মায়া নয়'ত? হিতৈষী সেজে তাকে কোন বিপদে ফেলতে পারে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগে, সন্দেহে তার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। ম্লান একটু হেসে স্তম্ভিত গলায় বলল: তুমি যেই হও, এই অপমান মাথায় নিয়ে এখান থেকে আমি যাব না। তুমি মানুষ ক্ষেপানোর মন্ত্র জান। তোমাকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেব না। হয় যুদ্ধ কর, না হয় মর। আমার হাতে মৃত্যু তোমার ললাট লিখন।

কবন্ধ নিমেষে একটা প্রস্তর খণ্ড তুলে নিয়ে রামচন্দ্রের আঘাতকে প্রতিহত করল। বলল: রাঘব মানুষ একটা সূত্র ধরে জন্মায়। এই জন্মের কারণ সে নয়। তবু তার প্রতি ঘৃণা কিংবা একটা পূর্ব ধারণা বা আক্রোশ নিয়ে বিচার করাও ঠিক নয়। রাক্ষস তোমার শত্রু। কিন্তু রাক্ষস মাত্রেই কি তোমার শত্রু? আমি'ত তোমাকে শত্রুর চোখে দেখি না। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি বলে নিরস্ত্র হয়ে এসেছি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তোমাকে সাবধান করতে ভয় পাচ্ছি না।

রামচন্দ্র তার উত্তোলিত খড়্গ ধীরে ধীরে নত করল। কিন্তু কবন্ধকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাক্ষসদের কূটকৌশলের অভাব নেই। কবন্ধের নিরুত্তাপ আচরণ এবং মোটামুটি বুদ্ধিমানের মত চিন্তা করার শক্তি দেখে সে একটু অবাক হল। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: তাহলে তোমার জাতির উপর বিশ্বাস-ঘাতকতা করছ কেন?

তোমার সন্দেহ অমূলক। আমি কোনদিন রাক্ষস নই। ঋষি স্থূলশিরার কামাগ্নিতে আমার জন্ম। আমি কুদর্শন বলে জন্মেই পরিত্যক্ত হই। রাক্ষস মাতার পরিচর্যায় আমি বড় হই। তারপর নিজের চেষ্টায় এই ক্রৌঞ্চারণ্যের অধিপতি হয়েছি। রাবণের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। তার সংগঠন শক্তি আমাকে তার অনুরাগী

করেছে মাত্র। কিন্তু আমি মনে প্রাণে তোমাদের লোক। আমার ধমণীতে আর্য রক্ত। তোমার সাফল্যে আমার সুখ, জয়ে আনন্দ। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের একজন দাস। তোমাকে সৎপরামর্শ ও মিত্রের সন্ধান দেব বলেই এসেছি।

রাম কবন্ধকে লক্ষ্য করছিল খুব নিবিষ্ট চোখে এবং অখণ্ড মনোযোগে। এতক্ষণ করেনি, দরকারও হয়নি। আর পাঁচজন রাক্ষসের চোখেই দেখেছিল তাকে। এখন মনে হচ্ছে সে আর রাক্ষস নয়, তাদেরই কেউ।

কবন্ধ একটা বড় রকমের শ্বাস ফেলে বলল ঃ যার সঙ্গে মিত্রতা করলে তুমি উপকৃত হবে সে হল কিষ্কিন্ধ্যার বিতাড়িত রাজপুত্র সুগ্রীব। এই বানর জাতি সমর-কুশলী, সাহসী এবং নির্ভীক। এঁকে বানর বলে অবজ্ঞা কর না। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তোমার ষোলকলা পূর্ণ হবে। হনুমানের মত বিচক্ষণ কূটকৌশলী মন্ত্রণাদাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধীর ও স্থির সাহসী সেনাপতিকে মিত্ররূপে লাভ করলে, সীতা উদ্ধারের কাজ ত্বরান্বিত হবে। ঋষ্যমূক পর্বত শিখরে তারা গোপনে অবস্থান করছে।

রামচন্দ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কবন্ধের দিকে। একটু বিভ্রমের মত। পৃথিবীটা যেন একটা মায়ার রাজ্য। এখানে সব কিছু অদ্ভুত।

রাম সংকটে পড়ল। বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে সে বেশি লাভবান হবে কয়েকদিন ধরে মনে মনে তার পর্যালোচনা করল।

বালী সাহসী, উদ্যমী, বীর। সে কিষ্কিন্ধার রাজা। অসীম তার শক্তি। এমন কি রাবণের মত ভুবন বিখ্যাত বীর তার বীরদর্প এবং শক্তিগর্ব চূর্ণ করার জন্য বারংবার তার রাজ্যে হানা দিয়েছে। তবু, পরাভূত করতে পারেনি। নিজেই পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গেছে স্বরাজ্যে। রাবণের দম্ভ, গর্ব চূর্ণ করেছে বালী। তাই, রাজ্যের নিকটতম শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে রাবণ এক রাজনৈতিক সখ্য সম্পর্ক স্থাপন করল। সখ্যসূত্রে বালী কোন অনুরোধ করলে রাবণের সাধ্য নেই তাকে অবহেলা কিংবা অমান্য করে। থাকবে কোথা থেকে ?

চতুঃসমুদ্র বন্দনা করতে বালী একবার দক্ষিণ সমুদ্র তীরে গিয়েছিল। রাবণও খুব গোপনে সেখানে এসেছিল। সন্ধ্যাবন্দনায় বালী ধ্যানস্থ হলে রাবণ চুপিচুপি অতর্কিতে পিছন থেকে তাকে আক্রমণের মতলব করল। কোন প্যাঁচে তাকে ঘায়েল করবে তার কৌশল স্থির করছিল মনে মনে। বালী কেমন করে তা টের পেয়ে অতর্কিতে ঘুরে দাঁড়ায় এবং রাবণকে জাপ্টে ধরে। বালীর বলিষ্ঠ দু'বাহুর পীড়নে রাবণের নাভিশ্বাস উঠল। একটু বাতাসের জন্যে সে শুধু হাঁকপাঁক করতে লাগল। অবশেষে বালীর সর্তে রাজি হয়ে ছাড়া পেল। প্রতিশ্রুতি দিল, জীবনে কোনদিন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তার কোন অনুরোধও অমান্য করবে না।

সুতরাং বালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে রাম বিনা যুদ্ধে এবং কোন ঝুঁকি না নিয়ে সীতারূপী শবরীকে উদ্ধার করতে পারবে। রাবণের ব্যক্তিগত মর্যাদার লড়াইর ইতি ঘটবে। তার আশা ভঙ্গ হবে। কিন্তু মন থেকে রাবণের শত্রুতা কোনদিন মুছবে না। এতে শুধু শত্রুতা জীইয়ে রাখা হবে। দেবতা-মানুষের সঙ্গে রাক্ষসের চিরন্তন বিরোধ থেকে যাবে অমীমাংসিত। শুধু তাই নয়, দেবতা এবং দক্ষিণদেশের বিরোধী শক্তিগুলি রামকে সমর্থন করে যে প্রকাশ্য বিরোধিতা করল, রাবণ কখনও তাকে ক্ষমা করবে না। তখন মর্যাদার লড়াইর লক্ষ্য ক্ষেত্র ও পাত্র বদল হবে। এদের স্বার্থ বিপন্ন করে বালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রামের কাম্য হল না।

রামের আরো মনে হল বালীর সঙ্গে মিত্রতা করলে তার তেরো বৎসরের উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং সাধনা জলাঞ্জলি দিতে হয়। এজন্যে সে বনবাসে আসেনি। রাক্ষসকে উৎখাত করা এবং রাবণকে নির্মূল করার সংকল্প তার মনে। রাবণ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় এখন বিপন্ন। চতুর্দ্দিক থেকে সে কোণঠাসা। একা। নিঃসঙ্গ। ঘরে বাইরে তার শত্রু। ঘটনা পরম্পরায় তার সঙ্গে রাবণের সংঘর্ষের বাস্তব অবস্থা উদ্ভব হয়েছে। এই অবস্থা তাকে তৈরী করতে হয়েছে। শত্রুর উপর আক্রমণ হানার এই অনুকূল অবস্থাকে বালীর বন্ধুত্বের বিনিময়ে কেন সে নষ্ট করবে ? তা-ছাড়া বিনা যুদ্ধে সীতা উদ্ধার হলে সীতার কোন গৌরব থাকবে না। অনুগ্রহের মূল্যে সীতার রাজকীয় দীপ্তি মলিন হবে। তার নিজের লাঞ্ছনার বা কি সান্ত্বনা থাকবে ? লোক-চক্ষে তার নিজেরও গর্ব করার কিছু থাকবে না। বীর্যের গর্বে যখন পুরুষ নারীকে গ্রহণ করে তখন পৌরুষের গৌরব বাড়ে। নারীও নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করে। ভয়াল আবর্ত্তের মধ্যে বীর যখন অকুণ্ঠ উৎসাহে ঝাঁপ দেয়, যুদ্ধের তাণ্ডবে সে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঞ্ছিতাকে ছিনিয়ে আনে, তাকে জয় করে তখন সেই বীর্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নারী পরম প্রাপ্তির আনন্দে কৃতার্থ হয়। বীরও চরিতার্থ হয়।

রামচন্দ্র অনেক ভাবল। বালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে তার নিজের সম্মান, গৌরব, মর্যাদা কিছু বাড়বে না। বালীর প্রবল ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, তেজ, সাহস, শক্তি, কর্মে পটুতা, বুদ্ধি বিচক্ষণতা তাকে এক অনন্য পুরুষ করেছে। কারো সাহায্য অনুগ্রহের প্রত্যাশী নয় সে। বালী বন্ধু হলে তার কাছ থেকে শুধু গ্রহণ করতে হবে, বিনিময়ে তাকে কোন সাহায্য বা উপকার করতে পারবে না। অনুগ্রহ, দয়া নিয়ে যে বন্ধুত্ব হয় তাতে শুধু হীনমন্যতাই জন্মে। রামচন্দ্র ভাল করেই জানে, রাজনৈতিক মিত্রতা কখনও সমানে সমানে হয় না। অন্তরের আনুগত্য বন্ধুত্বের বড় বন্ধন। পারস্পরিক সহ-যোগিতায়, স্বার্থে, অন্তরের আনুগত্যে তা মজবুত হয়। সুতরাং, অনুকম্পা নয়, সহযোগিতা, স্বার্থ ও আনুগত্য লাভের সম্ভাবনা বিচার করে রাজনৈতিক মিত্র অনু-সন্ধান করা উচিত। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা বন্ধন সুদৃঢ় হয়। একমাত্র সুগ্রীবের সঙ্গে এ ধরণের বন্ধুত্ব হতে পারে। সুগ্রীব তার মতই রাজ্যচ্যুত। নির্বাসিত রাজপুত্র। পত্নী রুমাকে তার অগ্রজ বালী সবলে গ্রহণ

করেছে। তার এবং সুগ্রীবের দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর মিল আছে। তাদের বন্ধু হওয়ার পথে এটা হবে সহজ মাধ্যম।

রামের সিদ্ধান্তকে লক্ষ্মণ অনুমোদন করল না। কঠোর ভাষায় অগ্রজের সমালোচনা করে বলল ঃ ভাইয়া, বনবাসটা আমাদের কখন রাজনৈতিক ব্যাপার হয়ে উঠল টের পেলাম না। জনকল্যাণকর কাজের নামে তুমি যে রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়লে তা জানতে, বুঝতে আমার খুব দেরী হল। কিন্তু তুমি তোমার নীতির লড়াইয়ে জিতবার জন্যে যাদের সাহায্য নিচ্ছ, জিতবার পর তারা যা চাইবে, না দিয়ে তুমি পারবে না।

মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হল রামের মুখাবয়ব। কয়েকমুহূর্ত নীরবতার পর নিরুত্তেজক স্বরে বলল ঃ লক্ষ্মণ, রাজনৈতিক শাস্ত্রের মুখস্থ বুলি নিয়ে রাজনীতি করা চলে না। রাজনীতিতে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির নীতিগুলি সর্বদা পরিবর্তনশীল। এক কালের রাজনীতিবিদ্‌রা তাদের কালের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা যা বলে গেছে পরবর্তীকালেও যে তা ঠিক ঠিক খাটবে এমন কোন মানে নেই। জীবনটা থেমে নেই। তার সমস্যাগুলোও এক ধরণের নয়। রাজনীতির কারবার বাস্তব নিয়ে। আদর্শ তার লক্ষ্য। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবের তফাৎটুকু সর্বদা মেনে চলতে হবে। রাজনীতি সর্বদা দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ, সমস্যা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধা নিয়ে স্থির হয়।

কিন্তু সুগ্রীব বালীর সঙ্গে যা করেছিল তাতে তার গৌরব নেই, আছে অপমান।

রাজনীতিতে শুচিবাইগ্রস্ততার কোন স্থান নেই। যে প্রকৃত কর্মী, সাহসী, বীর, যোদ্ধা, যার যোগ্যতা আছে, যে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেক অন্যায় তার দেহ স্পর্শ করে না। সাফল্যটাই তখন বড় হয়ে উঠে। সামনে আমাদের মর্যাদার লড়াই। তাতে জয়লাভই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। জয়ের পরের দিনগুলি আর এক জটিলতা সৃষ্টি করবে জানি। অনেক মিথ্যে দিয়ে জয়লাভের পর একটা বড় মূল্য দিতে হবে তাও জানি। কিন্তু থামবার উপায় নেই। পেছোবারও পথ নেই।

রাম লক্ষ্মণ কথা বলতে বলতে ঋষ্য মূক পাহাড়ে পৌঁছে গেল।

পাহাড়ের উপর থেকে ঢালু রাস্তার নীচ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। হনুমান হঠাৎ দেখতে পেল বেশ দূরে দু'জন লোক উঠে আসছে। এই পথে যারা চলাফেরা করে তারা খুব সাধারণ দুঃস্থ বানর। ফলমূল এবং কাঠ আহরণ করতে আসে। কিন্তু আজ যে লোক দুটি পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উঠে আসছে তারা বানর নয়। পরণে গেরুয়া বসন, বুকে উত্তরীয়, পিঠে তূণ, হাতে ধনু এবং খড়্গ। উঠে আসছে দু'জনে মাথা উঁচু রেখে, পিঠ সোজা করে। ঢালু পথে তাদের শরীর একটুও বাঁকছে না। একটানা পায়ের পর পা ফেলে অবলীলাক্রমে উঠছে। অপরাহ্নের রোদ পড়েছে পাহাড়ের গায়। আকাশ নেমে এসেছে পাহাড়ের পাদদেশে। নীল আকাশের অর্ধবৃত্তাকারের পটভূমিতে খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠে আসা দেখতে হনুমানের ভীষণ ভাল লাগল। মনে হল,

মানুষ এমনি জীবন পথে উঠে আসে, নিজের আনন্দিত পরিশ্রমে নীল আকাশের উদার অসীমকে পটভূমি করে।

সমস্ত উঁচু পথে উঠে এসে লোক দুটি খানিকক্ষণ দাঁড়াল। ক্লান্ত হয়ে থামল কিনা বুঝতে পারল না হনুমান। তবে, দাঁড়িয়ে তারা এধার ওধার দেখল, কিছু যেন ঠাহর করতে চাইল। গাছের ডালের দিকে তাকাল। বুঝি বা দেখল কোন গান গাওয়া পাখি, অথবা প্রজাপতিকে। তারপর এগোতে লাগল। কিছুদূরে এসে আবার থামল। পথের ধারে ছোট্ট একটা ঝুপরি থেকে বেরিয়ে এল একটি অর্ধনগ্ন পুরুষ। ঝুলি থেকে কি যেন বার করে দিল তার হাতে। নিশ্চয়ই খাদ্য। পুরুষটির সঙ্গে দু'চারটা কথাও বলল। এবার দিক পরিবর্ত্তন করে বড় বড় পা ফেলে এগোতে লাগল। ঋষ্যমূক শৃঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে হনুমান বৃদ্ধের ছদ্মবেশে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

সরল গ্রাম্য মানুষের মত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল : মহাত্মন্ আপনারা কে? দেখে মনে হয় বিদেশী। কিন্তু রাজর্ষির বেশে এখানে এসেছেন কেন? মস্তকে তপস্বীর জটা, হস্তে বিশাল ধনু, পৃষ্ঠে তূণ, দক্ষিণ করে খড়্গ। মহাশয়রা এখানে এসেছেন কেন? এ স্থান অতি ভয়ংকর। প্রাণ নিয়ে কেউ এখান থেকে ফেরে না। আপনি যদি সেই পথে যেতে চান, তবে দেরি করবেন না। যত বড় বীর আর যোদ্ধা হোন্ আপনি, মহাবীর সুগ্রীবের হাত থেকে রেহাই নেই। আরে, অমন করে চেয়ে চেয়ে দেখছেন কি? বড় মায়া হচ্ছে জীবনের উপর তাই না? হবেই'ত। বালী আপনার মত অনেক যোদ্ধা পাঠিয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ ফেরেনি।

রাম কিছুক্ষণ অবাক চোখে ছদ্মবেশী হনুমানের দিকে চেয়ে রইল। রহস্য গম্ভীর চোখের তারায় এক আশ্চর্য কৌতুক হাস্যের মাধুর্য। অধরোষ্ঠেও মৃদু মধুর হাস্য রেখাটি এক অপূর্ব ছন্দে ফুটে উঠল। রামচন্দ্রের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ও স্থির শান্ত দু' নয়নে এমন একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল যে হনুমান তাকে কিছুতে উপেক্ষা করতে পারল না। তার প্রগলভতা, কৌতুক সহসা স্তব্ধ হল। মনে হল, আগন্তুকের তীক্ষ্ন সন্ধানী চোখ যেন তার ছদ্মবেশকে টের পেয়েছে। ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলল হনুমান—মহাত্মন, ঋষ্যমূক পাহাড় শিখরে বালীর অনুজ ভ্রাতা সুগ্রীব আছেন। কার্যতঃ তিনি ভ্রাতা কর্তৃক বিতাড়িত ও নির্বাসিত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল রামচন্দ্রের। বলল : আমি রামচন্দ্র, ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। মহাবাহু সুগ্রীবের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

হনুমান সবিস্ময়ে বলল : তুমি রামচন্দ্র। আমি সুগ্রীব বান্ধব ও সচিব হনুমান। আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। প্রগলভতা মার্জনা কর। বহুকাল ধরে তোমার নাম ও গুণাবলী অবগত আছি। আজ তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলাম। রাজপুত্র সুগ্রীবও তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে।

বালী ও সুগ্রীবের ভ্রাতৃপ্রেমে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ একটি নারীকে নিয়ে। সে নারী হল সুষেণ কন্যা তারা। তারার রূপ-লাবণ্য ও শ্রীর তুলনা নেই। সেই রূপ দেখে সুগ্রীব মজল। তাকে পাওয়ার জন্যে উন্মাদ। কিন্তু সে তার ভ্রাতৃজায়া। বলবান বীর ভ্রাতার পত্নী, বীর্যের গর্বে কোনদিন তাকে জয় করার স্বপ্নও দুরাশা। অথচ, বাসনা প্রবোধ মানে না। বুকের ভেতর কামনার শিখা দপ্‌দপ্ করে। আর রাত্রে দেহের জ্বালায় সারা অঙ্গ পোড়ে। দেহের দাহ জুড়োতে শোবার ঘরে টেনে আনে সুন্দরী সুন্দরী দাসীদের। তবু জ্বালা কমে না। লেলিহান অগ্নিশিখার মত ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।

স্নেহময়ী পত্নী রুমাও পারল না সুগ্রীবের অতৃপ্তি মেটাতে। তার দাহ জুড়োতে। প্রতিদিন তারার সঙ্গে প্রাসাদে দেখা হয়। দেখলে সুগ্রীবের বুকের ভেতরটা কেমন করে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সুগ্রীবের উদাস করা দুটি চোখের নীরব ভাষা তারার বুঝতে কষ্ট হয় না। কেবল তার সামনা সামনি পড়ে গেলে তারা কেমন অপ্রস্তুত হয়। সৌজন্য দেখাতে মুচকি হাসে। মনে মনে ভাবে সুগ্রীব কেন বুঝতে চায় না, সে ঘরের গৃহিণী। রাজ্যের রাণী, রাজার মহিষী। নির্জন নিভৃতের কামিনী নয়। সর্বক্ষণ তার পাশে রাজা বালি, আর একপাশে আছে পুত্র অঙ্গদ। তাছাড়া কত পাত্র-মিত্র পরিজন, তবু মূঢ় দেবরের একি নির্লজ্জ ব্যবহার!

বালিরও চোখে পড়েছে দৃশ্যটা। পড়লেও কিছু না বুঝেই যেন মুচকি হাসে। রাণী যে তার পরমা সুন্দরী তারা। পুরুষের গর্ব এবং মর্যাদা সে। তার রূপ লাবণ্যে পুরুষ চিত্ত যদি না একটু আবেগপ্রবণ হয় তাহলে বুঝবে কেমন করে তারা সুন্দরী? পর পুরুষের আকাংখার ধন হলেই তবে পত্নী সম্পর্কে অহংকার হবে, অন্যের চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে হবে। তাই কোন স্বজাতীয়, আত্মীয় কিংবা অন্য পুরুষ যখন তারার রূপের সমাদর করে শ্রীর স্তুতি করে, কিংবা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকে লেহণ করে তখন বালির মনটা একটা বিজয়ীর গর্বে, গৌরবে, অহংকারে টইটুম্বর হয়ে যায়। কামার্ত পুরুষের চকচকে লোভাতুর দৃষ্টির দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে বেশ একটা মজা উপভোগ করে। বালীর নীরব ঔদাসীন্য সুগ্রীবের স্নায়ুকে মাতাল করে তুলল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যায়। কিন্তু সুগ্রীবের অন্তরে কামনার আগুন নেভে না। সেই কামনার কোন ক্লান্তি নেই। রজনী প্রভাত নেই। অহরহ তুঁষের আগুনের মত জ্বলে। আকাংখা যেন অনির্বাণ করে জ্বালিয়ে রাখল তার বাসনাদীপকে। অন্তর ভরে রইল জ্বালা আর দাহ।

সুগ্রীবের এই মুগ্ধতা, তারাকে বিচলিত করে। তার দীন নম্র প্রেম নিবেদনে তারার অন্তর ভরে থাকে। সেই সঙ্গে রুমাকে মনে পড়ে। বেচারা নিশ্চয়ই সুখী হয়নি। কত দুঃখী। রুমার জন্য কষ্ট হয় তারার। কল্পনায় রুমার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। স্বামীর নিষ্ঠুর অবহেলার জন্য হয়তো কত কষ্ট হয় তার। মনের যন্ত্রণা চেপে সে সারাদিন ঘর গেরস্থলীর কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। মনের তল থেকে একটা সুতীব্র ঘৃণা অকস্মাৎ তার বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠল। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায আচ্ছন্ন হল তার মন। মনে হল, সুগ্রীব তার রূপ যৌবনের অপমান, তার নারীত্বের অপমান। যন্ত্রণায় কঠোর হয়ে উঠল তার মুখখানা। দুঃসহ দুশ্চিন্তা, বিষাক্ত একটা পোকার মত তার মাথার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল। যদি কোন দুঃসময়ে স্বামী তাকে সন্দেহ করে! সুগ্রীবের নির্লজ্জ লোলুপ চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি সূঁচের মত বিঁধে তার মাথার ভেতর। একটা কামুক, চরিত্রহীন লোকের জন্যে সে কেন দুশ্চরিত্রা হয়ে যাবে? দুঃস্বপ্নের মত মন থেকে সব মুগ্ধতাকে মুছে ফেলার জন্য সে সুগ্রীবকে তার কক্ষে ডেকে পাঠাল।

নিঃশব্দ পায়ে সুগ্রীব কক্ষে প্রবেশ করল। শ্বেতশুভ্রফেনপুঞ্জে নরম শয্যায় একটি রঙীন ফুলের মত গা এলিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসেছিল তারা। স্বচ্ছ রক্তাভ রঙের মিহি বস্ত্রে আবৃত তার দীর্ঘ তনু যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। দৃঢ় কঠিন দুটো সুডৌল স্তনে পড়েছে লালচে আভা, নিতম্বের যৌবনশ্রী, জঙ্ঘায় ছায়াময় মরীচিকা সুগ্রীবের স্নায়ুকে বিকল করে দিল। সুপুষ্ট আপেলের মত গোলাপী গালে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের রেখা সুগ্রীবের বড় বড় নীল চোখ দুটি কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করল। সে কথা বলতে পারল না।

কয়েকমুহূর্ত মাথা হেঁট করে সে নিজের পায়ের আঙুল, পরিধানের বস্ত্র দেখল। কেমন একটা তীব্র আবেগে তার অন্তরটা হঠাৎ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। সুগ্রীবের স্বপ্নাচ্ছন্ন দুই চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত জিগ্যেস করলঃ আচ্ছা দেবর, চতুর্দিকে লোকজনের মধ্যে অমন দীন নয়নে আমাকে দেখতে তোমার লজ্জা করে না? এত কি দ্যাখ?

সুগ্রীবের শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। পাথরের মূর্তির মত চেয়ে রইল সে। কামনার আগুন নিভে গিয়ে চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ভার ভার গলায় বললঃ ঠিক জানি না, কেন দেখি?—কি দেখি?

বঙ্কিম হয়ে উঠল তারার ভুরু যুগল। বললঃ জান বৈকি?

জানো যদি, বল।

বলতে লজ্জা হয়।

কেন?

বিধাতার দান এই নারীদেহের রূপলাবণ্য শুধু ভোগ করার জন্যে উন্মত্ত না-হয়ে, শ্রদ্ধা করতে শেখ দেবর। তোমার মঙ্গল হবে—

এ কথার অর্থ—

তোমার রুমা আছে।

পাশে নিয়ে শোবার মত একজন মেয়েমানুষ সে।

তারা অধোবদন হল। লজ্জায় রাঙা হল তার মুখাবয়ব। ঘৃণায় আলোড়িত হয়ে উঠল তার চেতনা। ভর্ৎসনা করে বলল ঃ ছিঃ, ওভাবে কথাটা বলা কি খুব পৌরুষের কাজ হল তোমার ?

ধক্ করে উঠল সুগ্রীবের বুকের ভেতরটা, ক্লান্ত আর হতাশ গলায় বলল ঃ কেন তুমি ডেকেছ ?

তোমার জন্যে। তুমি কেন এমন পাগল হয়েছ ?

জীবনের জন্য। অকৃতার্থ জীবনকে পরিহার করে জীবনকে পাবার জন্যে।

তুমি কেন বোঝ না, ওভাবে পাওয়া যায় না। এ জীবনে পাবেও না। প্রেমই নারীর সাধনা, প্রেমই মহত্ত্ব—প্রেমই তার কলঙ্ক।

বাসনার অমৃত শিখা প্রেম। যেখানে অনন্ত বাসনা, সেখানে অমর প্রেম।

তোমার কাছে যা অমর প্রেম, অন্যের কাছে তা মরণের ফাঁস।

মৃত্যুর উপহার নিয়ে এসেছি তোমার আত্মার আশ্রয়ে। তুমি আমাকে গ্রহণ কর। মৃত্যুত্তীর্ণ কর একটি চুম্বনে।

দেবর !

দেবী তোমার ঐ কুহক চোখ আর জ্বলন্ত রূপের কি চুম্বক টান, আর দুর্দান্ত দাহ। তুমি আমার অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেমশিখা।

ছিঃ ছিঃ। ধিক্কার দপ করে উঠল তারার কণ্ঠস্বরে। দু'হাতে সে কান ঢেকে বলল ঃ সত্যিই তুমি অমানুষ হয়ে গেছ। নইলে, এমন কথা কেউ মাতৃসম ভ্রাতৃবধূর সামনে উচ্চারণ করে না। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

দেবী, তুমি মাতা নও, কন্যা নও, জায়াও নও। তুমি আমার অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেমশিখা। আমি চাই তোমাকে।

আহত বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠল তারা। ধিক্কারে ঘৃণায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। চিৎকার করে বলল ঃ তুমি যাও। নিজের সর্বনাশ ডেকে এন না।

সুগ্রীব তবু নড়ল না। ভয়ে দুরু দুরু কাঁপছিল তারার বুক। কিন্তু ঘৃণায় খদ্যোতের মত জ্বলতে লাগল তার দুই চোখ। আদেশের স্বরে বলল ঃ যাও বলছি। আর এক মুহূর্ত দেরী করলে বিপদসংকেতের ঘণ্টী বাজিয়ে আমি তোমার মত পশুকে হত্যা করব…প্রাণের যদি মায়া থাকে তা-হলে এখুনি বেরিয়ে যাও।

নিজের দীর্ঘ দেহের অপার স্বাস্থ্যের মহিমার দিকে গর্বের দৃষ্টিতে একবার ভাল করে তাকিয়ে সুগ্রীব তারার কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

তারার গর্বোদ্ধত সতীত্বের অহংকার সুগ্রীবের বুকে আগুন জ্বালল। কেমন করে তারাকে বধূরূপে পাবে সে কথা ভাবতে গিয়ে অকস্মাৎ তার দেশাচার ও প্রথার

কথা মনে পড়ল। বানরজাতির প্রথা হল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবর্তমানে তার পরবর্তী অনুজ ভ্রাতাই হবে জ্যেষ্ঠের বিধবা পত্নীর ভর্তা।

অমনি এক উচ্চকিত রক্তস্রোত বয়ে গেল তার সারা শরীরে। ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে। কয়েকমুহূর্ত কী ভেবে নিজের মনে বলল ঃ বেশ তাই হবে। বালিকে বধ করার কাজ খুব কঠিন নয়। খল যুদ্ধে তাকে হত্যা করে একসঙ্গে বহু আকাংখিত কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসন এবং তার অনন্ত বাসনার দীপ শিখা তারাকে একসঙ্গে লাভ করবে। এক ঢিলে দুই পাখী মারতে হবে। মনটা খুশিতে উত্তাল হয়ে উঠল সুগ্রীবের।

আচমকা একদিন সুগ্রীব গোপনে মায়াবীর সঙ্গে মিলিত হল। মায়াবী একটু অবাক হল। বিস্ময়টা নিজের ভেতর চেপে রাখল। মনে মনে অনুভব করতে পারছিল ক্ষমতা লোভী সুগ্রীবেরর ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিণাম এমন এক জায়গায় পৌঁছিয়েছে যেখানে অন্যের সাহায্য ও সমর্থন তার দরকার হয়েছে। কৌতূহল এক অদ্ভুত জিনিস। মায়াবী নিজের মনে কত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা করল। তারপর বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল ঃ মহাবাহু সুগ্রীব আপনার সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের অভিপ্রায়কে অভিনন্দিত করি এমন ভাষা আমার জানা নেই।

সুগ্রীব একটু ইতস্তত করে হাসল। বলল ঃ না, কোন অভিপ্রায় নিয়ে আসিনি। বন্ধু ভেবেই এসেছি। অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করব। সত্যিমিথ্যা জানি না। আমি নিজের চোখেও দেখিনি। কিন্তু খুব বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি। কথাটা যে একেবারে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেব তাও নয়। ভ্রাতার অধঃপতন, পদস্খলন থেকে উদ্ধার করার এক মহান মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে আমি একটা আবেদন করতে এসেছি। আমরা আপনাদের চিরশত্রু। বালীর বিক্রম সইতে না পেরে আপনার পিতা দুন্দুভি পরলোকে গেছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা যে পরস্পরের শুভাকাংখী হতে পারি তার এক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে আমি এসেছি।

সুগ্রীবের সুচতুর কূটভাষণে মায়াবী অভিভূত হল। অথচ কি কারণে এমন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল তা মায়াবীর হৃদয়ঙ্গম হল না। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মায়াবী ভেবেছিল, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কোন বেচ্ছা শোনাতেই সুগ্রীব তার কাছে এসেছে। কিন্তু সে তার কিছুই করল না। সুগ্রীবের উদ্দেশ্যও খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার ভাষণে চুম্বক আকর্ষণ আছে। বিভ্রান্ত হওয়ার ভয়ে মায়াবী নিজেকে সংযত ও সতর্ক রাখল। বলল ঃ আপনি যা শুনেছেন অকপটে বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

সুগ্রীব কয়েক মুহূর্ত ভাবল। মনে মনে গল্পটাকে গুছিয়ে নিয়ে বলল ঃ মৃত স্বামীর সম্পদের গরবিনী উত্তরাধিকারিণী আপনার ভগিনীকে দস্যুরা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছিল। অগ্রজ বালি তা জানতে পেরে দস্যুদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করল। অভাগিনী কৃতজ্ঞ নারী বালীর চরণে মাথা ঠেকিয়ে বলল ঃ বীর, নিশ্চিত মৃত্যু আর

লাঞ্ছনা থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। সামান্য নারী আমি। কি আছে আমার, যা তোমাকে দিতে পারি। তুমি কে জানি না। আমি দুন্দুভিকন্যা কাঞ্চনবালা।

অমনি বালীর মুখ চোখের রঙ, রেখা বদলে গেল। কমনীয়তা অন্তর্হিত হল। চোয়াল শক্ত হল। চোখ দুটি তীক্ষ্ণতায় জ্বলতে লাগল। কাঞ্চনাবালার নরম দেহটাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে পিষতে লাগল। উন্মত্তের মত চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল। তার মুখে শরীরে পাশব পীড়নের একটা যন্ত্রণা চিহ্ন ফুঠে উঠল। তাতেও পরিতৃপ্ত হয়নি বালি। কাঞ্চনবালাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সে এক গুহার মধ্যে আটকে রাখল। সেখানে দিনের পর দিন মত্ত উল্লাসে প্রমত্ত নিশিযাপন করে। রাজ-কার্যে তার মন নেই, প্রজারা দর্শনে এসে ফিরে যায়। কাঞ্চনবালাকে আপনি উদ্ধার করুন। রক্ষা করুন বালীকে।

মায়াবী অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলল না। যন্ত্রণায় পান্ডুর হল তার মুখবর্ণ। ভগিনীর নিদারুণ লাঞ্ছনার কাহিনী তাকে কয়েকমুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ ও বিহ্বল করে রাখল। অনেকদিন হল ভগিনীর কোন খোঁজ খবর নেই। এর মধ্যে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ সে কিছুই জানতে পারল না। কাঞ্চনবালার জন্যে একটা কষ্ট বোধ করল। বহুক্ষণ পর বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মৃদুকণ্ঠে ভগ্ন স্বরে বলল ঃ এই দুঃসংবাদ কেন বহন করে আনলে মহাবাহু ? আমি আপনাদের কেউ নই। তবু, শত্রুকে দিয়ে মহারাজ বালীকে নিবৃত্ত করতে চান্ কেন ? আপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নিজে কোন বদনামের ভাগী না হয়ে কার্যোদ্ধার করার এমন চমৎকার কৌশল আর হয় না। আপনি বুদ্ধিমান, চতুর। আপনার বন্ধু হলে আমিও লাভবান হব। আপনার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি নিজের স্বার্থেই গ্রহণ করলাম।

বালীকে কোনরকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে সেই রাতেই মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে এসে উপস্থিত হল। আকাশভরা চাঁদের আলোয় চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রকৃতি নিঝুম। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। নিথর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মায়াবী হুংকার দিল ঃ ওহে বর্বর, নিষ্ঠুর, নরাধম, বালী সাহস থাকে'ত সুখ শয্যা ছেড়ে উঠে আয়। আমি দুন্দুভিপুত্র মায়াবী। আমার ভগিনীর জীবন তোর প্রমত্ত ব্যাভিচারে বিষময় হয়ে উঠেছে। আমি তোর সেই পাশব প্রবৃত্তির সাজা দিতে এসেছি। ওরে, প্রমত্ত বানর রমণীর বাহুবন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আয়।

প্রহরীদের সতর্কতামূলক ঘণ্টা বেজে উঠল। বালী মায়াবীর ক্রুদ্ধ তর্জন গর্জন শুনল। নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার বিরক্তিতে তার ভুরু কুঞ্চিত হল, মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটল। দ্বিতীয়বার একই ভাষায় মায়াবীর আস্ফালন শুনল। ক্রোধে অপমানে বালী থর থর কেঁপে উঠল। তাকে গাত্রোত্থান করতে দেখে মহিষী তারা বলল ঃ স্বামী কোথা যাও এই নিশাকালে ? ও কোন দুষ্ট ব্যক্তির ষড়যন্ত্র। তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না।

ভয়ংকর ক্রোধেও বালী হাসল। বলল ঃ প্রিয়তমা, ভয় নেই। সিংহ কখনও

শশককে ভয় পায় ? ওর অপবাদ আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে কালিমা লিপ্ত করছে। ওকে বধ করা দরকার।

উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কে তারার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। অস্ফুটস্বরে বলল ঃ স্বামী কোন দুষ্ট ব্যক্তি দুরভিসন্ধি করে তোমাকে বিভ্রান্ত করছে। প্রভাত হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর। আমার মন কিন্তু প্রবোধ মানছে না। তুমি যেওনা।

কিন্তু তারার কোন আকুতি মিনতি পারল না বালীকে নিবৃত্ত করতে। মত্ত মাতঙ্গের মত সে কক্ষ থেকে নির্গত হল। এর ভেতর সুগ্রীবও তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। বালীর পথ আটকে ধরল। বলল ঃ অগ্রজ, তুমি বীর, সাহসী, নির্ভীক জানি। কিন্তু এই নিশাকালে তোমার প্রাসাদের বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। এ যে রাবণের দুরভিসন্ধি নয়, কে বলবে ? তুমি শত্রুর ফাঁদে পা দিও না।

তারা বলল ঃ আমারও সেই কথা।

সুগ্রীব বলল ঃ তুমি কক্ষে অপেক্ষা কর। আমি দেখছি, মায়াবী কি চায় ? তার রণ সাধ আমি মিটিয়ে দেব।

বালী তৎক্ষণাৎ আপত্তি করে বলল ঃ না, না, তা হয় না সুগ্রীব ! আমাকে সে অপমান করেছে। অপমানের এই সাহস তাকে কে দিল ? আমাকে তার রহস্য ভেদ করতে হবে।

মুহূর্তের জন্য সুগ্রীব চমকে উঠেছিল। কিন্তু অন্ধকারের ভেতর তার সেই মুখ বোধ হয় কারো নজরে পড়ল না। এক লহমার জন্যে কি একটা ভেবে নিয়ে স্তিমিত কণ্ঠে বলল ঃ তা-হলে, অনুমতি কর, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

তারার বুক কেমন করে উঠল। চোখে মুখে তার একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল ; তবু মনের সে কথা বলতে পারল না। অসহায়ের মত মৃদুস্বরে আপত্তি করে সুগ্রীবকে বলল ঃ এই রাতে তুমি মিছিমিছি কেন কষ্ট করবে ?

সুগ্রীব বলল ঃ চতুর্দিককে নজর রাখব আমি।

তারা তৎক্ষণাৎ বলল ঃ স্বামী, নারী বলে আমাকে অবহেলা কর না। আমার মন মানছে না। আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

বালী হেসে হেসে বলল ঃ কোন উৎকণ্ঠা ভয়ের কারণ নেই প্রিয়তমা। তুমি নির্ভয়ে থাক। কোন চক্রান্তকারীর সাধ্য নেই বালীর কেশস্পর্শ করে। একদিন রাবণের দুষ্টু অভিসন্ধিও আমি বাণচাল করেছিলাম। তার কাছে'ত মায়াবী নয়। সুগ্রীব'ত আমার সঙ্গে আছে।

বালী আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঝড়ের বেগে ধাবিত হল। মায়াবী কৌশলে বালীকে পাহাড় গুহার দিকে নিয়ে গেল। গুহা মুখে উপস্থিত হয়ে সক্রোধে গর্জন করে বলল ঃ আমার ভগিনী কাঞ্চনবালার লাঞ্ছনা, অপমানের প্রতিশোধ নেব বলেই তোকে গুহায় টেনে এনেছি।

বজ্রগম্ভীর গলায় বালী বলল ঃ তুমি কি পাগল হলে অর্বাচীন ? তোমার দম্ভ আর স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

বৃথা তর্ক রাখ। দ্বন্দ্বযুদ্ধে মীমাংসা হবে জয় পরাজয়। তার আগে দেখাও ভগিনী কোথায় ?

গুহার মধ্যে অতর্কিতে বালীকে ঠেলে দিল মায়াবী। কিন্তু বালীও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে হাত ধরে টেনে নিয়েছিল গুহার অভ্যন্তরে। সক্রোধে তাকে ছুঁড়ে মারল পাহাড় গাত্রে। ঘোর যুদ্ধে মত্ত হল তারা। গুহা গহ্বর থেকে তাদের রণোল্লাস আর ঘন ঘন হুংকারের গম্ভীর রব বেরোতে লাগল।

সুগ্রীব গুহা গহ্বরের মুখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। অতঃকিম্! পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হল। কিন্তু বালীকে যুদ্ধে হত্যা করার সাধ্য মায়াবীর নেই জেনেও সে কাঞ্চনবালা গুহা বন্দীর এক মিথ্যে গল্প ফেঁদেছিল। বালীকে নিয়ে মায়াবী গুহার মধ্যে ঢুকলে সুগ্রীব ঐ গহ্বরের মুখ বন্ধ করে দেবার মতলব আঁটল। বালী হত্যার এই সহজ পথেই সে পাবে সিংহাসন আর তার বহু আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিতা রমণী ভ্রাতৃবধূ তারাকে। সুগ্রীব দেরী না করে পাথর খণ্ড দিয়ে গুহা গহ্বরের মুখ বন্ধ করে দিল। জীবিত অবস্থায় ঐ গুহা থেকে বালী কোন দিন যাতে বেরোতে না পারে সেজন্যে অসংখ্য প্রস্তর খণ্ডের এক স্তূপ তৈরী করল। তারপর নিজে সেখানে মাসাধিক কাল কাটিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করল।

সুগ্রীবকে একা শ্রান্ত ও বিষণ্ন হয়ে ফিরতে দেখে তারা ডুকরে কেঁদে উঠল।

ঋষ্যমূকে রামচন্দ্রকে দেখার পরেই সুগ্রীবের মস্তিষ্কে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের মত এত কথা ঝলকিয়ে উঠল। কিন্তু এসব ঘটনা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। হনুমানও নয়। রামচন্দ্রকে এসব কথা বলা যায় না। তাই, কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতা নিয়ে সে রামচন্দ্রকে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে তার বিষণ্ন গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মৃদু হেসে বলল ঃ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন আর্য।

সুগ্রীবের বিনয় বচনে অভিভূত হল রাম। শান্ত এবং গম্ভীর স্বরে বলল রাম ঃ আমাদের দু'জনের দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা আশ্চর্য মিল আছে। আমাদের দু'জনের পরস্পর বন্ধু হওয়া তাই খুব সহজ। আমার সখ্য যদি তোমার প্রীতিকর হয় তবে এই প্রসারিত বাহু গ্রহণ করে আলিঙ্গনে ধরা দাও।

সুগ্রীব কথা বলতে পারল না। বুকের ভেতর থর থর করে উঠল। দৃষ্টিতে কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতা। সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে রামের কথাগুলি একটি স্ফুরিত ঝংকারে বাজছিল। এক আবেগের ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর সে রামের সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। তারপর অগ্নি প্রদক্ষিণ করে শপথ নিল সুগ্রীব। বলল ঃ এখন থেকে তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হলে, আমাদের সুখদুঃখ এক হল।

রাম প্রতিজ্ঞা করল ঃ আমিও বন্ধুর দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্যে তার মনে সুখ উৎপাদনের জন্যে যা করলে ভাল হয়, করব।

সুগ্রীব হৃষ্ট হয়ে বলল ঃ প্রিয় রামচন্দ্র ভ্রাতা বালী আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে

দিয়েছে। আমার ভার্যাকে হরণ করেছে। আমি ভীত হয়ে এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় নিয়েছি। আমি বিপদাপন্ন। তোমার শরণাগত। তুমি আমার ভয় দূর কর। বালীর বিনাশ হলেই আমার সব দুঃখ দূরে হয়।

শান্ত গলায় রাম প্রশ্ন করল ঃ তোমাকে বালী দেশ থেকে বিতাড়িত করল কেন? তোমার অপরাধ কি?

সুগ্রীব একমুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল ঃ অপরাধী জানিল না অপরাধ তাহার, বিচার হইয়া গেল। আমি কিছুই করলাম না, জানলাম না, তবু আমি অপরাধী হয়ে গেলাম। একবার বালীর এক পুরাতন শত্রু মায়াবী নিশাকালে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। যুদ্ধ করল পাহাড় গুহা অভ্যন্তরে। মাসাধিককালে ধরে যুদ্ধ চলল। একদিন রণহুঙ্কার থেমে গেল। প্রাকৃতিক কারণে ভীষণ ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রপাত হতে লাগল। হঠাৎ একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড পাহাড় গাত্র থেকে গড়িয়ে গুহামুখে আটকে গেল। বৃষ্টি থামলে দেখলাম চাপ চাপ রক্ত প্রস্তরের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসছে। বালী শিলাপিষ্ট হয়েছে ভেবে আমি আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠলাম। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে সব কথা বললাম। বালির শূন্যস্থান পূর্ণ করতে আমাকে সিংহাসনে গ্রহণ করতে হল। বানরকুলের প্রথানুসারে ভ্রাতৃবধূ তারা আমার মহিষী হল।

সুগ্রীব দম নিতে থামল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। রাম ও লক্ষ্মণ মনোযোগ দিয়ে এক অবিশ্বাস্য অভূতপূর্ব কাহিনী শুনছিল। তাদের উদ্দীপ্ত অপলক দৃষ্টি সুগ্রীবের দিকে। হনুমান, জাম্বুমান খুব বিস্ময়ের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এ সব তাদের জানা। তবু শুনতে ভাল লাগছিল তাদের।

সুগ্রীবের কোমল মুখ আর আয়ত কালো উজ্জ্বল চোখের চাহনি আর গলার গম্ভীর স্বরটা হঠাৎ বদলে গেল। তাকে কেমন একটু বিব্রত অস্থির দেখাল। আস্তে আস্তে বলল ঃ বৎসরান্তে জীবনের চাকা ঘুরে গেল। অকস্মাৎ বালি প্রত্যাবর্তন করল রাজ্যে। তার আবির্ভাব শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, বিস্ময়কর। আমাকে সিংহাসনরূঢ় দেখে সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। যখন শুনল তারাকে আমি মহিষীরূপে গ্রহণ করেছি তখন আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তারার হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচি। কিন্তু তার তিরস্কার, ভর্ৎসনা, গঞ্জনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করল। সে কথা মনে হলে এখনও মর্মযন্ত্রণা পাই। বালী আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল ঃ তুই বংশের কুলাঙ্গার। রাজ্যলোভে, সিংহাসনের মোহে, তারাকে বধূরূপে ভোগ করার লোলুপ লালসায় ভ্রাতৃপ্রেম বিস্মৃত হয়ে গুহা গহ্বরের মুখ শিলাখণ্ডে অবরুদ্ধ করে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিস। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি তোর সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছি। তোর মত বিশ্বাসহন্তা, ভ্রাতৃহন্তার স্থান নেই এ রাজ্যে। যাদের সহায়তায় তুই সিংহাসনে আরোহণ করেছিস, পতিব্রতা তারার সতীত্ব নাশ করেছিস তাদের সঙ্গে এখনি বিদায় হও। তারাকে গ্রহণ করে তুই যে অন্যায় করেছিস, আমাকে দুঃখ দিয়েছিস সেই কষ্ট দেবার জন্যে রুমা থাকবে আমার কাছে।

কথা শেষ করে সুগ্রীব চুপ করে বসে রইল। রামের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জা করল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে প্রকৃতি দেখছিল।

হনুমান একটু তফাতে বসে রামকে দেখছিল। রামের মুখে রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণাও নেই। এক ধরণের তীব্রতা এবং গভীর তন্ময়তা আছে।

রাম পাষাণ মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে রইল। নিবিষ্ট হয়ে সে তাকিয়েছিল সুগ্রীবের দিকে। কিন্তু তার দৃষ্টি শূন্য। তাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। রামচন্দ্রের মনে সুগ্রীবের ছবি খুব স্পষ্ট। বালীর অভিযোগে তার লোভ, স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার যে ছবি ফুটে উঠল সেটাই তার চরিত্রের আসলরূপ। শুধু তাই নয়, কুটচক্রের নায়কও বটে। সুগ্রীবের কার্যে যথেষ্ট সততার অভাব আছে, তার আচরণও সন্দেহজনক। সর্বোপরি সে বিশ্বাসের অবমাননা করেছে। বিশ্বাসহন্তা, ভ্রাতাকে নির্বাসিত করে বালী কোন অপরাধ করেনি। বালীর কোন কাজ নিন্দনীয় নয়। সে সৎ, নির্ভীক, বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। তবু বালীর সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা করা চলে না। কারণ তাকে নিজের বশে কিংবা অধীনে আনতে পারবে না সে। অনুগ্রহ, দয়া, করুণা ছাড়া কৃতজ্ঞতাপাশে কারোকে আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু অসহায় বান্ধবহীন সুগ্রীব অনুগ্রহ পেলে অবশ্যই তার অনুগত থাকবে।

সুগ্রীবের অনন্ত বাসনা। সে চায় অপমানের প্রতিশোধ। চায় সিংহাসন আর বালী মহিষী তারাকে একান্তভাবে। তার বাসনার জগৎ খুব সংকীর্ণ। ক্ষুদ্র একটি বিশেষ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। ঐটুকু পাওয়া সুগ্রীবের খুব কঠিন হবে না। নিজেও হয়ত সে অর্জন করতে পারত। কিন্তু বালী রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তার জনবল, বাহুবল, মিত্রবল, অর্থবল, বিরাট। সুতরাং নির্বাসিত সুগ্রীব কয়েকজন অনুগামী বান্ধবের বাহুবল সম্বল করে বালীর বিশাল শক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা এক নির্বোধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করল।

নির্বাসিতদের কার্যকলাপের উপরেও বালীর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। নিজের তত্ত্বাবধানে তার একটি বিশেষ গুপ্তচর সংস্থা ছিল। পুত্র অঙ্গদের উপর তার পূর্ণ দায়িত্বভার। সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, নল এবং নীল-এর সাধ্য নেই তাদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে বাইরের কোন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর যোগাযোগ হলেও বালীর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসবে না। তার নিজেরও বালীর বিরোধিতা করা নিরাপদ নয়। কোন কারণে সংঘর্ষ বাধলে রাবণ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বালীর সঙ্গে যোগ দেবে। তাই, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সুগ্রীব বালীর দ্বন্দ্বে সুগ্রীবের পক্ষ গ্রহণ করবে বলে স্থির করল। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি হলে তার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ এবং অনুগত থাকবে।

রামকে নিরুত্তর দেখে হনুমান একটু আশ্চর্য হল। রামচন্দ্রের দৃষ্টি স্থির নিশ্চল। একরকম চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না। কেবল মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ে বুক উঠানামা করে। রামচন্দ্র কোন প্রতিক্রিয়া বা ভাব-বৈলক্ষণ দেখা গেল না। হনুমানের উদ্বেগ ও শঙ্কা যুগপৎ বৃদ্ধি পায়। রামের খ্যাতি, বীর্যবল, জনপ্রিয়তাকে

তারা নির্বাসন মুক্তির মূলধন করে তুলবে, ভেবেছিল। কিন্তু রামের নিশ্চল নির্লিপ্ত ভাব তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সুগ্রীবের চোখেও জিজ্ঞাসা জাগে। অপরাধ বিভ্রান্ত মনে নানা যুক্তিহীন প্রশ্ন। অত কিম!

সুগ্রীব হনুমানের চোখের দিকে তাকাল। দুজনে নিশ্চুপ। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। সুগ্রীবের মুখে ম্রিয়মানতা ফোটে। এক আতঙ্কিত সংশয়ে তার অসহায় দৃষ্টি উদ্দীপ্ত হয়। বিস্ময়াহত নিচু স্বরে প্রশ্ন করল: বন্ধু রামচন্দ্র তোমার স্তব্ধ বিস্ময়, উদাস বিহ্বলতা, নিশ্চল নীরবতার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।

সুগ্রীবের জিজ্ঞাসায় রামচন্দ্র একটু চমকাল। মুখ তুলে তাকাল। চোখে তখনও অন্যমনস্কতার ঘোর। সুগ্রীবের মুখে শিশুর অসহায়তা। রামচন্দ্র হাসল না। বরং মুখে একটা কোমলতা ফুটল। বিভ্রান্তের মত বলল: বন্ধুবর সুগ্রীব, কার্যোদ্ধারের কি পরিকল্পনা করেছ তোমরা?

হনুমান একটু হতাশ গলায় বলল: যাই করবার চেষ্টা করি না কেন, বিপদে পড়ার ভয় আছে। এমন জড়ভরত হয়ে দিন কাটাতেও ভাল লাগছে না। কিছু করব, তার পথও খুঁজে পাচ্ছি না। মনটা মুষড়ে পড়েছে। এই অসহায় অবস্থার ভেতর আশা জাগানোর মানুষ নেই, উৎসাহ দেবার মত নেতা নেই। এখন তুমি আমাদের ভরসা, সহৃদয় আশ্রয়। তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি।

রামচন্দ্র হাসল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: কিন্তু আমিও তোমাদের মত নিরাশ্রয়, অসহায়। আমার কি আছে, যা নিয়ে তোমাদের পাশে দাঁড়াব?

তোমার খ্যাতি, যশ, বীর্যবল, জনপ্রিয়তার কদর সারা দক্ষিণ দেশে। তোমাকে চেনে না, জানে না এমন কেউ নেই।

সুগ্রীব ব্যাকুলস্বরে বলল: রামচন্দ্র আমরা তোমার শরণাগত। তুমি আমাদের পথ ও শপথ দুইই।

এ কথায় রামচন্দ্র যেন একটু খুশি হল। একটা দীপ্তি ক্ষণেক খেলা করে গেল তার মুখে। চোখের গভীর দৃষ্টি যেন বলল: এটাই তো চাইছিলাম। রামচন্দ্র তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সুগ্রীবকে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। তারপরে বলল: বালীর কাছে তোমার প্রথম দাবী কি রাখবে?

মুক্তি। সমস্বরে সুগ্রীব ও তার অনুগামীরা বলল।

কার মুক্তি?

রামের প্রশ্নে তারা বিব্রতবোধ করল। এত সরাসরি প্রশ্নটা আশা করেনি। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। এক অদ্ভুত গভীর সমস্যা তাদের প্রত্যেককে বিচলিত এবং বিভ্রান্ত করল।

রামের অধরে স্নিগ্ধ হাসির রেখা।

হনুমান একটু গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করল: কোন মুক্তির কথা বলছ?

নির্বিকারভাবে রামচন্দ্র বলল: তোমরা যে মুক্তি চাইছ?

সে মুক্তিত ভাগাভাগি করে নেয়ার জিনিস নয়। এ মুক্তি সার্বিক এবং সামগ্রিক।

উত্তম। কিন্তু বালী তার আদেশ প্রত্যাহার করবে কেন? প্রত্যাহারের কোন কারণ আছে?

হনুমান নিরুত্তর। দু'চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে সে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুগ্রীব ইতস্তত করে বলল: মানে, তুমি যদি দূত হয়ে সব গুছিয়ে একটা কিছু কর।

তোমাদের এই বিরোধের আমি কেউ নই। একজন বিদেশী হয়ে বালীর আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করব কেন? আর, সে বা শুনবে কেন? ভিক্ষা করে মুক্তি অর্জন করা যায় না। মুক্তি কারো দান কিংবা করুণা নয়। অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা নিয়ে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু মুক্তি লাভ হয় না। বীর্য বলে যদি তা জয় না করা হয়, তবে তার গৌরব কিংবা মর্যাদা থাকে না। অনুগ্রহে তার ধার কমে যায়। এ কারণে যুদ্ধ করে তোমাকে এ মুক্তি অর্জন করতে হবে। নইলে মুক্তির শর্ত হবে দাসত্ব।

সুগ্রীব নীরবে মাথা নাড়ল। গভীর এক দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল: সখা, বালীর শক্তি তুমি অবগত নও। তার তুল্যবীর ত্রিভুবনে নেই। রাবণ পর্যন্ত তাকে সমীহ করে। নিমেষে সে এক তীরে দশটি বৃক্ষ ভূপাতিত করে। বুনো মহিষের শিং ধরে তার ঘাড়টা মুচড়ে ভেঙে দেয়।

রামচন্দ্র কথা শুনতে শুনতে ধনুতে তীর যোজনা করে নিমেষে বিশটি বৃক্ষ ধরা শায়ী করল। একটি পাহাড় চূড়াকে বহু উর্ধ্বে নিক্ষেপ করল। দুটো ঘটনাই পলক পড়ার আগে এক একসঙ্গে ঘটল।

সুগ্রীব হনুমানের দুই চোখে বিস্ময়। মুগ্ধ বিভোর সুগ্রীব স্থির দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুহূর্তে একটা গর্বের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমস্ত চেতনা। তীব্র আবেগে তার অন্তরটা যেন রামচন্দ্রের শৌর্যবীর্যের পদতলে লুটিয়ে পড়তে চাইল। অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে সুগ্রীবের বেশ কিছুটা সময় লাগল। কিছুক্ষণ কেটে গেলে অস্ফুটস্বরে সুগ্রীব বলল: সখা, এ কি ইন্দ্রজাল, না বাস্তব? অলীক, না সত্য? মিথ্যা, না মরীচিকা?

রাম সুগ্রীবের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসল। কেমন একটা রহস্যময় গম্ভীর সে হাসি। অপরিহার্য কোন কর্তব্য নির্ধারণেব সংকেত যেন দিল সে।

রামের বাক্যে সুগ্রীবের তেজ ও সাহস উদ্দীপ্ত হল। বুকের মধ্যে একটা তরঙ্গ বয়ে গেল! শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সুগ্রীব নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল: রামচন্দ্র যার সখা, বালীর শক্তিকে সে ভয় পায় না। কিন্তু যুদ্ধ হবে কি উপায়ে? অস্ত্র, সৈন্য পাব কোথায়? প্রত্যাশিত মুক্তিই বা আসবে কোন পথে, কি ভাবে?

হনুমান বলল: যুদ্ধ দু'উপায়ে করা যায়। এক অস্ত্রের দ্বারা, অন্য এক কৌশলের দ্বারা। আমরা কোন যুদ্ধ করব সখা?

রামচন্দ্রের মুখে চেপা হাসি, চোখে কৌতুক। বলল: সব যুদ্ধেই বাহুবল, অস্ত্রবল এবং কৌশল দরকার হয়। যুদ্ধের প্রকৃতি অনুসারে এক এক ধরণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যুদ্ধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করার উপর যুদ্ধের কৌশল নির্ভর করছে। তুমি রুমাকে দিয়ে তার ক্ষেত্র তৈরী কর। বালীর কাছে রুমাকে দাবি করে লোক পাঠাও। বিনা যুদ্ধে বালী রুমাকে দেবে না। তুমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর।

সখা! চমকান ভয়ে ডাকল সুগ্রীব।

রাম তার কথায় কর্ণপাত না করে বলল: যুদ্ধ হবে, শহরের বাইরে, উৎসুক জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে দূরে, নির্জন অরণ্যবেষ্টিত প্রান্তরে। গর্বিত বালী এই শর্ত মেনে নিয়েই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। আমি তোমার সহায়ের জন্যে থাকব বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করে। তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হওয়ার আগে আমি তাকে অন্তরাল থেকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করব।

কাল বিলম্ব না করে রামের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে সুগ্রীব বালীকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করল। বলদর্পী, অহংকারী বালী সুগ্রীবের শর্ত মেনে নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ করল। বালীর আক্রমণে সুগ্রীব অসহায় হয়ে পড়ল। রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। এবং প্রচণ্ডভাবে নিগৃহীত হয়েও সে যুদ্ধ চালিয়ে গেল।

রাম কিন্তু শরনিক্ষেপ করল না। একবার ধনু উত্তোলন করে সে আবার নামিয়ে নিল। রামচন্দ্রের মনে হল সুগ্রীব ভীষণ, লোভী, স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ। কার্যকালে সে উপকারীর উপকার বিস্মৃত হতে পারে। সুতরাং তার জয়কে সহজ এবং অনায়াস-লব্ধ করা উচিত নয়। তাকে বুঝতে দেয়া দরকার যে, নিজের বিক্রমে সে বালীকে পরাস্ত করতে পারে না। রামের সাহায্য ছাড়া যে বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব নয় এই অনুভূতি এবং চেতনা জাগানোর জন্যে আরো একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হবে তাকে। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ'ত আর আমৃত্যু নয়। সুতরাং, সুগ্রীবকে তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটু শিক্ষা দেয়া উচিত।

বালীর দ্বারা লাঞ্ছিত, নিঃগৃহীত, অপমানিত ও পরাভূত হয়ে সুগ্রীব রোষে, ক্ষোভে রামচন্দ্রকে ভৎসনা করে বলল: সখা তুমি প্রতিশ্রুতির অবমাননা করেছ। বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করতে অক্ষম জেনেও তোমার কথায় তা করেছি। কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য করনি। এভাবে আমাকে অপমান করলে কেন? তুমি কি আমার শক্তি সাহসের পরীক্ষা করলে? তোমার এই রহস্যময় আচরণের কপটতা আমি বুঝতে অক্ষম। প্রতিশ্রুতি ভেঙে তুমি নিজেকেই অপমান করেছ। ছোট হয়ে গেছ আমাদের কাছে। সখা এ তোমার কেমন সখারীতি?

সুগ্রীবের ভৎসনা বাক্যে জর্জরিত হল রামচন্দ্র। কিন্তু ক্রুদ্ধ কিংবা বিচলিত হল না। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বলল: সখা, মনস্তাপ করা তোমার সাজে না। তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবলে, আমার দিকটা একবারও চিন্তা করলে না। দোষত তোমারই। আমাকে ঘৃণাক্ষরে

জানতে দাওনি তোমারা যমজ ভ্রাতা। দু'জনের আকৃতি, প্রকৃতি, মুখাবয়ব এক-রকম। এমনকি মল্লযুদ্ধের পোশাকও এক। আমার পক্ষে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ হল। আমাব শর নিক্ষেপে যদি বন্ধু হত হয় এই সংশয়, দ্বিধায় ধনু উত্তোলন করেও পারিনি শর নিক্ষেপ করতে। তোমরা সমান বিক্রমে দুজ'নে লড়েছ। তোমাদের অভিন্ন সাদৃশ্য হেতু আমি প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারিনি। এখন বল, এ আমার অপরাধ, না ইচ্ছাকৃত কর্তব্যচ্যুতি।

সুগ্রীব কৃষ্ণবর্ণ গালে অসহায় হাতখানা বুলিয়ে হতাশ গলায় বলল: সব আমার ভাগ্য।

সুগ্রীবের গণগণে অভিমান রামচন্দ্রের হাস্যোদ্রেক করল। মৃদু কণ্ঠে বলল: বন্ধু, কিছুকাল বিশ্রাম নিয়ে আবার তুমি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান কর বালীকে। এবার মল্লযুদ্ধে তোমার নিজস্ব বস্ত্র পরিধান করবে। তাহলে আমার চিনতে কোন অসুবিধে হবে না।

অঙ্গদের কাছ থেকে কথাটা শোনা থেকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে তারার রাগের হল্কা বয়ে যাচ্ছিল। তাকে খুব উত্তেজিত এবং অশান্ত দেখাচ্ছিল। সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না। অমঙ্গল ভাবনায় থেকে থেকে কেঁপে উঠল তার শরীর।

প্রত্যূষে শয্যা থেকে উঠে বালীকে প্রণাম করা তারার প্রতিদিনের অভ্যাস। রোজকার মত প্রণাম করল। কিন্তু আজ যেন তার অশান্ত আবেগকে কিছুতে সংযত করতে পারল না। বালীর পদতলে মাথা রেখে চুপ করে পড়ে রইল। অঝোরে কাঁদল। বালীর পায়ের পাতা ভিজে গেল। তার কান্নায় বালীও বিহ্বল হল। কিন্তু অস্থির হল না। ভূমিতল থেকে স্নেহভরে দু হাত ধরে তাকে তুলল। বুকের উপর টেনে নিয়ে আদর করল। চোখ মুছে দিল। তার গালের উপর গাল রাখল। মুখের উপর ঝুলে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। তারপর স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে চুপ করে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বালীর বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর এক ভালবাসা। সেই দুকূল ছাপানো ভালবাসায় সে তারাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। গদ গদ স্বরে বলল: তোমার চোখে এত অশ্রু কেন রাণী?

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত কান্না জড়ানো গলায় বলল: তোমার জন্যে কাঁদি। সব সময় তোমাকে হারানোর ভয় যেন আমাকে কুরে কুরে খায়।

বালী হাসি হাসি মুখ করে বলল: আমার জন্যে তুমি এত কাঁদ? কেঁদে কখনও কল্যাণ হয়? কোন মেয়ে স্বামীর কল্যাণের জন্যে কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলায়, শুনেছ?

স্বামী তোমার পরিহাস বড় নির্মম। মানুষ কাঁদে কখন জান? বড় দুঃখে আর বড় অসহায় হয়ে সে কাঁদে। নিস্ফল আক্রোশ আর অসহায় রাগে দু'চোখ ভরে যায় জলে। তুমি ঠিক বুঝবে না। আমার উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার কোন মূল্য তুমি'ত দাওনি।

তারা, তোমার পরামর্শকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা করি।

অমনি তারার দু'চোখ কৌতুকে উপচে উঠল, মুখে কপট হাসি ফুটল। বলল: তা-হলে পরীক্ষা হোক। বল, আমার কথা শুনবে। সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাবে না। তার কোন প্ররোচনায় ভুলবে না। প্রতিজ্ঞা কর: তুমি যাবে না।

তারা তুমি কি ছেলেমানুষ হলে?

অঙ্গদ খবর পাঠিয়েছে সুগ্রীব অযোধ্যার নির্বাসিত রাজপুত্র রামচন্দ্রের সখ্য হয়েছে। রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুগ্রীবকে সিংহাসন পাইয়ে দেবে। বিনিময়ে সুগ্রীব তাকে অপহৃতা সীতার উদ্ধারে সাহায্যে করবে। তুমি সুগ্রীবের ফাঁদে পা দিও না। তার প্ররোচনায় কিংবা কটু ভাষণে উত্তেজিত হয়ে কখনও যুদ্ধ কর না।

রামচন্দ্র বীর। সে নির্বোধ হবে কেন? সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার কি লাভ?

রাজনৈতিক বন্ধু কখনও সমানে সমানে হয় না। সুগ্রীব তার দ্বারা উপকৃত হলে অনুগত থাকবে। কিন্তু তোমার সাহায্য পেলেত সে আশা পূরণ হবে না।

রামচন্দ্র আর্য। আর্যরা কখনো কাপুরুষ নয়। ধর্ম-বিরোধী যুদ্ধ অন্ততঃ রামচন্দ্র করবে না। সে অত্যন্ত নীতিবান। বিচার প্রবণ। তুমি নির্ভয়ে থাক।

তবু, আমার মন মানছে না। গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং সংঘর্ষের পরিণাম কখনও ভাল হয় না। এই আত্মঘাতী সংগ্রাম সংসারে এবং জীবনে শুধু অনর্থ আনে। তুমি জেদ কর না। রুমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই কলহ মেটাও।

তুমি বলছ কি?

স্বামী কেন বুঝতে চাইছ না, রুমার দাবী তার উপলক্ষ্য মাত্র। সে চায় তোমার রাজক্ষমতা। কোনদিন যে রুমাকে একটু আদর করল না, তার দিকে ফিরেও তাকাল না, তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ কখনই নয়। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে রুমা কোন ব্যাপার নয় আসল উদ্দেশ্য তোমার প্রাণনাশ করা। রুমাকে ফিরিয়ে দিলে তার সমস্যার কোন সুরাহা হবে না, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে পড়বে। কিন্তু সুগ্রীবের অন্য মতলব থাকলে তা আর গোপন থাকবে না। তাকে তোমার চিনতে সুবিধা হবে। মূলতঃ সে খল, চতুর, দুরভিসন্ধিপরায়ণ। তাকে বিশ্বাস কর না। বিভ্রান্ত হয়ো না তার কথায়।

বালী বিস্ময়ে স্তব্ধ হল। প্রতিবাদ করার মত যুক্তি পেল না খুঁজে। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল: তারা, তোমার কথা সত্য হলেও রুমাকে ফেরৎ দিতে পারি না।

আমার মর্যাদা সম্ভ্রমের সঙ্গে সে এখন যুক্ত। সুগ্রীব আমার অপযশ গাইবে। রামচন্দ্রের ভয়ে আমি রুমাকে মুক্তি দিয়েছি, এ মিথ্যে প্রচারে আমার খ্যাতি নষ্ট হবে। এই অপবাদ নীরবে মেনে নিলে শত্রু হাসবে। আমার দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়বে। রামচন্দ্র যে আমার অধিক বলশালী এই প্রচার প্রশ্রয় পাবে। সুতরাং, এই কঠিন কূট চাল ভাঙতে অবশ্যই তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হবে। অপমানের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। বীর, বীর শয্যাই কামনা করে।

স্বামী! তারার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। গলা থেকে একটা বিকট আওয়াজ করে কান্নার স্বর বেরোল।

বিজয়ীর মত গর্বিত পদক্ষেপে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল বালী।

সকালের রোদ তরল সোনার মত গলে পড়ছিল। সূর্যের লাল আলো পড়ে বালীর লাল রঙের রেশমের পোশাকটা আরো রাঙা হয়ে উঠল। তারার মনে হল, রক্তের সমুদ্রে স্নান করে বালী যেন শূন্যের উপর পা ফেলে ফেলে চলেছে। হু হু বাতাস তার বুকের কাছে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের অজান্তে একটা কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

তারা নিশ্চল হয়ে বসেছিল জানলার পাশে। অসহ্য একটা অস্থিরতায় ছটফট করছিল তার বুকের ভেতরটা। সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছিল। তারার মনে হল, সুগ্রীব আর বালীর সংঘর্ষে বালী যেন উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। অবসন্নতায় থর থর করে কাঁপছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় তারার দম বন্ধ হয়ে এল। বুকের তীব্র উৎকণ্ঠা প্রশমিত করতে সে বাইরের দিকে তাকাল।

গ্রীষ্মের প্রকৃতি যেন উদাস। বৈরাগী। ধুলো মাখা। নদীর জলে পাহাড়ী ঢলের রক্তাভ চিহ্ন, জোয়ারে নম্রতা, ভাটার টানে একতারার উদাসী ঝংকার। কুলের অনেক সুখ দুঃখের কথা গান হয়ে ভেসে যায় বাতাসে। আকাশের রঙ বদল হচ্ছে ধীরে, বাতাস তার গতি বদলায় উত্তর থেকে দক্ষিণে। গাছপালা স্থির। ডালে ডালে পাতা খসার ডাক। পশুরা, পাখীরা যেন বরষার বর্ষণের বিপদ সংকেত পেয়ে গেছে।

অকস্মাৎ মা, মা করে অঙ্গদ এল সেখানে। তারা তার ব্যাকুল ডাক শুনে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় চমকে উঠল। বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল। অঙ্গদ অসহায়ের মত মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুল স্বরে কেঁদে কেঁদে বলল ঃ মা, মা-গো তীরন্দাজ সংবাদ-বাহকের সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছি। বড় দুঃসময়। মা মা-গো পিতা নেই। পিতাকে হত্যা করেছে রামচন্দ্র। অঙ্গদ আর বলতে পারল না। জননীর কাঁধে মাথা রেখে অসহায় শিশুর মত বিলাপ করতে লাগল।

তারার দুচোখ দিয়ে অঝোরে জলধারা নামল। কান্না জড়ানো গলায় থেমে থেমে টেনে টেনে বলল ঃ আমি জানতাম, এরকম কিছু হবে। কিন্তু পুত্র আমার কোন কথা কানে নিল না তোর পিতা। রামচন্দ্রের উপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু আমি জানি তার মত নির্দয় মানুষ হয় না। সে রক্ত মাংসের তৈরী এক পাথরের মূর্তি।

তার হৃদয় নেই, প্রাণ নেই। থাকলে, নিজের পিতাকে অমন করে মরতে দিত না, পারত না, ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে মহাবীরকে অস্ত্রাঘাত করতে।

মা-গো বিলাপের সময় নয় এখন। অনেক সময় পাবে তার। এখনও পিতার দেহে প্রাণ আছে। শুধু তোমার জন্যে বেঁচে আছে। শীঘ্র চল। সারথি রথ নিয়ে প্রস্তুত।

শোকাতুরা তারা বিলাপ করতে করতে বনস্থলে প্রবেশ করল। বালীর নিশ্চল দেহের সামনে এসে ডুকরে কেঁদে উঠল। কণ্ঠ দিয়ে তার এক তীক্ষ্ন আর্ত্তনাদ বেরোল ঃ স্বা—মী—ঈ-ঈ!

ভূমিতে আছড়ে পড়ল তারা। পাগলিনীর মত স্বামীকে আলিঙ্গন করে বলল ঃ বীর আমার, কথা বলছ না কেন? ওঠ। ভূমিশয্যা নৃপতির যোগ্য নয়। ও-গো বানরেশ্বর আমি তোমার তারা। রোদন করছি, তুমি কথা বলছো না কেন? অভিমান করেছ বীর?

বালীর দেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারা। দুই চোখ তার অশ্রুর পরিবর্তে খদ্যোতের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলতে লাগল। তিক্ত স্বরে বলল ঃ কোথায় নরাধম রামচন্দ্র? কাপুরুষ, হীনবীর্য, পাষণ্ড, শয়তান, কোথায় তুমি?

রামচন্দ্র নীরব। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়। খুব গভীর বিষাদগ্রস্ত দেখাল তাকে। চোখ মুখে তার উত্তেজনা নেই। বরং একটা কৌতুকভাব যেন ঝলকে উঠল। নিরীহ চোখে তারার দিকে তাকাল। বিষণ্ন থম থম গম্ভীর মুখে ভাষা ও স্বর বদলে গেল। বলল দেবী, শোকাতুরা তুমি। তোমাকে সান্ত্বনা জানাই এমন ভাষা আমার নেই। তবু তোমার দুঃখ, কাতরতা দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

তারার চোখ মুখ তীব্র ধিক্কারে ঝলকে উঠল। তার ভাষাও বদলে গেল। রুক্ষ স্বরে বলল ঃ চুপ কর কপট সাধুবেশী পাপাচারী। তোমার ছলনা আমার স্বামী বুঝতে না পারে, কিন্তু আমি তোমার ধর্মের নামে কপটতা ঠিক চিনেছিলাম। বিনা অপরাধে শরাঘাতে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ। এই গর্হিত কর্ম করে, সাধু সমাজের কাছে তুমি কি কৈফিয়ৎ দেবে? নিজের বিবেককে কি বোঝাবে?

রাম শান্তভাবে বলল ঃ ভামিনী, তুমি শোকাতুরা। শোকবশে কি বলছ, জান না। বালী কখনও নির্দোষ নিরপরাধ নয়। সে ভগিনী স্থানীয়া ভ্রাতৃবধূকে কাম-পরবশ হয়ে অধিকার করেছে।

তারার দু'চোখ জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ন স্বরে চিৎকার করে বলল ঃ মিথ্যে কথা। নির্বাসনের কষ্ট লাঘব করার জন্যে ভগিনীজ্ঞানে তাকে আপন গৃহে পালন করেছে। একে তুমি পাপ বল? নিজের অপরাধ ঢাকতে তুমি অনেক মিথ্যে সৃষ্টি করছ। তোমাদের মনু বলেছে পাপী রাজদণ্ড ভোগ করলে নির্মল হয়ে পুণ্যবান সাধুর ন্যায় স্বর্গে যায়। কিন্তু রাজা যদি পাপীকে শাসন না করে তার অন্যায়কে, অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় তবে রাজা স্বয়ং শাপগ্রস্ত হয়। তুমিও অনুরূপ অভিশপ্ত হলে। আমার

এই শোক হাহাকার, অশ্রু, কষ্ট, যন্ত্রণা তোমাকে সুখী করবে না। এই বিলাপ, হাহাকার তোমার বিবেককে প্রতিমুহূর্ত অনুশোচনায় জর্জরিত করবে।

রামের কথার মধ্যে উত্তেজনা নেই। শান্ত। বলল ঃ বালীকে আমি ক্রোধবশে বধ করিনি, বধ করে আমার মনস্তাপও হয়নি। কারণ সুগ্রীব আমার সখা। তার পত্নী ও রাজ্য উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি আমি পালন করেছি মাত্র।

তবে কেন সম্মুখ সমরে আহ্বান করলে না তাকে? কাপুরুষ দস্যুর মত হীন উপায়ে জঙ্গলের অন্তরালে লুকিয়ে তাকে হত্যা করলে কেন?

রামচন্দ্র চমকে উঠল। সংবিৎ ফিরে পেল। মাথা নেড়ে বলল ঃ অন্যায় কেন? শিকারী পশু হত্যা করে কখনও হীনতা বোধ করে না। বরং কৃতিত্বের গৌরব অনুভব করে। আমি বানরকে হত্যা করে লজ্জা পাব কেন?

তারার বুকে সহসা যেন বজ্রাঘাত হয়। মুহূর্তে সে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। তার দৃষ্টি আচমকা আঘাতে বেদনার্ত হল। ভুরু কুঞ্চিত হল। যন্ত্রণামথিত স্বরে উচ্চারণ করল ঃ ছিঃ! এই কি আর্যকুলতিলক রামচন্দ্রের উপযুক্ত কথা? ধিক্। ধিক্ তোমার পৌরুষকে। এ হল ভীরু, অপরাধী, পাপীর আত্মসান্ত্বনা খোঁজার যুক্তি। এই নিকৃষ্ট যুক্তি দিয়ে তোমার কাজের সাফাই গাইতে লজ্জা করল না? করবে কোথা থেকে? তুমি'ত নিজের পিতার মৃত্যুর অপরাধকে পিতৃসত্য রক্ষার মত একটা বড় মিথ্যে দিয়ে অযোধ্যার মানুষকে বোকা বানিয়েছ। কিন্তু সুষেণ কন্যা তারা সে ধাতু দিয়ে গড়া নয়। রামচন্দ্র তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি করুণারও অযোগ্য।

তারার ক্রোধ, ধিক্কার, অপমান, ভর্ৎসনা, তিরস্কার সব মিলিয়ে রামচন্দ্রের মনে একটা জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি সৃষ্টি হল। বিমূঢ় চিন্তার সব কেমন যেন ওলোট পালট হয়ে গেল। অনুচিত মুগ্ধতা মস্তিষ্কে পাপে বিদ্ধ হল। মাথা নিচু করে বিনম্র স্বরে বলল ঃ বৃথা গঞ্জ কেন আমায়? আমি কে? মহাকাল করে সব। তুমি আমি নিমিত্ত তার। কাল ফুরায়েছে মহাবাহু বালীর। মহাকাল করায় কর্ম, আমি তার যন্ত্র। দোষ কেন দাও সখী। আমি অনুতপ্ত। অপরাধ নিও না। শান্ত কর তাপিত চিত্ত তোমার। আমিও তোমার মত এক অভাগা। শোকার্ত। শোন সখী, অঙ্গদ হবে তার পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকার। গৃহে ফিরে কর তার যুবরাজ পদে অভিষেক আয়োজন। আমি নিজ হস্তে এঁকে দিব রাজতিলক তার ললাটে।

তারার মুখের অভিব্যক্তি এবং প্রতিক্রিয়া বুঝতে একমুহূর্ত থামল। তারপর কি ভেবে নিয়ে হনুমানকে কাছে ডেকে ফিস ফিস করে বলল ঃ পবন পুত্র, তুমি রাজধানী গিয়ে পুরবাসীদের জানিয়ে দাও, সিংহাসন নিয়ে বালী ও সুগ্রীবের চিরন্তন বিরোধ শ্রীরামচন্দ্রের উপস্থিতিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বালী পরাজিত ও নিহত। তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে বীরবাহু সুগ্রীব।

হনুমান নির্দেশ পেয়ে প্রস্থান করলে, রাম অঙ্গদকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করল।

বলল : বৎস, জীবন মৃত্যু, জয়-পরাজয় অনিত্য। বীর পিতার বীর পুত্র তুমি। নারীর মত অশ্রু বিসর্জন তোমার শোভা পায় না। তুমি এ রাজ্যের ভাবী রাজা। আমার স্নেহের পাত্র। মানুষ-বানর, রাক্ষসের মহাসমরের নেতৃত্ব যে তোমার মত তরুণ বীরকে নিতে হবে। পুত্র আমার, বীর আমার, ওঠ। মোছ অশ্রুজল।

মৃত পতিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ শোকস্তব্ধ তারাকে ডাকল : প্রিয়সখী। চেয়ে দ্যাখ সখার চোখেও জল। নরদেহে পাষাণ হৃদয় নয় আমার। তুমি রাজমাতা। এ রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বিরাজ করবে চিরকাল। তোমার সে রাজ গৌরব মর্যাদা কখনও ক্ষুন্ন করবে না কেউ। রাজা সুগ্রীব হবে তোমাব একান্ত সেবক।

॥ আঠারো ॥

বালীর মৃত্যুর দ্বাদশ দিন পর সুগ্রীবের অভিষেক রাজসমারোহে হল। রামচন্দ্র বানর সৈন্য পরিদর্শনের জন্যে হনুমান অনুষ্ঠানকে খুব জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলল। রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বানব সৈন্য। সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্র একজন সম্মানীয় অতিথিরূপে একে একে অতিক্রম কবল পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গজবাহিনী। প্রত্যেকেই তাদের দেশীয় প্রথায় সজ্জিত। এর পরে এল এক সুবেশা যুবক যুবতীর সারি। এরা নৃত্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করে তাদের অভিবাদন করল। তাদের শরীরে চমৎকার পোশাক। মাথায় পাতার মুকুট। এরপর বহু সুন্দরী নানা রঙের পোশাকে তাদের তনু আবৃত করে সুগন্ধী ফুল, চন্দন আর অগুরু ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

জনস্রোত উপছে পড়েছিল। অকস্মাৎ সবাই চিৎকার করতে লাগল রাজমহিষী তারা আসছে। হাতে তার বেলফুলের মালা। বানর দেশের প্রথানুসারে মৃত রাজার রাণী নতুন রাজাকে পতিরূপে বরণ করবে। তারা সুগ্রীবকে তাই বরণ করতে এল পুনর্বার। তার মস্তকে বানর দেশীয় সুবর্ণ উষ্ণীষ। গোলাকার কণ্ঠে চওড়া সোনার গলাবন্ধ : প্রবাল আর মূল্যবান পাথরে সজ্জিত। তার দু'বাহু স্বর্ণালংকারে ভূষিত, কব্জিতে স্ফটিকের বলয়। তারার বক্ষ উন্মুক্ত। বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। সাপের খোলসের মত একটা উড়না তার দেহকে পেঁচিয়ে ধরেছে।

কিন্তু রামচন্দ্র ওসব কিছু দেখছিল না, তারাকে দেখছিল। বয়স হওয়া সত্ত্বেও তারার দেহের বাঁধুনি, যৌবনবতী রমণীর মত অটুট। একটুও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নি। দেহের লালিত্য এতটুকু টান ধরেনি। রামচন্দ্র খুব কাছ থেকে তারাকে দেখল। যে মুখ সুগ্রীবকে চরিত্রভ্রষ্ট করেছে। বিশ্বাসহন্তা করেছে। ত্রুটিহীন সেই পাথরের খোদাই করা নিটোল মুখ আর পেলব নধর ত্বক ও তনুর দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। বর্তুলাকার চিবুক, পরিপূর্ণ ঠোঁট, নাসারন্ধ্র আর ঝিনুকের মত দুটি কান, ছোট কপাল আর চমৎকার থোকায় থোকায় নেমে আসা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম,

আর পদ্মকলির মত দুই অক্ষি, সত্যি অপরূপ। চোখ দুটি যেন ঘুমন্ত। কি গভীর অনুভূতি মাখানো চোখ, মুখ, অঙ্গ। তবু, রামচন্দ্রের মনে হল তারার রক্ত মাংসের ওই দেহের মধ্যে সব ক্ষমতা লুকিয়ে নেই। এর বাইরেও আছে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আর প্রচন্ড চারিত্রিক ক্ষমতা। নিদ্রা ভারাক্রান্ত মোহময় আঁখিকোণে সে কেমন করে লুকিয়ে রাখল সেদিনের অগ্নিশিখা? ক্রুদ্ধ শোকার্ত তারার দুই চোখে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তার দ্যুতি কোথায় লুকোল? তার নিস্তরঙ্গ ওষ্ঠের মাঝখানে অগ্নি-শ্রাবী সেই ভাষাই বা কেমন করে অন্তর্ধান করল। তারার এই অদ্ভুত রূপান্তর আশ্চর্য করল তাকে।

তারা কঠিন কোমলের সমন্বয়। সে শুধু আকর্ষণ করে, কিন্তু গ্রহণ না। তাকে দেখার পর কোনো পুরুষই বিস্মৃত হতে পারে না। তাই, বালী তার দ্বিচারিণীত্বকে ক্ষমা করে ছিল। সুগ্রীবও তারাকে দেখার পর কি আশ্চর্য সুন্দর আর মুগ্ধ মোহন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার নম্র চাহনি, নীরব, নিঃশব্দ মুগ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে তার মুখের রঙ বদলে দিল। ভারী একটা সুন্দর দীপ্তিতে সুগ্রীবের মুখখানা চকচক করতে লাগল।

তারা সুগ্রীবের সামনে বুকে দু'হাত জোড় করে দাঁড়াল। তার সৌন্দর্যে সুগ্রীব যত মুগ্ধ হোক না কেন, তারার কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই। মৃদু কৌতুক আভাসে রঞ্জিত হল অধর। ঠোঁটের কোণে যেন একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা জমে উঠেছে। সুগ্রীবের খুব কাছে থাকার জন্যে রামচন্দ্র তারাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল। তন্দ্রাজড়ানো চোখ দুটি বড় বিষণ্ণ আর করুণ দেখাল। মনে হল, অনেক কালের অনেক বেদনা আর ঘৃণা জমেছে সেখানে। তার স্তব্ধতা যেন বঞ্চায় নীরব সংকেত। আসন্ন কোন সর্বনাশের ইংগিত। রামচন্দ্রের ইচ্ছে হল সুগ্রীবকে সতর্ক করার জন্যে বলে মেয়েরা তখন বিশ্বস্ত হয় যখন তারা ভালবাসে। কিন্তু এখানে কোন ভালবাসা নেই। বিশ্বাহীনতার জনিতে বাধ্য হয়ে তোমাকে গ্রহণ করেছে। ভালবাসাহীন শুষ্ক মরুভূমিতে শুধু তৃষ্ণা নিয়ে তুমি মরীচিকার পিছনে ঘুরবে। ও'র বুকে প্রতিহিংসা তুঁষের আগুনের মত জ্বলছে। সাবধান। ও নিজে জ্বলবে, তোমাকেও দাহ করবে। ও তোমাকে নরকে নিয়ে যেতে পারে, আবার শেষ করেও দিতে পারে। বন্ধু আমি ভয় পাচ্ছি। তোমার অভিষেকের সঙ্গে আমার আশা প্রত্যাশা বোধ হয় নির্মূল হল। কথাগুলো তাকে বলার আগে সুগ্রীব নিচু হয়ে তারার হাত থেকে কণ্ঠে মালা পড়ল। তাকেও পরিয়ে দিল। তারপর হাত ধরে সিংহাসনে বসল।

বর্ষাকাল।

যুদ্ধের সবচেয়ে অনুপযুক্ত সময়। কিন্তু রামচন্দ্র সময়টাকে অলসভাবে কাটাল না। একে প্রস্তুতির কাল করে তুলল। দক্ষিণারণ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুদ্ধের

জন্য লোক সংগ্রহ করা হল। তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিল লক্ষ্মণ। জাম্বুমান, নীলের উপর ছিল বানর সৈন্যদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব। আর হনুমান তার নিজের তত্ত্বাবধানে একটি গুপ্তচর বাহিনী গঠন করল।

অগস্ত্যর কাছে শেখা অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্রগুলি রামের তত্ত্বধানে তৈরী হল কামার-শালায়। দেবলোক ও দণ্ডকারণ্য থেকেও এল নানা ধরণের আয়ুধ। দেখতে দেখতে অস্ত্রাগার ভরে উঠল। শুধু তাই না, বর্ষায় ফসল ভাল হওয়ায় খাদ্যশষ্য মজুত করতে কোন কষ্ট হল না।

অষ্টপ্রহর রাম লক্ষ্মণ, হনুমানের সতর্ক পর্যবেক্ষণ, কঠোর পরিশ্রম, এবং দায়িত্বে আসন্ন সংঘাতের বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে শরৎকাল এসে গেল।

তবু সুগ্রীবের দিক থেকে যুদ্ধের কোন তাড়া ছিল না। রাজ্যে কে কোথায় কি করছে সুগ্রীব তারও খোঁজ রাখত না। তারাকে নিয়ে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তার দিন কাটছিল। তারার সান্নিধ্যে সে কখনও ক্লান্ত বোধ করত না। যৌন-বিলাস ভীষণ ভালো লাগত তার। নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেত, তারার প্রতি কি দুরন্ত তৃষ্ণা তার। কি ভীষণ ক্ষুধা ঃ কত বিচিত্র লোভ আর লালসা। আবার শক্তি উদ্যমের কি বিপুল অপচয় তার জন্যে। সুগ্রীবের ভাল লাগে এ জীবন জ্বালা। অনির্বান জ্বালা। তৃষ্ণার নেই। বিরাট উন্মুক্ত আকাশের মত যত দূরে চাও—চলে যাও—তবু কত বিচিত্র কোন শেষ অনুভূতিতে, ব্যথায়, আনন্দে, পরিপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে দয়িতাকে দেখে দয়িত কখনও হাসিতে উদ্ভাসিত, কখনও প্রেমাবেগে তার দুই আঁখি ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠে। প্রিয়মুখ চুম্বন সুখে মুখ থেকে কত না অস্ফুট প্রলাপ বাক্য নির্গত হয়। কখনও বিপুল পুলকে কম্পিত সারা অঙ্গে রতিরঙ্গ প্রকাশ পায় ঘন ঘন নিঃশ্বাসে এবং তার চোখের চাহনিতে।

প্রতিদিন একই ক্লান্তিকর কথা ও ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে তারা ক্লান্তিবোধ করে। দুর্নিবার কামাসক্ত এই লোকটিকে তার একটুও পছন্দ নয়। মনে প্রাণে তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। তার জন্যে একটুও প্রেম কিংবা মমতা অনুভব করে না। সুগ্রীবের মধ্যে তারা পুরুষের বদলে একটা পশুকে দেখতে পায়। যে শুধু নিজের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, সুখ ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না। ঘেন্নায় মনটা যখন টৈটুম্বর হয়ে যায় তখন সুরার পাত্রে চুমুক দিয়ে তারা একটু চাঙ্গা করে নিজেকে। আর এই উত্তেজক পানীয়টা পেটে গেলেই যেন বুদ্ধিটা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে।

সুগ্রীব কাপুরুষের মত এক শ্রেষ্ঠ বীর্যবান মানুষকে পেছন থেকে ছুরি মেরে হত্যা করেছে। যাকে সমগ্র ভারতবর্ষের অস্ত্রও বশীভুত করতে পারত না গুপ্তঘাতকের হাতে তার এই মৃত্যু তারার মনকে বিষিয়ে রেখেছে। তাদের জঘন্য অপরাধকে তারা ক্ষমা করেনি। যার চক্রান্তে ও ইচ্ছায় এই জঘন্য কাজ হল তার কার্যে বিঘ্ন ঘটাতে তারা সুগ্রীবকে নিবিড় বাহুপাশে বাঁধল। সুগ্রীব কর্তব্যচ্যুত হল। তার সব বিচার বুদ্ধি, বিবেচনা লোপ পেল। তারাকে নিয়ে সে স্বপ্নের ভেতর ডুবে রইল। সে ভুলল রাজ্যপাট। প্রতিদিনের রাজনৈতিক কাজকর্ম। সুগ্রীবের বুকে ঝরনার নূপুর ছন্দের মত

প্রেমের কি মিষ্ট সুর বয়ে চলেছে। পাপিয়া যেমন তার সঙ্গীকে মুহুর্মুহু প্রেম নিবেদন করে তারাও তেমনি সুগ্রীবকে বুকে টেনে নেয়, চুম্বন করে। তারার হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সুগ্রীবের হৃৎস্পন্দন মেশে। তারা জানে এ ভালোবাসা নয়, তার বেঁচে থাকা নয়, নিজেকে ফুরিয়ে নিঃশেষ করা। তবু তারার মনে হয় সে জয়ী হয়েছে। রামচন্দ্র দীন অনুগ্রহ প্রার্থীর মত বারবার তার কাছে দূত পাঠাচ্ছে। রাজকার্যে অবহেলার জন্যে সুগ্রীব লোকের কাছে দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে। সুগ্রীবের এই অগৌরবে, অপযশে তার বুকের অনির্বাণ জ্বালা জুড়ায়। কিন্তু শান্তি পায় না। কোথায় একটা ব্যথা কাঁটার মত বিঁধে থাকে। তারা বেশ বুঝতে পারে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংকটের সঙ্গে কোথায় যেন বনিবনা হচ্ছে না। নিজের সঙ্গে তার নিজের বিরোধ। সেটা বালীর প্রতি প্রেম, প্রতিহিংসা, না সুগ্রীবের দেহকেন্দ্রিক ভালবাসার গ্লানি? নিজেই ভাল করে বোঝে না। তবে মাঝে মাঝে এই দেহটাই তার যত নষ্টের মূল বলে এর উপর রাগ হয়, ঘেন্না হয়। এই দেহের নেশা যতদিন পুরুষের না কাটে ততদিন নারী সম্রাজ্ঞী তার কাছে। যতদিন না জীবনের দুর্দিন নেমে আসছে, ততদিন কেন সেই সুখ গৌরবে মত্ত থাকবে না?

বালী নিহত। সে জীবন থেকে মুছে গেছে। সুগ্রীব তার অনুরাগী। অনুগত বাধ্য প্রেমিক। তারা নিজেকে দ্বন্দ্বমুক্ত করে সুগ্রীবের উপর দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বলল: প্রিয়তম, আমার হাত ধর। আমাকে তুলে ধর। তোমার চোখ আমার চোখে রাখ। বল—

সুগ্রীব গদ গদ হয়ে হয়ে বলল: আমি তোমাকে ভালবাসি প্রিয়া। শুধু তোমাকেই। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার মধ্যে এমন কামনা জাগ্রত করতে পারেনি। তবু আমার দুঃখ, আমাকে তুমি ভালবাসতে পারনি। এখনও আমার প্রতি একটু একনিষ্ঠ হতে পার না। আমার শক্তি বা ক্ষমতার জন্য নয়, অথবা আমার সৌভাগ্যের জন্যও নয়—শুধু আমার জন্য, সুগ্রীবের জন্য।

অভিমান, দুঃখ যুগপৎ তারার কণ্ঠে ছাপিয়ে উঠল। বলল: হাঁ, যে সুগ্রীব দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ; যে স্নেহময় ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। যার জীবনটা শূণ্যগর্ভ একাকীত্বে ভরা। সত্যিই প্রেমেই কেবল তা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু কোথা পাব প্রিয়তম। আমি যে রাত্রির মত অন্ধকার। আমার নিজের অন্তরের অন্ধকার কাটছে না। তোমাকে আলো দেখাব কোথা থেকে? আমিও তোমার মত রিক্ত। তোমার মত আমিও বলছি, আমাদের হৃদয় এক হয়ে মিলুক। আমাকে তোমার দু'বাহুর মাঝখানে টেনে নাও। আমরা ভালবাসার শপথ নেবো নতুন করে—যে শপথ সারাজীবনে ও ভঙ্গ হবে না। শোনো সুগ্রীব, এখন থেকে চিরজীবনের মতই আমি তোমার, শুধু তোমারই একা।

সুগ্রীব তার দিকে হাতখানা প্রসারিত করে দিয়ে টেনে নিল বুকের উপর।

কিছুক্ষণ মাথা অবনত করে বসে রইল হনুমান। এক অদ্ভুত তিক্ততায় তার মন ভরে উঠল। ধীরে ধীরে হতাশ বিষাদ গলায় উচ্চারণ করল—রমণীর রূপ, মোহ, কি চমৎকার বস্তু, যা যে কোন রাজাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করতে সক্ষম, আর সক্ষম তার ন্যায় নীতির পথ ত্যাগ করাতে।

হনুমানের দ্যুতিময় সদাশয় বাণী রামচন্দ্রকে মুগ্ধ করল। কথা বলার অবসরে রামচন্দ্র হনুমানের চোখের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার অভিব্যক্তির সততা ও আন্তরিকতাকে খুঁজছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর রামচন্দ্র গভীর গলায় বলল ঃ সুগ্রীব শপথ বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু তার প্রতি এক দুরন্ত মোহে, কি এক অনিবার্য সহানুভূতির আকর্ষণে আমার বিবেক, নীতি বিসর্জন দিয়েছি। শুধু তার জন্যে। আমার মতই এক হতভাগ্যের জন্যে। আমার সে কলংক কোনদিন মুছবে না। কিন্তু সুগ্রীব তার বন্ধুত্বের কোন প্রতিশ্রুতি পালন করল না। আমার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করল।

ক্লান্ত স্বরে হনুমান বলল ঃ এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। শুধু দুঃখ, মহান রামচন্দ্রকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

প্রিয় বন্ধু সুগ্রীবের বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করছে। এ এক ভয়ংকর তীর। এটা যে ছোঁড়ে তার দিকেই সেটা ফিরে আসে। তাকে সাবধান হতে বল।

রামচন্দ্র আর দাঁড়াল না। কিন্তু তার কথাগুলো এত গম্ভীর আর বিষাদ যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

রামচন্দ্র চলে যেতে হনুমান লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে রথে চেপে সুগ্রীবের প্রাসাদে উপস্থিত হল। রাজ-অন্তঃপুরে হনুমানের প্রবেশ ছিল অবারিত। এমন কি রাজার শয়নকক্ষেও বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারত। তথাপি, রাজপ্রাসাদের দ্বার অতিক্রম করে বিরাট দরদালান পেরিয়ে সুগ্রীবের শয়নকক্ষের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। একজন পরিচারিকা দরজা উন্মুক্ত করে ধরল। তবু সুগ্রীব তাকে আগমনের সংবাদ দিতে ভেতরে পাঠাল। পরিচারিকা অনুমতি নিয়ে ফিরে এসে সে থামা থামা পদক্ষেপে শয়ন কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল। সুগ্রীবের সামনে এসে দাঁড়াল। অভিবাদন করে বলল ঃ বন্ধুবর সুগ্রীব, শুধু সিংহাসন, সম্পদ, নারী, সম্ভোগ, বিলাস, রাজপুরুষের চাটুকারিতাই কি জীবনের সব! তোমার শপথ, প্রতিশ্রুতি এর কি কোন মূল্য নেই? সখা রামচন্দ্রর অনুগ্রহ নিয়ে তুমি রাজ্য, সিংহাসন, পত্নী পেয়েছ। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তা ভুলে গেলে কেমন করে? তোমার এই অকৃতজ্ঞতার কোন তুলনা হয় না।

সুগ্রীব ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ঃ হনুমান, তুমি কি আমায় নীতিশিক্ষা দিতে এসেছ ?

একটু হাসবার চেষ্টা করে হনুমান বলল ঃ তুমি'ত তোমার মধ্যে নেই। তুমি অপ্রকৃতিস্থ, উম্মাদ। রাক্ষসী খেয়েছে তোমাকে। কোন শিক্ষাই কাজে লাগবে না। তাই যা তোমার মনে ধরবে, চমকে দেবে তাই শোনাতে এসেছি।

সুগ্রীব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল ঃ হনুমান, তুমি আমার বন্ধু। একথা আর কেউ বললে তার জিভ আমি ছিঁড়ে ফেলতাম।

হনুমানের ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু সে হাসল না। ব্যঙ্গ করে বলল ঃ রাজা হয়ে তুমি ছোটখাট বিধাতা হয়ে উঠেছ। তোমার যে অনেক ক্ষমতা তাও জানি। কিন্তু ও সব আমাদের দেয়া। আমরা তোমাকে শ্রীরামের সাহায্যে রাজা করেছি। আবার, আমরা ইচ্ছে করলে, ওখানে অঙ্গদকে বসাতে পারব। তুমি তখন বন্দী অথবা নির্বাসিত হবে।

লক্ষ্মণের কণ্ঠস্বরে অজান্তে তীব্র বিরক্তি এবং উষ্মা প্রকাশ পেল। বলল ঃ নির্বিষ সাপের ফোঁস অসহ্য।

সুগ্রীব চমকে উঠল। তীব্র আঘাতে হৃদয় মথিত হল। হনুমানের মনে দয়া করুণা, সহানুভূতি উদ্রেক করতে তার কন্ঠস্বর বদলে গেল। আহত অভিমানে বলল ঃ হনুমান তুমি আমাকে অপমান করতে এসেছ কি ?

প্রীতিস্বরে বলল ঃ না বন্ধু।

স্খলিত ভেজা গলায় সুগ্রীব বলল ঃ তবে, মিছিমিছি তিরস্কার ভৎর্সনা করছ কেন ?

স্নিগ্ধ ও মৃদুকণ্ঠে হনুমান বলল ঃ এটুকু গালমন্দ তোমার প্রাপ্য। সখা রামচন্দ্র তোমার উপর রুষ্ট। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমিও, শপথ, প্রতিশ্রুতি কিছুই রক্ষা করনি। তোমার প্রতিশ্রুতিভঙ্গে এই অপারাধ আমাদের সমগ্র বানর-জাতিকে লজ্জিত করেছে। তুমি আমাদের রাজা। আমাদের সম্ভ্রম নষ্ট হোক এমন কোন কাজ করা তোমার উচিত নয়। কার্যতঃ তোমার জন্যে শ্রীরামের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

কয়েকমুহূর্ত স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে সুগ্রীব বলল ঃ সখা, রামচন্দ্রের কার্য-সাধনের কোন অন্তরায়'ত করিনি আমি। রাজভাণ্ডার সখার সেবায় উম্মুক্ত। তোমরা সর্বক্ষণ তাঁর সাহায্য করছ। দেশ-বিদেশ থেকে যেসব অগণিত লোকজন সৈনিক এসেছে তাদের ভরণ পোষণের সব দায়িত্ব'ত আমরা নিয়েছি। অস্ত্র নির্মাণের ও উপকরণ যোগানের বিপুল অর্থ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছি। তবু বিশ্বাসঘাতক এই অপবাদ দিচ্ছ কেন ? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগও বা আনছ কেন ?

লক্ষ্মণ সহসা প্রশ্ন করল ঃ রাজার কোন কর্ত্তব্য তুমি করেছ ? প্রতিশ্রুতিমত কাজ হচ্ছে কি না তার খোঁজ করেছ কখনও ? জানতে চেয়েছ কি সখা কেমন আছে ? তার কাজের জন্য আর কি কি প্রয়োজন ? বর্ষার পর আরো এক ঋতু যাই যাই করছে, তবু যুদ্ধযাত্রার কোন উদ্যোগ নেই। এই অহেতুক দেরী কার স্বার্থে ?

ভাই লক্ষ্মণ রাজাকে রাজ্যের স্বার্থ অবশ্যই দেখতে হয়। মিত্রতা মানে এই নয় যে, আমার দেশের ও জাতির ধ্বংসস্তূপের উপর মিত্রের বিজয় কেতন উড়বে। সব দিক বিবেচনা করে আমাকে অগ্রসর হতে হবে।

লক্ষ্মণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি কি মনে কর, তোমাকে ছাড়া রামচন্দ্রের চলবে না। অগ্রজ তোমার অনুগ্রহ কিংবা অনুকম্পার প্রত্যাশী নয়। বন্ধু বানর নরপতির রাজমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে নিয়ম মাফিক একটা আদেশ প্রত্যাশা করেন। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেতে শ্রীরামের অভিযান থেমে থাকবে না।

সুগ্রীব কয়েকমুহূর্ত্ত চুপ করে থাকল। রাবণের সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষ করা তার ইচ্ছা নয়। কিন্তু ঘটনাস্রোত যেভাবে এগোল তাতে আর দায়িত্ব এড়িয়ে থাকা অসম্ভব হল। নিজের দোষ ও ত্রুটি গোপন করতে সে কথার আশ্রয় নিল। প্রীতি-বাক্যে লক্ষ্মণকে তুষ্ট করার জন্যে বলল ঃ ভাই লক্ষ্মণ তুমি অকারণ ক্ষুব্ধ হচ্ছে। অগ্রজ তোমার অতিথি নয়, তিনি আমার সখা। আমার হৃদয়ের আত্মীয়। আমার সব কিছুর উপরে তাঁর অধিকার। নিজের মনে করে তিনি যা যা করছেন তার তদ্বির তদারক কি ভাল দেখায়? এই বাহ্যিক শিষ্টাচার ও সৌজন্য লোকে অনাত্মীয় ও অতিথির সঙ্গে করবে। আমি নিতান্ত সংকোচবশতঃ এবং সখা বিব্রত হবে মনে করেই তার কোন কাজ দেখিনি, খোঁজ করি নি। এ যদি আমার অপরাধ হয়, কর্তব্যচ্যুতি হয় তা হলে আমি দোষী।

লক্ষ্মণের দুই চোখে মুগ্ধতা, দৃষ্টিতে বিস্ময়। তার চোখে চোখ রেখে সুগ্রীব হৃষ্ট হয়ে বলল ঃ আমি'ত জানি সখা আমাকে সহায়মাত্র করে নিজের তেজেই রাবণবধ ও সীতা উদ্ধার করবেন। কিন্তু রাবণের সঙ্গে সৈন্যেরা যুদ্ধের উপযুক্ত হয়েছে কি না তার সংবাদ'ত আমি পায়নি। সেনাপতিদের নির্দ্দেশ না পেলে আমি কেমন করে যুদ্ধের আদেশ দেব?

লক্ষ্মণ জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না। বড় বড় আর ঘন কালো ডাগর দুটো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে টলটল করতে লাগল। একটা অনুতাপ জনিত বেদনা। কয়েকমুহূর্ত সুগ্রীবের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলল ঃ সখা, তোমাকে যে কটু কথা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা কর।

হনুমান তার বিশ্বস্ত গুপ্তচর বাহিনী ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করল রাবণের অনুগত বান্ধব ও রাজাদের কার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব? তারা রাবণকে কিভাবে সহায়তা করতে পারে? তার পেছনে কোন কোন শক্তি আছে?

রাক্ষস ও অসুররা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ করে জানল। যেসব রাজ্য রাবণের পক্ষ নিতে পারে বলে মনে হল, তাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সুগ্রীব বিনত নামক এক যূথপতির উপর ভার অর্পণ করল। দক্ষিণ দিকে সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে কোথায় কিভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হবে, তার দায়িত্ব অঙ্গদকে দিল। তাম্রপর্ণী নদী পার হয়ে পান্ড দেশের অভিযানের ভার পড়ল নীলের উপর। সাগরের অপর পারে শতযোজন বিস্তৃত যে দ্বীপ আছে সেখানে রাবণ বাস করে। সেই দেশ অনুসন্ধান করতে সুগ্রীব হনুমানকে পাঠানো যুক্তিযুক্ত মনে করল। হনুমান ছাড়া আরো কারো দ্বারা এই কঠিন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে সুগ্রীবের মনে হল।

হনুমানকে বিদায় দেবার সময় সুগ্রীব তাকে আলিঙ্গন করে বলল: হনুমান, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তোমাকে দিলাম কঠিন কার্যের ভার। তুমি বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান এবং কালোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধ হস্ত। তোমার সাফল্য বিজয়কে ত্বরান্বিত করবে। আর যদি ব্যর্থ হও তাহলে আমরা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব। তোমার কার্যের উপর আমাদের বিজয়ের অর্ধেকটা নির্ভর করছে। তুমি প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্যন্ত আমরা এই সমুদ্রসম নদী তীরে অপেক্ষা করব।

হনুমান অভিভূত হল। রামচন্দ্র এক বিচিত্র দৃষ্টিতে সুগ্রীবের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত। সাফল্যের জয়যাত্রা সুরু। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতার উপর গড়ে উঠেছে এক নতুন রাজনৈতিক আত্ম-নির্ভরতা। তবু রামচন্দ্রর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। তাকে নীরব থাকতে দেখে হনুমান বলল: সখা রামচন্দ্র আমাকে আলিঙ্গন দাও।

রাম তার আচ্ছন্নতার মধ্যে চমকে উঠল। হনুমানকে দু'বাহুর মধ্যে টেনে নিল। বলল: বন্ধু, কুটবুদ্ধির জালে শত্রুকে কিভাবে পরাস্ত করতে হয় তুমি জান। মানুষের দুর্বলতার সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি তুমি ভাল করেই বোঝ। তোমার সাফল্য সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তবু জেনে রাখ, সীতা অন্বেষণ তোমার একমাত্র কাজ নয়। তোমাকে যে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো অনুধাবন কর। এই বিশাল সমুদ্রসম নদী পাড়ি দেয়ার জন্য এর সংকীর্ণ গতিপথটি সন্ধান কর। লংকার কুলে পেঁছিতে না পারলে আমাদের কোন বিক্রম নেই। তোমার দ্বিতীয় কাজ হল লংকায় পেঁছে বিভীষণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। বিভীষণ তোমাকে সাহায্য করবে। তবু সতর্ক হয়ে কথা বলবে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে রাক্ষসদের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও বিরোধ সৃষ্টি করবে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজ-কর্ম করে শত্রুর আতঙ্ক বৃদ্ধি করবে। গোপন সংবাদ সংগ্রহের কাজে বিভেদকামী লোক নিযুক্ত করবে। প্রয়োজনে উৎকোচ দেবার জন্যে বিভীষণের কাছ থেকে রত্ন, অলংকার, মুদ্রা সংগ্রহ করবে। লঙ্কার উপকূল জুড়ে কি ধরনের কত দুর্গ আছে তা সন্ধান করবে। তাদের কত সৈন্য, কত রকমের অস্ত্র আছে তারও সন্ধান নেবে। রাজ্যের অভ্যন্তরে শত্রুকে দুর্বল করার বীজ বপন করতে যা যা করলে ভাল হয় সব

তোমাকে করতে হবে। বিভীষণ সম্ভবতঃ তোমার আশ্রয়দাতা হতে পারে। নির্ভয়ে তুমি আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিয়ে যাত্রা কর।

হনুমান হঠাৎ উৎফুল্ল হল। মনটা মুহূর্তে খুব উদার আর মহৎ হয়ে গেল। বলল ঃ সখা সমুদ্রের পারে আমি যাব। আমাদের প্রত্যেকটি সৈনিক ঐ অচেনা সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। আমি রাবণের প্রাসাদ আগুন লাগিয়ে খাক করে দেব। সীতাকে আমরা ফিরিয়ে আনব অযোধ্যার মাটিতে।

রামচন্দ্রের অধরে স্ফুরিত হাসির ঝিলিক। আনন্দে বুকের ভেতরটা উদ্বেল হয়ে উঠল। হনুমানকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করার জন্যে বলল ঃ এই আকাঙ্খা আর আকাঙ্খা পূরণের প্রয়াসই বীরচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতিমুহূর্তকে সে সার্থক করতে চায় বীরধর্ম পালন করে। অদম্য তার উদ্যম, প্রচণ্ড তার শক্তি, দুর্মদ তার সাহস, সুতীব্র তার সহিষ্ণুতা, গভীর তার কর্তব্যবোধ। ভয়াল আবর্তের মধ্যে বীর অকুণ্ঠ উৎসাহে ঝাঁপ দিতে তাই তার ভয় করে না।

॥ উনিশ ॥

যুদ্ধের প্রস্তুতি লংকাতেও পূর্ণোদ্যমে শুরু হল।

সারা লংকার সমস্ত বীর সৈনিক ও সেনাপতিদের ডাকল রাবণ। তাদের নিয়ে একদিন রাজসভা বসল। আমন্ত্রিত অতিথিদের শপথ স্মরণ করে দেবার জন্য রাবণ বলল ঃ দেশ ও জাতির সংকটে নিজেদের বিবাদ-বিভেদ ভুলে এক জাতি, এক রাষ্ট্র এই ঐক্যবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা শত্রুকে অতীতে প্রতিহত করেছি, ভবিষ্যতেও করব। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা মাতৃভূমিকে রক্ষা করব। দেশের জন্য, জাতির জন্যে প্রত্যেক বীরের প্রাণ উৎসর্গীকৃত।

রাবণের ঘোষণার ভেতর অকস্মাৎ বিভীষণ উঠে দাঁড়াল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে রাবণের কথার প্রতিবাদ করে বলল ঃ এই যুদ্ধ তুমি প্রত্যেক লংকাবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছ। তোমার নিজের একটি ভুলের মাশুল দিতে হবে গোটা জাতকে। জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে নারী হরণের ঘটনাকে না জড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধেই ফয়সালা করে নিতে পারতে।

নিস্তব্ধ সভাকক্ষে বিভীষণের কথাগুলো ঝড় তুলল। নানা জনে নানা মন্তব্য করল। উত্তেজনা দানা বাঁধার আগে রাবণ ক্রোধ প্রশমিত করে শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল ঃ ভ্রাতা বিভীষণ, জাতীয় সংকট কালে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সবচেয়ে গুরু নাগরিক দায়িত্ব। বিরোধকে যে উস্কে দেয় সে দেশের শত্রু। তোমার বিচার-বোধহীন নির্বোধ উক্তি কেবল সংশয় বাড়িয়ে তুলল। সভাস্থ ব্যক্তিদের অবগতির জন্য আমি একটি প্রশ্ন করব। তোমাকেই তার জবাব দিতে হবে। নারী হরণ আর নারী অঙ্গবিকৃতিকরণের মধ্যে কোনটা বেশী অমানবিক আর বর্বরতা ?

বিভীষণ অপরাধীর মত মাথা হে'ট করল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রাবণ বলল: নৃপতির নারীহরণের ঘটনা বীর্যাবর্তের নিদর্শন। পৌরুষবলে নারীকে হরণ করা, নৃপতির কোন গর্হিত কর্ম নয়। কিন্তু লক্ষ্মণ বিনা কারণে নির্দোষ শূর্পণখা এবং অয়োমুখীর নারী অঙ্গ বিকৃতি যেভাবে করল তা বর্বর সমাজের মানুষও চিন্তা করতে পারে না। তারাও বোধ হয় সে দৃশ্য দেখে চমকে উঠত। আমি তাদের এই জঘন্য আচরণের প্রতিবাদ করেছি সীতাকে হরণ করে। তার রাজকীয় মর্যাদা, গৌরব, সম্ভ্রম দিতে কোন ত্রুটি রাখিনি। আমার ধারণা ছিল, সহায় সম্বলহীন রাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে সীতা উদ্ধারের ডাক দেবে, অথবা সে তার আচরণের জন্য লজ্জা প্রকাশ করে তার মুক্তি প্রার্থনা করবে। কিন্তু রামচন্দ্র উত্তরাপথ দক্ষিণারণ্যের লোকজনকে ক্ষেপিয়ে আমার বিরুদ্ধে জড় করে এক বিরাট যুদ্ধ আয়োজন করছে। অথচ, এই যুদ্ধ হওয়ার কোন কল্পনাই আমার ছিল না। দু'জনের মর্যাদার লড়াই দ্বন্দ্বযুদ্ধেই নিষ্পত্তি হতে পারত। কিন্তু রাম যখন তা করল না, তখনই বুঝতে পারলাম তার মতলবের কথা। যেন তেন প্রকারে আমাদের সঙ্গে একটা বিরোধ পাকিয়ে সে এক সর্বনাশা যুদ্ধ চায়। তাই গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের অপরাধে শূর্পণখাকে অয়োমুখীকে প্রাণে না মেরে তাদের নাসিকা, স্তন কেটে দিয়েছে। আমাদের প্রতি তাদের ঘৃণ্য মনোভাব, অবজ্ঞা, বিতৃষ্ণা, ক্রোধ ঐ জঘন্য বর্বরতায় প্রকাশ পেয়েছে। এটা কি আমাদের জাতীয় অপমান নয়? আমাদের রাক্ষসকুলের নারী লাঞ্ছনা, নির্যাতনকে জাতীয় সমস্যার চোখে দেখা কি কোন অন্যায় কাজ হল সভাসদবর্গ? সাধারণ মানুষের মনে রামচন্দ্রের বর্বরতা সম্পর্কে যে আতংক জেগেছে, নিরাপত্তা বিষয়ে সে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে সে কি জাতীয় সংকট নয়?

রাবণের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তার জয়ধ্বনি দিল। সকলের ভেতর চাঞ্চল্য উৎসাহ দেখে রাবণের অন্তরে আশার সঞ্চার হল। মনেতে স্বস্তি অনুভব করল। বিভীষণের নির্বোধ উক্তি যে সংকট সূচনা করেছিল তা থেকে এত সহজে মুক্তি পাওয়ার কথা ভাবতে তার সারা অঙ্গে এক পুলকানুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। খুশি খুশি মন নিয়ে বিভীষণকে প্রশ্ন করল: বিভীষণ শুনতে পাচ্ছ সকলের হৃদয়ের অফুরন্ত আনন্দ আর উল্লাস? তুমি কি আমাদের রাক্ষসবংশের সন্তান? তুমি কি আমার ভাই? না, অন্য গ্রহের কোন মানুষ? এই আনন্দ সাগরে তুমি কেন এত নিরানন্দ? তুমি কি চাও রাক্ষসজাতি বিরোধ বিভেদে টুকরো টুকরো হয়ে যায়? কোন স্বার্থ আর মতলবে তুমি এমন জঘন্য কাজ করতে চাইছ? তোমাকে সতর্ক সাবধান করার জন্যে বলি, রাক্ষসজাতির দেশাত্মবোধের, স্বাজাত্যপ্রীতি, দেশ ও জাতির অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ উৎসর্গিত প্রাণ, তাদের শৌর্য বীর্য, সাহস, তেজ, আনুগত্য, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, পরামর্শ আমার সর্বশক্তির মূল। এই পরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ লংকাকে ভারতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে। এ গৌরব সমগ্র লংকাবাসীর। আমি কেবল সহায়মাত্র।

রাবণের বিপুল জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল রাজসভা। নানা জনের নানা কথার

ভেতর একটা কথা বারংবার শোনা যেতে লাগল : লঙ্কাধিপতি, মানুষ ও রাক্ষসের বিরোধ সনাতন। এ তারই পুনরাবৃত্তি। আমাদের পুরনো খেলা। এ খেলার শেষ নেই কোনদিন। আমরা রামকে রুখব। সোনার লঙ্কায় তাকে পা রাখতে দেব না।

রাজসভার চৌহদ্দী ছাপিয়ে সাগরসম বিশাল নদী, পাহাড় আর উপত্যকা ঘেরা সারা লঙ্কায় ছড়িয়ে পড়ল সে কথা। সাড়া জাগল প্রতিটি লংকাবাসীর বীর প্রাণে।

হনুমান নদীতে ভেলা ভাসাল। প্রশস্ত লম্বা কাষ্ঠখণ্ড অনুকূল স্রোতে ভেসে চলল। গাঢ় কৃষ্ণাভ নীল তরঙ্গ সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে কল কল্লোল তুলে আছড়ে এসে পড়ছে ভেলায়। তরঙ্গ শীর্ষে রৌদ্রচ্ছটা ঝিকমিক করছে। অবিরাম কল্লোল ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে দশদিক। যে দিকে তাকায় হনুমান, শুধু-জল-আর-জল।

কিস্কিন্ধ্যার উপকূল থেকে লঙ্কার অভিমুখে যেতে যেতে হনুমান ভাবছিল রাবণের কথা। বিশাল বাহিনী নিয়ে লংকা থেকে সুদূর দেবভূমি পর্যন্ত হানা দিয়েছে সে। একবার নয়, বহুবার সে আর্যাবর্তের বিভিন্ন স্থান আক্রমণ করেছে। রণতরী সাজিয়ে বারবার এতবড় বিরাট যুদ্ধ পরিচালনা করা শক্ত কাজ। সুতরাং তার মনে হল, এই নদী পার হওয়ার নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত সেতু আছে।

নদীবক্ষে একটি উঁচু পর্বত দেখতে পেল। ওটাই কি মৈনাক পর্বত? পর্বতের কাছাকাছি আসতে উপর থেকে একের পর এক দড়ির ফাঁস পড়ল তার উপর। দড়ির ফাঁসে আটকা পড়ল সে। হনুমান বুদ্ধি হারাল না। কোনরকম চেঁচামেচি কিংবা চিৎকারও করল না। নিরীহের মত চুপ করে থাকল। উপর থেকে দড়ি টেনে তোলার আগেই সে একটি ভারী শিলাখণ্ডের গায়ে দড়ির একপ্রান্ত জড়িয়ে দিল। সাধ্যসাধ্যি করেও যখন উঁচুতে তাকে তোলা গেল না তখন আট দশ জন এক হাঁটু জলের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে এসে তাকে ধরল। ষণ্ডামার্কা দু'জন লোক তার মুক্ত হাত দুটো চেপে ধরল। একজন তার সামনে বর্শা তুলে ধরল। একটু তফাতে আর একজন খড়্গ নিয়ে দাঁড়াল। বাকীরা তার ফাঁস খুলতে লাগল। ফাঁসমুক্ত হয়েই সে বর্শাধারী ব্যক্তিকে পায়ের প্রচণ্ড ঠেলায় গভীর জলে ছুঁড়ে দিল।

খড়্গধারী ব্যক্তির দিকে একজনকে ঠেলে দিয়ে অন্যদের উপর প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ক্ষিপ্র আক্রমণ এবং মুষ্ট্যাঘাতে তারা সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। সঙ্গীদের ঘায়েল হতে দেখে খড়্গধারী হনুমানকে বধ করতে উদ্যত হল। হনুমান আক্রমণের নিশানা থেকে সরে গিয়ে তার অস্ত্রচালনা রোধ করল। জলের মধ্যে তার মুণ্ডু চেপে ধরে হত্যা করল। মাত্র কয়েকমুহূর্তে তার জয় সম্পন্ন হল। প্রহরীদের পোষাকের সঙ্গে নিজের পোষাক বদলে নিয়ে সে একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করে ফেলল।

এরা যে সকলে রাক্ষস প্রহরী তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। লঙ্কার দুর্ভেদ্য উপকূলে কোন বিদেশী যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্যে এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। স্বল্প জলের নীচে সুন্দর শিলাস্তর দেখতে পেল। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে ডুবো পাহাড় আড়াআড়ি ভাবে নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে গিয়ে মিশেছে। এই পথে লঙ্কায় পৌছানো যায় বলে হনুমানের ধারণা। এখানে নদীর বিস্তারও অপেক্ষাকৃত কম মনে হল। অন্য পাড়ে দিগন্ত বিস্তৃত ঘর বৃক্ষবেষ্টনীর একটা ছায়াঘন ভাব আকাশের নীচে দেখতে পেল।

সূর্য তখন অস্তাচলে। পশ্চিম আকাশে রক্তাভা হয়ে উঠেছে। সূর্য টকটকে লাল। গোল। নদীর দিকে মুখ করে উদ্ধতের মত দাঁড়িয়ে আছে বিরাট দুর্গ। সেউঁতির উপর দেহটাকে মিশিয়ে দিয়ে ঘাড় উঁচু করে হনুমান দেখতে লাগল বাঁধানো নদীর ঘাটে বেলা শেষের আভায় রক্তাভ জলে কৃষ্ণকায় পুরুষেরা স্নান করছে। সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ ঘাটের পৈঠায় বসে, পা ছড়িয়ে গল্প করছে। এরা সকলেই সৈনিক। তাদের সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ এখানে ওখানে ছড়ানো। হনুমান ডুবো পাহাড়ে হাঁটু পর্যন্ত জলে গা ডুবিয়ে বসে রইল।

নদীর কল্লোলে কান পেতে ওদের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করল। মধু মক্ষিকার গুঞ্জন ধ্বনির মত ধ্বনিত হতে লাগল। স্বর অনুচ্চ, কিন্তু সুরে উত্তেজনা রয়েছে। কিন্তু একটা কথা বা শব্দ বোঝা যায় না। বহুজনের উচ্চারিত কথার জটলা বাতাসে ভেঙে গিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। জলের কলধ্বনি যেন তার উপর একটি আবরণ টেনে দিয়ে তাকে আরো অস্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু মনে হচ্ছে, একটা হায় হায় আক্ষেপ যেন সব কিছুর মধ্যে রয়েছে।

অন্ধকার ঘন হলে দুর্গের শীর্ষ থেকে তূর্য ধ্বনি করল প্রহরী। সৈনিকেরা যে যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় দৌড়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল। পেটা ঘণ্টায় আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের বিশাল দরজা বন্ধ হয়ে গেল!

চারদিক ফাঁকা এবং শূন্য হয়ে গেলে হনুমান চুপিচুপি জল থেকে তীরে উঠল। তার দৃষ্টিতে বিস্ময় মিশ্রিত জিজ্ঞাসা। মুখে অপরিচয়ের অভিব্যক্তি।

অচেনা স্থানে কোথায় যাবে, কি করবে এ সব চিন্তা করল না। চতুর্দিকে গুপ্তচর এবং পাহারাদারদের সন্ধানী দৃষ্টি। একটু ইতস্তত করলেই লোক বিদেশী বলে সন্দেহ করবে। তাই, কোন দ্বিধা সংশয় না করে সে সামনের পথ ধরে এগোতে লাগল।

জ্যোৎস্নার আলোয় মাঠের মাঝে আয়নার মত ছোট ছোট জলাশয়, খাল, বিল ঝিকি ঝিকি করে। ধান খেতগুলো চাঁদের আলো লেগে সোনালী খড়ের মত দেখায়। পথের ধারে কচি সবুজ রঙ দেখা যায় আলু মটরের খেতে। অনেক জায়গায় লম্বা ঘাসের জঙ্গল, কিছু বাবলার ঝাড় চোখে পড়ল। দূরে বিচ্ছিন্ন একটা পাতাঝড়া বড় গাছের শাখায় অনেক বেলেহাঁসের দল। এরা যাযাবর পাখী। এসেছে বাঁচার তাগিদে বিপুল খাদ্যের প্রত্যাশায়। যেতে যেতে চোখে পড়ল একটি বিশাল বন। বনটি শিকারের উপযুক্ত। পাখী, শৃগাল, খরগোস, বরাহ, বনবেড়াল পথের উপর দিয়ে

যেতে দেখল। দু'একটা মানুষ বাসের ঝুপড়িও দেখল। যতই এগোয় ততই গ্রাম চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

একদল নারীপুরুষের সাথে দেখা হল পথে। কোমরে নেংটি; গায়ে ছেঁড়া জামা, মাথায় গামছা জড়ানো, কানের ফুটোয় গোঁজা মোটা কাঠি, কালো কুচকুচে রঙ; মেয়েদের হাঁটুর উপর কোমড় পর্যন্ত কাপড় জড়ানো। উপরের অংশ নগ্ন। বক্ষে কোন আবরণ নেই। মানুষগুলোকে দেখলেই বোঝা যায় এরা গ্রামের আদিবাসী। ঝুপড়িতে বাস করে। শিকার করে। মজুরী খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। সৈনিকের পোশাকে হনুমানকে দেখে তারা সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে হনুমান সারা রাত ধরে ঘুরল। কুকুরেরা তাকে দেখে ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল যা একান্তই গৃহস্বামীর সতর্ক হওয়ার সংকেত। ঝুপড়ি থেকে মানুষ বেরিয়ে আসে দলে দলে। লংকার প্রহরীর পোশাক পরিহিত হনুমানকে দেখে তারা আবার নিশ্চিন্ত চিত্তে যে যার ঘরে ফিরে যায়। হনুমান বুঝতে পারল যে নগরের কাছাকাছি কোন গ্রামে এসেছে। মনে মনে ভাবল, এটা তার ভালই হল। এখানে নিজেকে লুকানোর জায়গা যেমন পাবে, তেমনি গুপ্তচরের দৃষ্টির বাইরে বসে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে লংকার একটা সামগ্রিক পরিচয় এবং অনেক গোপন খবরও সংগ্রহ করতে পারবে।

গ্রামে গ্রামে প্রহরীর ছদ্মবেশে ঘুরে এ দেশের মানুষের আচার-আচরণ রপ্ত করল। ভাষা তার আগেই শেখা ছিল। ফলে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে কোন বাধা হয় নি। হনুমান আশ্চর্য হল, এ দেশের মানুষের চোখে রাবণ লংকার বিধাতা। তার সীতা হরণ কোন মন্দ কাজ নয়। শূর্পণখা এবং অযোমুখীর অঙ্গবিকৃতিকরণ-কারীকে তারা ক্ষমা করতে রাজী নয়। তাদের ঐক্য সংহতি এত দৃঢ় ও মজবুত যে কোন কথাতে তারা বিভ্রান্ত হয় না। জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করতে এবং অপমানের প্রতিশোধ নিতে যদি রাক্ষসবংশ ধ্বংসও হয় তবু প্রত্যেকে জীবন মরণ পণ করে, দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। রাক্ষসদের মধ্যে বিভেদ ঘটানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তাদের দৃঢ় মনোবল, আশ্চর্য মানসিকতা হনুমানকে বিস্মিত করল। কিন্তু তারা তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে যখন শুরু করেছে তখনই অন্যত্র সরে গেছে। হনুমান তার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারল, এভাবে বেশিদিন প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব। কাজেই সীতা ও বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাতের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে সে বৃদ্ধ কুব্জায় ছদ্মবেশে লংকা নগরীতে প্রবেশ করল।

নিশ্ছিদ্র পাহারা ভেদ করে সুউচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হনুমানের সাধ্যে কুলাল না। রাজপুরীর কোথায় কি আছে? রাবণের সৈন্যসংখ্যা

কত, কি কি ধরণের যুদ্ধাস্ত্র এবং যানবাহনাদি আছে তার কোন তথ্যই সে সংগ্রহ করতে পারল না। দুর্গের অভ্যন্তরে রাবণের আনন্দ নিকেতন, প্রাসাদ কানন, সরোবর প্রভৃতি রয়েছে। সীতা কোথায় ? সে জীবিত না মৃত তাও জানতে পারল না। বিভীষণের সঙ্গেও তার দেখা হল না।

হনুমান হতাশ হল। কি করবে কিছুই স্থির করতে পারল না। বিমর্ষ চিত্তে একটি নির্জন পরিত্যক্ত পুষ্করিণীর ধারে বসে সে ভাবছিল, অতঃ কিম ? কিস্কিন্ধ্যায় ফিরে সে সুগ্রীবকে কি বলবে ? রামচন্দ্র উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসার উত্তরের জবাব কি দেবে ? জাম্বুমান, অঙ্গদ এর কৌতূহল কেমন করে নিবৃত্ত করবে ? তার চাতুরীর সুনাম, পৌরুষের গর্ব সাহসের আত্মশ্লাঘা সব বিফলে গেল ! শক্তিবীর্য সাহসের অগ্নিপরীক্ষায় এমন ব্যর্থ হওয়ার লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে তার মন পুড়তে লাগল। এ জীবন থাকার চেয়ে না রাখাই ভাল। এতবড় অপমান নিয়ে বাঁচার মত দুঃসহ যন্ত্রণা আর কিছু নেই। সুতরাং আত্মহত্যা করেই সে জ্বালা জুড়োনোর সংকল্প করল। পরক্ষণেই মনে হল, মৃত্যু মানেই জীবনের সমাপ্তি। জীবন থেকে ভীরু কাপুরুষের মত পলায়ন। আত্মহত্যার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। শাস্ত্রেও আত্মহত্যা অত্যন্ত নিন্দিত ও গর্হিত কর্ম। প্রাত্যহিক জীবনে আত্মহত্যাকারীকে প্রীতির চোখে দেখে না। তাদের অযোগ্য, অপদার্থের চোখে দেখে।

হনুমানের বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে অনেক বেদনা ও গ্লানি বেরিয়ে গেল। বুকটা হাল্কা বোধ হল। আত্মহত্যার ইচ্ছাটা ত্যাগ করে সে চিন্তা করতে লাগল আরো একটু ধৈর্য, অধ্যবসায়, বুদ্ধি সাহস দেখাতে পারলে হয়ত ব্যর্থতার এই বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। সাহস ও উদ্যমই সৌভাগ্যের মূল। তাতেই সুখ এবং কার্যসিদ্ধি হয়। যে সব স্থান এখনও তাঁর যাওয়া বাকী আছে সেইসব স্থান ঘুরে দেখলে হয়ত 'মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন'।

অবসাদ, বিষাদ, হতাশ ভাবটা অকস্মাৎ মন থেকে দূর হল। মাথাটা ভীষণ খালি আর দেহটা হাল্কা বোধ করল হনুমান। আশা জাগল। উদ্দীপনা এল। মনে বল, বুকে সাহস জাগল। হনুমান এবার উঠে দাঁড়াল।

অন্ধমায়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষে করা মেয়েটির গানের কলিগুলো তার মনে পড়ল। প্রত্যেকটি কথা ও সুর তার অনির্বচনীয়। এদেশের মানুষের কাছে এই সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। কণ্ঠে সুরে এক অদ্ভুত মোহ সঞ্চার করে। যারা কখনও শোনে নি কিংবা এভাষা বোঝেও না তাদের মনেও সুর এক মোহ সৃষ্টি করে।

হনুমান নিজের কণ্ঠে গুণ গুণ করল। সে নিজেও ভাল গাইতে জানে। বানর-ভূমিতে তার সঙ্গীতের খ্যাতি আছে। অন্ধ মেয়েটির খালি গলার গানের সুরে মোহ মাখানো। সে নিজেও তন্ময় হয়ে গেছে বহুবার। এই গান মানুষের মনকে রাঙিয়ে দেয়, তার হৃদয়কে জয় করে। তাকে সুদূরলোকে নিয়ে যায়। এই গানের ভিতর দিয়ে তাকে দুর্গে ঢোকার পথ করে নিতে হবে।

দুর্গের উত্তর দিকের প্রবেশ পথে একটি শিবের মন্দির আছে। ঐ দিকটা নগরের একেবারে পশ্চাৎভাগ বলে বড় কেউ আসে না। লোক চলাচল করে কম। প্রহরীর সংখ্যাও নগণ্য। এখান দিয়ে তাকে দুর্গে ঢোকার রাস্তা করতে হবে। বৃদ্ধ কুব্জ ফকিরের ছদ্মবেশে হনুমান আপন মনে গুণ গুণ করতে করতে মন্দির দেখে থামল। লোহার গরাদ লাগানো দ্বারদেশে ভেতর থেকে বন্ধ। কেবল কাঠের কপাট দুটি উন্মুক্ত আছে দর্শনাথীদের দর্শনের জন্য।

তন্ময় হয়ে দেখছিল হনুমান। দুই চোখে তার বিহ্বলতা নামল। কণ্ঠে সুর ভরে উঠল। লোহার গরাদ ধরে সে গাইতে লাগল। তার সঙ্গীতে অনাদি সৃষ্টির আদিতে নিস্তরঙ্গ শব্দের মধ্যে প্রথম নটরাজের চরণ পাতে যে ধ্বনি ঝংকৃত হল, যে সুর জন্ম নিল, সেই সুরের হিল্লোল সৃষ্টি হল। প্রলয় তাণ্ডবের ভীম ভয়ংকর নিনাদ থেকে বংশীধ্বনি, আকাশের মেঘ গর্জনের বজ্রনাদ থেকে কোকিলের কুহুধ্বনি সবই তার কণ্ঠে ঝংকার তুলল। প্রহরীরা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। কারো কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

গান শেষ হলে ফকিরবেশী বৃদ্ধ কুব্জ হনুমান লঙ্কাবাসীর নিজস্ব ভঙ্গীতে দেবতাকে তার প্রণাম নিবেদন করল। ভক্তিতে আপ্লুত দুই চোখের কোণ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। মাটি ভিজে গেল।

শ্রোতা প্রহরীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সুরের ছোঁয়ায় তাদের মন হয়েছে পুলকিত। হৃদয় হয়েছে অস্থির। বুকের ভেতর তাদের নানা ভাবতরঙ্গ উপছে উঠল।

এ গান হনুমানের নিজের রচনা। এ হল শুধু সঙ্গীতের ভুমিকা মাত্র। সুর ও তালের দেবতার বন্দনাগীতি।

সঙ্গীতের যাদুমন্ত্র যেন আশপাশের প্রহরীদেরও চুম্বকের মত আকর্ষণ করল। তারা একে একে জড় হলে দ্বার দেশে। সবাই আরো গান শুনতে উৎসুক। কিন্তু হনুমানের তখনও পর্যন্ত প্রণাম শেষ হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে প্রণাম করল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সে মাটি থেকে উঠল। কৌতূহলী চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে সে দুর্গ দ্বারের গরাদে অনেকগুলি মুগ্ধ শ্রোতার খুশি খুশি মুখ দেখে। পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজল।

মন্দিরের পুরোহিত ততক্ষণ হনুমানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাল করে দেখল তাকে। তারপর স্নিগ্ধ আর প্রশান্ত কণ্ঠে বলল ঃ কে তুমি ফকির? কোথায় শিখলে এই নাম গান? বিধাতা তোমার কণ্ঠে সুর দিয়েছে। পাথরের দেবতাদের পর্যন্ত তোমার গানে ঘুম ভেঙে যায়। তুমি আমাদের মন্দিরে এস। নাট মন্দিরে আবার নাম কীর্ত্তন কর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হনুমান বলল ঃ না।

প্রহরীরা বলল ঃ আমরা তোমাকে যেতে দেব না।

হনুমান নীরব। গম্ভীর থমথমে মুখে তাদের দিকে দক্ষ অভিনেতার মত তাকিয়ে

রইল বেশ কিছুক্ষণ। প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখখানা। মুহূর্তে তার রঙ বদলে পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ করল। শান্ত অথচ মধুর গলায় বলল ঃ বাবা সকল, আমি ফকির। আমাকে বাধা পড়তে নেই। বাঁধতেও নেই। পথই আমার সব। আমি বিশ্বসভায় বসে নিজের মনে নামকীর্ত্তন করি। আমার শ্রোতা কেউ নেই। বনের পাখী, হরিণ, গাছপালা, লতা এরাই শোনে। তোমরা ঈশ্বরের নাম গান শুনে মুগ্ধ হয়েছ, সেও আমার কিছু নয়। ঈশ্বরের জিনিস। ঈশ্বরের সেবক হয়ে তাঁর সম্পদ যদি তোমাদের দিতে পারি তা-হলে ঈশ্বরপূজা হল। তোমাদের ঐ ভিতরটা বড় সংকীর্ণ। ওখানে আমার স্থান হবে না। আমার অপরাধ নিও না বাবা সকল—ভিক্ষুক রাজার মন্দিরে গেলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যায়। আমাকে মহাপাপের ভাগী কর না।

থর থর করে কেঁপে উঠল পুরোহিত। তার চেতনার ভেতরে সমস্ত সত্তার ভেতরে ফকিরের কথাগুলো আলোড়িত হতে লাগল। তার মনে হল, ফকির যেন ভুবনজোড়া আলোর ভাণ্ডার এনে দিল তার কাছে। মুগ্ধ স্বরে বলল ঃ তুমি উদার, তাই বা কেন বলি-তুমি সাধক, আলোর দূত।

হনুমান তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলল ঃ না, না আমি অচ্ছুৎ। তোমাদের পায়ের ধুলো। আমার ঈশ্বর পূজার কোন অধিকার নেই।

পুরোহিতের পরম আবেগে চোখ দুটো সহজে বুজে এল। কেমন একটা স্বর্গীয় সুখের অনুভূতিতে তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে গেল। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ঃ কৈলাসে যিনি বাস করেন সেই শিবশংকর নিজেও অন্ত্যজ। তিনি আছেন তোমার মধ্যে, আবার রাজার মন্দিরে। তাঁর যদি রাজার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থাকে তোমারও আছে।

আমাকে লোভ দেখিও না পুরোহিত। আমার অপরিচ্ছন্ন পোশাকের কটু গন্ধে দেবমন্দিরের শুচিতা নষ্ট হবে। তোমরা ঘেন্নায়, গন্ধে কাছাকছি বসতে পারবে না। এ জন্যেই আমাকে মন্দিরে ডেক না।

পুরোহিতের হৃদয়ের ভেতর সেতারের ঝংকারের মত বাজতে লাগল ফকিরের কথাগুলো। বলল ঃ অবহেলা আর ঘৃণা তোমার মনে যে পুঞ্জীভুত অভিমান জমে উঠেছে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলব এমন জোর আমার নেই। তোমার গানের সুরে রয়েছে সমন্বয় ঘটানোর শক্তি।

ব্রাহ্মণ আমি, মুর্খ, তত্ত্ব বুঝি না, সত্য চিনি না। মনের আবেগে গান গাই। বিধাতা কণ্ঠে যেমন যেমন সুর আর কথা দেন, আমি তেমনভাবেই গাই। গান আমার পূজা। আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য।

প্রহরীদের অনেকে বলল ঃ যথার্থ ভক্তের মত কথা বটে। এতকাল পরে একজন সত্যিকারে ভক্ত পেলাম। ইচ্ছে হচ্ছে ওর শিষ্য হয়ে যাই।

একজন প্রহরী'ত দ্বার খুলে একেবারে বাইরে এল। বলল ঃ ফকির শুনব না তোমার কথা। তুমি ভেতরে চল। আমরা তোমার কাছে গান শুনব।

হনুমান বলল ঃ ওরে পাগল ছেলের দল, আমাকে এমন করে বাঁধিস না। আমাকে ছেড়ে দে। কথা দিচ্ছি, প্রতিদিন তোদের গান শুনাব।

আরো কয়েকজন প্রহরী প্রথমজনের দেখাদেখি বেরিয়ে এল। ফকিরকে একরকম ঠেলে ঢোকাল দুর্গে। পুরোহিত বলল ঃ তুমি বোধ হয় লঙ্কার কুলদেবতা। অসময়ের দূত। এর আগে তোমাকে দেখিনি কখনো। কিন্তু তোমার গানে সাম্যের সুর। বিরোধ অবসানের মন্ত্র। লঙ্কার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের যে অগ্নি জ্বলছে তাতে শান্তি বারি ঢালতে পারে তোমার এই গান।

কথাটা গভীরভাবে হনুমানকে স্পর্শ করল। এক মুহূর্ত থামল। সারা লংকা ঘুরে মানুষের কোন বিভেদ সে দেখতে পায়নি। তবু বিভেদের বিষ ছড়ানোর ছোট বড়, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজেয় প্রশ্ন তুলেছে। এইভাবেই বিভ্রান্ত করতে হয়। ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয়, ঐক্যের মধ্যে বিভেদ আনতে হয়। হনুমান তার কূট রাজনীতিক বুদ্ধিতে বুঝেছিল, রাবণের প্রকৃত বিপক্ষীয়রা বিভেদের কথা শুনলে তার ইন্ধন যোগাতে সাড়া দেবে। পুরোহিত তার সেই বুদ্ধির চালে ধরা পড়েছে। কিন্তু তার মতিগতি সম্পূর্ণ জানা নয়। একে বিশ্বাস করাও উচিত নয়। ধূর্ত কোন গুপ্তচর পুরোহিতের বেশে সহানুভূতিতে ভুলিয়ে তার বিভেদবুদ্ধিকে যে উস্কে দিচ্ছে না, কে বলতে পারে? হনুমান আরো সতর্ক হল, কথা সংযত করল। কোন কারণে যদি তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে তা-হলে গুপ্তচরগিরির কঠিনতম সাজা, নির্যাতন, মৃত্যু-দণ্ড ভোগ করতে হবে। সুতরাং সাবধানেই সে কথা বলল ঃ এসব বলছ কেন পুরোহিত? আমি মূর্খ মানুষ। তোমাদের বড় কথা বড় ভাব আমি বুঝব কেমন করে? আমাদের এই সোনার লংকা ছারখার করার মানুষ লংকায় আছে?

না থাকার কি আছে?

সর্বনাশ! শত্রু একেবারে ঘরের ভেতরে?

পুরোহিত ফকিরের কানে ফিস ফিস করে বলল ঃ লংকেশ্বর দুধ কলা দিয়ে যে কালসাপটি পুষেছে একদিন তার বিষে মরতে হবে লংকাবাসীকে।

হনুমান বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পুরোহিতের দিকে। লোকটি তাকে এ সব কথা বলছে কোন মতলবে?

দুর্গের দরজা কর্কশ শব্দ করে বন্ধ হল। প্রহরীদের মনে কোন সংশয় যাতে না জাগে সেজন্য দ্বারের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে বলল ঃ যাঃ, আমার বাইরে বেরোনোর দরজাটা বন্ধ করে দিলে? ছিলাম বনের পাখী, করলে আমাকে খাঁচার পাখী। খাঁচার পাখীর গান বনের পাখীর মত প্রাণবন্ত হয় না। তোমরা আমাকে বেঁধে রেখ না, ছেড়ে দাও। আমি না হয় প্রতিদিন তোমাদের গান শোনাব। কিন্তু বাধা পড়লে আমি হাঁফিয়ে উঠব। মরে যাব।

হনুমানের কথায় প্রহরীরা কৌতুক অনুভব করল। একজন বলল ঃ খাঁচার ভেতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়, ধরতে পারলে মন বেড়ীখানা দিতেম পাখীর পায়।

হনুমান বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ ও বাবা, আমার ভীষণ ভয় করছে। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

প্রহরীরা হাসতে হাসতে বলল ঃ যুদ্ধে কে বাঁচে, কে মরে জানি না। যতক্ষণ বাঁচি ততক্ষণ তোমার গানের সুরে মনটাকে মাতিয়ে রাখি।

হনুমান আর কথা বাড়াল না। নাটমন্দিরে শ্বেতপাথরে শুভ্র মেঝেতে বসে সে গান ধরল। অন্ধ মেয়েটির সেই গান। হনুমান জানে, এদেশের নদী পরিবেষ্টিত মানুষ নদীকে বড় ভালবাসে। এরা ভীষণ নদী সচেতন। তারা নদীর শঙ্খের অলংকার পরে, তাই দিয়ে কত শিল্প রচনা করে, বেদনায় আনন্দে তারা এর বেলাভূমিতে গিয়ে বসে। নদীর কল্লোলে প্রেমিক-প্রেমিকা হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনে। নদীর বাতাস তাদের নিদ্রা আনে। আবার এই নদীর তুফানে ঘর উড়িয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয়। নদীর নীলকজ্জ্বল বর্ণের আভা তাদের দেহের লাবণ্য সুষমা সঞ্চার করে। এই দুরন্ত নদীই তাদের জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনার সঙ্গে মিশে গেছে। একে তারা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। নদীর সাঁ সাঁ বাতাস যেন হনুমানের গানের মধুর সুরের সঙ্গে মিশে অনির্বচনীয় হয়ে উঠল। শ্রোতাদের সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা।

হনুমান ফকিরের ছদ্মবেশে সংগোপনে তার কাজ করে চলল গোপনে। একদিন অকস্মাৎ বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়ে গেল। রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়ে বলল ঃ আমি হনুমান। শ্রীরামের দীন সেবক।

বিভীষণ সবিস্ময়ে বলল ঃ আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর পবন পুত্র।

হনুমান তার ইতস্ততঃভাব কাটিয়ে বলল ঃ মহাত্মা বিভীষণ, রামচন্দ্রের ধর্মরাজ্য স্থাপনের সংকল্প এবং ধর্মপূজায় যাতে কোন বিঘ্ন না হয় সেজন্য তিনি লংকায় আপনার মত পরম ধার্মিকের শরণাগত। আপনার অগ্রজ মানুষের ধর্মপালনের স্বাধীনতা হত্যা করেছে। প্রতিহিংসোন্মত্ত হয়ে মহিষী সীতাকে হরণ করেছে। তার এই অনাচার অত্যাচার রামচন্দ্রের সহিষ্ণুতা বিচলিত করেছে। তস্করের মত নারী হরণ করে রাক্ষসকুলে কালিমা লেপন করেছে। বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মার যোগ্য শাস্তি মৃত্যু। তার আর কোন ক্ষমা নয়। এবার ধর্মযুদ্ধ।

হনুমানের দু'চোখ আগুনের মত জ্বলছিল। তার বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় থেকে যেন বজ্রাগ্নি নির্গত হচ্ছিল। বিভীষণের মনে হল, মহাকাল যেন জেগে উঠেছে হনুমানের মধ্যে। লজ্জায় সে মুখ নিচু করল। মৌন হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল ঃ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প সার্থক হোক শ্রীরামের। আমি তাঁর ধর্মপ্রতিষ্ঠার পথে একজন সহায়মাত্র হতে পারি।

শ্রীরামকে অবশ্যই আপনার অভিলাষ জানাব।

বিভীষণকে অভিবাদন করে সে নিজের কুটীরে ফিরে গেল। সেই রাতেই লঙ্কাপুরী ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল।

গভীর রাতে প্রহরীরা যখন ঘুমে অচেতন, হনুমান চুপিচুপি অশোকবনে সীতার কক্ষে প্রবেশ করল। সীতারূপী শবরী তাকে দেখে খুব চমকে উঠেছিল। সীতার মুখ দিয়ে কোন ভয়ার্ত্ত স্বর বের হওয়ার আগে মুখে আঙুল দিয়ে তাকে সে চুপ করে থাকার ইংগিত করল। তারপর শ্রীরামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়ে সে তার কুশল জিজ্ঞাসা করল। তার দুঃখের কাহিনী শুনল। সবশেষে হনুমান বলল ঃ রামচন্দ্র শীঘ্র তোমাকে উদ্ধার করার জন্য লংকা অভিযান করছে। আর কিছুকাল ধৈর্য ধরে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

অশোকবন থেকে বেরিয়ে হনুমান অস্ত্রাগারের গোপন সুরঙ্গ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। আগুন লাগাল। দাহ্য পদার্থ দিয়ে রাবণের প্রাসাদেও অগ্নিসংযোগ করল। তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাতে গেলে একজন রক্ষী তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু হনুমান তাকে টুঁ শব্দটি করতে দিল না। মুষ্ঠির প্রবল চাপে তার শ্বাসরোধ হল।

পঞ্চম পর্ব

বিরাট প্রাণের বিরাট মৃত্যু

॥ কুড়ি ॥

দুর্গের অভ্যন্তরে এত বিরাট অগ্নিকাণ্ড এর আগে ঘটেনি। প্রকৃতির খেয়ালে কিংবা দৈবদুর্বিপাকেও এ অগ্নিকাণ্ড হয়নি। হয়েছে মানুষের খেয়ালে, গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীর ইচ্ছায়।

লঙ্কার সবচেয়ে বড় শক্তি তার পাথরের প্রাচীর। সে প্রাচীর মানুষের তৈরী নয়। বিশ্বকর্মার হাতে গড়া। অতুলনীয় তার দৃঢ়তা। মানুষ'ত দূরের কথা, দেবতাদেরও সাধ্য নেই ঘা মেরে এক টুকরো পাথর খসানোর। সেই প্রাচীরের নিখুঁত পাহারা ব্যবস্থা অতিক্রম করে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এক অসম্ভব।

তবু তাই হল। দুর্গরক্ষক এবং গুপ্তচরদের দায়িত্ব শৈথিল্যের রন্ধ্রপথ ধরেই তা অনিবার্যভাবে হয়েছে। রাবণ গুপ্তচর ব্যবস্থাকে আরো নিখুঁত করার প্রতি জোর দিল। কিন্তু তার সব সন্দেহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের উপর।

বেশ কয়েকদিন তার অশান্তিতে কাটল। মন স্থির করতেই সময় লাগল। অবশেষে প্রকাশ্য রাজসভায় বিভীষণকে ডাকার সিদ্ধান্ত করল। পাত্র-মিত্র সভাসদ-বর্গের সামনেই তাকে একজন বিচারপ্রার্থী অপরাধীর মত হাজির করা হল।

রাবণের দুই ভুরু কুঞ্চিত হল। চোখ ঈষৎ ছোট হল। দুই ভুরুর মধ্যস্থলে ছোট্ট একটি বৃত্তচিহ্ন ফুটল। বেশ কিছুক্ষণ চোখ টানটান করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিভীষণ নীরব। কোন প্রশ্ন করল না। অথচ, রাবণ প্রত্যাশা করেছিল বিভীষণ নিরপরাধ হলে তাকে এইভাবে অপমান করার কারণ জিগ্যেস করবে। কিন্তু বিভীষণ তার কিছুই করল না। তার মুখ কেমন পাণ্ডুবর্ণ।

রাবণের প্রত্যাশায় আঘাত লাগল। সে একটু বিচলিত হল। শান্ত অথচ মৃদু গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল। বিভীষণ, দুর্গের অভ্যন্তরে অগ্ন্যুৎপাত কোন দৈব দুর্বিপাক নয়, মানুষের চক্রান্ত। রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত। এসম্পর্কে তোমার নিজের ধারণা কি?

বিভীষণ অসহায়ভাবে তাকাল। তার সরল নিষ্পাপ দুই চোখে গভীর বিস্ময়, অগাধ ভয়, আর দুর্ভাবনার মিশ্র অভিব্যক্তি। বলল: আমি বুঝতে পারছি না কেন এমন সন্দেহ আমার উপর করা হল?

রাবণের অধরে একটা বাঁকা হাসি বিদ্যুতের মত খেলে গেল। এ প্রশ্ন তুমি করতে পারছ? একজন ফকির এই দুর্গের অভ্যন্তরে বেশ কিছুদিন ধরে বাস করেছে। পুরোহিতের প্রশ্রয়ে সে ঢুকেছে, তোমার আশ্রয়ে থেকেছে, তার সঙ্গে তোমার গোপনে কথাবার্তাও হয়েছে। একি সত্য?

বিভীষণের সর্ব শরীরে এক হিম শিহরণ বয়ে গেল। অপরাধীর মত মাথা নিচু

করে রইল। মাটিতে পায়ের পাতা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল ঃ ফকির এই লঙ্কার নাগরিক শুনেছি। সে দুর্গে কেমন করে ঢুকেছে জানি না। তার মধুর সঙ্গীত আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে স্বচ্ছন্দে সে ঘোরাঘুরি করত। রক্ষীদের শিবিরে শিবিরে গান গাইত। আমি জানতাম, রক্ষীদের বিনোদনের জন্যে রাজা বোধ হয় তাকে নিযুক্ত করেছে। তাই নিসংকোচে তাকে ডেকেছি, কথা বলেছি। এর ভেতর কোন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আছে কিনা, আমার জানা নেই।

কিন্তু সে লোকটি কোথায় ?

আমি জানব কেমন করে ?

রাবণ কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল তন্ময় হয়ে। তারপর গলায় দরদ ঢেলে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল ঃ আচ্ছা বিভীষণ, তোমার সঙ্গে আমার অবনিবনা কোথায় ? তোমার ন্যায়ধর্ম, বিবেককে প্রশ্ন করে বল, কার বেশী অপরাধ ? আমার, না, রামের ? নারীর অমর্যাদা বেশী করেছে কে ? ভগিনী শূর্পনখার উপর লক্ষ্মণ যে বিক্রম প্রকাশ করেছে তুমি তার নিন্দা করছ না কেন ? নিজের ভগিনী অপেক্ষা শত্রু পক্ষের মেয়ে কি বেশী আপনার ? সীতাকে আমি কোন অমর্যাদা করিনি। লক্ষ্মণের মত বর্ব্বর হতে আমার শিক্ষা ও রুচিতে বেঁধেছে। রাজকুলবধূ সরমা নিজে তার তত্ত্বাবধানে আছে। তবু ভগিনীর অপমান অসম্মান তোমার চিত্ত স্পর্শ করল না। অথচ সীতার দরদে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আশ্চর্য তোমার মর্যাদাবোধ ? নিজের পরিবারের মানুষকে যে সম্মান করতে শেখেনি সে অন্যের জন্য যখন কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন করে তখন বুঝতে হবে তার পিছনে স্বার্থ আছে। তুমি যে এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত তা তোমার মনোভাব থেকে স্পষ্ট হচ্ছে।

রাবণ কয়েকমুহূর্তের জন্য থামল। বিভীষণ তবু নিরুত্তর। তাকে মৌন দেখে বলল ঃ তোমার আচরণ দেখে যদি কেউ মনে করে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছ তুমি, তা-হলে কি জবাব দেবে ?

বিভীষণ অস্ফুট স্বরে বলল ঃ আমি যদি প্রতিবাদ করি তাহলেও কারো মুখ বন্ধ করতে পারবনা।

লঙ্কায় এত লোক থাকতে তোমাকেই-বা শুধু বলছে কেন ? কৈ তুমি'ত লক্ষ্মণের কাজ নিন্দে করতে পারলে না ? বলতে পারলে না, সীতা হরণের চেয়েও বেশি বর্ব্বরতা কাজ হল ভগিনীর নাসিকা ছেদন, অযোমুখীর স্তন কর্তন। তোমার কাজই তোমার পরিচয়। কিন্তু এসব করছ কেন ? সিংহাসনের লোভে ? চুপ করে থেক না। জবাব দাও। এই সিংহাসন যদি তোমার প্রিয় হয়ে থাকে, এই ছেড়ে দিচ্ছি তার আসন, তুমি এখানে বস। আমি সানন্দে তোমাকে রাজমুকুট পরিয়ে দেব। কিন্তু দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাতৃহন্তা হয়োনা। এর মতন বড় অভিশাপ আর নেই।

রাবণ সত্যিই তার সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। মাথার মুকুট খুলে রাখল সিংহাসনে। বিভীষণ স্তব্ধ। নির্বাক। লজ্জায় অপমানে তার সর্বশরীর রি রি করে জ্বলতে লাগল। আসলে রাবণ তাকে দিয়ে তার আনুগত্য হীনতাকে কবুল করে

নিতে চাইছে। যার অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড মৃত্যু। আবার চুপ করে থাকলে অপরাধ স্বীকার করা হয়। তাই সে আস্তে আস্তে বলল: তুমি আমাকে বিষ নজরে দেখছ। এক বিষাক্ত সন্দেহে আমাকে জর্জরিত করছ। কি বললে আমি সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে পারি নিজেই ভেবে পাচ্ছিনা। মুখের নিন্দা প্রকাশ কি সব? তাতেই কি আমার আনুগত্য প্রমাণ হয়? আমার দুর্ভাগ্য, কোন ছলনা না করে নিজে যা অনুভব করি অকপটে তাই বলি। কিন্তু তা নিয়ে এক ভুলের পাহাড় তৈরী হয়েছে। পাহাড় আমাকে তোমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে।

রাবণ বলল: মানুষ নিজের প্রয়োজনে পাহাড় ভেঙে পথ বার করেছে। তোমার কাছে পৌঁছনোর জন্যে সেই পথ, তোমাকেই করতে হবে।

বিভীষণ এক মুহূর্ত ভাবল। রাবণ ও রামের মর্যাদার লড়াই এমনিতে মিটবে না। যুদ্ধ অনিবার্য। রাবণ কখনও রামের কাছে আত্মসর্মপণ করবে না। এমন কি সন্ধিও নয়। সুতরাং বন্দীত্ব নির্বাসন অথবা মৃত্যুদন্ড এড়ানোর জন্যে তাকে এমন কিছু বলা দরকার যা রাবণকে ভাবিয়ে তুলবে তাকে অস্বস্তিতে ফেলবে। সভাসদ বর্গকেও বিচলিত ও বিভ্রান্ত করবে। মতবিরোধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে বিভেদ দ্বন্দ্ব জাগিয়ে আত্মমুক্তির এক পথ করতে হবে তাকে। সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি লাভের এটাই হল একমাত্র পথ। তাই সে খুব ধীরে ধীরে বিচক্ষণের মত বলল: নিরাবেগ চিত্তে স্থান কাল পরিস্থিতি বিচার করলে আমার মত সকলেই অনুভব করতে পারবে যে রামচন্দ্রের সঙ্গে বিশাল ভারতবর্ষের মানুষ এবং তাদের রাজশক্তি আছে। যুদ্ধ বাধলে রামচন্দ্রের সৈন্যক্ষয় অস্ত্রক্ষয় পূরণ হবে। দেবতারা, আর্যাবর্তের সকল রাজা, তার নিজের রাজ্য অযোধ্যা, এবং বিশাল দক্ষিণারণ্য থেকে অস্ত্র, সৈন্য খাদ্য নিয়মিত সরবাহ থাকবে অব্যাহত। রামচন্দ্রের এই সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত। আমাদের পাশে কে আছে? স্থানসংকীর্ণতা আমাদের বড় বাধা। সুউচ্চ লঙ্কার প্রাচীর যত বড় বাধা হোক প্রতিদিনের যুদ্ধে যে সৈন্যক্ষয়, অস্ত্রক্ষয় হবে তার ঘাটতি দিনে দিনে শূন্য করবে রাজশক্তি যোদ্ধা, অস্ত্র উপকরণ এবং ধন। সুতরাং এযুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। আমাদের ঐক্য সংহতি দৃঢ়তা মনোবল আমাদের শক্তি যত গর্বের হোক না কেন পরিণাম তার অপচয়। রক্তক্ষয়। আর স্বজন বিনাশ। একটি বিরাট জাতির ধ্বংস। গর্বই হবে লঙ্কার পতন।

সভাকক্ষ স্তব্ধ। সূচীপতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। রাবণ বিস্ময়ে নির্বাক। সভাসদবর্গ এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব খুঁজছে। তাদের চোখে মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছাপ। কেমন একটা বিবর্ণ বিষণ্ণতায় সকলে অভিভূত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর রাবণ মুখ বিকৃত করে বলল: ধিক্। বংশের কুলাঙ্গার। শত্রুর পদলেহন করতে তার প্রশস্তি গাইতে তোমার লজ্জা করল না। কার্যতঃ তুমি শত্রুর কাছে আত্মসর্মপণ করতে প্ররোচিত করছ। আশ্চর্য তোমার বিচারবোধ। কত নির্লজ্জ হলে, তবে রামের পদতলে মাথা রেখে তার করুণা ভিক্ষার কথা বলতে পার। তোমার কি একটু মনুষ্যত্ববোধ নেই? স্বাজাত্য প্রীতি? আত্মীয়

প্রেম ? কিছু কি নেই ? যদি ছিটে ফোঁটা থাকত তা হলে প্রতিটি লঙ্কাবাসীর মত বিদ্রোহে জ্বলে উঠতে। তুমি আমাদের দেশ ও কুলের কেউ নও। তুমি এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

শিবপূজা করে সরমা একটা স্বর্ণ রেকাবীতে করে কিছু ফুল, বেলপাতায়, এবং প্রসাদ নিয়ে বিভীষণের ঘরে ঢুকল। বিভীষণ জানলায় ধারে দাঁড়িয়েছিল। সরমা ঘরে ঢুকতে সে ঘাড় ফেরাল। মুখখানা তার আগুনের মত গণগণ করছিল। মনে হচ্ছিল, দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সংঘাতে তার শরীর জুড়ে যেন বেজে যাচ্ছিল যুদ্ধের রণদামামা।

কয়েকমুহূর্তের জন্য সরমা থমকে দাঁড়াল। তারপর মাটি মাড়িয়ে বিভীষণের পাশে এসে দাঁড়াল। সরমার পরণে লাল রঙের রেশমী কাপড়। পিঠভর্তি খোলা চুল। মাথার উপর ছোট্ট একটু ঘোমটা। কপালে সিঁদুরের টকটকে লাল টিপ। ভারী শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ আর মিষ্টি লাগছিল। দেবীর মত নিষ্পাপ পবিত্র মুখশ্রী দেখলে হৃদয় ভরে যায়। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। তবু চোখ বুজে এল বিভীষণের। বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত পাপবোধ টনটন করতে লাগল।

স্তব্ধ কক্ষ।

সরমা গলবস্ত্র হয়ে বিভীষণকে প্রণাম করল। স্বহস্ত রচিত পুষ্পমাল্যখানি তার কণ্ঠে পরিয়ে দিল। মাথায় ঠাকুরের ফুল বিল্বপত্র ছোঁয়াল। হাতে প্রসাদী মিষ্টি দিল।

সরমার শান্ত দুই চোখে কি গভীর অনুভূতি মাখানো। কি গভীর মায়া নিয়ে তাকিয়ে আছে বিভীষণের দিকে।

ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতার ঢেউ বিভীষণের বুকে দাপিয়ে বেড়াল। সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে সরমার অভিব্যক্তির ভেতর নানা মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারল।

প্রভাতী পুষ্পের মত মুখে তুলে তাকাল সরমা। মৃদুস্বরে বলল: স্বামী কদিন ধরে কতকগুলো কথা জিগ্যেস করব ভাবি। কিন্তু মন স্থির করতে পারি না। আজ শিব প্রণামের সময় মনে মনে বলেছি, ঠাকুর আমার দুর্বলতা দূর কর। চিত্তে বল দাও।

বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বিভীষণ প্রশ্ন করল: এমন কি জিজ্ঞাসা আছে যে ঠাকুর ডাকতে হয় ?

সরমার দুই চোখে খুশি ঝলকে উঠল। বলল: আছে গো আছে। তোমাকে নিয়ে

কত কথা কানে আসে। মন মানে না। কিন্তু সংশয়ও যায় না। নিজের মনে নিজেই জ্বলি। আজ দ্বন্দ্ব মুক্ত হতে চাই।

সরমা বিশ্বাস হারিয়ো না।

আমার সেই বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা আজ। তাইত তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, যারা তোমাকে বলে বিশ্বাসঘাতক, দেশ ও জাতির শত্রু, লঙ্কার অভিশাপ তারা কি যথার্থ সত্য বলে?

সরমা গুজবে কান দিও না। বিশ্বাস হারিয়ো না।

স্বামী, প্রশ্নের জবাব তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

জবাব দিতে গিয়ে বিভীষণের কণ্ঠস্বর ভারী হল। বলল: দুঃখে, অভিমানে, লজ্জায় নিজের কথা আর বলতে পারি না। বলতে বড় ঘৃণা হয়, কষ্ট হয়। আমি বড্ড একা। চারপাশে আমার কেউ নেই।

সরমার চোখ ছলছল করে উঠল। বলল: তোমার দোষ কি? অপরাধই-বা কোথায়?

অগ্রজের সঙ্গে গলা মেলাতে পারিনা বলেই তার চোখে শত্রু আমি।

সরমার দুই চোখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। বলল: স্বামী, দেবতার মত ভাই তোমার। তাকেও অপবাদ দিচ্ছ? সমগ্র দেশের মানুষ তার দুটি বাহু। সারা লঙ্কায় তুমি ছাড়া আর কেউ একথা বলে না। অথচ সে তোমার সহোদর। তবু তার প্রতি যথেষ্ট অনুগত নও তুমি। কিন্তু অগ্রজকে দেখেছি স্নেহশীল, ভ্রাতৃ বৎসল। তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ কর কোন্ মতলবে? কিসের স্বার্থে? আমাকে তোমার খুলে বলতে হবে।

মহিষী তুমি ঠিক আমার যন্ত্রণা বুঝবে না। আমি কেন অগ্রজের মত হতে পারি না? রাবণ অগ্রজ বলেই কি এক বিপুল ক্ষমতা আর অধিকার ভোগ করবে চিরকাল? আমি কনিষ্ঠ হতে পারি, কিন্তু আমিও যে দেশের জন্য জাতির জন্যে কিছু করতে পারি, দিতে পারি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকব কেন চিরকাল? আমার বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে তবু আমি সেই সৌভাগ্যের অধিকারী নই, কেন? আমি সাম্রাজ্য চাই, সিংহাসন চাই। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব সব চাই।

স্বামী তোমার মুখে এমন কথা শুনতে হবে কোনদিন স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। তুমি কেন বোঝ না অগ্রজ উত্তরাধিকারী সূত্রে এ ক্ষমতা লাভ করেনি। কেউ তাকে দয়া করেও দেয়নি। নিজ ভুজবলে, বুদ্ধিবলে রাজপদের গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করেছে।

আমিও তার সঙ্গী ছিলাম।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের অগণন নক্ষত্র বিলীন হয়ে যায়। নীল আকাশ জুড়ে থাকে শুধু দিবাকরের অবাধ আধিপত্য। তেমনি সব মানুষের সমান ক্ষমতা থাকে না। এ নিয়ে কোন অভিমান চলে না। দ্বেষ বিদ্বেষ বৃথা। ঈর্ষাও অনুচিত।

ঈর্ষা মানুষের ধর্ম সরমা। ঈর্ষা থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। ঈর্ষা সুমহান। ঈর্ষা মানুষের বল, তেজ, প্রেরণা, উদ্যম। ঈর্ষা অগ্রগতির রথ।

স্বামী তুমিই বলেছ, বিশ্বাস হারিয়ো না। কিন্তু অগ্রজের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা কোথায় ?

সরমা ইতিহাস কেবল পুনরাবৃত্তি করে। অগ্রজ একদিন সাম্রাজ্যের জন্যে সিংহাসনের জন্য বৈমাত্রের ভ্রাতা কুবেরকে বিতাড়িত করতে কোন লজ্জাবোধ করেনি। কুবেরকে সিংহাসনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যদি বিশ্বাস ভঙ্গ না হয় তাহলে আমার বেলায় তা দোষ বলে গন্য হবে কেন ?

স্বামী এক জঘন্য পাপ চিন্তা তোমার বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঈর্ষার আগুনে নিজে জ্বলছ, এ লঙ্কাকেও জ্বালাবে। আমি একজন বিশ্বাসঘাতকের স্ত্রী এই অপবাদ আর দুঃখে আমার মর্ম বিদীর্ণ হচ্ছে।

রাবণ কুবেরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি ? তার অধিকার কেড়ে নিয়ে ন্যায় ধর্ম লঙ্ঘন করেনি।

সরমার দুই চোখ ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ম স্বরে প্রতিবাদ করে বলল : না। অগ্রজ কোন অন্যায় করেনি। কুবের রাক্ষসবংশের কেউ নয়। পিতামহ সুমালীকে বিতাড়িত করে ইন্দ্র লংকায় যে উপনিবেশ করেছিল কুবের ছিল তার প্রতিনিধি। এদেশের সঙ্গে যার কোন মমতার সম্পর্ক ছিল না বলেই সোনার লংকাকে নরককুন্ড করে তুলছিল। রাজার কোন দায়িত্ব সে পালন করেনি। দেশের মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এদেশের মাটি মানুষের প্রতি তার কোন দরদ ছিল না। তার সময়ে লঙ্কা ছিল শ্রীহীন, লক্ষহীন। মহাজনের মত সে শুধু দেশের সম্পদকে নিগড়ে নিয়েছে, মানুষের কষ্টের দিকে তাকায়নি। তার চোখ ছিল ইন্দ্রের দিকে। তাকে খুশি করা ছিল কুবেরের কাজ। দেশকে ইন্দ্রের কাছে বন্ধক দিয়ে সে সিংহাসনের সুখ আনন্দ ভোগ করেছে। তাতে দেশের লজ্জা আর দৈন্যই বেড়েছে। হৃতসর্বস্ব দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে অভিশাপমুক্ত করল কে ? সোনার লঙ্কা কার স্বপ্নের সৃষ্টি ? কার চেষ্টায় লঙ্কার গৌরব মর্যাদা বাড়ল ? রাক্ষস জাতিকে সম্মানিত করল কে ? উত্তর : অগ্রজ। অগ্রজের উদ্যমে এদেশের মাটি হয়েছে সোনা। মানুষের সম্পদ, সমৃদ্ধি, সুখ সবই তার কৃতিত্বে সম্ভব হয়েছে। রাক্ষস জাতি কোনদিন তার সেই অবদানকে বিস্মৃত হবে না। লোভের বশে, বাসনার তাড়নায় তুমি অকৃতজ্ঞ হয়ো না। এদেশের মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা নিয়ে অগ্রজ শুধু দেশের রাজা নয়, হৃদয়ের রাজা। দ্বিতীয় বিধাতা। তার বিপক্ষে যাওয়ার অর্থ অকৃতজ্ঞতা। বিশ্বাসঘাতকতা। তুমি বিশ্বাসঘাতক হয়ো না। আমি তোমার ধর্মপত্নী হয়ে বলছি, অধর্ম কর না। অগ্রজ কোন অধর্ম করেনি। লঙ্কার মানুষ অকাতরে অগ্রজের আহ্বানে নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে, আর সামান্য লোভ তুমি জয় করতে পারছ না ?

সরমা আমি তোমার বক্তৃতা শুনতে চাই না।

সরমার চোখের চাহনিতে শিশুর অসহায়তা ফুটল। ভেজা গলায় বলল : মূর্খ নারী আমি। স্বামীর অপবাদ, দুর্নাম মর্মে বেঁধে। তার দুর্মতি বিচলিত করে। শঙ্কা জাগায় অন্তরে। তাইত এত কথা বলি। স্বামী হয়ে এটুকু বোঝ না ?

বুঝি বলেইত তোমাকে রাজরাণী করার স্বপ্ন দেখি।

চাই না তোমার রাণী হতে। রাণীগিরিতে আমার লোভ নেই। এই ক্ষুদ্র সুখই আমার ভাল।

কিন্তু আমি যে চাই।

সরমার দৃষ্টি দপ্ করে জ্বলে উঠল। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় মোরে বলল ঃ তা-হলে আমি তোমার সঙ্গে নেই। তুমি নিজের যাত্রাপথের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী।

বিভীষণের সমস্ত চেতনা নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভুত আচ্ছন্নতায় ডাকল ঃ সরমা।

সরমার দুচোখের কোণ দিয়ে জল টসটস করে পড়তে লাগল। মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। মূর্ছারোগীর মত এক অসহায় কষ্টকর অবস্থা তার চোখে মুখে রেখা ও রঙ বদলে দিল। শরীরের ভেতর একটা আকুল করা অস্থিরতা টনটন করছিল। কান্না গিলে গিলে বলল ঃ আজ আমি স্বামীহীনা হলাম।

দুহাতে মুখ ঢেকে সরমা অনেকক্ষণ কাঁদল। একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছিল। তারপর ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর থম থমে গলায় বলল ঃ স্বামী কোন আদর্শের জন্য তুমি লড়ছ না। নিজের স্বার্থে তুমি ছলনা করছ, লোভে ভাইকে হত্যা করছ স্বজাতিকে খুন করছ। তুমি যা করছ তাতে আমারও গৌরব নেই, আছে অপমান। মনে রেখ অনেক মিথ্যে দিয়ে জয়লাভের মাশুল তোমাকে দিতে হবে। যাদের নিয়ে যে অস্ত্রের ব্যবহারে তুমি জিতবে তারা তোমাকে একেবারে নীচে নামিয়ে আনবে। জয়ের পরের ক্লান্ত দিনগুলির অবসাদ আনবে। আর কেউ না জানলেও তুমিত জান অশোক বনের বন্দিনী নারী রামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতা নয়। তার ছায়া। এত তার নিজের কথা।

অগ্রজকে দোষ দিচ্ছ কেন? রামচন্দ্র শঠ প্রবঞ্চক। যুদ্ধের মতলবে সে অগ্রজকে ঠকিয়েছে।

বিভীষণ স্তব্ধ। গম্ভীর। বিষণ্ণ। তার দুই চোখের উদাস শূন্য দৃষ্টিতে কেমন একটা সুদূর ভাব ফুটে উঠল। মনে হল সে যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়। অন্য কোন গ্রহের লোক। তার কোন যন্ত্রণা নেই, ব্যথা নেই, দুঃখ নেই। বুকের ভেতর এক অবোধ রহস্যময় অনুভূতি তাকে সুখ দুঃখের ওপারে নিয়ে গেল। মানুষের কাছে বড় তার কীর্ত্তি। কীর্তি অবিনশ্বর। চিরন্তন। তার কোন ক্ষয় নেই, শেষ নেই। আবেগ ভালবাসা এসব অসময়ের বিলাস। ক্ষুদ্র সুখ। সামান্য তৃপ্তিতে কীর্তিমান মানুষের মন ভরে না। সে চায় কর্মের গৌরব, খ্যাতির সুখ। নব নব দুঃখ বরণের অঙ্গীকার তাকে উদ্দীপ্ত করে, অনুপ্রাণিত করে। জয় তার একমাত্র লক্ষ্য। রাবণের সংগ্রামদীপ্ত জীবনের দিনগুলোর স্মৃতি তার চোখে ভাসে। বিভীষণেরও মনে হয় ক্ষমতা পেলে সেও রাবণের মত কীর্তিবান হতে পারত। ক্ষমতা পুরুষের শক্তির উৎস। তার ব্যক্তিত্বের দীপবর্ত্তিকা। ক্ষমতার সেই তপ্ত স্বাদ তার অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মোমের মত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

॥ একুশ ॥

সৈন্যদের ভেতর অকস্মাৎ কোলাহল হতে হনুমান শিবির থেকে বেরিয়ে এল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল কোলাহল। তার মর্ম ও কারণ অনুধাবন করতে চেষ্টা করল। তার ভুরু কুঁচকে গেল, চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোলাহলটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। একটু পরে দেখল কয়েকজন বানরসৈন্য চক্রাকারে বেষ্টন করে কাকে যেন ধরে আনছে।

বন্দীর উপর চোখ পড়তে অবাক হয়ে গেল হনুমান। সৈন্যরা কিছু বলার চেষ্টা করলে চোখের ইঙ্গিতে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বলল। তারা চলে গেলে হনুমান দু-পা এগিয়ে এসে বিভীষণকে আলিঙ্গন করল। তার কুশল গ্রহণ করল। তারপর তাকে নিয়ে রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে যাত্রা করল।

সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের শিবির পাশাপাশি। এর চতুষ্পার্শে উম্মুক্ত তরবারী নিয়ে বানর সৈন্য পাহারারত। হনুমানকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু বিভীষণ শিবিরের মুখোমুখি হতে পাহারারত সৈনিক উম্মুক্ত তরবারি উঁচিয়ে ধরে তার পথ আগলে ধরল। হনুমান চোখের ইঙ্গিত করলে তরবারি নামিয়ে পথ ছেড়ে দিল।

ভারি পর্দা পার হয়ে বেশ খানিকটা খালি কক্ষ গিয়ে রামের বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হল। কল্পনার অতীত এক অদ্ভুত আশ্চর্য অজিনধারী জটাজুট রামচন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল বিভীষণ। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সেই মুহূর্তে আপ্লুত হল তার হৃদয়। যথার্থ তাকে ধর্মের পূজারী মনে হল।

রামচন্দ্র নির্বাক। অর্ধনিমীলিত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। ভুরু কুঁচকে হনুমানকে কিছু ইঙ্গিত করল। অত্যন্ত নিচু গলায় ফিস ফিস করে বলল:
—ইনি বিভীষণ।

রামচন্দ্র আলিঙ্গন করল তাকে। হাত ধরে পাশে বসাল। বলল: লোকমুখে শুনেছি, আপনি ধর্মপরায়ণ। লঙ্কায় শুধু আপনার মধ্যে ন্যায়, ধর্ম, বিবেক প্রকাশিত।

বিভীষণ লজ্জায় মুখ নত করল। বলল: আমি আপনার বন্ধুত্বলাভের আশায় লঙ্কায় ধনসম্পত্তি, আত্মীয়বর্গ, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে আপনার শরণাগত হয়েছি। প্রীতিলাভে ধন্য হয়েছি। এখন আমাকে গ্রহণ করে চরিতার্থ করুন।

রামচন্দ্র একমুহূর্ত ভাবল। বিভীষণের কথাগুলো কতখানি আন্তরিক, আর কতখানি কপট তা পরিমাপ করবে কি দিয়ে? হাজার হোক সে শত্রুপক্ষের লোক। তাকে বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে অবিশ্বাস করে ঠকা ভাল। রাবণ যে গুপ্তচর করে তাকে পাঠায়নি, কে বলতে পারে? কাজেই রামচন্দ্র তার অভিসন্ধি ভাল কি মন্দ জানার

জন্যে মিষ্ট বাক্যে প্রশ্ন করলঃ স্বজন, স্বদেশ ত্যাগ করে তুমি আমার শরণাগত হচ্ছ কেন ?

শান্ত ও স্নিগ্ধ স্বরে বললঃ লঙ্কায় আমি ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ। মহান রামচন্দ্রের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার জন্য লঙ্কায় রাজপুরীতে আমার স্থান নেই। কিন্তু যে মানুষ দুঃখের দ্বারা ধৈর্যের দ্বারা বিরূপ হৃদয় জয় করে, যার ধীর, স্থির, শান্ত স্বভাব, চরিত্র মাধুর্য, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বিশাল ভারতবর্ষের মানুষকে এক অখণ্ড রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, ঐক্যবদ্ধ করেছে। ধর্মযুদ্ধের পতাকাতলে সমবেত করেছে তাকেশ্রদ্ধা না করে থাকতে পারি ? আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, আনুগত্যকে আপনি এমনভাবে আকর্ষণ করলেন যে, নিজের ঘরের আকর্ষণও আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল !

রাম বিস্ময়বোধ করলেও কিন্তু গম্ভীর হয়ে বললঃ বিভীষণ, লঙ্কার শত্রুপক্ষ আমি। সুতরাং আমার পক্ষ নিয়ে লঙ্কার বিরুদ্ধে কোন অপ্রীতিকর কর্ম তোমার পক্ষে করা কি খুব কঠিন হবে না ? পারবে করতে ?

আমি সৈনিক। সেনাপতির নির্দেশ মেনে চলাই আমার কাজ। বন্ধুর আদেশ পেলে আমি রাবণবধে এবং লঙ্কাজয়ে তোমায় সাহায্য করব। আমার কর্তব্যে কোন শৈথিল্য হবে না।

তা হলে আমিও তোমাকে কর্তব্যের পুরস্কার দেব লঙ্কার স্বর্ণ সিংহাসন। তারপর হনুমানের দিকে তাকিয়ে বললঃ এই মুহূর্তে তুমি বিভীষণকে রাক্ষস রাজপদে অভিষেকের আয়োজন কর। একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রশাসনের অধীনে আমরা রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

হনুমান প্রস্থান করলে রাম জিগ্যেস করল, আমরা কেমন করে সাগর পার হব, তার উপায় তুমি নির্ধারণ করে দাও বিভীষণ।

বিভীষণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললঃ বন্ধু রামচন্দ্র এককালে ইক্ষ্বাকুবংশের সগর পুত্রগণ খনন কার্য করে এই বিশাল নদী সৃষ্টি করে রাক্ষসদের অগ্রগতি রোধ করতে চেয়েছিল। রাক্ষসেরা সেইজন্য এই নদীকে সাগর বলে। এই নদীতে আড়াআড়িভাবে একটা ডুবো পাহাড় আছে। ওটি বাঁধের কাজ করে। এই নদীর জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলেন চতুর্থ অগস্ত্য। মলয়গিরি, আর মৈনাক পর্বতের গুহামধ্যে একটি বিশাল লৌহফটক আছে। ঐ ফটক ভাঁটার সময় উন্মুক্ত করে দিলে নদীর এক দিকের সব জল সাগরে গিয়ে পড়বে। নদী জলশূন্য হবে। তখন সৈন্যবাহিনীর সাগর অতিক্রম করতে আর কোন বাধা থাকবে না।

বিভীষণের সৎপরামর্শে রামচন্দ্রের দুশ্চিন্তার অবসান হল। অন্যথায় সেতুবন্ধন করে এই সাগর পার হওয়া ছিল এক অসাধ্য এবং কালবিলম্ব কর্ম।

সমুদ্র শুষ্ক হল। সৈনিকেরা জলশূণ্য সাগরবক্ষে মহোল্লাসে ক্রীড়া করতে লাগল। রামচন্দ্রের সহসা মনে হল এদের এই আনন্দ, সুখ, উল্লাস যে কোন মুহূর্তে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত এক অসহায় মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। অতীতে সাগরজয়ী সগরবংশের ষাট হাজার সৈন্য দৈব দুর্ঘটনায় অথবা শত্রুর চক্রান্তে সাগরগর্ভে সলিল

সমাধি প্রাপ্ত হয়েছিল। অনুরূপ কোন মতলব নিয়ে রাবণ বিভীষণকে যে পাঠায়নি কে বলবে? বিভীষণের উদ্দেশ্য ভাল হলেও বিপদের আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অকস্মাৎ কোন কারণে ডুবো পাহাড়ের বাঁধ যদি জলের চাপে ভেঙে যায়, অথবা শত্রুর মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে বিদীর্ণ হয় তখন বিপুল সৈন্যক্ষয় এড়ানোর কোন উপায় থাকবে না। রামচন্দ্র কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ এবং কুশলী বাস্তুকার নলকে তার আশঙ্কার কথা বলল।

নল মাথা হেঁট করে কয়েক মুহূর্ত্ত গভীরভাবে কি চিন্তা করল। সমস্ত চিন্তা ভাবনা একাগ্র করে আস্তে আস্তে বলল: আপনার অনুমান যথার্থ। অনুমতি করলে মাত্র পাঁচদিনই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শাল, অর্জুন, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ দিয়ে এক প্রশস্ত সেতু তৈরী করতে পারব।

সেতু নির্মাণ শেষ হল। তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাহারার জন্য শ্রমিক ও রক্ষী নিযুক্ত হল।

তারপর শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে রামচন্দ্র সৈন্য বিভাগ করে দিল। লক্ষ্মণের নেতৃত্বে যে অগ্রবর্ত্তী বাহিনী সর্বপ্রথম সেতু অতিক্রম করবে তাদের নিরাপত্তার সব দায়-দায়িত্ব বিভীষণের উপর ন্যস্ত করে রামচন্দ্র তার সততা ও আন্তরিকতার আর এক পরীক্ষা গ্রহণ করল। এর অর্থ, বিভীষণের মতলব এবং মনোভাব জানা। নিজের দেশ ও জাতির প্রতি সত্যি সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এটা রামচন্দ্র এখনও বিশ্বাস করে না। বিভীষণের প্রকৃত ভূমিকা শত্রুতার, না মিত্রতার এবারেই তা বোঝা যাবে।

রামচন্দ্রের নির্দেশে বিভীষণ তার চারজন রাক্ষস সচিবকে নিয়ে রাত্রিকালে সেতুর লঙ্কাভাগ রক্ষা করতে গেল। লঙ্কানগরী প্রবেশের গুপ্তপথ যদি শত্রুর ছলাকলায় পূর্ণ হয় তা হলে রাতের অন্ধকারে শত্রু সন্দেহে বিভীষণ এবং তার চার সচিবকে লঙ্কার রক্ষীদের হাতে প্রাণ হারাতে হবে।

যথাসময়ে অপর পার থেকে বিপদমুক্তের সংকেত পাঠাল বিভীষণ। লক্ষ্মণ যাত্রা সুরু করল। কিন্তু রামচন্দ্র সন্দেহমুক্ত হতে পারল না। তাই জাম্ববান এবং সুষেণ বেগবান অশ্ববোঝাই রথ নিয়ে সর্বক্ষণ লক্ষ্মণের পার্শ্বভাগ রক্ষা করে চলল।

মাঘের কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে নানা দেশের লোকজন নিয়ে গঠিত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিরাপদে রাতের মধ্যেই লঙ্কার উপকূলভাগে পেঁছিল।

প্রত্যূষে নগররক্ষক শার্দুল দুর্গপ্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেল লঙ্কার উত্তর দিকের বিশাল প্রান্তর অগণিত সৈনিকের ছাউনিতে পরিণত হয়েছে। রাতারাতি এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড কেমন করে ঘটল শার্দুল ভেবে পেল না। এই সৈন্য শিবির যে রামচন্দ্রের তাতে কোন সন্দেহ রইল না। কোন যাদুবলে রামচন্দ্র সমুদ্র জয় করল? এতবড় বিশাল বাহিনী নিয়ে যে লোক রাতারাতি শত্রুর মাটিতে ঘাঁটি করতে পারে তার সাহস বিক্রমকে সমীহ করতেই হয়।

শার্দুলের সংবাদ রাবণকে বিচলিত ও বিমর্ষ করল। লঙ্কার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বাধা

ছিল তার বড় ভরসা। কিন্তু রামচন্দ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সেই বিশাল সাগর পেরিয়ে লঙ্কার উপকূলে কেমন করে পেঁছিল? সমুদ্রজল নিষ্কাশিত করে সে সেতুবন্ধন করল কেমন করে? তাকে সমুদ্র শোষণের গোপন কথা জানাল কে? বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ তবে কি রামচন্দ্রের শিবিরে? এখন লঙ্কার সুউচ্চ দুর্গপ্রাচীর তার একমাত্র প্রতিরোধ। কিন্তু এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায়? রাবণের মনে হল রামচন্দ্র চতুর্দিক দিয়ে তাকে জালে ঘিরে ফেলেছে। তার পালানোর কোন পথ খোলা রাখেনি। সুতরাং এই গভীর সংকট থেকে কি করলে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার সমাধানসূত্র বার করতে সে মন্ত্রণাপরিষদ ডাকল। বলল: রামচন্দ্রর বিশাল সশস্ত্র বাহিনী লঙ্কার উত্তর দ্বারে উপস্থিত। রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এত বড় অসাধ্য সাধন কেমন করে করল? এখন কার দায়িত্ব ও অবহেলায় এমনটা হল, এসব কূট তর্কে গেলে পরস্পরের উপর দোষারোপ ও তিক্ততা বাড়বে। শত্রুর বিভেদ সৃষ্টির এই চক্রান্তে আমি যাব না। বরং আমাদের ভুলে যে, জাতীয় সংকট সৃষ্টি হল তার মোকাবিলা করতে আমাদের কি করা উচিত আপনারা তার পথ প্রদর্শন করুন।

সারণ বলল: সীতাকে নিয়েই যুদ্ধ। অশোকবনের সীতা যখন অযোধ্যায় রাজবধূ বৈদেহী নয়, তখন তাকে মুক্ত করে দিলে আমাদের বাধা কোথায়?

রাবণ গম্ভীর গলায় বলল: বাধা আছে। অশোকবনের সীতা বৈদেহী নয়। কিন্তু ঐ সীতাকে নিয়ে যখন রাক্ষস ও মানুষের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ তখন তাকে ছেড়ে দেব কি করে? আত্মমর্যাদার লড়াইতে রাক্ষস হেরে যাবে, ছোট হয়ে যাবে এমন চিন্তা তোমার মাথায় কেমন করে এল?

শার্দুল বলল: মহারাজ যথার্থ বলেছে। রামচন্দ্র যুদ্ধ চায়। লঙ্কা বিজয় তার লক্ষ্য। ঐ সীতা শুধু বিবাদের উপলক্ষ্য। লঙ্কেশ্বর ভগিনীর মর্যাদা রক্ষার জন্য বৈদেহী হরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কিন্তু রামচন্দ্র প্রজ্ঞাবলে এরকম কিছু একটা ঘটবে অনুমান করেই যেন সীতার এক বিকল্প খাড়া করে জনকনন্দিনীকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখল। তার ফলে, লঙ্কেশ্বর সীতাজ্ঞানে অপহরণ করল অন্য এক রমণী। তবু তার জন্যে রামের কত অভিনয়। যুদ্ধের মতলবে যে এ শঠতা করেছে আজ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট তা। ভারতবর্ষের মানুষকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করার জন্য নকল সীতার এই ছলনা। লক্ষ্মণের জঘন্য বর্বরতা চাপা দেবার এক কূট কৌশল। ধিক্ রামচন্দ্রের ন্যায়বোধ, ধর্মবোধ আর মনুষ্যত্বকে।

শুক এক কোণে চুপ করে বসেছিল। তার চোখে রামচন্দ্রের করুণাঘন মুখ ভাসছিল। বানর সৈন্যের ছদ্মবেশে সে রামের শিবিরে শিবিরে ঘোরাঘুরি করে তদারকির ছলে জেনে নিচ্ছিল কোথায় কত সৈন্য এবং অস্ত্র মজুত আছে। বেশ কয়েকদিন এইভাবে কাটল। অকস্মাৎ একদিন বিভীষণের চোখে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল। আত্মগোপনের কোন পথ রইল না। বিভীষণ কোন অনুনয় বিনয় শুনল না। বরং এমন তীব্র বাক্য ব্যবহার করল এবং হিংস্রভঙ্গীতে আচরণ করল যে

ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। জীবনের আশা ত্যাগ করে তিক্ত স্বরে শুক বিভীষণকে বলল : দাসের আনুগত্য তোমাকেই মানায়। বিশ্বাসভঙ্গকারীকে বিশ্বস্ততা কত শূন্যগর্ভ রামচন্দ্রও জানে। স্বার্থপর বিশ্বাসভঙ্গকারী বিভীষণকে রামচন্দ্র কিছুমাত্র শ্রদ্ধা করে না। তাকে ঘৃণা, করুণা, কৃপা করে।

বিভীষণ ক্রোধে আত্মসম্বরণ করে কোনরকমে জবাব দিল, তোমার শ্লেষের জবাব আমি দেব না। চরবৃত্তির অপরাধে তোমাকে শকুনের মুখে অথবা জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে আনন্দ-উৎসব করব। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল বিভীষণ। অতি ভয়ংকর হিংস্র মনে হচ্ছিল তাকে।

দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্ঠে বেঁধে বিভীষণ তাকে রামচন্দ্রর কাছে হাজির করল। রামচন্দ্র মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ককেমুহূর্ত কি যেন ভাবল চুপ করে। তারপর মৃদু হেসে প্রশ্ন করল : তোমার কিছু বলার আছে কি ?

নিষ্পলক চোখে তরুণ রাক্ষস শুক রামচন্দ্রের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কেন যেন তার মনে হল, রামচন্দ্র বীর স্বদেশপ্রাণ। সুতরাং যে কোন স্বদেশপ্রাণ বীরের প্রতি তার একপ্রকার শ্রদ্ধা ও হৃদয় দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। এটা বীর চরিত্রের ধর্ম। এরকম একটা অনুমান করে শুক অকম্পিত বুকে নির্ভয়ে উত্তর করল : মহান রামচন্দ্র নিজের দেশকে ভালবাসার অধিকার প্রত্যেকের আছে। মাতৃভুমির সার্বভৌম এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি যা করেছি তা কোন অপরাধ নয় আমার। রক্ষার জন্য সকলেই তা করে।

গুপ্তচরের শাস্তি কি জান ?

নিজের জীবন নিয়ে যদি ফিরে যেতে নাও পারি, তবু জানব দেশের জন্য, জাতির জন্য আত্মবলি দিয়েছি। আমি একজন সৈনিক, দেশসেবক। মৃত্যুর পরোয়া করি না। পরাধীন রাজার প্রজা হয়ে বেঁচে থাকার মত অপমান আর কিছু নেই। মৃত্যু-দণ্ড আমাকে সেই লজ্জা আর অগৌরব থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

রামচন্দ্র কয়েকমুহূর্ত কথা বলতে পারল না। বুকের ভেতর সম্ভ্রম আর অনুরাগের গুরু গুরু বাজনা বাজছিল। মুগ্ধ চোখে শুকের দিকে তাকিয়ে রইল। রামচন্দ্র যেন চোখ ফেরাতে ভুলে গেল ; যার অনিবার্য পরিণতি শুক নিজেই খানিকটা বিব্রত এবং অসহায়তা বোধ করল। মুখ নীচু করল। রামচন্দ্রের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল। বলল : তাহলে'ত তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না। মাতৃভুমি রক্ষার পবিত্র শপথ নিয়ে তুমি এসেছ, তোমার সেই শপথ অপূর্ণ রেখে তোমাকে মরতে দিতে পারি না। যাও বীর তুমি মুক্ত। এখনও যদি কিছু অদেখা থাকে অথবা আবার দেখতে ইচ্ছে করে তবে বিভীষণ তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। সব দেখেও রামচন্দ্রকে পরিমাপ করতে পারবে না, তার যুদ্ধকৌশলও বুঝতে পারবে না। শুধু দেখায় কোন ক্ষতি হয় না।

শুকের অবাক হওয়ার পালা। তার দুই চোখে মুগ্ধতা নেমে আসে। বিভীষণ

রীতিমত অপ্রস্তুত বোধ করে। শুকের মনে হল বিশ্বাসঘাতকতা বিভীষণকে অপমান করার জন্যই যেন রামচন্দ্র তাকে ক্ষমা করল। অথবা শত্রুর প্রতিও যে উদার মনোভাবাপন্ন, তাকে ক্ষমা করার মত যে ঔদার্য ও মহত্ত্ব আছে ; তার এক নজির স্থাপন করল। রামচন্দ্রের মহনুভবের সেই স্মৃতি এবং করুণাটুকু যেন কিছুতে ভোলা যায় না। মনকে সব সময় রাঙিয়ে রাখে। একমাত্র মস্ত বড় অন্তঃকরণ যার আছে কেবল সেই পারে শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ক্ষমা করতে। রামচন্দ্রের ঐ ছোট্ট করুণাটুকু যেন শুককে বদলে দিল। তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাল।

শার্দুলের কঠোর মন্তব্যে তার সমস্ত চেতনার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। এক বেদনার সাগরের বুকে সে যেন ভেসে চলল ; আর সেই সাগরের বুকে চোখে পড়েছে এক মমতা মাখানো কল্যাণকামী মুখ। সে মুখ সে দৃষ্টি তার চোখের উপর একাগ্র হয়েছিল। আর তার স্পর্শের অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার শিরায় শিরায়। তাই কথা সহ্য করা তার কাছে অসম্ভব হল। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। বলল : মহারাজ অনুমতি করলে মাননীয় শার্দুলের শেষ কথাগুলো সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা শোনাতে পারি।

রাবণ ভর্ৎসনা করে তীক্ষ্ন স্বরে বলল : শুক, যুদ্ধকালে জাতীয় সংহতির অন্তরায় হয় এমন অপ্রিয় কথা বলা সচিবের অকর্তব্য। যে শত্রু আমাদের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত তোমরা যদি তাদের স্তুতি কর তা হলে বলব রাজনীতির কিছুই বোঝ না। তোমাদের মত সরল সচিবদের নিয়ে আমার রাজকার্য পরিচালনা করা এক সমস্যা।

সারণ গভীর দৃষ্টিতে রাবণের মুখ লক্ষ্য করে বলল : মহারাজ যুদ্ধ ছাড়া যখন এই ভয়ংকর সংকটের কোন সমাধান নেই, তখন বৃথা কালক্ষয় করে শত্রুকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেয়া কি ভাল ? আপনি অবিলম্বে চতুর্দিক থেকে যুদ্ধ সূচনা করে শত্রুকে বিব্রত করুন।

সারণ, তুমি ঠিক বলেছ। আমিও তাই চাই। কিন্তু তার আগে লোকের মনে রামচন্দ্র সম্পর্কে বিশ্বাস ও উচ্চধারণাকে ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেব। রাম সৎ, ধার্মিক, আদর্শবান নয় ; সে শঠ, প্রতারক, ধূর্ত ভীষণ মিথ্যেবাদী। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে কোন শাস্ত্রবিরোধী নীতিবিগর্হিত কাজ সে করে। লক্ষ্য তার জয়। সে শুধু জয় চায়। সীতা হরণের ঘটনা মিথ্যা। তার যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়, অধর্মযুদ্ধ। সাম্রাজ্য লোভে সে অন্যায়ভাবে রাক্ষসরাজ্য আক্রমণ করেছে। রাক্ষস শক্তির ধ্বংস এবং লঙ্কা জয়ের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং চক্রান্ত নিয়ে সে দণ্ডকারণ্যে এসেছিল। ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শান্তিপ্রিয় রাক্ষসজাতির উপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। শূর্পণখার নাসিকা ছেদন, অযোমুখীর নাসা অঙ্গুলির বিকৃতি যদি না করত তা-হলে এই যুদ্ধ হত না। রাক্ষসের আত্মাভিমান মর্যাদা কিসে নাড়া খাবে ধূর্ত রামচন্দ্র তা জেনেশুনে এই বর্বর আচরণ করেছে। সে আমাদের বনের পশুর চোখে দেখে। তাই যুদ্ধ সুরুর আগে রামচন্দ্রের পক্ষে যে সব আর্যাবর্তের

রাজারা যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে রামচন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, হনুমান, সুগ্রীবকেও নিমন্ত্রণ করে জানাব, অপহৃতা নারী সীতা নয়।

সারণ বলল : কোন লাভ হবে না রাজা। তাদের অন্তরে বৈরীতার আগুন তাতে নিভবে না। আপনার ভীতি তাতে জানাজানি হয়ে যাবে। প্রত্যয় সৃষ্টির মত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যখন দেখাতে অক্ষম হবেন তখন তা নিছক কৌতুককর এক অপপ্রচার হবে। শত্রুরা হাসবে। আপনার গৌরব তাতে কমবে বৈ বাড়বে না।

সারণ, মানুষের অন্তর থেকে এখনও সত্য, ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ একেবারে উবে যায় নি। বিবেক একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি। এখনও কিছু ভাল মানুষ আছে।

মহারাজ, নিষ্ফল অরণ্যে রোদনে কোনো লাভ নেই। আপনার চরিত্র গৌরবই তাতে খর্ব হবে।

সারণ এ আমার যুদ্ধ এড়ানোর কোন কৌশল নয়। প্রকৃত সত্য ও ঘটনা তারা অন্ততঃ জানুক।

শুক বলল : মহারাজ, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সৃষ্টি করতে না পারলে রামচন্দ্রের মহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে, তার চরিত্রে কালিমালিপ্ত হবে।

রাবণ হেসে বলল : ঠিক তাই-ই।

প্রহস্ত বলল : মহারাজ, আমি সারণের সঙ্গে একমত হয়ে বলছি কালক্ষয় না করে আমাদের যুদ্ধ সূচনা করা উচিত। সম্ভব হলে আজ রাত্রে অথবা কাল প্রত্যূষে যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে। শত্রুপক্ষ এখনও ভাল করে প্রস্তুত হতে পারেনি। এই অবস্থায় সুসংবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে পারলে আমরাই লাভবান হব অধিক।

রাবণ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল : তা-হলে, ইতিহাসের চির পুরাতন দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে যাক রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধে। প্রত্যূষে প্রহস্ত তুমি পূর্ব-দ্বারে নীলের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ কর। পশ্চিমদ্বারে হনুমানকে ইন্দ্রজিত অবরোধ করুক। মহাপার্শ্ব মহোদর দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদকে আক্রমণ করুক, আর আমি উত্তরদ্বারে সর্বলোকের উৎপীড়ক, দস্যু রামচন্দ্রকে বধ করার জন্যে যুদ্ধ করব। বীরবাহু, কুম্ভ-কর্ণ, তরণী সেন এরা মধ্যস্থান আক্রমণে থাকবে।

মাঘ মাস।

তূর্যধ্বনিতে আকাশ কেঁপে উঠল। শুরু হল যুদ্ধ। চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হল রামচন্দ্র। দিনাবসানের শেষে শত্রুতার অপমান নিয়ে রামচন্দ্র তাঁবুতে ফিরল। প্রথম দিনের অতর্কিত আক্রমণে অনেক সৈন্য মারা পড়ল। কিন্তু রাবণ তাদের তিষ্ঠতে

দিল না। রাত্রিবেলাতেও রামচন্দ্রের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখল। দিবারাত্র ধরে চলল যুদ্ধ।

মাঘ মাস শেষ হয়ে ফাল্গুন পড়ল। রামচন্দ্র বুঝতে পারল বাইরে বাইরে আক্রমণ চালিয়ে রাবণের কোন ক্ষতিই তারা করতে পারেনি। উল্টে তাদের ক্ষতি হয়েছে বিপুল। এইভাবে যুদ্ধ করলে রাবণকে জব্দ করা যাবে না। তাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করতে হবে। হানা দিতে হবে মধ্যস্থানের দুর্বল দুর্গদ্বারগুলি। যেখান দিয়ে খাদ্য যায়, অস্ত্র আসে। ঐ গুপ্ত পথের তোরণ তাকে ভাঙতেই হবে। রাক্ষসের বীরত্বের গর্বে, দম্ভে এবং আস্ফালনে আঘাত না করলে দুর্গের বিবর থেকে তারা বেরিয়ে আসবে না। ছলে অথবা কৌশলে রাবণকে টেনে নামাতে হবে মুক্ত রণাঙ্গণে। সেই প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠান হল রাবণের কাছে। দূত সবিনয়ে নিবেদন করল রামের দ্যুতিময় বাণী। বলল ঃ বীর করবে মুখোমুখি লড়াই। হয় যুদ্ধ, না হয় পরাজয়!

সেই সম্মুখ যুদ্ধের শুরু। বসন্তে তার শুভ সূচনা।

সমস্ত বীর আর সৈন্যদলকে জড়ো করে রামচন্দ্র নির্দেশ দিল ঃ অপমানের কলঙ্ক নিয়ে আমরা কেউ দেশে ফিরব না। সামনে ঐ দুরারোহ লঙ্কার দুর্গ প্রাচীর,— আমাদের ভাঙতে হবে। জয় করতে হবে ওকে। তার জন্যে যতদিন লাগে লাগুক। জীবন কেটে যায় তো যাক। আয়ুর রক্তাক্ত অবসান না হওয়া পর্যন্ত চলবে আমাদের সংগ্রাম। বীর করবে মুখোমুখি লড়াই। সে ভাগ্য জয় না করতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে অনায়াসে জয় করতে পারে। মৃত্যু জীবনের সত্য। বীর খোঁজে মৃত্যু উত্তরণের পথ। যুদ্ধের তাণ্ডবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে খুঁজবে মৃত্যু উত্তরণের পথ। সেই পথের প্রান্তে পাতা স্মৃতির সিংহাসন। অমরত্বের আসন। যা কোনোদিন নিঃশেষ হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখে তোমরা সাহস সঞ্চয় কর। শাণিত কর তোমাদের অস্ত্র। পৃষ্ঠে তূণ, হাতে ধনু, খড়্গ, ভল্ল, ঢাল—যার যা খুশি তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় যুদ্ধে। ঐ যুদ্ধ শেষ হবে না, যতক্ষণ না লঙ্কার উদ্ধত দুর্গ, রাক্ষসের দর্প মাটিতে খসে পড়বে, ততক্ষণ এ যুদ্ধ চলবে। ন্যায়ের জন্য, ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ।

রাক্ষস-সন্তান চারণ দল লঙ্কার পথে পথে যুদ্ধের সাফল্যের গান গেয়ে ফিরছে। তাদের গানে সীতা হরণের কথা বাদ যায়নি।

একটি নারীর মুখের জন্য
যুদ্ধের তাণ্ডবে ছারখার হল লঙ্কা।
স্ত্রীলোক'ত মানুষ নয়—
সে জন্তু ;
তাকে নিয়ে লক্ষ্মণের জন্তুর মত ব্যবহার!
যে দেহ আলিঙ্গনে শরীর শিহরিত হয়,
স্পর্শে চিত্ত স্পন্দিত হয়,

লক্ষ্মণ সেই স্ত্রী অঙ্গ—
টুকরো টুকরো করে কেটেছে, ছিঁড়েছে।
নাম ? জিজ্ঞাসা কোরো না তার নাম,
চেয়ো না তার পরিচয়
শুধু মনে রেখো
সে তোমাদের ঘরের মেয়ে
শূর্পণখা আর অযোমুখী।
ভাগ্যের চেয়ে বড় আর কিছু আছে ?
তাই ভুল না
বিস্রস্ত তার কেশপাশ
ভূলুণ্ঠিত তার বসন
শত্রুর হাতে তার নিগ্রহ।
ভুলো না—
একটি নারীর মুখের জন্যে
কত তরবারি খুলেছে
কত মানুষ মরছে
তবু কেউ জানল না তার রহস্য।
কোনদিন কেউ জানবে না, কেউ বলবে না একটি কথা ?
তাই, রহস্যের কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন আমি খুলেছি ;
দেখেছি অশোক বনে বন্দিনীর সীতার মুখ।
যে মুখের জন্যে সেতু বন্ধন হল, দগ্ধ হল সোনার লঙ্কা।
জনক নন্দিনী সীতার সেই মুখ দেখিনি তার মুখে।
অযোধ্যার রাজবধূর
দুই ওষ্ঠের মাঝখানে, চিবুকের নীচে
যে কালো ছোট্ট তিলটির আশ্রয়
মুখের পরিপূর্ণতা
অশোক বনের বন্দিনী কোথায় হারাল তারে ?

চারণের আবৃত্তি শুনতে নগরীর পথে লোক জমে গিয়েছিল। সাদা পোশাকে কয়েকজন বানরও ছিল সেখানে। চারণ দল টের পেয়ে যেন কিছুটা উদ্দীপ্ত হয়ে বলল: পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনার আর কোন নজির আছে ? এযুদ্ধ রাক্ষসরাজ্যে আর্য বিজয় কেতন উড্ডীন করা জন্য। নারীর জন্য নয়। সীতার জন্যেও নয়। তা হলে তোমরা বল ভাই, কার দোষে এত রক্তপাত, এত মানুষের মৃত্যু, ঘরে ঘরে হাহাকার ? কে সেই হত্যাকারী ? লঙ্কায় সুখ শান্তি, নিদ্রা কোন্ দস্যুতে ছিনিয়ে নিল ?

লঙ্কায় আকাশ বাতাস সর্বক্ষণ মুখরিত রইল চারণের গানে, আবৃত্তিতে, গল্পে।

রামচন্দ্রের শিবিরেও ভয় ও দুর্ভাবনা।

সম্মুখ যুদ্ধের শুরু থেকে এক অভাবনীয় বিপর্যয় সুরু হয়ে গেল। উভয় পক্ষের অগণিত বীর মড়কে উজার হয়ে গেল। শত শত রথের ঘোড়া এবং পাহারাদার কুকুর মালবাহী গর্দভও বাদ রইল না।

যুদ্ধের ষাট দিন অতিক্রান্ত।

বীরবাহু নেই, বিভীষণপুত্র তরণী সেন, ভাই কুম্ভকর্ণ, মাতুল কালনেমি আমাত্য প্রধান সারণ, সেনাপতি প্রহস্ত রথী মহারথীদের কেউ নেই। দিন দিন রাবণ ভীষণ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু উদ্যম হারাল না। নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলে, এরা গেছে বলে কি রাক্ষসরা যুদ্ধ করবে না? এরা ছাড়াও এখনো বীর আছে। যোদ্ধা আছে। অস্ত্র আছে। রাক্ষসের গর্ব, ভরসা এবং শেষ অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ আছে। মুহূর্তে রাবণের মনে সব দ্বিধা কেটে যায়। সংশয় দূর হয়। এবার কর্ত্তব্যের আহ্বান। সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অনেক বিলম্ব হয়েছে। আর লোকক্ষয় নয়। এবার রামকে জয় করতে হবে। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে। রাবণ তাই অনেক ভেবে ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি করে পাঠাল।

রামচন্দ্রের বাহিনীও প্রস্তুত। তাদের দলেও বীরের অভাব নেই। সেনাপতি হনুমান একাই এক'শ। এ ছাড়া আছে নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্র নিজে।

উত্তরের তোরণ দ্বার খুলে রাক্ষস সৈন্যেরা রাঘব সৈন্যের মুখোমুখি হল। বিবাদমান দুই পক্ষ নিমেষে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্ত্তে অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহণে, অস্ত্রের ঝনঝনায়, আহতের আর্ত্তনাদে আকাশ মুখরিত হল। বাতাস ব্যাকুল ও ত্রস্ত হল। বিপুল বানর সৈন্যের মৃত্যু দেখে লক্ষ্মণ নাটকীয়ভাবে ইন্দ্রজিতের সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু অস্ত্রনিক্ষেপের কোন সুযোগ ইন্দ্রজিত তাকে দিল না। তার ভীম গদা নিক্ষেপে সে মূর্ছাহত হয়ে ভুতলে লুটিয়ে পড়ল। রামচন্দ্রের অন্তঃকরণ হায় হায় করে উঠল। ছুটে এসে লক্ষ্মণকে আড়াল করল। প্রচণ্ড রোষে উম্মাদ হয়ে গিয়ে সে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করলে। অগস্ত্যর অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্রও নিষ্ফল হল ইন্দ্রজিতের সমর কৌশলের কাছে।

রামচন্দ্র চতুর্দ্দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। ঘনঘন শঙ্খধ্বনি করে সে সাহায্যের সংকেত পাঠালো তখন অন্যস্থানের রণে ক্ষান্ত দিয়ে হনুমান, সুগ্রীব রামচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়াল। এবং তার দু'পাশ রক্ষা করতে লাগল. কিন্তু ইন্দ্রজিতের প্রবল আক্রমণের সামনে তারা দাঁড়াতে অক্ষম হল।

পলায়নপর রাঘব ও হনুমানকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রজিত সদর্পে বলল: কোথা যাও বীরবর রামচন্দ্র। এই বিক্রম নিয়ে তুমি এসেছ লঙ্কা জয় করতে। শোন্ ভীরু এ যুদ্ধ জনক নন্দিনী সীতার জন্য নয়, জনৈক নারী হরণের জন্যও নয়। এ যুদ্ধ চিরপুরাতন রাক্ষস মানুষের যুদ্ধ, আর্য-অনার্যর সংগ্রাম। তোমাদের দলের যে কোন বীরকে আমি যুদ্ধের আহ্বান করছি। আমৃত্যু দ্বন্দ্বযুদ্ধ। আমি যদি মরি পিতা

তোমার খেলনার সীতাকে ফিরিয়ে দেবে। আর আমি যদি জিতি তাহলে অযোধ্যার রাজবধূ জনক নন্দিনী সীতা অশোক কাননে বন্দী থাকবে যাবজ্জীবন।

ঘোষণা শেষ হল। তবু কেউ সিংহ বিক্রমে তার সামনে এসে দাঁড়াল না।

রামচন্দ্রের মন বিচলিত। মুখে তার প্রকাশ নেই। কিন্তু স্নায়ুর ভেতর বৃশ্চিক দংশনের মত সুতীব্র জ্বালা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার কোন উপশম ছিল না। ইন্দ্রজিতের বীরদর্প, তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, খলখল হাসি তার কানে তীব্র ঝংকারে বাজছিল। আত্মগ্লানিতে হৃদয় মথিত হতে লাগল। এত অপমান ইন্দ্রজিতের আগে কেউ তাকে করেনি। বীরের গর্ব দর্প চূর্ণ করেছে ইন্দ্রজিৎ। রাবণ পুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানে সে অস্ত্র নামিয়ে, লড়াইয়ে যোগ না দিয়ে ভীরুর মত শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। অগণিত যোদ্ধার ভেতর দিয়ে মাথা হেঁট করে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। পালিয়ে এল। এই আত্মগ্লানি, লজ্জা, অপমান তার নিষ্কলুষ চরিত্রের এক উজ্জ্বল কলংক হয়ে রইল চিরকাল। ইন্দ্রজিত বেঁচে থাকলে আরো কত কি ঘটার আশংকা জাগল তার মনে। থেকে থেকে অন্যমনস্কতার ভেতর সিংহ শিশুর গর্জন কানে বিষবর্ষণ করতে লাগল। সমস্ত সত্তার ভেতর প্রবল প্রতিক্রিয়া হতে লাগল, রামচন্দ্র হেরেছে, রামচন্দ্র পালিয়েছে। দুয়ো-দুয়ো।

কথাগুলো বুকের ভেতর টাটাতে লাগল। তার তুঙ্গস্পর্শী পুরুষকারের মাথা হেঁট হল এক বালকের কাছে? এতকালের বীর খ্যাতি, গর্ব যে কত দুর্বল, আর মিথ্যা ছিল ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করে রামচন্দ্র মর্মে মর্মে অনুভব করল। এই সিংহ শিশু বেঁচে থাকতে লঙ্কা জয় দুরাশা। এমনিতে অনেক লড়াই হবে, অনেক মৃত্যু, অনেক ধ্বংস হবে তার পক্ষে। ইন্দ্রজিতকে সম্মুখ যুদ্ধে জয় করা কিংবা বধ করা এক আকাশ কুসুম কল্পনা। রাবণের পরাজয়, লঙ্কার পতনকে অনিবার্য করতে দরকার এই বীরের মৃত্যু।

রামকে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাল। লঙ্কা জয় সম্পূর্ণ করতে করতে পারে একমাত্র ঘরের শত্রু বিভীষণ! সুতরাং রামচন্দ্র তাকেই ডেকে পাঠাল শিবিরে।

ধীর পায়ে শিবির কক্ষে প্রবেশ করল বিভীষণ। রামচন্দ্রের দু'চোখ বোজা। মুখ গম্ভীর, থমথমে। তার পায়ের শব্দেও রামের কোন ভাবান্তর নেই। বিভীষণ অদ্ভুতভাবে রামচন্দ্রর দিকে তাকিয়েছিল। এক তীব্র উৎকণ্ঠায় বুক তার টাটাতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্বপ্নাচ্ছন্নের মত মৃদু স্বরে ডাকল ঃ বন্ধু রামচন্দ্র!

রামচন্দ্র চোখ মেলল। কিন্তু কথা বলল না। বুক কাঁপিয়ে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে ক্লান্ত ও অবসন্ন গলায় বলল ঃ আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। লঙ্কা বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে আমি ফিরে যাব মনস্থ করেছি। আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তোমাকে লংকার সিংহাসনে অভিষেক করে যাব। কিন্তু সে স্বপ্ন, সাধ বোধহয় আমি পূরণ করতে পারলাম না।

রামচন্দ্র আপনাকে আগে কখনও এমন বিচলিত আর অশান্ত হতে দেখিনি। আমার চিরকালের দেখা রামচন্দ্রর হঠাৎ এই রূপান্তর কেন? কেন এই অস্থিরতা?

ব্যর্থতা আমাকে বিচলিত করেছে। পরাজয় আমাকে অস্থির করেছে আমি শান্ত থাকতে পারছি না।

বন্ধু একদিনের যুদ্ধে'ত জয় পরাজয় মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে না। তবে এত উতলা হচ্ছ কেন? ইন্দ্রজিত বীর। সম্মুখ যুদ্ধে তাকে জয় করা সাধ্যাতীত কর্ম। তবু—

ইন্দ্রজিতের পতন ব্যতীত লঙ্কার পতন অসম্ভব।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে লঙ্কার সম্পর্ক স্থাপনের সব পথ বন্ধ। লঙ্কার সঞ্চিত রসদও ফুরিয়ে এসেছে। অস্ত্রেরও সেই অবস্থা। আর কিছুদিনের মধ্যে টান পড়বে অস্ত্রে, খাদ্যে, সৈন্যে। কোথায় থাকবে প্রতিরোধের শক্তি? দেখতে না দেখতে নাভিশ্বাস উঠবে।

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকলে আমাদেরই নাভিশ্বাস উঠবে আগে। ভুলে যেও না, তার কালান্তক অস্ত্রে ধ্বংস হবে, নিশ্চিহ্ন হবে রাঘব বাহিনী। যুদ্ধে সত্তর দিন কেটেছে। আমাদেরও অস্ত্রে সৈন্যে রসদে টান পড়েছে। সরবরাহ অব্যাহত থাকলেও যে কোন সময় তা বন্ধ হতে পারে। যুদ্ধের জয় পরাজয় আরো ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন। কিন্তু ইন্দ্রজিত তার অন্তরায়। তোমার সিংহাসনের কণ্টক।

বিভীষণ হতাশ বিষণ্ণ গলায় বলল: এত যুদ্ধ, শ্রম, দুঃখ, রক্তপাত সব ব্যর্থ হবে? স্বর্গ কি হবে না কেনা? সিংহাসন আমি চাই না। কিন্তু শ্রীরামের পরাজয় দেখব কেমন করে? নিদারুণ অভিমান নিয়ে প্রিয়বন্ধু ফিরে যাবে এ পরিতাপের বেদনা বহন করার আগে ইন্দ্রজিতের আয়ু হোক সংক্ষিপ্ত। গুপ্তঘাতকের ছুরি ঝলসে উঠুক নিবিড় অন্ধকারে। অনন্ত নিদ্রার পথে তার পরিত্রাণ হোক।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের খুব কাছে বিমর্ষচিত্তে বসেছিল। বিভীষণের স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বর তার তন্ময়তা ভঙ্গ করল। উদ্দীপ্ত হল তার কন্ঠস্বর। বলল: সেই অবশ্যম্ভাবী আঘাত কে হানবে? কেমন করে কাঁটাতরুর তলে রক্ত পুষ্পের মত ঝরে পড়বে তার রক্তাক্ত দেহ?

সুগ্রীবের কানের কাছে মুখ এনে কৃতান্তের মত কর্কশ কণ্ঠকে নরম করে ফিস ফিসিয়ে বলল: এই যুদ্ধ আমার প্রত্যাশার স্বপ্ন। রাবণের পুত্রকে মেরে তার সব অপমানের শোধ নেব। তুমি যদি ভাইকে হত্যা করাতে পার তবে আমি কেন পারব না ভ্রাতুষ্পুত্রকে? তুমি'ত আমার প্রেরণা।

প্রত্যূষে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করল। পুজোপচার সাজিয়ে নিবিষ্ট মনে ধ্যান করছিল ইন্দ্রজিত। তার দুই চোখে তন্ময়তা। ইষ্ট পূজায় বিভোর। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। গুপ্ত ঘাতকের পদশব্দ পর্যন্ত টের পেল না। ধ্যান সমাহিত ইন্দ্রজিতের পূজারী মূর্তির দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল লক্ষ্মণ। তারও কেমন একটা মুগ্ধতা এসেছিল। প্রদীপ শিখার মত চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

বিভীষণের বুকের ভেতর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। লক্ষ্মণের বিভ্রান্ত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সে ভয়ে চমকে উঠল। সময় সীমিত। কোন কারণে ইন্দ্রজিতের

তন্ময়তা ভঙ্গ হলে সমূহ বিপদ হবে। সে টের পাওয়ার আগে চুপি চুপি তাকে হত্যা করতে হবে। বিভীষণ লক্ষ্মণের কানে কানে ফিসফিস করে বলল: লক্ষ্মণ হাঁ করে দেখছ কি? ঐ তো তোমার সামনে বসে পূজারত ইন্দ্রজিৎ। এই তো সুযোগ। ধনুকে তীর লাগাও। এফোঁড় ওফোঁড় করে দাও ওর বুক। লক্ষ্মণ দেরি কর না। মেঘনাদ টের পেয়ে গেলে আমরা কেউ আর জীবিত ফিরব না। ধনুকে তীর লাগাও।

লজ্জায় লক্ষ্মণের চোখ দুটো ছটফট করে উঠল। দ্বিধা করল না। পাঁচটি তীর একসঙ্গে ইন্দ্রজিতের পিঠ ভেদ করে গেল। রক্ত ঝরল। চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল: বিশ্বাসঘাতক—বেইমান—

পূজার শঙ্খ, ঘণ্টা নিয়ে মেঘনাদ সজোরে পলায়মান ঘাতকদের দিকে ছুঁড়ল। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হল।

গুপ্ত পথ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে শুনল: বিশ্বাসঘাতক, পথের কুকুর তোদের কোন ক্ষমা নেই। ইতিহাসে তোদের এ কলংক কোনকালে মুছবে না।

শিবিরে ফিরল বিভীষণ। রামচন্দ্রকে দেখে মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। নির্বিকার ভাবে বলল: সর্বনাশের ঘণ্টা বেজেছে। লঙ্কার পতন হতে আর বেশী দেরী নেই।

রামচন্দ্র এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। বুকের ভেতর তার কেমন একটা অনুতাপ জমে উঠল। মনে হল কোথায় যেন একটা বিরাট পরাজয় হয়েছে তার। গভীর ব্যথায় থমথম করতে লাগল মুখ। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। করুণ আর মৃদু কণ্ঠে বলল:

কে দিয়েছিল তোমার ঐ নাম—বিভীষণ!
সত্যিই কি ভীষণ সুন্দর আর নিষ্ঠুর তুমি।
সার্থক তোমার নাম।
তোমার রহস্য বাঁকা ওষ্ঠ রেখার দিকে তাকিয়ে আমি,
লঙ্কার সর্বনাশ দেখি।
সব ধ্বংস,
সব মৃত্যুশেষে অনির্বাণ হয়ে—
থাকবে তোমার রামভক্তির গরিমা।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পঞ্চদশ দিনে রাবণ যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করল।

এবার শেষ যুদ্ধ।

ঝড়ের তাণ্ডবে যেমন গাছপালা ঝাপটায় তেমনি রাবণ গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সৈন্য তাড়িয়ে বেড়াল। দিনের শেষে রাক্ষস সৈন্যেরা দুর্গে ফিরল না। সারা রাত ধরে পাহারা দিল। ভোর হতে না হতে তুমুল যুদ্ধ আর কঠিন আক্রমণ হানল। বানর ও রাক্ষস সৈন্য উভয়ে আহত হল, নিহত হল। লড়াই করার শক্তি আর কারুর রইল না। সাধারণ সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে লাগল রাবণের হাতে যেমন, তেমনি রামের হাতেও। রুখবার শক্তি কারো নেই। মৃত্যুপণ যুদ্ধ।

ইন্দ্রজিতের শোক, বীরবাহুর শোক, স্বজন বিয়োগের দুঃখ, বেদনা শোক রাবণের হৃদয়কে পাথর করেছে। সেই পাথর ভেতে উঠেছে। তার অগ্নিময় ক্রোধ আর প্রতিশোধস্পৃহা ফুটেছে আগ্নেয়গিরির লাভার মত। উম্মাদের মত রাবণ যুদ্ধ করতে লাগল। নিজের উপর সে সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। সে যে বৃদ্ধ, একবারও মনে হয়নি। বুকের হাহাকার তাকে যেন তেজ শক্তি দিচ্ছিল। তার বজ্রতীক্ষ্ন বর্শা আর বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত দীপ্ত তীরের আঘাতে রামচন্দ্র ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল।

রাজপ্রাসাদের স্তম্ভশীর্ষ থেকে এ দৃশ্য দেখছিল রাণী মন্দোদরী আর অভাগিনী পুত্রবধূ প্রমীলা। ইন্দ্রজিৎ পত্নী প্রমীলা প্রাসাদশীর্ষ থেকে চিৎকার করে বলল ঃ পিতা, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছ কেন? নরখাদককে বিশ্রাম নিতে দিও না। ও তোমার কত পুত্র হত্যা করেছে, কত স্বজন মেরেছে—ওকে মারো, হত্যা করো। ওই শয়তানের রক্তে তোমার হৃদয়ের আগুন নিভবে।

মন্দোদরী আকুল স্বরে বধূর সঙ্গে চিৎকার করে বলছিল ঃ স্বামী তুমি ফিরে এস। শোকে তুমি উম্মাদ হয়েছ। তুমি সুস্থ নও, শান্ত নও। তুমি ফিরে এস। তুমি গেলে লঙ্কা পিতৃহারা হবে। স্বামীহারা হব আমি। প্রপৌত্ররা অভিভাবকহীন হবে। শুধু তুমি এদের কথা ভেবে ফিরে এস। তুমি ছাড়া রাক্ষসের আর কোন সহায় নেই।—কেউ নেই।

কিন্তু তাদের সে চিৎকার যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পেঁছিল না। উজান বাতাসে ভেঙে ছড়িয়ে গেল হাহাকারে। যুদ্ধের হুঙ্কার, উল্লাস আর আর্তনাদের মধ্যে ডুবে গেল, হারিয়ে গেল সে স্বর।

বৃদ্ধ রাবণের বিক্রম রামচন্দ্রের আর এক বিস্ময়। মহাবল রাবণের বীরখ্যাতি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কত যুদ্ধ করেছে, কত মৃত্যু সে হেনেছে, তবু গায়ে তার আঁচড়টি লাগেনি। মানে কারো শক্তিতে সামর্থে তা কুলোয়নি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মে মোড়া। সে বর্মে রামচন্দ্রের ভল্ল, তীর কিছুই বিদ্ধ করতে পারছে না। একমাত্র গলদেশের দিকে সামান্য একটু স্থান যা বর্মহীন।

হত্যার নেশায় উম্মাদ হয়ে ক্লান্ত আহত রামচন্দ্র প্রতিহিংসাময় ক্রোধে যুদ্ধের নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিজের ধনুতে স্থাপন করে রাবণের কণ্ঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। রামের নিশানা অব্যর্থ। তীর রাবণের কণ্ঠ ভেদ করল।

ছিন্ন শির হল বীর। রাবণের চির উন্নত শির লুটাল ধরণীতলে।

বিরাট যুদ্ধে বিরাট প্রাণের মৃত্যু হল। অষ্টআশি দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হল।

প্রাসাদ শীর্ষের উপর দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখল রাণী মন্দোদরী আর পুত্রবধূ প্রমীলা। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেল দুই দুর্ভাগিনী।

ধূপছায়ার মত সন্ধ্যা নামল রণক্ষেত্রে।

অস্তমান সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠল লঙ্কার পশ্চিম আকাশ। দূরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা নেমে এল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার তাতেই যেন গভীর আর নিবিড় হয়ে উঠল।

বিধুর সান্ধ্যপরিবেশে রামচন্দ্র কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন দগ্ধ হতে লাগল। রণক্ষেত্রে আহত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তরব, বিলাপ, করুণ ক্রন্দন ধ্বনির মত কানে বেজে যেতে লাগল। আর তাতেই মনটা অবসন্ন আর ক্লান্ত হতে লাগল।

রামচন্দ্রের শিবিরে শিবিরে সৈন্যরা বিজয় উল্লাসে মত্ত। তাদের সঙ্গে আর্যাবর্তের রাজা ও দেবতারাও আছে। ঋষি-মুনি এসবের মধ্যে না থাকলেও তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সাফল্যের তৃপ্তি ও সুখের উল্লাস এক রোমহর্ষ রহস্যময় অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করল। শরীর বারংবার কণ্টকিত হয়ে উঠল পুলকে, গৌরবে, আনন্দে।

কিন্তু জয়ের আনন্দ কিংবা উল্লাস রামচন্দ্রের মনকে আকর্ষণ করল না। শিবিরে আপন কক্ষে নির্বাক, নিশ্চল হয়ে বসে রইল। শোক দুঃখের স্মৃতির ভেতর মগ্ন হয়ে রইল তার সমগ্র সত্তা।

রাবণের মৃত্যু রামচন্দ্রের মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। রাবণ জয়ের পরের দিনগুলো কত ভয়ংকর শূন্যতার আর নিঃস্বতার ভরে থাকবে সে কথা ভেবে রামচন্দ্র একটু অস্থিরতা বোধ করল। অথচ রাবণের এই পতনের জন্য দেবতা মানুষে মিলে কত ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা, কত প্রস্তুতি, দীর্ঘকাল ধরে কত প্রতীক্ষা, কত উৎকণ্ঠা, আর কত সতর্ক সাবধানতায় কেটেছে। এর জন্যে চোদ্দ বছর তার বনে জঙ্গলে পাহাড়ে কেটেছে। এতগুলো বছর সে গৃহছাড়া, স্বজনছাড়া। রাবণের পতনের জন্যে সে পিতাকে হারিয়েছে, সিংহাসন ছেড়েছে, কত অজানা দেশের পথে পথে ঘুরেছে, কত রোমহর্ষ স্বপ্ন দেখেছে, কত অদ্ভুত বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, কত মৃত্যু দেখেছে। তখন কিন্তু এই নিষ্ঠুর পারণামের কথা ভেবে তার মন একটুও বিচলিত কিংবা অস্থির হয়নি। বরং কর্তব্যে আরো কঠোর করেছিল তাকে। ক্ষমতামত্ত স্বৈরাচারী রাবণের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা এবং ধার্মিকদের উদ্ধারের জন্যে বিশাল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর মানুষকে একসূত্রে বেঁধে অধর্মচারী রাবণের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযান করল। দেবতা, মানুষ, বানর গৃধ্র, শবর নিষাদ সব শ্রেণী, সববর্ণ ও ধর্মের পাদপীঠতলে দাঁড়িয়ে অধর্মের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ল। সর্বশক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে তবে রাবণের পরাজয় ঘটানো সম্ভব হল। সেই বিরাট মানুষটার মৃত্যুতে রামচন্দ্র জয়ের আনন্দের চেয়ে বেশি নিরানন্দ আর ক্লান্তি অনুভব করতে লাগল।

একটা কূট সন্দেহে মন আলোড়িত হল। রামচন্দ্র এই প্রথম নিজেকে স্বাধীন ও মুক্ত করে প্রশ্ন করল রাবণের অধর্ম কোথায়? তার দোষ কি? স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার, দেশ

প্রেম, স্বজাত্য প্রেমকে যদি মন্দ কিংবা অধর্ম বলা হয়, তা-হলে আর্যাবর্ত্ত কেন, দেবতাদেরও কেউ ধর্মনিষ্ঠ, সংযমী নয়। দেবতাদের স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচারের'ত কোন তুলনা হয় না। এসব জেনে বুঝেও ঋষিদের পরামর্শে, দেবতাদের অনুরোধে রাক্ষসের হাত থেকে আর্যাবর্ত্ত এবং দেবলোক'কে বাঁচানোর শপথ নিয়েছিল। আর, তার জন্যেই ঋষিদের মিথ্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। একটা দীর্ঘকালীন বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল রাবণের মৃত্যুর কারণ।

রাবণের মৃত্যুটা তাই যেন কোথায় ভীষণ লেগেছে তার। যে মানুষটার জন্যে কত চিন্তা, উৎকণ্ঠা, কত পরিকল্পনা তার সব সমাপ্তি ঘটে গেল। সব কিছুর জন্যে যাকে দায়ী করা যেত, সেই মানুষটা পৃথিবী থেকে সরে যেতে স্বপ্নের মত সব মিলিয়ে গেল, কোথায়? আর কোন উৎকণ্ঠা নেই, দুর্ভাবনা নেই। সব ফাঁকা, শূন্য। রামের নিজেকে বড় নিঃস্ব লাগল। রিক্ত মনে হল। কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করল। রাবণ বেঁচে থাকতে যা কোনদিন কখনো অনুভব করেনি তার মৃত্যু যেন সেই উপলব্ধি দিল তাকে। রামের মনে হল, রাবণের অপর নাম উন্মাদনা, উত্তেজনা—কী রোষে, কী তেজে, কী বীর্যে, কী শত্রুতায়, কী প্রতিহিংসায়, কী যুদ্ধে। রাবণ নেই, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, উত্তেজনা নেই, উদ্বেগ, ভয় কিছু নেই। জীবনটা যেন গতিহীন, দ্বন্দ্বহীন হয়ে গেছে। জীবনে আর কোন আকর্ষণ নেই যেন। নিরুপদ্রব অখ্যাত ধূসর সুদীর্ঘ জীবনের কথা চিন্তা করে রামচন্দ্রর অন্তরে বিষাদ ও গ্লানি জমল।

কক্ষে তার মন টিঁকল না। মাথায় ধিকি ধিকি অঙ্গার জ্বলতে লাগল। আত্মধিক্কার ও চারিদিককার কলুষিত পরিবেশের উপর ঘৃণা তাকে পাগলের মত করে তুলল।

চৈত্র মাস।

শীতের প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে। বাইরে গাছের ডালে বিরহী কোন কোকিল একটানা ডেকে চলেছে। রামচন্দ্র শিবিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। প্রকৃতি শান্ত ও সীমাহীন। নির্মেঘ আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র যেন যুদ্ধে নিহত অসংখ্য মৃত সৈনিকের চোখের মত তাকে নিরীক্ষণ করছে। হতোদ্যম রামচন্দ্র ঊর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। তার বুক থেকে ধাবিত হয় পুঞ্জীভূত অভিমান। প্রশ্ন করে—আমি কি করেছি আমার অপরাধ কোথায়? আমি যা করেছি নিজের জন্যে নয়, দেবতা ও মানুষের জন্যে, আর্যাবর্তের স্বার্থে। তবু কেন তোমাদের রক্তচক্ষুর ভর্ৎসনা? কেন এই তিরস্কার? উঃ ঈশ্বর।

রামচন্দ্র অনেকক্ষণ একা চুপ করে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার চুলে এলোমেলো ফুরফুরে হাওয়া লাগে। কেমন একটা উদভ্রান্তিতে তার দুই চোখ করুণ নিষ্প্রভ। আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টিহীন নিষ্প্রাণ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা।

রুপালী জ্যোৎস্নায় চরাচর ভরে গেছে। উদ্ভাসিত রণক্ষেত্রে দুইচোখ ছড়িয়ে দিয়ে রামচন্দ্র নিঝুম হয়ে বসে রইল। মনটা মৃত্যু চেতনায় ছেয়ে রইল। মানুষের মৃত্যু হলেও সর্বাংশে মরে না। সে এক ভিন্ন অস্তিত্বে বেঁচে থাকে মানুষের অন্তরে।

মৃত্যুর পরবর্তী সেই ভিন্ন জগৎ আর ভিন্ন অস্তিত্বের কথা বিবশ হয়ে এই অনুকূল পরিবেশে ভাবছিল।

মৃদু কোমল জ্যোৎস্নার আলোয় চরাচরে এক রহস্যময় অস্পষ্টতা সৃষ্টি হল। জ্যোৎস্নার ভেতর একটা অতিলৌকিকতার স্পর্শ আছে। পার্থিবতায় লেগেছে পরলোকের আলো-আঁধারি। রামচন্দ্র কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হেঁটে যাচ্ছিল জ্যোৎস্নায়। পৃথিবী ছেড়ে সে যেন এগিয়ে চলল প্রেতলোকে।

নিহত শবের পাশ কাটিয়ে রামচন্দ্র ভূলুণ্ঠিত রাবণের ছিন্ন মুণ্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। দু'চোখের কোণ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। রাবণের ছিন্ন মুণ্ড আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। কি প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ মুখখানা। কোন রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, অভিযোগ নেই চোখের চাহনিতে। অবশ্য, অভিযোগ, তিরস্কার, কিংবা ভর্ৎসনা করার কোন সুযোগ অদৃষ্ট তাকে দেয়নি। তাই এক ভাগ্যের করুণ পরিণামের দিকে তাকিয়ে অদৃষ্টকে যেন উপহাস করছে।

দীর্ঘশ্বাসের মত এক ঝলক বাতাস এসে লাগল রামচন্দ্রের মুখে। বাতাস যেন ফিস ফিস করে রাবণের মনের কথাটা রামচন্দ্রের কানে কানে বলল: ভাই বিভীষণ এই মহাশ্মশানে তুমি কোন স্বর্গ রচনা করবে? রামচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকটা রাবণের জন্যে হাহাকার করে উঠল। তার নিষ্প্রাণ দেহের সামনে ম্লান মুখে ও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে নিজের মনে মনে বলল: ওগো বীর, স্বদেশ প্রাণ তুমি, বিরাট মহান তোমার গরীমা। তোমাকে প্রণাম করি। পরিতাপ দহনে জর্জরিত আমার চিত্ত। এই জয়ে আমি কোন গৌরব অনুভব করছিনা। কোথায় যেন তোমার কাছে আমি হেরে গেছি। তাই একে আমার জয় বলে দাবি করব না। কিন্তু তোমার পুজোয় আমি নৈবেদ্য দিয়েছি বিশাল ভারতবর্ষ।

গভীর ব্যথায় থম থম করতে লাগল রামের মুখখানা। করুণ আর মৃদুকণ্ঠে বলল: মন থেকে কোনদিন তোমাকে মুছে ফেলতে পারবনা। এই যুদ্ধে আমি একজন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ও বন্ধু হারালাম। কিন্তু তবু কেন, কেন তোমার প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হল না? বাঁধাত ছিল না, তবু কেন সংস্কার দ্বিধা ষড়যন্ত্র থেকে মনকে মুক্ত রাখতে পারলাম না। কেমন বুকফাটা হাহাকারের মত শোনাল তার কথাগুলো।

বিশ্বামিত্র পিছন থেকে কাঁধ স্পর্শ করল। আকস্মিক স্পর্শে রামচন্দ্রর সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। শিরায় শিরায় বয়ে গেল এক অদ্ভুত শিহরণ। কষ্টে, দুঃখে, বেদনায় আনন্দে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় চেপে ধরল চক্ষু বুজল শ্বাসরুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল: আচার্য! আপনি এই মহাশ্মশানে কার সন্ধানে এলেন?

বিশ্বামিত্রর কণ্ঠস্বর গম্ভীর অথচ শান্ত। বলল: রামচন্দ্র, তোমার বীর্যে ক্ষাত্রবংশের গ্লানিমুক্ত হল। অজেয় রাক্ষস রাজ্যে আর্য প্রভুত্ব স্থাপিত হল। তোমার এই বিশাল জয়ের কোন তুলনা নেই। এক কঠিন ব্রত পালন করে তুমি যশভাগী হলে। আমার আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনের নব নব সাফল্য সূচনা করুক।

রামচন্দ্রের বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ বয়ে গেল। অস্থিরতায় মাথা নাড়ল। আকুল নীরব কান্নায় নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল। চোখ বোজা। চোখের কোণে টলটল করছে জল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় রামচন্দ্রের মুখ স্পষ্ট। বিশ্বামিত্র অবাক চোখে রামের করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। রামচন্দ্রের মুখখানা যেন চারদিককার পরিবেশের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। চোখের জল তার মুখখানিকে আরো সুন্দর করল। বিশ্বামিত্র অপ্রস্তুত বিস্ময়ে প্রশ্ন করল : তোমার চোখে জল ?

রামচন্দ্র স্বপ্নাতুর চোখে বিশ্বামিত্রর দিকে চেয়ে থেকে বলল : এসব কাউকে বোঝানোর নয়। নিহত রাবণ আজ আমাকে যত কাছে টানল এত কাছে আগে টানলে বোধ হয় এই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে আমাকে অশ্রু তর্পণ করতে হত না।

বিশ্বামিত্র মৃদুস্বরে তিরস্কার করে বলল : ছিঃ রামচন্দ্র, আজ বড় আনন্দের দিন। পুরুষকার বলে দেবকে করতলগত করে তুমি রাবণের দর্প-নাশ করেছ। এত বড় সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি তোমাকে নিরানন্দ করবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

আচার্য রামচন্দ্র মহাবীর হলেও মানুষ—তার চরিত্রে মানবিক দৌর্বল্যটুকু যাবে কোথায় ?

রাক্ষসের এ ভাগ্যফল।

হাঁ, আচার্য মহাবীর রাজা শত পুরুষকার দিয়েও তার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারল না। ভাগ্য অমোঘ। সেই অমোঘ সত্য হল মৃত্যুর হাতে চরম পরাজয়ে।

রামচন্দ্র তোমাকে উতলা হতে নেই। এখন দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের সময়।

আচার্য আমাকে স্মরণ করে দিয়ে কৃতার্থ করলেন। বিভীষণের অভিষেক বাকী। রাজ্য কখনও নৃপতিশূন্য থাকে না। এক রাজার বিদায়ের সঙ্গে আর এক রাজাকে বরণ করে নেয়াই রাজ ধর্ম। রাজ ধর্ম, জীবন ধর্ম এক নয় আচার্য। পুরুষ শূন্য লঙ্কা হতাশায় ভুগছে, বুকে তার আতঙ্ক। হৃদয়ে অনুশোচনা, দীর্ঘশ্বাসে ঘৃণা আর অভিশাপ। কোন্ সহানুভূতি আর সমবেদনার আবরণ টেনে দেব তাদের ক্ষত লাঞ্ছিত, শোক সন্তপ্ত মনের উপর !

॥ বাইশ ॥

শবরী আছে অশোক কাননের প্রাসাদে। সেখানে সে বন্দিনী নয়। রাবণের মহিষীদের মত সেও থাকে যত্নে আদরে। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম বিলাসের সমাদরের কোন ত্রুটি রাখেনি রাবণ। বিভীষণ পত্নী সরমা এবং তার কন্যা কলা তাকে দেখাশোনা করে। এ-ছাড়াও আছে দাসী। খোজা প্রহরী।

লাল রঙের একটি কাপড়ের উপর শবরী আপন মনে নানা রঙের সুতো দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রের এক শান্ত সুন্দর আত্মদৃপ্ত বীর-

মূর্ত্ত করছিল। শেষ টানটুকু দিতে তখন সামান্য বাকী। কোলের উপর সেটা রেখে কখন যেন অন্যমনস্ক উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল শবরী, নিজেও জানে না। মাথার ভেতর দিয়ে খণ্ড মেঘের মত অসংখ্য ঘটনা, স্মৃতি, কথা ভেসে যায়। কোনটাই থামে না।

যুদ্ধ শেষ।

রাবণ নিহত। তার শেষকৃত্য সমাপ্ত।

রণবাদ্য স্তব্ধ।

রাজ অন্তঃপুরে শোকের সাগর। সকলে বিষণ্ণ, মৌন, শান্ত।

শবরীও কেমন একটা আবেশ মাখানো অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। দেহের শিরায়, রক্তের প্রবাহে, মাথার স্নায়ুর মধ্যে কি যেন উষ্ণতা। তীব্র একটা কিছু বয়ে যাচ্ছিল।

রামের সমাপ্ত প্রায় চিত্রের উপর তার দৃষ্টি স্থির।

লঙ্কা বিজয়ের পর দুদিন কাটল। বিভীষণের অভিষেক সমাপ্ত। কুলপ্রথা অনুসারে শাস্ত্রীয় বিধিমতে রাবণ মহিষী মন্দোদরীর সঙ্গে বিভীষণের বিবাহ ও অভিষেকের অব্যবহিত পরে সম্পন্ন হয়ে গেছে। তথাপি, রামচন্দ্র একবারও তাকে দেখতে এল না, নিতেও এল না। এমন কি কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে তার খোঁজ পর্যন্ত করল না। অথচ, সে রামকে একটু দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। কতবার ইচ্ছে হয়েছে রামচন্দ্রের আহ্বান ছাড়াই তার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু নিজের অভ্যন্তরে কতকগুলো বাধা আর সংশয়ের জন্য সে তা করতে পারল না। কোন মুখে সে রামের সামনে দাঁড়াবে? কি কৈফিয়ৎ দেবে? রামচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: কোনদিন কেউ জানবে না তার পরিচয়। কিন্তু রাবণ সব গোলমাল করে দিল। বিশ্বাস ও মনোনয়নের পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু রামচন্দ্র তার অঙ্গীকার রক্ষা করেছে। তার জন্যেই এত বড় একটা যুদ্ধ, লোকক্ষয় হয়েছে। এমনটা যে হবে শবরী স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। এখন সে কথা ভাবলে, শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠে পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা তীব্র হাহাকার তার হৃদয় জুড়ে বেজে গেল। অনুশোচনায় বুক টাটাল।

রামের কাছে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের দুয়ার তার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন কিছু তার কাছে আশা করাই অন্যায়। রামচন্দ্র অনুগ্রহ করে যদি তার কাছে একবারও না আসে, তা-হলে অভিযোগ করার কিছু নেই। কোন অধিকারে রামচন্দ্রের উপর জোর করবে? অধিকারের কি মূল্য সে দিয়েছে? অনুশোচনার দাহে জ্বলে যেতে লাগল বুকটা। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনটা বিস্বাদ আর তেতো হয়ে গেল।

সকাল থেকে শবরীর প্রতীক্ষার শেষ নেই। রামচন্দ্র আসবে এই আশায় আশায় তার বেলা বয়ে গেল। দুপুর হয়ে এল। তবু রামচন্দ্র কিংবা তার কোন প্রতিনিধির দেখা নেই। ক্ষিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছিল। কিন্তু রামচন্দ্রকে প্রণাম না করে সে

জলস্পর্শ করবে না বলে মনে মনে স্থির করেছে। এই প্রতিজ্ঞাই তার হৃদয়কে দ্রব করে রাখল।

রামচন্দ্রের শিবিরে সে খবর পেঁ ছিল। একটা শিহরণ আর ভয় খেলা করে গেল রামের শরীরে। শবরী এমনভাবে পাগলের মত তাকে চায়, এটা ভাবতে তার নিজের কাছেই কেমন সংকোচ আর লজ্জা লাগল। বাস্তবিকই একটা অজ্ঞাত ভয়ে তার বুক চিন চিন করল। শবরীকে নিয়ে রামচন্দ্রের এক অদ্ভুত সংকট সৃষ্টি হল। আর সেজন্যেই শবরীর সঙ্গে সাক্ষাতে বিলম্ব হচ্ছিল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু রামচন্দ্রের লড়াই থামেনি। লড়াইটা অবশ্য খুব সাংঘাতিক। একেবারে রামের ব্যক্তিগত লড়াই। শবরীকে নিয়েই এই লড়াই তাকে এখন করতে হচ্ছে নিজের মনের সঙ্গে এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে। শবরী কে? কেউ জানে না সেকথা। রাবণ যেভাবেই বলুক না কেন তা কেউ বিশ্বাস করেনি। রাবণের যুদ্ধকালীন প্রচারকে রামচন্দ্রের উপর অবিশ্বাস সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টির এক চক্রান্ত বলেই মনে করেছিল। বানর-সৈন্য এবং মিত্রবাহিনীর কান ভারী করে তাদের বিভ্রান্ত করা এবং তাদের ভেতরে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা ছিল আর এক প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র। সুতরাং, সীতা যে শবরী, এ সত্য বিশ্বাস করার মত কোন কারণ হয়নি।

কিন্তু ঘটনার সমস্যা আরো গভীরে। সেজন্যে ভেতরে ভেতরে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। শবরীকে নিয়ে যে ছেলেখেলা, এবার তা গোটানোর প্রয়োজন। শবরীর ভেতর থেকে কেমন করে জনকনন্দিনী সীতা বেরিয়ে আসবে তার কোন চিন্তাই মাথায় এল না। কি ধরণের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হলে এই রূপান্তরীকরণ সম্ভব। রামচন্দ্র কিছুতে তার রহস্য ভেদ করতে পারল না।

রামচন্দ্রের মনের অভ্যন্তরে খবর কেউ রাখে না। সেখানে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া তার বুকের ভেতর জ্বালা ধরিয়ে দিল। এক একটা নাম আর মানুষকে নিয়ে কত স্মৃতি তৈরী হয়। এই যে শবরী ছয় মাস ধরে রাবণের অশোক কাননে বন্দী হয়ে অশেষ মনোকষ্ট ভোগ করল তার নীরব সেবা ও আত্মত্যাগকে ভুলবে কেমন করে? আবার তাকে বিসর্জনই বা দেবে কেমন করে? অশোকবনে বন্দিনী শবরীকে সীতা বলে গ্রহণ করলে বাল্মীকি আশ্রমের জনকনন্দিনীকে নির্বাসিন দিতে হয়। দুই সীতার এই সমস্যা রামচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলল। ভেতরে সে এক তীব্র অস্বস্তি টের পেল। অনেক কিছুই অনুভব করল। শিবিরে শিবিরে জোর কানঘুষা হচ্ছে. দুদিন হয়ে গেল তবু রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করল না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল না পর্যন্ত। সে কেমন আছে, কি অবস্থায় আছে তা নিয়েও কোন দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা কিংবা উদ্বেগ তার নেই। অশোক কাননে বন্দিনী সীতা সম্পর্কে রামচন্দ্র নির্বিকার, আগ্রহহীন। ভুলেও তার নাম উচ্চারণ করেনি কখনও। তাকে দেখতে যাওয়ারও কোন কৌতূহলও দেখায়নি।

রামচন্দ্রের আচরণ সকলকে সন্দিহান করে তুলল। দেবতা, ঋষি, হনুমান, সুগ্রীব কেউ সে সন্দেহ থেকে বাদ থাকল না। সকলের মনে বিস্ময় ও প্রশ্ন—সীতা হরণের

দুঃখ, বিরহ কষ্টের সে ব্যাকুলতা রামচন্দ্র কোথায় হারাল ? সীতার সামান্যতম অদর্শন এবং বিচ্ছেদ যে সইতে পারত না—ইনি কি সেই রামচন্দ্র ? হৃদয়কে রামচন্দ্র এমন পাথর করল কেমন করে ? যে রামচন্দ্র করুণাময় হীনপতিতের বন্ধু, তিনি সীতার উপর এত নির্দয় আর অকরুণ হলেন কেন ? সীতার অপরাধ কি ? তার দোষ কোথায় ? অন্যায় বা কি ?

শবরীই রামচন্দ্রকে উদাসীন থাকতে দিল না। এক লহমায় তাকে দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হল। শবরীর সংবাদ শুনে একটু দ্বিধায় পড়ল। মুখ একটু বিবর্ণ হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিভীষণের দিকে তাকিয়ে বলল : বিভীষণ, তুমি এখন লঙ্কার অধিপতি। আমি তোমার বন্ধু মাত্র। রাজকার্য চালনায় আমি কেউ নই। তুমিই সব। সীতাকে মুক্ত করে দেয়া তোমার কাজ। তোমার আদেশ না পেলে সীতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি কেমন করে ? সীতার কাছে যাওয়ার'ত কোন অনুমতি আমার নেই। কিংবা সে যে মুক্ত সেকথাও বলনি কখনো। তাহলে, আমার অপরাধটা কোথায় ?

বিভীষণ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। অন্যেরা বিস্মিত ও পুলকিত হল। তাদের মনের অভ্যন্তরে যে সংশয় আর সন্দেহ জমে উঠেছিল তার অবসান হল। দম ফেলে সকলে বাঁচল। বিভীষণ লজ্জায় মাথা নুইয়ে বলল : সখা সবার সম্মুখে তুমি আমাকে অপরাধী করলে। কিন্তু এদেশ বাহুবলে তুমি জয় করেছ। তুমি এর সম্রাট, শাসক। আমি তোমার দীন প্রতিনিধি। তোমার রাজ্যে, তোমাকে আদেশ করা আমার মানায় ? আমাকে এত বড় করে দেখবে তুমি কল্পনাও করিনি। একে আমার কর্তব্যহীনতার অপরাধ বল না। আমার অন্ধ আনুগত্য নিয়ে তোমার এই নিষ্ঠুর কৌতুক আমাকে শুধু লজ্জাই দিল। আমার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করতে এখনি অশোক কাননে যাব। জননী সীতাকে সসম্মানে মুক্ত করে তোমার কাছে আনব !

রামচন্দ্রের অধর মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হল। অদ্ভুত সুন্দর সে হাসি। একেবারে লাজুক প্রেমিকের মত সরল ও সহজ হাসি। বিভীষণ চলে গেলে রামচন্দ্র নিজের শিবির কক্ষে প্রবেশ করল।

মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতার ভেতর রামচন্দ্র তার বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির কথা ভাবল। একথা সত্য যে তার জীবনে এখন দুইস্তরের দুই গ্লানির সংক্রমণ ঘটেছে। এর একপিঠে সীতা, আর একপিঠে শবরী। শবরীর সঙ্গে প্রয়োজনের অবৈধ, অপ্রেম সম্পর্ক—সীতার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে পীড়াদায়ক করে তুলেছে। কিন্তু এরকম মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। তবু হয়। কিন্তু স্থায়ী হয় না। বয়স ও অভিজ্ঞতার সংযমে শবরীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ সেবামুখী। শবরী অপহৃতা হওয়ার পর থেকে তার মনের ভেতর সে আরো স্তিমিত এবং শ্লথ। তবু তাকে নিয়ে তার মনের ভেতর ঝড় উঠেছে। চিন্তার কোন থৈ পায় না। মনের ভেতর দুই সীতাকে নিয়ে যে অভূতপূর্ব গভীর সংকট উপস্থিত, তার সমস্যা ও প্রতিকারের স্বরূপ রামচন্দ্র নিজেও জানে না। এখনও তা অব্যাখ্যাত। এক অজ্ঞাত ভয়, উদ্বেগ তার

মস্তিষ্ক জুড়ে ছড়িয়ে যায়। ভাগ্যের এক অভূতপূর্ব অসহায়তার মধ্যে সে বন্দী। যে কোন চিন্তার মুহূর্তে সেই অসহায়তা তার রূপ ও সমস্যাগুলোকে প্রকট করে। মনের এই অবস্থার সঙ্গে কোন বাস্তব সংকেত বা সূত্র খুঁজে পায় না, যা বৈদেহীর সঙ্গে শবরীর পাল্টাপাল্টির কাজকে সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য করে। সমস্যার সমাধানসূত্রে অলৌকিকতা রামচন্দ্রের কল্পনার দিগন্তকে স্পর্শ করে যায়। কিন্তু এমন কিছু সে ভাবতে পারে না, যা সেই অজ্ঞাত অলৌকিক মায়াকে ইংগিত করতে পারে। তথাপি, এই অলৌকিকতা বর্তমানে তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ অন্তরলোকে গহীন অন্ধকারে প্রদোষের স্নিগ্ধ আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক অদ্ভুত যুক্তিতে। বুকের মধ্যে গতিময় তীরের ফলার মত এসে আমূল গেঁথে গেল তার ভাবনা। দেহ ও মনের শুচিতার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে শবরীকে প্রমাণ করতে হবে সে নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধা। রামচন্দ্র জানে শবরী অভিমানী এবং ধর্মপ্রাণা। তার কাছে চরিত্র ও জীবনের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। চরিত্রের পবিত্রতা হারানো তার কাছে জঘন্যতম অপরাধ। সুতরাং সেই চরিত্রের উপর রামচন্দ্রের সন্দেহকে সে সহ্য করতে পারবে না। অভিমানে, দুঃখে, অপমানে সে আত্মহারা হয়ে পড়বে। মৃত্যুর মত এক কঠিন সংকল্প তখন তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হওয়া কিছু নয়। সাধারণ লোক বিশ্বাস করে সত্যবাদী এবং ধার্মিককে অগ্নি কখনও গ্রাস করে না। এই বিশ্বাসে প্রত্যয়বান হয়ে শবরী নিষ্কলুষ চরিত্রের মহিমা, সত্যের তেজ এবং ধর্মের জয় দেখাতে এবং সত্য যাচাই করতে অগ্নিপরীক্ষার মত একটি কঠিন পরীক্ষাকে গ্রহণ করবে। তাতে শবরীই শুধু মরবে কিন্তু শবরী সীতা হয়ে উঠবে কেমন করে?

দূরে কোলাহল শোনা গেল। শব্দ ক্রমে নিকটতর হল। সীতা ও রামের যুক্ত জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। রামের বুকের রক্তের কলধ্বনিতে বাজতে লাগল তীব্র একটা আবেগ। বুকের ভেতরটা তার তোলপাড় করছিল। রামচন্দ্র আস্তে আস্তে শিবির কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এল। পথের দুধারে কৌতূহলী সৈনিক ও জনতার ভীড়। সকলের কণ্ঠে সীতা ও রামের যুক্ত জয়ধ্বনি। পরম আবেগে চোখদুটো বুজে এল রামচন্দ্রের।

মণিমাণিক্যখচিত কারুকার্যময় ময়ূর পঙ্খী শিবিকায় সীতাকে নিয়ে আট বেয়ারা ছুটছে। বাতাসে সীতার শ্বেতশুভ্র বসনের প্রান্তভাগ পতপত করে উড়ছে। রামচন্দ্রের মনে হল নীল আকাশের বুক চিরে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্যুতের চমকানো আলোকরেখা। কেমন একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল রামচন্দ্রের চেতনা।

রামচন্দ্রের শিবির কক্ষ সংলগ্ন প্রাঙ্গন এমন বড় নয়, যেখানে বিপুল লোকের স্থান সংকুলান হয়। তাই, শবরীরূপী সীতাকে দেখার জন্য ভীড় সেখানে উপছে পড়েছে। সকলেই ভেতরে এবং সামনে যেতে চায়। তাই ভেতরে যাওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। প্রহরীরা ভীড় ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু সে এক

প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য কাজ। মাঝে মাঝে জনতার গতি রুদ্ধ করতে প্রহরীরা মৃদু লাঠি চালাল। তবু ভীড় সামলাতে পারে না। শিবিকার পেছন পেছন জনতার যে স্রোত ছুটল, কার সাধ্য রোধে তার গতি?

রামচন্দ্রর নির্দ্দেশে শিবিকা থামানো হল। শবরীরূপী সীতাকে উৎসুক জনতার শতসহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হল। জনতা বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। পলক পড়ল না তাদের। মুহূর্ত্তে তারা শান্ত হয়ে গেল। মনে হল আকাশের এক শুকতারা যেন নেমে এসেছে তাদের মধ্যে। স্বপ্নের পরী যেন তাদের ভেতর দিয়ে চলেছে। কেমন অবশ হয়ে গেল তাদের স্নায়ুগুলো।

রামচন্দ্রের নিজের চোখও ধাঁধিয়ে গেল। জলস্থল, অন্তরীক্ষের সমস্ত, লাবণ্য, সমস্ত রহস্য এক করে শবরী যেন এক অপরূপা মানবপ্রতিমা। রামচন্দ্র এমন খুঁটিয়ে আগে কখনও দেখেনি তাকে। এই প্রথম নির্ভয়ে, নিসংকোচে তার রূপ দেখল। জনতার মধ্যে থেকে বলল মধুর। মধুর। দূর থেকে রামচন্দ্রের ভেসে এল অনেক মানুষের মৃদুগুঞ্জন। তার মধ্যে একটি স্বর স্পষ্ট। জনতার মধ্যে কে যেন কথাটা তুলল। যে লোকটার নামে এত দুর্নাম, সে রূপেশ্বরী সীতার যৌবন লাবণ্য মাধুরী অনাঘ্রাত রেখেছে একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না।

স্বতঃতাকে দুলিয়ে যাওয়া এই হঠাৎ মন্তব্যটি শবরীর জীবনের অন্তিম প্রহরের সংকেতের মত শোনাল। কথাটা শবরীর মস্তিষ্কের অন্ধকার সীমানায় এক বিস্মিত জিজ্ঞাসা ঝিলিক দিয়ে গেল। কিন্তু সেজন্য লাঞ্ছনায় কোন অনুভূতি স্পর্শ করল না। কোন গ্লানিবোধও জাগল না অন্তরে। কেমন একটা অমঙ্গলজনিত শংকায় শবরী কেঁপে উঠল ক্ষণেক কঠিন, ক্ষণেক কোমল অনুভূতিতে।

শবরী ভীড়ের ভেতর দিয়ে এসে রামচন্দ্রকে প্রণাম করল। রামচন্দ্রের প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। তার অনুভূতির ভেতর একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল।

শবরী অবাক অপলক চোখে রামচন্দ্রের দিকে তাকাল। দৃষ্টিস্থির রামচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসু চোখের দিকে। তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটে দ্বিধার হাসি। কিন্তু তার চোখের তারায়ও যেন অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। একটা জিজ্ঞাসা যেন তার ঠোঁটে কাঁপতে লাগল। কিন্তু উচ্চারণ করতে পারল না। রামচন্দ্র বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের চাহনিতে বিস্ময় নেই, একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহ। ভ্রূকুটি দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে কিসের চিন্তার ভেতর যেন মগ্ন হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর করুণ চোখে অপলক তাকিয়ে ধীরে ধীরে শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলল: তোমাকে জীবিত দেখব এ আশা আমার ছিল না। তবু আমি থেমে থাকিনি। তোমার উদ্ধার করার শপথ নিয়ে যুদ্ধ করেছি। মাঘের মধ্যভাগে যে যুদ্ধের সূচনা চৈত্রের শেষভাগে তার সমাপ্তি। অনেক মানুষ মরেছে। রক্তের নদী পার হয়ে তোমার কাছে পৌঁছিয়েছি। আমার একটি সুখের জন্যে কত স্ত্রী তার স্বামীকে হারাল, কত জননী তার পুত্রকে হারাল, কত শিশু তার পিতাকে হারাল। তাদের সে বুক-ফাটা কান্না, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস আমি ভুলতে পারছি না। তোমাকে ফিরে পেয়েও

আমার মন কেন খুশিতে উচ্ছসিত হয়ে উঠছে না। চেতনার গভীরে কেন সাড়া জাগাচ্ছে না তোমাকে বরণ করবার।

শবরীর বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল। মুক্তার ফোঁটার মত দু'ফোঁটা অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করতে লাগল তার গালে। গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। নিঃশব্দ কান্নার মধ্যে হারিয়ে গেল তার বুকের ভাষা। শবরী মাথা নাড়ে আর বলেঃ তোমার কথা রাখতে পারলাম না।

রামচন্দ্র তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার ভেতরে অস্পষ্ট কুয়াশার মত ফুটে উঠল সীতার মুখ তার মৃগহরিণীর মত কালো চোখের স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি। শূন্যগর্ভ গুহার মত তার বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করছে। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাসে রামচন্দ্রের বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে গোপনে মিলিয়ে গেল। কেমন কঠিন, নিষ্ঠুর আর বেদনাহীন হয়ে উঠল রামচন্দ্রের অন্তর। আস্তে আস্তে গম্ভীর গলায় বলল ঃ আমি যুদ্ধে শত্রু জয় করে তোমাকে উদ্ধার করেছি। পৌরুষ দিয়ে যা করা যায়, আমি করেছি। শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে রাবণের পরাভবে। আমার শপথ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে।

শবরীর কালো আয়ত দুই চোখের করুণ দৃষ্টি রামের মুখে স্থির। অপলক। স্খলিত ভেজা গলায় বলল ঃ তোমার করুণা পেয়ে ধন্য হলাম আমি। তোমার দয়া চিরদিন মনে থাকবে। জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না। কিন্তু আমি তোমাকে কি দিতে পারলাম প্রিয় ? সামান্য বিশ্বাসটুকুও রাখতে পারলাম না। অনুতাপে অনুশোচনায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। আমাকে তুমি করুণা কর।

আগুনে পোড়া সাপের মত শবরীর বুকের ভেতরটা বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় যে মথিত হতে লাগল রামচন্দ্র তা স্পষ্ট টের পেল। তবু রামচন্দ্রর কোন চাঞ্চল্য জাগল না। শবরীর হাহাকার অনুশোচনার রহস্য তার অজানা নয়। প্রাণের উদ্বেলতায় শবরীর মুখ দিয়ে অসাবধানে সেই গোপন রহস্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই রামচন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে বলল ঃ তুমি করুণারও অযোগ্য। তুমি অস্পৃশ্য, চরিত্রহীন।

না—না—শবরীর সমস্ত সত্তাটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। প্রচণ্ড একটা ঝড় যেন ভেঙে পড়ল বুকের ভেতর। মর্মবিদ্ধ যন্ত্রণায় আকুল হয়ে কাঁদল। ভাঙা স্বরে বলল ঃ এত বড় কলংক তুমি আমাকে দিতে পারলে ? তোমার কষ্ট হল না ? এত নিষ্ঠুর কেন হলে ঠাকুর ? তোমার সেই প্রেম, অনুভূতি কোথায় গেল ? সে কি সব ছলনা ? শবরীর স্বরে যন্ত্রণার ঝংকার। তার উত্তোলিত মুখ রামচন্দ্রের মুখোমুখি স্থির। তার দুই চোখ বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে উঠে। প্রাণ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত দুর্জয় আর অপরূপ দেখায়। রামচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হয়। মস্তিষ্ক চিন্তাশূন্য, এবং সম্মোহিতের মত তার অবস্থা। উভয়ে নির্বাক। পরস্পর দৃষ্টিবদ্ধ। কতকগুলো মুহূর্ত কেটে যায়। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে মাথা কোটে শবরী। চুপি চুপি স্বরে রামচন্দ্রের কানে বলল ঃ আমি আর চুপ করে থাকব না। আমাকে সব কথা বলতে দাও।

রামচন্দ্র নিজেকে আক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত বোধ করল। দৃষ্টিতে উদ্বেগের রূপ বদলাল। শবরীর চোখের উপর চোখ রাখতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপল। অজানা আশংকায় বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। বিবশ আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল এক লহমায়। বুকের ভেতরে একটা দুরন্ত ঘূর্ণি যেন পাকিয়ে উঠল। যা তার উদ্বেগ,, শংকা থেকে উৎসারিত—দমনে অসহায় এবং দুরন্ত। রামচন্দ্র অবাক হয়ে যায়। বাস্তব কি আশ্চর্য! স্থান, কাল ও পরিস্থিতির এই মুহূর্তেই শবরী যেন নিয়তির এক অমোঘ সংকেতে রূপে আবির্ভূত হয়। রামচন্দ্রের গভীর চিন্তামগ্ন, মৌন মুখে পেশী ও রেখায় কাঠিন্যের ঢেউ জাগল। ভুরু কুঁচকে গেল। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও স্নেহহীন হল। বলল ঃ রাবণ তোমাকে ভোগ করার উন্মত্ত লালসায় হরণ করেছে। তোমাকে বক্ষের মধ্যে নিপীড়িত করেছে। অঙ্কে নিয়েছে। কুচোখে দেখেছে। এরপরে কোন রমণীর সতীত্ব, শুচিতা থাকে? না থাকতে পারে? লোকে তাকে কুলটা বলবে। সমাজ নিন্দা করবে।

রামচন্দ্রর অপ্রত্যাশিত তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হল শবরী। তার ভুরু কেঁপে উঠল বিস্ময়ে। শবরীর দৃষ্টিতে সব কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। শ্বাসরুদ্ধ যন্ত্রণামথিত স্বরে বলল ঃ আমার কি দোষ বল? যে দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয় তার জন্যে আমি দোষী হব কেন? পুরুষের শক্তি বলের কাছে আমি অসহায়। রাবণ হরণকালে আমার দেহ স্পর্শ করেছে কিন্তু কোন অসম্মান করেনি। এখন পর্যন্ত এ দেহ কখনও পুরুষ সংসর্গে আসেনি। অনাঘ্রাতা পুষ্পের মত পবিত্র। সব জেনে বুঝে তুমি আমার মহৎ চরিত্রকে সম্মান করলে না। তোমার এই কলংকের ভার আমি বহন করতে পারছি না। তুমি এতগুলো লোকের মাঝখানে আমাকে অপমান করলে। লোকের চোখে আমাকে ছোট করে দিলে। সারাজীবন ধরে এই অপমানকে অসত্যকে বয়ে বেড়ানো থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমিও আর এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারছি না। কষ্টে লজ্জায় বুক আমার জ্বলে যাচ্ছে। এর চেয়ে বোধ হয় অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরা অনেক ভাল।

রামচন্দ্র বিভ্রান্ত বোধ করল। বিচলিত শবরীর যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরে রামচন্দ্র স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বলল ঃ তুমি ঠিক বলেছ। অগ্নি কখনও মিথ্যে বলে না। অগ্নি দিয়ে কারো কখনো মুখোশ হয় না। জনতার অপবাদ, মিথ্যা কলংক স্খালন হতে পারে একমাত্র অগ্নিপরীক্ষায়। সত্য ও ধর্ম অবিনশ্বর। অগ্নিও পারে না তাকে প্রজ্জ্বলিত করতে। তুমি অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করে সত্যের পরীক্ষা দাও। মানুষের বিভ্রান্তি দূর হবে। আমার মনের গ্লানি ঘুচবে।

রামচন্দ্রের কথার মধ্যে উত্তেজনা নেই, শান্ত, তার অপলক চোখের দৃষ্টি শবরীর দিকে। নীজের অগোচরেই তার দৃষ্টিতে মুগ্ধতা নেমে এল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শবরী। চোখের জল তার শুকিয়ে গেছে। মতঙ্গ মুনির কথা মনে পড়ল। কথাগুলো দূরাগত বাণীর মত কানের পর্দায় বাজতে লাগল শবরীর। "রামের হাতেই তোমার মুক্তি। সেই মুক্তির ঘণ্টাধ্বনি যেন সে শুনতে পাচ্ছে। তার আর ভয় নেই। প্রশান্ত কণ্ঠে স্নিগ্ধ স্বরে বলল ঃ তুমি চিতা প্রস্তুত কর।"

পশ্চিম আকাশে একটু একটু করে সূর্য হেলে পড়েছে। আবছায়া অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল মাটিতে। কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ উঠতে তখনও কিছু দেরী আছে। নক্ষত্রখচিত আকাশের মৃদু আলোয় দিগন্তবিশারী প্রান্তর উদ্ভাসিত হয়ে আছে। অন্ধকার খুব গাঢ় নয়। অনেকটা কুয়াশায় ঢাকা সন্ধ্যার মত।

রামচন্দ্র একা শিবির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে একটি চৌকিতে দুহাত জড়ো করে থুতুনিতে ভর দিয়ে বসে আছে। ভাবলেশহীন নির্বিকার পাথরের মত স্তব্ধ মূর্তি তার। দুচোখে বিষাদের ছায়া থম থম করছে। কি এক গভীর চিন্তায় সে মগ্ন।

চৈত্রমাসের ফুরফুরে হাওয়া বইছিল দক্ষিণ দিক দিয়ে। রামচন্দ্রের চোখেমুখে লাগছিল এলোমেলোভাবে। আরাম, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা সব মিলিয়ে কেমন একটা আচ্ছন্নতায় চোখ বোজা। ঠোঁট শুকনো।

দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল বিভীষণ। রামচন্দ্রের মুখে একটা উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে মাটি মাড়িয়ে রামচন্দ্রের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বিভীষণ বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল। মনের মধ্যে তার অনেক যুক্তিহীন উল্টোপাল্টা কথা কাজ করে যাচ্ছিল। বিভীষণ চুপচাপ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রামচন্দ্র কিন্তু তার উপস্থিতি টের পেল না। বিভীষণ গাঢ়স্বরে ডাকল ঃ সখা রামচন্দ্র !

রামচন্দ্র চমকাল না। আস্তে আস্তে চোখ খুলল। ধীর ও গম্ভীর গলায় বলল ঃ তুমি প্রাসাদে যাও নি ?

যাচ্ছিলাম এই পথে। তোমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আর এগোতে পারলাম না। কেমন একটা কষ্ট হল বুকের ভেতর। কিন্তু এত ভাবছ কি ? তুমি কোন সমস্যায় পড়েছ ?

রামচন্দ্র বিভীষণের প্রশ্নে একটু থতমত খেল। অপ্রস্তুতভাবে হাসল। ইতস্তত করে বলল ঃ না, ও কিছু নয়।

বিভীষণের মনটা কোথায় যেন ধাক্কা খেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল ঃ মনের ভেতর তোমার যে ঝড় উঠেছে সে'ত আমি জানি।

রামচন্দ্র নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে রইল বিভীষণের দিকে। শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল ঃ কি জান ?

বিভীষণের দুই চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল। বলল ঃ রাবণের ক্রোধ থেকে বৈদেহীকে বাঁচানোর প্রয়োজনে তুমি তাকে বাল্মীকির উৎপলারণ্যের আশ্রমে রেখে

এসেছ। আর সীতার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পম্পানগরের শবরী এল। চিবুকের নীচে ছোট্ট তিলটি ছাড়া শবরীর সঙ্গে সীতার আর কোন অমিল ছিল না।

বিভীষণ! রামচন্দ্রের এ কোন চমকানো বিস্ময় নয়, চাপা একটা সতর্কতামূলক শব্দ।

বিভীষণ মৃদু হাসল। বলল ঃ শবরীর বিশ্বাস তোমার হাতেই তার মুক্তি। তুমি তার স্বর্গলাভের সিঁড়ি। একথা জেনেই তুমি তার কাছে গেলে, সাহায্য চাইলে। তোমার বিপদের কথা শুনে কি এক দুরন্ত মোহে শবরী রাজি হল পঞ্চবটীতে সীতা সেজে থাকতে।

রামচন্দ্র স্তব্ধ বিস্ময়ে বোবা। আস্তে আস্তে সমর্থন সূচক ঘাড় নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব শান্ত গলায় বলল ঃ আশ্চর্য! কোন্ মন্ত্রবলে তুমি আমার মনের রহস্য ভেদ করলে? সুযোগ সন্ধানী দেবতা ঋষিরা পর্যন্ত পারল না আমার মনের গহণে ঢুকতে। আর তুমি কেমন অক্লেশে আমার সেই ধন চুরি করলে?

শবরীর গোপন নারী নক্ষত্র পর্যন্ত জেনেছ। তোমার কাছে আমার গোপন কিছু নেই। তারপর একটু থেমে হতাশ গলায় বলল ঃ শবরী আমার জীবনের এক কাঁটা।

কাঁটা কেন বলছ সখা?

বিভীষণের প্রশ্নের কি জবাব দেবে রামচন্দ্র? সব কথা খুলে বলতে মন সায় দিল না। ভারী অস্বস্তি বোধ করল। নিজের দ্বিধা এবং সংশয়ের এক অন্ধকূপের ভেতর তলিয়ে গিয়ে আর কোন আত্মজন কিংবা সুহৃৎ নয়, বিভীষণকেই তার একমাত্র ত্রাণকর্তা মনে হল। বিভীষণের কৌতুহল প্রকাশ খুবই ইংগিতপূর্ণ। সমস্যা সমাধানের গোপন রহস্য হয়ত বিভীষণ জানে। তাই নির্জন সন্ধ্যায় তাকে একান্ত একা পেয়ে সেইকথা বলতে এসেছে। রামচন্দ্র আর দ্বিধা করল না। খুব সহজ কণ্ঠে বলল ঃ সে বেঁচে থাকলে আমি ছোট হয়ে যাব। ঘটনার রহস্য সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। বৈদেহীকে লাভ করাও এক সমস্যা হবে। অথচ, যুদ্ধের পরের ক্লান্ত দিনগুলিতে তাকে কাছে পাওয়ার জন্যে মন আমার অধীর হয়েছে। কিন্তু শবরী সেই সুখের পথ আগলে রেখেছে। শবরীরূপী সীতার সম্পর্কে লোকের মনে যে সন্দেহ জমেছে তার নিষ্পত্তি করব কেমন করে? গোপনে এই পরিবর্ত্তন হতে পারত। লোকেও বুঝতে পারত না। কিন্তু অশোকবনের বন্দিনী নকল সীতাকে নিয়ে লোকের মনে যে সন্দেহ, সংশয় রয়েছে, অপবাদ এবং দুর্নাম দিয়ে তার ভূত তাড়াব কি করে? লোকমুখের সেই দুর্নাম শুনলে বৈদেহী লজ্জায় অপমানে ঘেন্নায় প্রাণত্যাগ করবে। তাই জনসমক্ষে দিবালোকে এমন এক নজির সৃষ্টি করতে চাই যাতে লোকর মনের এই সন্দেহ ঘুচবে এবং শবরী বৈদেহী হয়ে উঠবে। এরকম একটা প্রত্যয় সৃষ্টি করতে হবে।

বিভীষণ রামচন্দ্রের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়েছিল। বুঝবার চেষ্টা করছিল তার মনোভাবটা কি? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভ্রূকুটি গম্ভীর মুখে বলল ঃ অর্থাৎ লোকচক্ষুর সামনে শবরীকে সীতা করার এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে হবে।

বিস্ময়টাকে লুকিয়ে রামচন্দ্র কিছুটা অপ্রতিভভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল : অনেকটা এরকমই। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্তিমিত কণ্ঠে বলল : ঈশ্বর সহায় হোন্ তোমার।

বিভীষণ যেন রামচন্দ্রের মনের কথা শুনতে পেল। একটু ইতস্তত করে বলল : উৎপলারণ্য থেকে বৈদেহীকে গোপনে পুষ্পক বিমানে নিয়ে এস। এর মধ্যে আমি চিতা প্রস্তুত করে রাখছি।

রামচন্দ্র অবাক স্বরে বলল : সখা কি করবে ?

প্রাসাদের গুপ্ত সুড়ঙ্গের পথ যেখানে শেষ হয়েছে তার বহির্দ্বারের উপর সুউচ্চ বেদী করে চিতা প্রস্তুত করা হবে। তারপর, অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেলে সুড়ঙ্গের ঐ বহির্দ্বার দিয়ে বেদীর উপর বৈদেহী আত্মপ্রকাশ করবে। দূর থেকে মনে হবে চিতা থেকে যেন উঠে এল বৈদেহী।

রামচন্দ্র স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল : চমৎকার।

লঙ্কার দক্ষিণে মহাশ্মশান লোকে লোকারণ্য। এর পাশেই মশান। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের এখানে মৃত্যুদণ্ড হয়। আর তাদের শবদেহ দাহ করা হয় ঐ শ্মশানে। শ্মশানের পিছনে সাগর।

অনেককাল মৃত্যুদণ্ড কারো হয়নি। রাবণের প্রভাবে রাজ্য সুশাসিত ছিল। দুষ্কর্ম করার লোকের অভাব। দক্ষিণ মশান আর শ্মশান এখন কিংবদন্তীর মত লোকের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। আজ সেখানে অশোকবনে বন্দিনী সীতার অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে শুনে কাতারে কাতারে লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। মেয়েদের দল ভারী। তাদের উৎসাহটা সবচেয়ে বেশি।

সাগরের তীর ঘেঁষে উঁচু বেদী। সেখানে স্তরে স্তরে কাঠ সাজিয়ে চিতা করা হয়েছে। ঘৃত মধু থরে থরে বেদীতে রাখা আছে। ওগুলো চিতায় দেবার জন্যেই আনা। এছাড়া আরো কিছু কাঠ বেদীর উপর মজুত করা আছে।

ভিড়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বলল : এত বয়স হল, অগ্নিপরীক্ষা জিনিসটা কানে শুনেছি, চোখে দেখিনি।

পাশের একজন লোক তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বলল : এবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে যেতে পারবে।

অনেক কিছুই এখন দেখবে। বলি, চোখে সর্ষে ফুল দেখেছ ?

সর্ষে ফুল'ত চোখে হামেশাই দেখতে পায়। প্রথম ব্যক্তি।

তুমি একটা বেরসিক। রসবোধ নেই। তৃতীয় ব্যক্তি।

আরে বুড়ো ও সর্ষে ফুল নয়। এ হল নিজের চোখের মনিতে সর্ষে ফুল দেখা। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

দূর বোকা, নিজের চোখের মণি কেউ কখনও দেখতে পায়? প্রথম ব্যক্তি।

এই অগ্নি পরীক্ষাটাও ঐ রকম ব্যাপার। তৃতীয় ব্যক্তি।

মানে তোমার চর্মচোখে কিছু দেখতে পাবে না। অথচ অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

তার মানে চিতা জ্বলবে না, সীতাও পুড়বে না। প্রথম ব্যক্তি।

নিজের অমন সুন্দর বৌকে কেউ জলজ্যান্ত পুড়িয়ে মারে? এ হল কথার ভেলকি? তৃতীয় ব্যক্তি।

আগুনের ধর্ম হল দহন করা। আগুনের এক নাম সর্বভুক। সে জল পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

তোমরা নাস্তিকের মত কথা বল। ধর্ম সত্য এগুলো চিরকাল আছে এবং থাকবে। এগুলো আগুনে পোড়ে না। জলে ডোবে না।

আমার ভাই কেমন সন্দেহ হচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি।

সন্দেহর কি আছে? সীতা যদি সত্যি সতী হয় তা-হলে অগ্নিতে পুড়বে না। প্রথম ব্যক্তি।

তোমার মুণ্ডু। অগ্নির প্রাণ বুদ্ধি অনুভূতি কিছু আছে? আগুনে ঝাঁপ দিলেই তাকে পুড়ে মরতে হবে। তবু যে খেলাটা কি—কিন্তু বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

এরা যখন নিজেদের মধ্যে কথায় মশগুল, তখন হঠাৎ জনতার মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। ঐ আসছে, ঐ আসছে রব উঠল।

সকলে ঘাড় উচু করে দেখতে লাগল। অত্যুৎসাহীরা উঠে দাঁড়াল। আবার তাদের একদল বসানোর জন্য চিৎকার, চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি করল।

তাহলে ব্যাপারটা ধোঁকা নয়। প্রথম ব্যক্তি।

আরে কি হয় দ্যাখই না। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

মঞ্চের উপর রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণ এবং কিছু ঋষি ছাড়া আর কেউ ছিল না। রামচন্দ্র জনতার দিকে করজোড় করে বলল: হে আমার প্রিয় লঙ্কাবাসী এবং আমার সুহৃদবর্গ, আজ অশোকবনে বন্দিনী সীতার সতীত্ব নিয়ে মানুষের মনে যে কুসন্দেহ এবং হীন সংশয় জমেছে তার স্খালন করতে সীতা সর্বসমক্ষে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে। অগ্নি কখনও মিথ্যে বলে না, আগুনে কারো মুখোশ হয় না। একমাত্র অগ্নিতে সত্য নিরূপিত হয়। আপনারা তাকে আশীর্বাদ করুন, অগ্নির কাছে প্রার্থনা করুন।

রামচন্দ্রের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। লক্ষ্মণ ঘৃতাহুতি দিয়ে অগ্নিশিখাকে প্রদীপ্ত করল। সীতা নির্বাক। স্থির দুই চোখে

কিসের একটা প্রশান্তি যেন তাকে আরো সুন্দর এবং দীপ্তিময়ী করেছে। রামচন্দ্রর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করল। ঋষিদের আশীর্বাদ নিল। চিতা প্রদক্ষিণ শেষ করে জনগণের দিকে ফিরে তাকাল। মুখে তার নির্মল হাসি। কঠিন প্রত্যয়। ছোট্ট করে সকলের উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার জানিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করতে করতে অগ্নিতে প্রবেশ করল। নিমেষে অগ্নি তাকে গ্রাস করল।

জোরে জোরে ঢাক, ঝাঁঝর, ঘণ্টা, শঙ্খ বাজতে লাগল। সীতার আর্তনাদ তার কাতর আর্তি শব্দের ভেতর চাপা পড়ে গেল।

একি দেখলাম! এমন করে কেউ স্বেচ্ছায় মরতে পারে? ইস্, আমি আর তাকাতে পারছি না। প্রথম ব্যক্তি।

মেয়েটার মুখে একটু ভয় কিংবা আতঙ্ক ছিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

সতী সাধ্বী মা আমার। ওকে অগ্নি স্পর্শ করবে না। প্রথম ব্যক্তি।

দেহটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। তবু আগুনের শিখা লক লক করছে ওর সর্বাঙ্গে। তৃতীয় ব্যক্তি।

মেয়েটা মরেই গেল। আগুনে পুড়লে কেউ বাঁচে কখনও? চতুর্থ ব্যক্তি।

ঈশ্বরের করুণায় অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়। ঈশ্বরের করুণা ও পাবেই। প্রথম ব্যক্তি।

আমাদের মনের পাপ সন্দেহ পরীক্ষার জন্যে অগ্নি ছলনা করছে। আমাদের প্রার্থনায় ও বেঁচে উঠবে। তৃতীয় ব্যক্তি বলল।

দূর বোকা। ও আর কোনোদিন বাঁচবে না। আগুন নিভে গেছে। দেহ ছাই হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি।

মেয়েটা তা-হলে কুলটাই ছিল। চতুর্থ ব্যক্তি।

আগুন নিভে গেলে সকলে কেমন হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। জনগণের সকলে বেশ একটা দুঃখ এবং কষ্ট অনুভব করল। মেয়েরা কেবল নিজেদের ভেতর সীতার সতীত্ব নিয়ে নানারকম কুৎসিত মন্তব্য করল, কেউ কেউ ব্যাঙ্গ বিদ্রূপও করল। জনতার মধ্যেও বেশ কোলাহল।

ঢাক, ঢোল, কাঁসর বাদ্য থেমে গেছে।

প্রথম ব্যক্তির চোখ চিতার উপর জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল।

চতুর্থ ব্যক্তি বলল: কি-গো বুড়ো, আর কেন? বাড়ী চল। তোমার সীতা আর ফিরে আসবে না। আগুনে পুড়ে তার দেহ ছাই হয়ে গেছে। ঐ দ্যাখ লক্ষ্মণ জল ঢেলে চিতা নেভাচ্ছে।

অভিভূত আচ্ছন্নস্বরে প্রথম ব্যক্তি বলল: মনে হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে। রামচন্দ্র

উচ্চৈস্বরে মন্ত্রপাঠ করছে। শুনতে পাচ্ছ গুরু গুরু করে মাটির মধ্যে শব্দ হচ্ছে। অগ্নিদেবের ঘুম ভেঙেছে। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আমি তার পদধ্বনি টের পাচ্ছি।

চতুর্থ ব্যক্তি হাসতে হাসতে বলল : পাগল! পৃথিবীতে যে কতরকম পাগল আছে।

প্রথম ব্যক্তি সহসা উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠল। উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বলল : ঐ দ্যাখ নাস্তিক, নিজের চোখে দ্যাখ ঈশ্বরের অপার মহিমা। সতী সাধ্বী মা আমার চিতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার হাসির ঝরণা।

জনতা দৃষ্টি ফেরাল। বেদীর দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিতেই তীব্র আবেগে কেঁপে উঠল। নিঃশব্দ পায়ে সীতা রামচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ে আবেগে রামচন্দ্র বোবা। সীতার দুই চোখ রামচন্দ্রের চোখের উপর ছড়ানো। তন্ময় হয়ে দেখছে তাকে। অধরে স্ফুরিত হাসির মাধুরিমা।

উজ্জ্বল চাঁদের মত সীতার স্নিগ্ধ মুখশ্রী দর্শকদের নিয়ে গেল কোন ঊর্ধ্বলোকে। মহৎ উদার এক অনুভূতির রাজ্যে। আশ্চর্য একটা অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে তারা মুগ্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। বিশাল জনতা নির্বাক। তাদের সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল এক বিহ্বল স্বপ্ন। এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তি নিয়ে জনতা সীতার জয়ধ্বনি করল।

মুহূর্তে অসংলগ্ন আর কেমন বিশৃংখল হয়ে গেল সীতার চেতনা। বিদ্যুৎ চমকের মত শবরীর কণ্ঠকর মৃত্যুর একটা কল্পিত ছবি তার চোখে ভেসে উঠল। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না সীতা। জনতার সামনেই রামের বুকের উপর মাথা রেখে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ল। রামের প্রশস্ত বুকের উপর বারংবার মাথা ঠোকে আর বলে : এ তুমি কি করলে? শবরীকে হত্যা করে তুমি কোন্ পুণ্য অর্জন করলে? ভালবাসা হল বিশ্বাস। যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে ভালবাসাও নেই। বিশ্বাস গেলে মানুষ কি নিয়ে থাকবে?

পরম আদরে সীতার মাথাটা বুকের ভেতর চেপে ধরে রামচন্দ্র অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় ডাকল : সীতা! সীতা!

রামচন্দ্রের বুকে মাথা রেখে ভেজা গলায় বলল : স্বামী আজ আমার মত দুর্ভাগিনী কে আছে? স্বামীর উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু কি করব বল, তুমি আমার বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিয়েছ। আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্য হারিয়েছি। সে সাম্রাজ্য হল বিশ্বাস। আজ যাদের কথা বিশ্বাস করে তুমি বালীকে শরবিদ্ধ করলে আর শবরীকে জী

করলে কাল তাদের কথা শুনে আবার আমাকে যে হত্যা করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায় ? আজ যারা প্রশ্রয় পেল, যারা জয়ী হল, তারা তোমার দুর্বলতা, ভীরুতাকে জানল। আগামীকাল একেই তাদের প্রতিহিংসা প্রতিশোধের অস্ত্র করে তুলবে। স্বামী, তীর একবার ছুঁড়লে সে আর ফিরে আসে না।

সীতার দিকে কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল ঃ বৈদেহী তোমার অবুঝ হলে চলে ? জনতার শত সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে তোমার আমার এ ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা দীর্ঘক্ষণ শোভা পায় না। জনতার জয়ধ্বনি এবং কোলাহলের মধ্যে আমাদের কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পাচ্ছে না ঠিকই, তবু দৃষ্টিকটু কোন কাজ আমাদের মানায় না।

সীতা রামচন্দ্রের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল ঃ স্বামী, আমি জানি তুমি সৎ-মহৎ-ধার্মিক বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। তবু তোমার একটা ভুলে বালী ও শবরীর মৃত্যুটা আমার ও তোমার প্রেমের মধ্যবর্তী হয়ে রইল। আমাদের সকল সুখের কাঁটা। কোনদিন এই স্মৃতি মুছে যাবে না। আমরাও সুখী হব না। আমার চোখের জলও বোধ হয় কোনকালে শুকোবে না। লঙ্কার অজস্র মানুষের মৃত্যুর এই মহোৎসব আর তাদের স্বজনের পাথর চাপা দীর্ঘশ্বাস আমার জীবনের এক অভিশাপ। অবরুদ্ধ আবেগে আর কিছু বলতে পারল না সীতা। দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামল। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল বৈদেহীর দৃষ্টি।

পরাভবের গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল রামচন্দ্রের মন। উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাসে মিশে রইল তার বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করা এক দীর্ঘশ্বাস।

॥ সমাপ্ত ॥

লঙ্কার রাজবংশ

সুকেশ
মাল্যবান>সুন্দরী (স্ত্রী)
সুমালী>কেতুমতী (স্ত্রী)
মালী>বসুদা (স্ত্রী)
৬ পুত্র
৪ কন্যা
অনল
অনিল
সম্পাতি
কৈকসী*
রাকা
কুম্ভনসী
প্রহস্ত
অকম্পন
+৬ পুত্র
বিশ্রবা মুণি (স্বামী)
খর
দুষণ
*কৈকসী
দেববর্ণী
কুবের
দশগ্রীব/রাবণ
কুম্ভকর্ণ
বিভীষণ
শূর্পণখা
মন্দোদরী
মেঘনাদ
অতিকায়
অক্ষকুমার